আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

# পিনাডিদা সমগ্র

# পিন্‌ডিদা সমগ্র

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

AMARBOI.NET

দে'জ পাবলিশিং
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

## সূচি

**উপন্যাস**

লিডার বটে পিন্‌ডিদা ৭

**গল্প**

পিন্‌ডিদার ফুটবল ৭৩
পিন্‌ডিদার বিচার ৭৯
পাঁটার ঘুগনি ৮৯
চিকেন রোস্ট ৯৫
পিন্‌ডিদার সিংহ ১০৪
পিন্‌ডিদার চণ্ডীপাঠ ১১১
পিন্‌ডিদার তেলতত্ত্ব ১২৩
মোগলাই পরোটা সঙ্গে কোর্মা ১৫৫
পিন্‌ডিদার মানবিক ভূত ১৬২
পিন্‌ডিদা ও মা উৎকোচেশ্বরী ১৭৪
পিন্‌ডিদার মেনু ১৯২
যাঃ কলা! ২১১
পিন্‌ডিদার মগজ ডাকাতি ২৪৭
পিন্‌ডিদা : হেভিওয়েট্ ফুটবল ২৪৭
পিন্‌ডিদার দেড় ব্যাটারি ২৬৮

PATHAGAR.NET

# লিডার বটে পিন্‌ডিদা

মুশকিল হয়েছে আমার। হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার এখনো দেড় মাস বাকি। আমার মতে দেড় মাস সময় সমুদ্রের মতো অঢেল সময়। দেড় মাস ছেড়ে দেড় দিন বাদে পরীক্ষা হলেও আমার দিক থেকে কোনো উদ্‌বেগের কারণ নেই। স্কুলে সব পরীক্ষাতেই বরাবর ফার্স্ট হয়ে এসেছি। সেকেন্ড বয় আমার থেকে সব সময়েই কম করে একশো নম্বর পিছনে। সব কটা পেপারে এক জিনিস। বারবার রিভিশন করতে করতে আর লিখতে লিখতে আমার মুখে ফেনা আর হাতে প্যারালিসিস হওয়ার দাখিল। তবু বাড়িতে এমন অবস্থা আমার যে আমি যেন একটা ফেল করা ছাত্র। বাবা আমাকে ডেকে গম্ভীর মুখে বলে, সোনা, এখন তুমি হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দিতে যাচ্ছ মানেই অ্যাডাল্ট হতে যাচ্ছ। পরীক্ষা পর্যন্ত আড্ডা-টাড্ডা দেওয়া আর খেলার স্বপ্ন দেখা ছাড়ো —মনে রেখো এটা তোমার লাইফের টারনিং পয়েন্ট। এ-সময় আপাত-আনন্দ বড় করে দেখলে ঠকবে।

অনেক দিন ধরেই লক্ষ্য করছি, আমার বাবা খুব সিরিয়াস হলেই আমাকে তুই ছেড়ে তুমি করে বলে।

বিকেলেও একটু বেরুবার উপক্রম করলেও মায়ের যেন চোর-ধরা মুখ। —অ্যাঁ? সোনা! কাল বাদে পরশু তোর পরীক্ষা আর তুই হাওয়া খেতে বেরুচ্ছিস?

অগত্যা ও-ঘরে বাবাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে হয়, সকালে পড়েছি, দুপুরে পড়েছি, মাঝে বিকেলেও একটু বেরুবো না? তোমরা কি পরীক্ষা-পরীক্ষা করে আমার মাথাটা খারাপ করে দেবে? আচ্ছা, বাবাকেই জিজ্ঞেস করে এসো, এত পড়ার পরে মাথাটা একটু খালি করার জন্যেও দুই- এক মাইল হেঁটে আসা উচিত কি না—হেঁটে না এলে রাতে আবার পড়লে বসতে স্বাস্থ্যের পক্ষে সেটা ভালো কি মন্দ। যাও জিজ্ঞেস করে এসো, তাতে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে না, তা হলে এক্ষুনি আমি পড়তে বসে যাচ্ছি।

মা তবু বুঝতে চায় না, বলে — হাঁটতে হয়, বেড়াতে হয়, বাড়ির ছাদে বেড়া না।

ও-ঘর থেকে আমার বর্ধমানের নামী ডাক্তার বাবার গলা শোনা যায়, ওকে যেতে দাও। তার পরের কথাগুলো আমার উদ্দেশে, হাঁটতে বেরিয়ে আবার আড্ডা দিতে বসিস না সোনা—হনহন করে দু-আড়াই মাইল হেঁটে চলে আসবি। আসা-যাওয়ায় চার বা পাঁচ মাইল হাঁটতে বেশি হলে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মিনিট লাগতে পারে। বাড়ি ফিরে তারপর দশ মিনিট বিশ্রাম, অল্প স্নান আর এক গেলাস দুধ খেয়ে বই নিয়ে বসবি।

ডাক্তার বাবার প্রেসক্রিপশন মায়ের খুব পছন্দ হয় না। কারণ, মায়ের সন্দেহ, হাঁটার বদলে আমি বন্ধুদের সঙ্গে বসে আড্ডা দিই। সন্দেহটা শতকরা একশো ভাগই যথার্থ। আর মা-ই কেবল জানে চল্লিশ পঞ্চাশ মিনিটের জায়গায় আমি দেড় ঘন্টা না কাটিয়ে বাড়ি ফিরি না।

ঠাকুমা, যে কিছুই বোঝে না, আর একমাত্র নাতিকে সব আপদ থেকে যার বাঁচানোর চিন্তা—বেরুতে দেখলে সে-ও ইদানীং রা কাটে— সোনামণি, তুই চললি কোথায়, তোর না হাই-সেকেন পরীক্ষা— লক্ষ্মীদাদা, এ দুটো দিন পড় মন দিয়ে। ভালো পাস করলে তোকে আমি একটা আস্ত আমসত্ত দেব!

জবাবে বুড়িকে আমার ভেঙচি কাটতে ইচ্ছে করে। ঠাকুমার ধারণা, হাই-সেকেন পাস করলেই আমি একেবারে বিদ্যের জাহাজ হয়ে যাব।

আর, যে মাস্টারমশাই আমাকে বাড়িতে পড়ায়, যে আমার বিদ্যের নাড়িনক্ষত্র জানে আর যার কথা বাবা বেদবাক্য ভাবে তারও এক রা। উঠতে বসতে বলে, সোনা, ডোন্ট ওয়েস্ট প্রেশাস টাইম— তুমি এখন যে-রকম খাঁটি বীজ বুনবে, ভবিষ্যৎ জীবনে সেই রকমই ফসল পাবে।

শুনে শুনে আমার কান ঝালাপালা।

ওদিকে মাঠের দলের সক্কলে ঠাট্টা করে। চটপটি বলে, পরীক্ষা আমরা আর কী দিচ্ছি, পরীক্ষা দিচ্ছে কেবল সোনা। কোনো পেপারে নব্বুই থেকে উননব্বুই হলেই দিন আর রাতের মতো তফাত!

কার্তিক বলে, আমার তো থার্ড ডিভিশন থেকে সেকেন্ড ডিভিশন হলেই দাদারা জিজ্ঞেস করবে টুকলিফাই করেছি কি না। সংস্কৃত-বিশারদ কেবলু ঘুরিয়ে ঠাট্টা করল, সোনা কি আর আমাদের মতো, ওরে আগে মেহনতং পরে সুখং—আমরা হলাম গিয়ে অল্প জলস্য মৎসঃ বেশি ফড়ফড়ান্তি।

এমনকি হাবুল হোঁতকা যার জন্য এই সমস্যা, বাগে পেয়ে সে পর্যন্ত টিপ্পনী কাটতে ছাড়ল না। বলল, সোনার দোষ কী, স্কলারশিপ মিস করলে সোনা পেতল হয়ে যাবে না? না রে সোনা তুই থাক, আমরা কজনে বেরিয়ে পড়ি— কি বলো পিন্‌ডিদা।

পিন্‌ডিদা রত্নটি কে বুঝতেই পারছ। হ্যাঁ, সেই প্রদীপনারায়ণ দত্ত, ব্রেজিলের বাছাই এগারো জনের ফুটবল চূড়ামণি পি.এন. ডি.— যার পায়ে বল পড়লেই অনুরাগীদের আকাশ-ফাটানো চিৎকারে আর উল্লাসে যে পি.এন. ডি. থেকে পিন্‌ডি হয়ে বসেছিল— আর অসময়ে হাঁটুর মালাইচাকি সরে যাওয়ায় যে সেখানকার লক্ষ লক্ষ ফ্যানদের চোখের জলে ভাসিয়ে আর তাদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে এসে এই বর্ধমান বাবুগঞ্জের মাঠের আড্ডায় আমাদের লিডার হয়ে বসেছে—সেই পিন্‌ডি মানে পিন্‌ডিদা। সবজান্তা, সর্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ আমাদের দলের মুকুটমণি পিন্‌ডিদা।

পিন্‌ডিদা সেদিনও এইসব ঠাট্টার সময় তার উঁচু ঢিবির সামনে বসে ভুরু কুঁচকে আকাশ দেখছিল। সেদিকে চেয়েই গম্ভীর মন্তব্য করল, অল ওয়ার্ক অ্যান্ড নো প্লে মেকস স্নাক এ ডাল বয়।

হাবুলের প্রস্তাবের জবাবে চটপটি চিড়বিড় করে উঠল, সোনা না যেতে পারলে প্রোগ্রাম বন্ধ! তোর ওই লাশ সাত মাইল পথ টানবে কে শুনি?

হাবুল অমনি রুখে উঠল, দ্যাখ চটপটি, আমার শরীরের ওপর নজর লাগিয়ে কথা বলবি না— পিন্‌ডিদা সামনে না থাকলে তোর মুন্ডুটা এই মাঠে ঘষে পটপটি বানিয়ে ছাড়তাম।

আমি না গেলে চটপটি বেচারা প্রোগ্রাম বন্ধ করতে চাইতেই পারে। কারণ, ছজনের মধ্যে চারজনের চারটে সাইকেল আছে—আমার, কার্তিকের, চটপটির আর কেবলুর। তার মধ্যে কেবলুর নতুন কেনা পুরনো সাইকেলের এমনি ঝরঝরে দশা যে একলা কেবলুকে নিয়ে ওটা আট মাইল পথ ভেঙে ডেসটিনেশনে পৌঁছুতে পারবে কি না সন্দেহ। তার ওপর সকলের মধ্যে কেবলুই সব থেকে কমজোরি। কাজেই ওর সাইকেলে আর কারো ওঠার প্রশ্ন ওঠে না। আমি না গেলে বাকি রইল দুটো সাইকেল। তার মধ্যে পিন্‌ডিদা বরাবরই কার্তিকের পিছনে চড়ে অভ্যস্ত। সাধারণত আমি থাকলে হেবো হোঁতকার লাশ আমি আর চটপটি পালা করে টানি। এর মধ্যে আমি না গেলে চটপটির একাই ওকে টানতে হবে। সেই জন্যেই আমি না গেলে ওরও যেতে আপত্তি।

ব্যাপার আর কিছুই নয়, হাবুল এর মধ্যে কার সঙ্গে গিয়ে আট মাইল দূরের সেই বাদশা মহলে টহল দিয়ে এসেছিল। নামে মহল কিন্তু আসলে বিরাট একটা পোড়ো বাড়ি। তার চারদিকের বিরাট চত্বরের সবই ওই কবরখানার মধ্যেই আবার বিশাল বাগান। আম জাম জামরুল নারকেল গাছ খেজুর গাছ কী নেই! বর্ধমানের সেরা পেয়ারাও ওই বাদশা মহলেই হত। ওখানে পাহারা বসানোর দরকার হয় না। কারণ, ওখানে ঢুকে উৎপাত করবে এমন সাহস ক জনের?

কিন্তু বছরদেড়েক আগে পর্যন্ত বড় দল করে দু-তিন মাস অন্তর এক একবার সেই বাদশা মহলের চত্বরে ঢুঁ দিয়েছি। যখনকার যা ফল আশ মিটিয়ে খেয়েছি। কিন্তু রাতে শুয়ে থরথর কাঁপুনি। এই বুঝি কবরের ভূতেরা সব উঠে এসে ঘরের মধ্যেই আমাদের ঘাড় মটকায়। গোরস্থানে গিয়ে উৎপাত করলেও বরদাস্ত করবে এরকম নিরীহ ভূত আছে বলে ভাবতাম না। তাই রাতে শোবার

সময় ঠাকুমাকে আঁকড়ে ধরে শুতাম আর ঘুম না আসা পর্যন্ত রাম নাম জপ করতাম। এখন আর অবশ্য অত ভয় নেই, কিন্তু সামান্য ডাব নারকেল জাম জামরুলের জন্য কে আর অত পথ ঠেঙায়!

পিন্‌ডিদার অবশ্য এখন পর্যন্ত একবারও সেই ভূতের আখড়ায় অর্থাৎ বাদশামহলে যাওয়া হয়নি। হয়নি কারণ, আমরা তো দল বেঁধে স্কুল থেকেই সটকান দিতাম। আর তখন পর্যন্ত সদ্য ব্রেজিল ফেরত ফুটবল স্টার পিন্‌ডিদাও এমন জাঁদরেল লিডার হয়ে বসেনি আমাদের।

এর মধ্যে ওই হতভাগা হাবুল সেখান থেকে ঘুরে আসার পরেই তার জিভ লকলক।— আ-হা, কী দেখে এলাম পিন্‌ডিদা, গাছে গাছে পাঁচ কিলো ওজনের সে কি ঘাসের থেকেও সবুজ ডাব—একবারে দুটো খেতে পারবে কি না সন্দেহ। আর কাঁদি-কাঁদি সোনার বরন নারকেল! আর জামরুল? হু-উ-স—দেখে মনে হল থোকা-থোকা রাজহাঁসের ডিম ফুটে আছে, অ্যায়সা বড় আর অ্যায়সা টসটসে। তার উপর আরো যা ছিল না এখন তাই হয়েছে, শশার চাষ করা হয়েছে, একদিকে দেখলাম কি নধরকান্তি কচি শসা সব — হু-উ-স!

হাবুলের কথা শুনে আমাদেরও জিভ খুব শুকনো ছিল না। বিশেষ করে গাছের থেকে কচি শসা ছিঁড়ে খেতে দারুণ ভালো লাগে। পিন্‌ডিদা নিস্পৃহ মুখে মন্তব্য করেছিল, চল্ তাহলে যাওয়া যাক একদিন, মুখ বদলাবার জন্য জলাহার ফলাহার মন্দ কী, তবে এক ব্যাগ টাটকা মুড়ি নিতে হবে। শসা আর নারকেল দিয়ে টাটকা মুড়ি এমনকি খারাপ—গলা শুকোলে ডাবের জল আর জামরুল—একটু নতুন তো হবেই, বিনোদ ব্যাটার চপ-কাটলেট খেয়ে খেয়ে পেটে ক্যানসার ধরে গেল। তা ছাড়া বাদশামহলের দুই-একটা ভূত-টুতের সঙ্গেও যদি দেখা হয়ে যায়—কতকাল ভূত দেখি না তার ঠিক আছে!

জলাহার ফলাহার ভুলে আমি বলে উঠেছিলাম, কতকাল ভূত দেখো না মানে—তুমিই কি কখনো ভূত দেখেছ নাকি?

পিন্‌ডিদা আমার দিকে অবাক চোখে খানিক তাকিয়েছিল—

আমার বয়স কত হল বল দেখি?

আমি আমতা আমতা করে জবাব দিয়েছিলাম, ছাব্বিশ বা ছত্তিরিশ হতে পারে।

পিন্‌ডিদার ওই প্যাঁকাটির মতো চেহারা দেখে বয়েস ঠাওর করা সত্যি শক্ত।

শুনে পিন্‌ডিদার মুখে পিত্তি জ্বালানো হাসি। যেন এমন ছেলেমানুষ আর দেখেনি। বলল, দু হাজার দুশো বা তিন হাজার দুশোও হতে পারে। পুরুষ মানুষের বয়সের হিসেব হয় তার অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝলি? বছর গুনে নয়—

মোসাহেব হেবো তক্ষুনি তারিফ করে উঠেছিল, যা বলেছ পিন্‌ডিদা! তোমার কি আর বয়সের গাছপাথর আছে! ওরাই শুধু চিনল না তোমাকে।

জলাহার ফলাহারের প্রস্তাব শুনে কেবল কার্তিক চটপটির আর ভূতের কথা শোনার ধৈর্য নেই। চটপটি বলে উঠল। পিন্‌ডিদা যে ভূতের কাছাকাছি একজন আমরা জানব কী করে? যাক, বাদশামহলে কবে যাওয়া হবে বলো?

কার্তিক বলল, দিন ঠিক করে ফেলাই ভালো, আমার সাইকেলটার একটা স্পোক ভেঙে পড়ে আছে, বদলে নিতে হবে— দিন ঠিক হলে দোকানে দেব।

কেবলু বলল, ভূতং অতীত কথাঃ— বর্তমানে জলাহারং ফলাহারং সারঃ কথা—দিন ঠিক করো পিন্‌ডিদা। শুভস্য শীঘ্রম্।

নির্লিপ্ত মুখে পিন্‌ডার মন্তব্য, এ কি আর মাউন্ট এভারেস্ট এক্সপিডিশান না ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরে পার হওয়া— একদিন হলেই হল—সামনের শনিবারে যাওয়া যেতে পারে।

সেদিন সবে মঙ্গলবার। মঙ্গলবারের বিকেলে মাঠে বসে শনিবারের বারবেলায় বেরুবার এ

প্রস্তাব কেন যেন আমার ভালো লাগল না। সেদিকে না গিয়ে আমি বলে ফেলেছিলাম, কিন্তু আমার যে পরীক্ষা ... মানে ... মা-ঠাকুমা-বাবা-মাস্টারমশাই দস্তুরমতো আমাকে গার্ড দেয়— বেরুবো কী করে?

জবাবে পিন্‌ডিদা তির্যক দৃষ্টিতে একবার আমার দিকে তাকিয়ে হাসি চাপার জন্য যেন অন্য দিকে মুখ ফিরিয়েছিল। আর তার পরেই অন্য সকলের এই হুল ফোটানো টিকা-টিপ্পনী।

পরের দিনও ওদের হুলে বিদ্ধ হয়ে মরিয়া হয়েই বলে ফেলেছিলাম, ঠিক আছে যাব।...তবে গোরস্তানে শনিবারে যাওয়ার দরকার কি, অন্য কোনো দিন ঠিক করো

এবারেও পিন্‌ডিদার সেই গা জ্বালানো মুচকি হাসি। বলল, তুই তোদের পুরুত ডেকে শান্তি স্বস্ত্যয়ন করে একটা দিনক্ষণ ঠিক কর তাহলে। তবে শনিবার না হলে আমার যাওয়া হবে না। শনি মঙ্গলবার ছাড়া শুনেছি ভূতেরা বেরোয় না। আমি কি শুধু ডাবের জল খাওয়ার জন্যে তোদের সঙ্গে বেরুতে চেয়েছি!

চটপটি বলে উঠল, সোনা, তোকে না আমরা সাহসী ভাবতাম! এই সাহস তোর অ্যাঁ ?

কেবলু পোঁ ধরল, কাপুরুষঃ সদা মরতি, বীরং একবারং!

আমার রাগই হয়ে গেল। ঝাঁঝিয়ে উঠলাম, দ্যাখ্ কেবলং, ফের বকবকং তো তোর মাথা আমি চুরচুরং করি দিবং। ঠিক আছে, শনিবারেই যাবং দেখি কার কত সাহসং।

সকলেই হইহই করে আনন্দ করে উঠল। পিন্‌ডিদা মন্তব্য করল, সোনাকে তোরা যা ভাবিস তা নয়...বুঝলি? একটু কাঁচা হলেও ওর ভিতরে দামি জিনিস আছে।

তার কথায় তক্ষুনি সকলেই সঙ্গে সঙ্গে সায় দিল।

কিন্তু আমি তো কথা দিয়ে বসলাম। তার পরেই ভাবনা। সকলের চোখ এড়িয়ে যাই কী করে। তারপর ঠিক করলাম, সকলের চোখ এড়িয়ে নয়, চোখের উপর দিয়েই যাব। বাড়িতে বলতে হবে, পরীক্ষায় ফার্স্ট সেকেন্ড হবে এমন একটা ছেলের বাড়িতে একসঙ্গে পড়তে যাব। পরীক্ষা-টরীক্ষার ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলা উচিত নয় ভেবে ভেতরটা কিন্তু-কিন্তু করছিল! তবু এ-ছাড়া আর উপায়ই বা কী! বিপাকে পড়ে স্বয়ং যুধিষ্ঠিরও কি ঘুরিয়ে মিথ্যা কথা বলেনি!

পরের দিনের মাঠের আড্ডায় পিন্‌ডিদা চিমটি কাটার সুরে আমাকে জিজ্ঞেস করল, কী রে সোনা, তোর মতটত বদলায়নি তো ? আমি ভাবছিলাম, আজ আবার এসে না বলিস রাতে বাদশামহলের গোরস্থানের ভূত ঘুমের মধ্যে তোর ঘাড় মটকাতে এসেছিল...তাই যাবি কি যাবি না ভাবছিস!

হেবো হোঁতকা খিলখিল করে হেসে উঠল। আর আমার পিত্তি আরো জ্বলে গেল। কিন্তু কিছু না বুঝতে দিয়ে বললাম, না, স্বপ্ন-টপ্ন কিছু দেখিনি, তবে পরীক্ষার চাপে কিছু কাহিল হয়েছি তো, আর বেশ দুর্বলও লাগে এখন— বেশি ধকল সহ্য করতে পারব না, আমার সাইকেলের পিছনে এবারে তুমি চাপছ।

মতলব না বুঝে হাবুল গোল গোল চোখ করে একবার আমার দিকে তাকালো, একবার পিন্‌ডিদার দিকে।

আমার কথা শেষ হতেই ওদিক থেকে চটপটি আঁতকেই উঠল একেবারে। সত্রাসে বলে উঠল, কেবলু তো পারবেই না — নিজের সঙ্গে ও মুড়ির ব্যাগ বইতে পারলেই হয়— তাহলে হাবুল আমার তার কার্তিকের ঘাড়ে পড়বে...কার্তিকের হিম্মত জানা আছে। দরকার নেই পিন্‌ডিদা, আমার নামটা ছেঁটে দাও, তোমরাই আনন্দ করে বেড়িয়ে এসো।

চটপটি এ-রকম বলবে জানা কথাই। কারণ, সকলে একসঙ্গে সাইকেলে বেরুলে হাবুলকে চারভাগের তিনভাগই আমাকে টানতে হয়। হেবোর থলথলে মুখখানা এখন দেখার মতো হয়েছে,

কিন্তু আমি সোজা দেখছি না, টেরিয়ে দেখছি। নরম গলায় চটপটির ভুল শুধরে দিলাম, হাবুল ঘাড়ে চাপতে যাবে কেন, পিছনের ক্যারিয়ারে তো বসবে।

—থাম্ থাম্, ওর নামই ঘাড়ে চাপা— পাঁচ মিনিটের মধ্যে বুকটা হাপর ওঠে। আমি স্রেফ কাট!

আমারই যেন সমস্যা। সমাধান মাথায় আনতেও সময় লাগল না। বললাম, তাহলে আর কী করা যাবে পিনডিদা, হাবুল তো এই সেদিন বাদশামহল থেকে ঘুরে এসেছে, এরই মধ্যে আবার যাবার দরকার কী সকলের অসুবিধে করে— আমরা না হয় ওর জন্যে নারকেল জামরুল শসা নিয়ে আসবখন।

হেবো হাতির থমথমে মুখ। পারলে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু পিন্‌ডিদা রায় না দেওয়া পর্যন্ত তার শ্বাস-প্রশ্বাসও বন্ধ মনে হচ্ছিল! কিন্তু সেয়ানা বটে পিন্‌ডিদা। হঠাৎ আকাশের দিকে মুখ তুলে হা-হা শব্দে হেসে উঠল। তার পরে হাসি থামিয়ে ছদ্ম কোপে হাবুলের দিকে তাকালো। —এই বুদ্ধি নিয়ে তুই আমাদের সোনার সঙ্গে লাগতে যাস? অ্যাঁ? আমি ওই কথা বললাম বলেই তুই অমনি খিক-খিক করে হেসে উঠলি? ও-যে তোকে এক হাটে কিনে আর এক বেচে আসতে পারে এখন সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝছিস তো? তার পর আমার দিকে ফিরল, যাক সোনা, ক্ষমা-ঘেন্না করে দে—তোর ঠাট্টা বোঝার মগজও ওর নেই।

লিডারের এমন মন্তব্য শুনে হাবুলই বা করে কী। সবটাই দেরিতে-বোঝা রসিকতার ব্যাপার ধরে নিয়ে সে-ও হাসতে লাগল।

পিন্‌ডিদা এবারে কাজের কথায় এলো। কার্তিককে জিজ্ঞেস করল, তোর সাইকেলের স্পোক সারানো হয়েছে?

কার্তিক বলল, এখনো তো ঢের সময় আছে—হয়ে যাবে।

পিন্‌ডিদা উপদেশ দিল, কিছুই শেষের জন্য ফেলে রাখতে নেই। ঠিক করে নে—

আমি চটপটিকে বললাম, সাইকেল অনেকদিন ধুরাছোঁয়া হয়নি। তখন সাইকেলের পিছনে লাগলে বাড়ির লোকের সন্দেহ হবে—দরকার আছে বলে বার করে তুই নিয়ে একটু দেখেশুনে রাখিস।

একটু বাদে গলার সুরে বেশ আন্তরিকতা মিশিয়ে পিন্‌ডিদা বলল, দ্যাখ্, আমরা সাত্ত্বিক জলাহার ফলাহার করতে যাচ্ছি বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সোনার পরীক্ষার সুফলের জন্য আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছাও থাকবে। তাই টাটকা গরম মুড়ি সোনার পয়সাতেই কেনা ভালো। আর জলাহার ফলাহারের পর একমাত্র দুধের জিনিসটাই চলতে পারে—তাই কিছু কড়াপাকের ভালো সন্দেশও সোনার তো নিতেই হবে—ওর পরীক্ষা তো আর তোদের পরীক্ষা নয়—দস্তুরমতো যাকে বলে জীবনের একটা টারনিং পয়েন্ট। আর নুন লঙ্কাটঙ্কাগুলো তোরা নিস—।

সকলে হইহই করে সায় দিল। আমি রাগে গুম। পিন্‌ডিদা সর্বদাই আমার ঘাড়টাই সব থেকে নরম আর সব থেকে মজবুত দেখে। বেশ বুঝে নিয়েছে, পরীক্ষার নামে আমার কিছু দুর্বলতা আছে। সবসময় সেই সুযোগ নেয়। শুধু ফলাহার জলাহার আর মুড়ি আহারে হবে না, তার সঙ্গে কড়া পাকের সন্দেশ চাই!

কিন্তু পরদিন হঠাৎ বৃহস্পতিবার সকাল হতেই এমন একটা খবর ছড়িয়ে পড়ল যা শুনে বুকের ভিতরে গুরুগুরু সকলেই। কাতারে কাতারে লোক ছুটেছে ঘোষাল বাড়ির দিকে। আমারও শনিবারের প্রোগ্রাম ছেড়ে পরীক্ষার চিন্তাও মাথা থেকে উঠে গেল। ছুটলাম আমিও।

ঘোষাল বাড়ি বলতে জমিদার বাড়ি। এককালে এই বর্ধমানে বিরাট অবস্থা ছিল তাদের। এখন তেমনি পড়ন্ত দশা তাদের। তবু সকলে জমিদার বাড়িই বলে। বিরাট কম্পাউন্ডের মধ্যে প্রাসাদের মতো বাড়িটা ভেঙে-ভেঙে পড়ছে। কম্পাউন্ডের চার দিকে উঁচু দেয়াল। কিন্তু তাও এক জায়গায় ধসে গেছে। আমরা আগের দিনের উৎসব বা পালা-পার্বণের যে-সব গল্প শুনেছি তার চেকনাই

এমন কিছুই নেই। কম্পাউন্ডের ভিতরেই কিন্তু জমিদার বাড়ি থেকে বেশ ফারাকে জমিদারদের দশ পুরুষের গোপাল মন্দির। গল্প শুনেছি নবরত্নের ওই গোপাল বিগ্রহের চোখ দুটো নাকি হীরের। যে দুটো হীরের দাম এই বাজারে কম করে দু লক্ষ টাকা। কিন্তু সেই গোপাল দেখে আমাদের একটুও বিশ্বাস হয়নি। এককালে হয়তো হীরের চোখে ছিল, সেই চোখ নিশ্চয় কবে বেচে খাওয়া হয়ে গেছ। কারণ আমরা যে চোখ দেখেছি সে দুটো কেমন ম্যাড়মেড়ে, খরখরে পাথরের মতো সাদা-সাপটা।

সকালে যে-খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, তার সার কথা, গত রাতে সেই মন্দিরে এক রক্তজলকরা কান্ড ঘটে গেছে। মন্দিরের পুরুত ঠাকুর আজ বিশ বছর ধরে সেই বিগ্রহের পুজো করে আসছে। আমি তাকে অনেক দেখেছি, কারণ আমার বাবা এখনো এই জমিদার বাড়ির পারিবারিক ডাক্তার —কোনো উৎসবে পার্বণে দশটা মাত্র বাড়িতে নেমন্তন্ন হলেও আমাদের হয়। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি হলেও পুরুত ঠাকুরটি বেশ কর্মঠ সবল পুরুষ। হবে না কেন, বারো মাসই গোপালের ঘি-দুধে ভোগ খেলে নধরকান্তি হবারই কথা। অবস্থা যতই পড়ুক গোপালের ভোগ তো আর বন্ধ হয়নি।

সক্কাল হতেই আজ নাকি দেখা গেছে মন্দিরের দরজা দুটো হাঁ করা খোলা। পুরুত ঠাকুর নিখোঁজ। গোপালের চোখ দুটো নেই, দু চোখের জায়গায় শুধু মার্বেলের মতো দুটো ঘষা পাথর গোঁজা। পুরুত ঠাকুর বরাবর লোহার গরাদ দেওয়া দরজায় তালা লাগিয়ে মন্দিরের ভিতরেই শুতো। আর বাইরের দাওয়ায় ঘুমোতো বিহারী দারোয়ান ছট্টুলাল—তার পাশে সর্বদা থাকত চার ফুট লম্বা লোহার ডান্ডা...সেই ডান্ডা ছট্টুর পাশেই পড়ে ছিল। মন্দিরের দাওয়া রক্তে ভাসাভাসি। ছোট্টুর বুকে চার-পাঁচটা ছোরার আঘাত। পুরুত নিখোঁজ। গোপালের চোখে পাথর গোঁজা। এই প্রথম আমরা জানলাম, কালও গোপালের ওই চোখ দুটো ছিল সেকেলে আমলের দামী হীরের। উৎসবে পার্বণে গোপালকে হীরের চোখ পরানো হয়। কিন্তু সেটা খুব কম লোকই জানে। কারণ সেই হীরের বাইরেটাও পাথরের মতো ঘষা-মোছা, কারো বোঝার উপায় নেই গোপাল কখন কোন চোখ পরল। এটা শ্রাবণ মাস, সদ্য সদ্য ঝুলন পূর্ণিমা পার হয়েছে। গোপালের আসল হীরের চোখ এই কটা দিনের জন্য পরানো হয়েছে এ-খবর একমাত্র জানার কথা পুরুত ঠাকুরের আর ঘোষাল বাড়ি অতিবৃদ্ধা গৃহিণীর। সেই হীরের চোখ নিপাত্তা। এত বছরের পুরোহিত নিরুদ্দেশ! আর বাইরে মন্দিরের দাওয়ায় ছট্টুলালের রক্তাক্ত মৃতদেহ। শহরের লোক দিশেহারা হবে না তো কী!

পড়াশোনা মাথায় উঠল। আমি সাইকেল হাঁকিয়ে চলে গেলাম। জমিদার বাড়ির বিশাল আঙিনা লোকে-লোকারণ্য। তার মধ্যে পুলিশ গিসগিস করছে। মাঝে-মাঝে লাঠি উঁচিয়ে তারা ভিড় হটানোর চেষ্টা করছে শুনলাম। ছট্টুলালের মৃতদেহ সরানো হয়ে গেছে। পুলিশ এখন সূত্র সন্ধানের কাজে লেগেছে।

একসময় চোখে পড়ল ভিড়ের মধ্যে এক জায়গায় চটপটি কেবলু কার্তিক আর হাবুল দাঁড়িয়ে। আমি কোনোরকমে জায়গা করে হাবুলের পিছনে সাইকেলের সামনের চাকায় গুঁতো মারতে ও চমকে ফিরল। আমি তক্ষুনি বললাম, তুই, খেয়াল করিনি, লাগেনি তো?

ওদের সকলেরই উত্তেজনা তখন তুঙ্গে। আমার গলা পেয়ে বাকি সকলেও ফিরে তাকিয়েছে। হাবুল বলল, ক্যান্টাভারাস ব্যাপার যে রে সোনা—শেষকালে এত কালের পুরুত ব্যাটা এই কান্ড করল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, পুলিশ বলছে পুরুতের কাজ?

চটপটি জবাব দিল, পুলিশ কেন, সবাই বলছে। ছট্টুলাল যতবড় জোয়ানই হোক, ঘুমের মধ্যে

ছুরি বসালে আটকাবে কী করে! তাও একটা-দুটো ঘা বসায়নি, পাছে বেঁচে উঠে নাম ফাঁস করে দেয় তাই জনার্দন পুরুত কোনো রিস্কই নেয়নি।

কার্তিক বলল, সে যখন নিখোঁজ, ফাঁস হতে আর বাকি থাকল কী?

কেবলু বলে উঠল, অর্থমনর্থম— বাপরে বাপ, হীরের জন্য মানুষ খুন!

আমি জিজ্ঞেস করলাম, পিন্‌ডিদা খবর পায়নি?

হাবুল বলল, ডেকেছিলাম, পিন্‌ডিদা বলল, আমি কোনো খুন-খারাপির মধ্যে নেই। গোপালের চোখে হীরে বসানো হয়েছে যখন একদিন না একদিন রক্তগঙ্গা হবে জানা কথাই।

আমি ভাবছিলাম, গত পরশুদিন এই জমিদার বাড়িতে খুলনের ভোগ খেয়ে গেছি...গোপালের এটাই সব থেকে বড় উৎসব...বৃদ্ধা জমিদার গিন্নি কম খরচ করেনি...কত রকমের জিনিস আমাদের যেচে খাইয়েছে, আর আজ কিনা এই রক্তজল করা ব্যাপার!

ভিড় হালকা হতে লাগল। আমরাও বেরিয়ে এলাম। সাইকেল নিয়ে ওদের সঙ্গে হেঁটেই ফিরছি। ওই পুরুতের মুখখানা আমার চোখে যত ভাসছে ততো অবাক লাগছে। ক্ষীর-ননী খাওয়া নাদুস-নুদুস চেহারা, মুখখানা মিষ্টি মিষ্টি—তার মনে এই থাকতে পারে ভাবাও যায় না।

কার্তিক হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা সোনা, এতবড় একটা ব্যাপার , কিন্তু পিন্‌ডিদা এলো না কেন বলতো?

আমি অন্যমনস্কের মতো জবাব দিলাম, রক্তটক্ত দেখা সকলের ধাতে সয় না, হয়তো ভেবেছিল এসে কী না কী দেখবে।

হাবুল অমনি চোখ পাকালো, তার মানে পিন্‌ডিদাকে তুই ভীতু বলছিস?

অর্থাৎ পিন্‌ডিদার কাছে গিয়ে লগান-ভাগান দেবার একটা মওকা পেল। আমার রাগই হয়ে গেল। বললাম, তোর মাথায় গোবর তাই তুই এই বুঝলি।

হাবুল সমান তালে জবাব দিল, এর মধ্যে বোঝাবুঝির কী আছে—তুই যা বললি তার সাদা মানে পিন্‌ডিদা ভীতু তাই রক্ত দেখতে পারে না।

রাগারাগিটা আরো খানিক গড়াতে পারত, পেছনে চেনা ঝরঝরে শব্দ আর হর্ন কানে আসতে ঘুরে তাকালাম। বাবার গাড়ি। গাড়িটা আমার পাশেই থেমে গেল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাবা রাগত স্বরে বলল, পড়াশুনো ফেলে বেরিয়ে পড়েছ—ওদিকে স্লাডপ্রেসারের বাক্সটা দরকার বলে আমি জমিদার বাড়ির থেকে ফোন করে তুই নেই শুনে আবার আমাকেই ফিরতে হল—কোনো কান্ডজ্ঞান যদি থাকত! জমিদার বাবুর স্ত্রী অজ্ঞান হয়ে আছেন, ব্যাপার সুবিধের নয়—আমি বাড়ি না থাকলে তোর হুটহাট বেরুনো চলবে না—যখন তখন দরকার হতে পারে।

বিরক্ত মুখে বাবা ড্রাইভারকে হুকুম করল, চলো—

গাড়িটা বেরিয়ে গেল। আমি আড় চোখে একবার হাবুলের দিকে চেয়ে বললাম, কালকের মধ্যে বুড়ি ভালো না হয়ে উঠলে আমার পরশু বাদশামহলে যাওয়ার বারোটা বেজে গেল।

চটপটি আমাকে আশ্বস্ত করার মতো করে বলল, কালকের মধ্যে বুড়ি ঠিক ভালো হয়ে যাবে দেখিস—

আমি ওকে চোখ টিপে দিয়ে বললাম, কে জানে কী হবে, একে হীরের শোক—দাম তো আর কম নয়, এখন দু লক্ষ টাকা হবে শুনছি—তারপর জলজ্যান্ত পুরনো লোকটা খুন—বুড়ি ঠিক ধরে নিয়েছে তার গোপালের কোপেই এমনটা হল—একদিন ছেড়ে তিন দিন অজ্ঞান হয়ে থাকাও আশ্চর্য কিছু নয়।

চটপটি আমার ইশারা বুঝেছে। গলা শুকিয়ে বলল, তাহলে কী হবে—এদিকে আমাদের যাওয়া তো সব ঠিক, ওদিকে তোর কথামতো আমি তো টাটকা মুড়িরও অর্ডার দিয়ে ফেলেছি, সন্দেশের অর্ডার তুই দিবি বলেছিলি—

আমি বললাম, কী আর হবে, তোরা যাবি—মুড়ির দাম না হয় আমি দিয়েই দেব—পিন্‌ডিদার কথা তো আর আমি অমান্য করতে পারি না।

হাবুল অমনি বলে উঠল, কড়া পাকের সন্দেশ? সেও তো তোর দেবার কথা।

আমার কিছু বলার দরকার হল না। চটপটিই খেঁকিয়ে উঠল, তোর কি চোখের পর্দা বলে কিছু নেই হেবো, সোনা যেতে পারবে কি পারবে না সে জন্যে চিন্তা নেই—কড়া পাকের সন্দেশের কথাই তোর আগে মনে পড়ল? সোনা যেতে না পারলে যে তোরও যাওয়া হবে না সেটা ভেবেছিস?

হাবুলের এবার সত্যি মুখ শুকালো। না, এটা তার সত্যিই মাথায় ঢোকেনি। আমতা আমতা করে বলল, তাহলে সোনার যাতে যাওয়া হয় স জন্য ইচ্ছাপুরণ কালীর কাছে সোয়া পাঁচ আনার পুজো দিয়ে আসব?

কীভাবে ওকে ঘায়েল করা হচ্ছে এতক্ষণে কার্তিক ওরাও বুঝেছে। কার্তিক ঠেস দিল, সোয়া পাঁচ আনার যুগ কি আর আছে— সোয়া পাঁচ টাকার পুজো দিলে যদি কিছু হয়।

যাক আমি নিশ্চিন্ত। হাবুল এরপর নিজের চিন্তাতেই চুপসে থাকবে—পিন্‌ডিদার কাছে লাগান-ভাগান করতে যাবে না।

কিন্তু ওদিকে ওপরঅলাও বোধহয় হাসছিল। বিকেলে সত্যি আমি বাড়ি থেকে বেরুতে পারলাম না। আমার মাঠের আড্ডা বন্ধ। জমিদার গিন্নির অবস্থা খারাপ। বাবা তিনবার করে ছোটা-ছুটি করছে। আমাকে বাড়ি থাকতে বলে গেছে। আমি অনুপস্থিত বলে একসময় কেবলু আর কার্তিক বাড়িতে খোঁজ নিতে এলো। খবর শুনে তারাও একটু চিন্তিত। বাবার হুকুম তো সকলে নিজের কানেই শুনেছে।

পরদিন সকালের কাগজে হইচই খবর। জমিদার বাড়িতে জোর ডাকাতি, হীরের চোখ নিখোঁজ, পুরনো ষণ্ডা দারোয়ান ছটুলাল খুন, পুরনো পুরুত নিপাত্তা, জমিদার গিন্নির বেহুঁশ দশা ইত্যাদি। পুরুত ঠাকুরকে ধরার জন্য পুলিশ চারদিকে লোক লাগিয়েছে। ঘুমন্ত অবস্থায় ছটুলালের বুকে পাঁচ-ছ বার ছুরি বসিয়ে সে-ই যে হীরে নিয়ে পালিয়েছে তাতে কারো সন্দেহ নেই।

কিন্তু আমার ভাবনা অন্য। আজ শুক্রবার। আজও বাবা তিনবার করে জমিদার বাড়ি ছুটছে—ফোন করে এটা-ওটা দিয়ে যেতে বলছে—আমি সাইকেলে করে দিয়ে আসছি। কিন্তু এ-রকম চললে কাল আমার যাওয়া হয় কী করে?

বিকেলের দিকে বুড়ির একটু উন্নতি হয়েছে শুনলাম। কিন্তু নিশ্চিন্ত হবার মতো কিছু নয়। বিকেলে বাবা বাড়ি নেই দেখে চট করে সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সোজা মাঠে। ওরা সকলে আমার জন্য উদগ্রীব হয়েই অপেক্ষা করছিল। এমনকি পিন্‌ডিদাও। সাইকেলটা স্ট্যান্ডের ওপর একপাশে দাঁড় করিয়ে রেখে সমাচার জানালাম। বললাম, দশ মিনিটের বেশি বসতে পারব না, বাবার আগেই আমাকে ফিরতে হবে।

পিন্‌ডিদার দিকে চেয়ে আর সকলের চোখেমুখে এখন একটাই প্রশ্ন, আমার যাওয়া না হলে কী হবে—সকলেরই যাওয়া পোস্টপোন করা হবে কি হবে না। পিন্‌ডিদা তখন আকাশের দিকে চেয়ে একমনে কী দেখছে। যেন আকাশের গায়ে কিছু লেখা আছে আর পিন্‌ডিদা সেটা পড়ার চেষ্টা করছে।

প্রায় চার মিনিট বাদে পিন্‌ডিদা আকাশ থেকে চোখ নামালো। তারপর ঠাণ্ডা গলায় ঘোষণা করল, যাওয়া হবে, সোনারও যাওয়া হবে—সোনা তুই কাল ভোরেই কড়া পাকের সন্দেশটা কিনে ফেল।

আর সকলে ছেড়ে আমি সুদ্ধু হকচকিয়ে গেলাম প্রথম। তারপর ভিতরটা তিরিক্ষি হয়ে উঠল। আসলে, যাওয়া হোক না হোক, কড়া পাকের সন্দেশ কেনা হয়ে গেলে সেটা তো আর ফেলা যাবে

না। আরো রাগ হয়ে গেল হেবো হোঁতকার কথা শুনে। সে বলে উঠল, তাহলে আর কি, পিন্‌ডিদা যখন বলছে যাওয়া হবেই। কড়া পাকের সন্দেশটা কাল সকালে তুই কিনেই ফেল সোনা—

আমি খেঁকিয়ে উঠলাম, আমার খুব সময় দেখলি—কেমন? সকালে মাস্টারমশাই হাজির, তার মধ্যে দুবার করে বাবার ফোন, এটা চাই—ওটা চাই আমার যাওয়ার আশা কতটুকু আমিই জানি।

আমার মেজাজ দেখে সকলেই চুপ খানিক। তারপর আমার থেকেও গম্ভীর মুখে পিন্‌ডিদা হাবুলকে শাসালো।—ফের তুই আগ বাড়িয়ে কথা বলবি তো তোর যাওয়া আমি বন্ধ করে দেব! যেতে না পারলে সোনার মনের অবস্থা কী হবে তা-ও বুঝতে পারছিস না?

ধমক খেয়ে হেবো হোঁতকার মাথা নিচু। গলায় মধু ঢেলে পিন্‌ডিদা আমাকে বলল সোনা—কিছু ভাবিস না—আমি বলছি, কাল আমাদের সকলেরই যাওয়া হবে, কড়া পাকের সন্দেশটা কাল তুই খুব ভোরেই কিনে ফেল।

আমি ভিতরে ভিতরে গজগজ করতে লাগলাম। হুঁ! উনি যেন আকাশের দিকে চেয়ে গুনেগেঁথে বলে দিলেন যাওয়া হবেই। আসল কথা যাওয়া হোক না হোক, কড়া পাকের সন্দেশ পেটে পড়া চাই। সেটা চেপে গিয়ে বললাম, আমার বেরুনোর জো আছে? কখন জমিদার বাড়ি থেকে বাবার ফোন আসে সেই জন্যে বইখাতা নিয়ে দু দিন ধরে আমাকে টেলিফোনের সামনে বসতে হচ্ছে।

পিন্‌ডিদা একটু মিইয়ে গিয়ে বলল, তাই তো রে, কী যে আমি স্বার্থপরের মতো বলছি ঠিক নেই—পরের কাজ যে নিজের কাজ ভাবে তার তুলনা আছে! কিন্তু তা বলে, তুই অতবড় দায়িত্ব নিয়ে ব্যস্ত বলে তোর সামান্য কাজটা করে দিতে পারব না এমন বন্ধু ভাবিস আমাদের? চটপটি! সোনার কাছ থেকে আজ রাতে হোক কাল সকালে হোক টাকা নিয়ে কড়া পাকের সন্দেশ কেনার দায়িত্ব তোর—হাঁ করে চেয়ে আছিস কি? সোনার পরীক্ষার শুভেচ্ছা সফরে বেরুচ্ছি আমরা—এটুকু করতে পারবি না?

কর্তব্যবোধের গলা করে চটপটি বলল, পারব পিন্‌ডিদা।

আমার রাগ আরো বাড়ল বই কমল না। পিন্‌ডিদা বলার পর থেকেই বিপদ ধরে নিয়ে মায়ের কাছ থেকে কুড়িটা টাকা আদায় করেই রেখেছিলাম। সেই কুড়ি টাকার নোটটা চটপটির মুখের ওপর ছুড়ে দিয়ে আমি উঠে পড়লাম। সাইকেলে চেপে বোঁ-বোঁ করে সোজা বাড়ি।

পরদিন অর্থাৎ শনিবার জমিদার গিন্নির অবস্থা সত্যি ভালো শুনলাম। বাবাকেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে দেখলাম। মাকে বলছিল, নার্ভাস শকটা কাটিয়ে উঠেছে মনে হয়, আজ বুড়ি জিজ্ঞেস করছিল, পুরুত ঠাকুরকে পুলিশ ধরতে পেরেছে কি না।

বেলা বারোটার মধ্যেও আর কোনো খারাপ খবর এলো না। এর মধ্যে কেবলু কার্তিক চটপটি তিনবার করে এসে খবর নিয়ে গেছে জমিদার গিন্নি কেমন আছে। নিজেদের বাবার গিন্নি হলেও ওদের বোধহয় অত চিন্তা হত না। যাক, যাওয়া হবে বুঝতে পারছি, কিন্তু কোন অজুহাতে দুপুরে বাড়ি থেকে সটকান দেব ভেবে পাচ্ছিলাম না। শেষে ঠাকুমার সামনেই মাকে বললাম, তিন তিনটে দিন পড়াশুনো মাটি হয়ে গেল, একবার সুরজিতের বাড়িতে গিয়ে দেখি তিন দিনের পিছিয়ে পড়াটা উশুল করতে পারি কি না—বাবা জিজ্ঞেস করলে বোলো ফিরতে একটু দেরি হতে পারে।

সুরজিত আমাদের ক্লাসের সেকেন্ড বয়। সব পরীক্ষাতেই কম করে আমার থেকে মোট একশো নম্বর কম পায়। যখন-তখন আলোচনার জন্যে সে-ই দুপুরের দিকে আমার বাড়িতে হানা দেয়। কিন্তু পৃথিবীতে কোন্ মা তার পড়াশুনার ব্যাপারে নিজের ছেলেকে সব থেকে ভালো ভাবে? মা বলল, ঠিক আছে যা, বেশি দেরি করিস না যেন।

মিথ্যের অনেক শত্রু। কে জানে আজই আবার দুপুরে সুরজিত আমার বাড়ি এসে হাজির হবে কি না! তাহলে তো চিত্তির। তাই প্রথমেই সাইকেল ঠেঙিয়ে গেলাম আড়াই মাইল দূরে সুরজিতের

বাড়ি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাকে জানিয়ে দিলাম দুপুরে আমি বাড়ি থাকছি না। তারপর আবার বাঁই-বাঁই করে সাইকেল চালিয়ে চটপটির বাড়িতে। সেখান থেকেই সকলের রওনা হবার কথা। আমাকে দেখেই পিন্‌ডিদা গম্ভীর মুখে বলল, দশ মিনিট লেট, পাংচুয়ালিটি সম্পর্কে এসে এসে এলে কী করবি?

আমি তেতেই ছিলাম একটু, কারণ তখনো দস্তুরমতো হাঁপাচ্ছি। জবাব দিলাম, লিখব, লিডারের খপ্পরে পড়ে মিথ্যের আশ্রয় নিতে হলে সব সময় পাংচুয়াল হওয়া যায় না।

সক্কলে ভেবেছিল, পিন্‌ডিদা রেগে যাবে, এমন কি বলে ফেলার পর আমিও। পিন্‌ডিদা গোল চোখ করে একটু চেয়ে রইল আমার দিকে। তারপর মুখে স্নেহের হাসি। বলল, উপস্থিত বুদ্ধির জন্য তোকে আমি ফার্স্ট ক্লাস নম্বর দিলাম।

শুনে আমারও ভেতরটা একটু ঠাণ্ডা হল। দুর্গা দুর্গা করে সকলে রওনা হয়ে পড়লাম। সঙ্গে এয়ারটাইট ব্যাগে টাটকা মুড়ি, নুন, আস্ত পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা, কড়া পাকের সন্দেশের বাক্স, নারকেল গাছে ওঠার দড়ি দুটো, হাত-দা, ছুরি—এই সব নেবার ব্যবস্থা ওরাই করেছে। হেবো হাতিটা প্রথমেই আমার সাইকেলের ক্যারিয়ারে। মনের আনন্দ সবাই চলেছে, কিন্তু আমি ভেবেছিলাম, আমার এত পরিশ্রমের পর হোবোটাকে প্রথম অন্তত চটপটির নেওয়া উচিত ছিল। এদিকে হাবুলের খুশি ধরে না। একটু বাদে গলায় বিস্ময় ঝরিয়ে বলল, আচ্ছা সোনা, আকাশের দিকে চেয়ে পিন্‌ডিদা কী করে বলল বলতো সে সক্কলের যাওয়া হবে? তাই তো হল—কিন্তু পিন্‌ডিদা জানল কী করে?

আমি বললাম, আকাশের গায়ে লেখা ছিল তুই দেখিসনি? আমি তো স্পষ্ট দেখলাম, পিন্‌ডিদা মনে মনে তার ইষ্ট দেবতাকে বলল কী হবে বলে দাও—সঙ্গে সঙ্গে ফুটে উঠল, কিছু ভাবনা নেই—সকলেরই যাওয়া হবে।

—যাঃ! ঠাট্টা করছিস.....

আমি রেগেই গেলাম। কি পিন্‌ডিদাকে নিয়ে ঠাট্টা? ডাকবো?

হাবুল ভড়কে গেল।—না না না না! আমি ঠিক বুঝতে পারিনি বলেই বলছিলাম—

আমার আর রাগ-টাগ কিছু নেই, মজাই লাগছিল। সাইকেলে আট মাইল এমন আর কী পথ। হেবো হাতির বোঝা নেবার জন্য আমি চটপটিকেও আর জ্বালালাম না। আধঘন্টার মধ্যেই হইচই করে সকল বাদশামহলের আঙিনায় পৌঁছে গেলাম।

এ এমন একটা জায়গা, যে প্রথম খানিকক্ষণ সকলের একটু গা ছমছম করবেই। আমরা অনেক এসেছি, তবু। পিন্‌ডিদা তো যাকে বলে একেবারে বাকশক্তি রহিত। কেউ একটু জোরে কথা বললেও তার অস্বস্তি। এই প্রথম এসেছে, এমন হতেই পারে। সুযোগ পেয়ে আমি সাহস জোগালাম, কিছু ভয় নেই পিন্‌ডিদা, আমরা এখানে অনেক এসেছি.....এখানকার ভূতেরা ঘাড় মটকায় না।

পিন্‌ডিদা সকলের মাঝে থেকে বিড়বিড় করে বলল, ভয়ের আবার কী আছে, আমিই তো তোদের টেনে নিয়ে এলাম.....তবে কিনা কবরের শান্তি নষ্ট করতে নেই—কী দরকার চেঁচামেচি হই-হুল্লোড় করে, কাউকে অসম্মান করার দরকার কী—যা করতে এসেছি করে চলে যাই।

অতএব যা করতে এসেছি তাই শুরু হল। ডাব বা নারকেল গাছে ওঠার ব্যাপারে দুজন মাত্র এক্সপার্ট—চটপটি আর কার্তিক। দুটো হাত-দা কোমরে গুঁজে আর পায়ে দড়ি বেঁধে ওরা কাঠবেড়ালির মতো প্রথমে তরতর করে একটা নারকেল গাছে আর একটা ডাব গাছে উঠে গেল। আসলে ডাব আর নারকেল তো একই গাছ। তফাত শুধু একটাতে সোনারবরন নারকেলের কাঁদি আর একটাতে ঘন সবুজ ডাবের কাঁদি। সেই ডাবের কাঁদি কি যে-সে কাঁদি। এক-একটাতে বোধহয় এক সের করে জল হবে। যাক, দড়িতে বেঁধে ওরা দুটো নারকেলের কাঁদি আর দুটো ডাবের কাঁদি

নামিয়ে দিল। আমি গুনে দেখলাম নারকেল এগারোটা আর ডাব নটা। সেগুলো দেখে পিন্‌ডিদা পাগলের মতো করতে লাগল। হাত-দা দুটো চটপটি আর কার্তিকের কাছে। তাই ডাব নারকেলগুলো অক্ষত থাকল। পিন্‌ডিদা সত্যি তো আর চোখ দিয়ে ওগুলোকে কেটে বা ছাড়িয়ে খেতে পারে না!

কিন্তু পিন্‌ডিদার কিছু ধৈর্যও আছে বটে। চটপটি আর কার্তিক নেমে আসতে আবার জোর করেই আর দুটো বাছাই গাছে তুলে দিল ওদের। ছ জনের জন্য এগারোটা বিরাট সাইজের নারকেল যথেষ্ট বেশি। কিন্তু বাড়িতে প্রত্যেকের দু-তিনটে করে নিতে হবে না? তাই তার আরো দু কাঁদি নারকেল আর তিন কাঁদি ডাব চাই।

আমি একটু বাধা দিলাম, আর ডাব দিয়ে কী হবে—সাইকেলে তো আর অত বোঝা নেওয়া যাবে না—আর খাওয়াও যাবে না—

কবরের শান্তি রক্ষা ভুলে পিন্‌ডিদা খেঁকিয়ে উঠল, খাব, মাথায় ঢালব, মুখ ধোব—হল? এই কার্তিক—এই চটপটির ওই দুটো গাছে ওঠ শিগ্‌গির।

আবার ওরা উঠল, নারকেল আর ডাবের কাঁদি নামালো। কিন্তু পিন্‌ডিদা তার পরেও কাউকে কিছু খেতে দেবে না। হাবুলকে জিজ্ঞেস করল, শশার বাগান কোথায়?

আমি বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, পিন্‌ডিদা জামরুল নেবে না —ওই দেখো কেমন থোকা থোকা জামরুল। আঙুল তুলে একটা গাছ দেখিয়ে দিলাম।

পিন্‌ডিদা হিংস্র দৃষ্টিতে জামরুল গাছটার দিকে খানিক চেয়ে থেকে হুকুম করল, ওঠ—!

কার্তিক আর চটপটি দু দুবার ডাব-নারকেল গাছে উঠে হেদিয়ে পড়েছিল। কেবলু বলে উঠল, জামরুল গাছ পিপীলিকাসু রাজত্বম্—আমার দ্বারা হবে না।

পিন্‌ডিদা আবার হুকুম করল, সোনা ওঠ!—

আমি বললাম, তুমি না হয় লিডার তুমি উঠবে না—কিন্তু হাবুল উঠবে না কেন? সে কী? তুমি পক্ষপাতিত্ব করো এ-তো তোমার শত্রুও বলবে না। আমি উঠছি, আমার সঙ্গে হাবুলকেও উঠতে বলো—জামরুল গাছে ওঠা তো আর ডাব-নারকেল গাছে ওঠা নয়!

হাবুলের দিকে চেয়ে পিন্‌ডিদা সঙ্গে সঙ্গে হুঙ্কার ছাড়ল, হেবো, ওঠ্—!

হেবো আমার পিছনে পিছনে বুক ফুলিয়েই গাছে উঠল। তবে ও কেবল মোটা ডালগুলো বেছে নিতে লাগল। আমি জামরুল গাছ ছেড়ে কুল গাছেও ঢের চড়েছি। থোকা থোকা জামরুল ফেলতে লাগলাম। ওরা প্যান্টের থেকে জামা টেনে তুলে আঁচলের মতো করে পেতে সেগুলো ধরতে লাগল। হাবুলও সানন্দে জামরুল ফেলছে—আমার মতো অত না হলেও তার উৎসাহ বেড়েই চলেছে।

হঠাৎ আমার চোখে পড়ল হাবুলের হাত দুই দূরে ইয়া ডবকা একা থোকা জামরুল। যেমন পুরুষ্টু তেমনি বড়। সেই সঙ্গে আমার আরো কিছু চোখে পড়ল। আমি ডাকলুম হাবুল!

ও আমার দিকে তাকাতে ওর পিছনটা আঙুল তুলে দেখিয়ে দিলাম।—ওই দেখ্।

মোটা শরীরটা ফিরিয়ে হাবুল দেখল। লোভে তার দু চোখ চকচক করে উঠল, সন্তর্পণে ডাল বদলে খপ করে পাতাসুদ্ধু সেই জামরুলের থোকা ছিঁড়তে গেল—

সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ।—উঃ গেছি গেছি! মরে গেলাম! মরে গেলাম!

সবার আগে আমিই চেঁচিয়ে উঠলাম, হাবুল কী হল? কী হল? সাবধান, গাছ থেকে পড়ে যাস না!

নিচের থেকে অন্য সকলেও চিৎকার করে উঠল, কী হল তোর—অ্যাঁ? অমন করছিস কেন?

হাবুল তখন গোঁ গোঁ করছে আর একটা ডালে ঠেস গিয়ে নিজের গায়ের মাংস ছিঁড়ছে। হঠাৎ যেন পাগলই হয়ে গেছে ও।

—বাবা গো! গেছি গো! আর্তনাদ করতে করতে জামরুল গাছের ডালপালা ধ্বংস করতে করতে ও নামতে লাগল। সবটা নামতেও পারল না। চার ভাগের তিন ভাগ নেমেই তিন মণ বস্তার মতো ধুপ করে মাটিতে পড়ল। তারপর গড়াগড়ি আর আর্তনাদ।

আমিও তরতর করে নেমে এলাম। হাবুলের সর্বাঙ্গ লাল বিষ পিঁপড়েয় ছেয়ে গেছে। ও গড়াগড়ি খাচ্ছে, আর্তনাদ করছে, আর নিজের গায়ের মাংস খুবলে তুলছে। আমি চটপট ওর গায়ের জামাটা খুলে ফেললাম। তারপর ওর সমস্ত গা পিঁপড়েসুদ্ধ মাসাজ করতে লাগলাম। প্রায় মিনিট পাঁচেক পরে সমস্ত বিষ পিঁপড়ে খতম। কিন্তু হাবুলের সমস্ত গা তখন ফুলে ফুলে আছে। মুখেও অনেক কামড় খাওয়ার ফলে দাগড়া দাগড়া হয়ে আছে। তারপরেও খানিকক্ষণ ধরে যন্ত্রণায় গড়াগড়ি। শেষে হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে গর্জন করে উঠল, উল্লুক কোথাকারের, তুই ইচ্ছে করে সব জেনেশুনেই আমাকে ওই জামরুলে হাত দিইয়েছিস—আমিও পিঁপড়ের মতো তোর গায়ের মাংস টেনে ছিঁড়ব।

আমি যতটা সম্ভব মুখ কাঁচুমাচু করে পিন্‌ডিদার দিকে তাকালাম।—শুনলে কথা পিন্‌ডিদা, ও সামনে থেকে হাত বাড়িয়েও কিছু দেখল না—আর আমি দূর থেকে দেখলাম! ওই জামরুলগুলো তো তোমার কাছেই—অমন জিনিস দেখলে পিঁপড়ে কারো চোখে পড়ে?

গম্ভীর ধমকের সুরে পিন্‌ডিদা বলে উঠলো, হাবুল! ডোন্ট বি ইমপেশান্ট অ্যান্ড ডোন্ট শো ইওর টেম্পার—সোনা ইজ ইনোসেন্ট!

চাপা রাগে হাবুল গরগর করতে লাগল বটে, কিন্তু পিন্‌ডিদার ধমক খেয়ে আর মেজাজ দেখাতে সাহস করল না।

হাবুলের মুখের দিকে চেয়ে একটু একটু হাসি পাচ্ছিল বটে আমাদের, কিন্তু কষ্টও হচ্ছিল। এতটা হবে ভাবিনি। ও একটু চালাক হলে অত পিঁপড়ে গায়ে মুখে উঠত না।

যাক, এরপর আমরা শশাখেতে। সমস্ত রসদ হাতের কাছে মজুত না রেখে পিন্‌ডিদা ফলাহার জলাহার আর কড়াপাকের সন্দেশাহারে বসতে রাজি নয়। মাথা পিছু দুটো করে শশা নিলেই যথেষ্ট হত, কিন্তু ছেঁড়া হল কম করে তিরিশ-পঁয়ত্রিশটা। পিন্‌ডিদা খেতে কম পারে না, কিন্তু চোখের দিশা তার অনেকগুণ বেশি।

এরপর বিশাল পড়ো দালানটার সামনে সকলে গোল হয়ে খেতে বসা হল। পিন্‌ডিদার হুকুম মতো আগে জামরুলের রসে গলা ভেজানো, তারপর ডাব, নারকেল, তারপর মুড়ি শশা, তারপর মুড়ি নারকেল, তারপর কড়াপাকের সন্দেশ—সব শেষে আবার ডাব।

কিন্তু মানুষের পেটে কত আর যাবে। একটা করে ডাব আর একটা করে নারকেল খেয়েই পেট ভরভর। মুড়ি শশা চালান দেবার পর মনে হল এবারে একটু দম নেবার সময় দরকার। যতই রাক্ষুসে দিশা থাক আমাদের, বাড়িতে দুপুরের ভাত তো কেউ আর কম সাঁটিয়ে আসেনি। আমিই প্রস্তাব করলাম, এবারে খানিকক্ষণ ইন্টারভ্যাল হোক পিন্‌ডিদা—বাদশামহল তো তুমি আগে আর দেখোনি, ঘুরে ঘুরে একটু দেখা যাক চলো, সব ভেঙে খসে খসে পড়লেও বেশ রোমাঞ্চকর লাগে। আর ওই ধসে-পড়া প্রাসাদ কতবার খোঁড়াখুড়ি হয়ে গেল জানো! সকলেই জানে ওখানে ঘড়া ঘড়া বাদশাই মোহর লুকনো আছে—কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ তার হদিস পেল না। সে রকম বরাত হলে হয়তো দেখব কোনো ভেঙে পড়া থাম-টামের ভেতর থেকে একটা মোহরের ঘড়া উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে।

আমি কখনো মোহর-টোহর দেখিনি, তাই মোহর কেমন চকচক করে জানি না। কিন্তু পিন্‌ডিদার দিকে চেয়ে মনে হল তার চোখ মোহরের থেকে কম চিকচিক করছে না। চটপটির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, সত্যি নাকি রে?

চটপটি জবাব দিল, আমরা তো ছেলেবেলা থেকেই মোহরের গল্প শুনে আসছি।

পিন্‌ডিদা করুণ দৃষ্টিতে একবার কড়াপাকের সন্দেশের বাক্সটার দিকে তাকালো। নিজের ভুলটা বুঝতে পারছে—এটা দিয়ে শুরু করাই উচিত ছিল, মাঝখান থেকে ভুষিমালে পেট ঢাউস। কিন্তু মোহর যদি নাও মেলে খিদে তো কিছু হবেই। বলল, এ-সব এখানেই পড়ে থাকবে?

আমি বললাম, সন্দেশের বাক্সটা সাইকেলের ক্যারিয়ারে বেঁধে রেখে যাওয়া যাক, মাটিতে পড়ে থাকলে সন্দেশের মানহানি করা হবে—আর সব যেমন আছে থাক, এই বাদশামহলের এলাকায় কুকুর বেড়ালও ঢোকে না।

ভিতরে ঢুকে এই দিনে দুপুরেও সকলেরই গা ছমছম করতে লাগল। কোথাও কড়ি-বরগা ঝুলছে, কোথাও বা বিশাল দেয়াল ফেটে ফেটে এখন হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ার অপেক্ষায় আছে। কিন্তু তার মধ্যেও বেশ একটা চাপা উত্তেজনা অনুভব করছি। আগে এখানে এলেও ভেতরে তো কখনো ঢুকিনি! আমাদের মনে হল এক-আধ ঘড়া মোহর পেয়ে যাওয়াও আশ্চর্য কিছু নয়।

এই দিনে দুপুরেও এই মহলে এখন আলো খুব ঢোকে না এমনি ভাঙা-চোরা দশা। খানিকটা এগিয়ে সিঁড়ি পেলাম। সিঁড়িরও তেমনি দশা। রেলিং নেই। দেয়াল ঘেঁষে ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এলাম। এর পর এক-এক দিকে এক-একটা মহল। খুব ভালো করে দেখে নিয়ে পিন্‌ডিদা স্ট্র্যাটেজি ঠিক করল। বলল, সব একসঙ্গে গিয়ে কাজ নেই। দুজন দুজন করে ভাগ হয়ে নে। কেবলু আর সোনা ওইদিকে যা। চটপটি আর কার্তিক এ-দিকে, আমি আর হাবুল ওই কোণের দিকে। কোনো কিছু দেখলেই 'লিডার'! বলে গলা ফাটিয়ে হাঁক দিবি।

এবারে রীতিমতো গা ছমছম করছে। আমরা যেন সত্যিকারের কোনো রোমাঞ্চকর অভিযানে বেরিয়েছি। লিডারের নির্দেশমতো জোড়ায় জোড়ায় এক-একদিকে সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে চললাম। আমার থেকে থেকে কেন যেন মনে হচ্ছিল, পিন্‌ডিদা যে কোণের দিকটা বেছে নিল সেদিক থেকেই বাদশাই মোহরের ঘড়াটড়া কিছু বেরিয়ে পড়তে পারে। কেবলু ফিসফিস করে বলল, রামনাম স্মরণং কুরু।

কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যেই একটা বিকট আর্তনাদ শুনে আমাদের গায়ের রক্ত জল।

—ও বাবারে! গেছিরে! সোনা—আঁ-আ! চটপটি-ই-ই—বাঁচা-আ-আ!

কেবলু দু চোখ বুজে ফেলে থরথর করে কাঁপতে লাগল। আমি ওর হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে বললাম, পিন্‌ডিদা আর হাবুলের গলা—শিগগির!

ছুটে যেতে যেতে দেখি ভয়ে সিঁটিয়ে কার্তিক আর চটপটিও ছুটে আসছে। ওদের দেখে সাহস একটু বাড়ল। তারপর এগিয়ে গিয়ে যে দৃশ্য দেখলাম, আমাদের আত্মারাম খাঁচা-ছাড়া। একটা পড়ো ঘরের সামনের বারান্দার চিৎপাত হয়ে শুয়ে প্রাণপণে হাত-পা ছুড়ছে পিন্‌ডিদা আর গোঁ গোঁ শব্দ করছে—আর তার বুকের ওপর দিয়ে কোমর থেকে পা পর্যন্ত চালিয়ে দিয়ে তেমনি গোঁ-গোঁ করছে হাবুল—দুজনেই চোখ বুজে গোঁ-গোঁ করছে আর থেকে থেকে হাত-পা ছুড়ছে।

আমরা পিন্‌ডিদার ওপর থেকে টেনে হিঁচড়ে হাবুলকে নামালাম। ও চোখ বুজে বসে বসেই ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। গোঁ-গোঁ করে পিন্‌ডিদাও চোখ না তাকিয়ে বলল, বাঁ-চা-ও! লিভিং গোস্ট! (জ্যান্ত ভূত)।

আমি চিৎকার করে বললাম, কোথায় লিভিং গোস্ট পিন্‌ডিদা—তোমার বুকের উপরে তো হেবো পড়েছিল।

আমরা গলা শুনে পিন্‌ডিদা চোখ মেলল। তারপর কেবলু আর কার্তিকের চেষ্টায় আস্তে আস্তে উঠে বসল। কটমট করে একবার হাবুলের দিকে তাকিয়ে বলল, কা-কা-কা-কাওয়ার্ড কোথাকার! তারপরেই সামনের ঘরটার দিকে চেয়ে আবার সিঁটকে গিয়ে গোঁ গোঁ করে বলল, ওই ঘরে লিভিং গোস্ট—!

আমরা বাকি চারজন বিমূঢ় কয়েক মুহূর্ত। জড়সড় হয়ে চারজনেই পায়ে পায়ে ওই পড়ো ঘরের দরজার কাছে এসেই বিষম চমকে উঠলাম।

নোংরা ঘরের মধ্যে দড়ির খাটিয়ায় একটা দেহ—

আমরা পালাতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার আগেই ওই খাটিয়ার কাছ থেকে একটু গোঙানির শব্দ কানে এলো। থমকে গিয়ে দেখলাম, দেহটা একটু একটু নড়ছে, আর ওই দেহের হাত পা খাটের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা। চারজনে হাত-ধরাধরি করে ঢুকে এগিয়ে এলাম.....লোকটার মুখও কাপড়ে বাঁধা—সমস্ত গায়ে আঘাতের দাগড়া দাগড়া দাগ।

মুখের কাপড়টা খুলে দিয়েই আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, এ-যে জমিদার বাড়ির পুরুত ঠাকুর!

লোকটা প্রায় বেঁহুশ। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে। তার হাত পায়ের বাঁধন খুলে দিতে দিতে আমরা চিৎকার করে ডাকলাম, পিন্‌ডিদা, শিগগির এ-ঘরে এসো—এখানে ভূত নয়, জমিদার বাড়ির পুরুত ঠাকুর!

পিন্‌ডিদা ভয়ে ভয়ে ভিতরে ঢুকল।

—জ-অ-ল। পুরুত ঠাকুরের গলায় অস্ফুট আর্ত শব্দ!

চটপটিকে বললাম, শিগগির ছুটে গিয়ে একটা ডাব কেটে নিয়ে আয়!

চটপটি তীরের মতো বেরিয়ে গেল। আমি সামনে ঝুঁকে চেঁচিয়ে বললাম, পুরুত ঠাকুরমশায়! আমি ডাক্তারবাবুর ছেলে সোনা! আপনি চোখ খুলে দেখুন!

কিন্তু শুনতেও পেল না। গলা দিয়ে আবার অস্ফুট শব্দ বেরুলো জ-অ-ল!

চটপটি ডাব নিয়ে এলো। আমরা খাওয়াতে চেষ্টা করলাম। ঠোঁট টেনে ধরতে হল। সামান্যই ভিতরে গেল, বেশির ভাগই গড়িয়ে পড়ল। তারপর বিড়বিড় করে বলল, রাম বা-দ-শা—এ-খ-নই আসবে—মা-র-বে।

শোনামাত্র পিন্‌ডিদা ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল। কেবল বলল, শিগগির পালিয়ে আয় সব—!

তার পিছনে হাবুল ছুটল। আমরা চারজন মুখ চাওয়া চাওয়ি করলাম! পুরুত ঠাকুরের মুখে আবার ডাবের জল দিতে চেষ্টা করলাম। সবটাই গড়িয়ে পড়ল। আবার অজ্ঞান হয়ে গেছে। মনে হল সর্বাঙ্গ কেমন স্থির হয়ে আসছে।

শিয়রে ভীষণ বিপদ মনে হতেই আমরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে দ্রুত নিচে নেমে এলাম। পিন্‌ডিদা চিঁ-চিঁ করে ধমকে উঠল, মরবি সব? কারা আসছে শুনলি না? আর এক সেকেন্ডও এখানে না, শিগগির চল্!

সবই পড়ে থাকল, কড়াপাকের বাক্সটা শুধু সঙ্গে এলো। প্রাণপণে সাইকেল চালিয়ে আমরা অর্ধেকের বেশি পথ পেরিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। কিন্তু মাথার মধ্যে এখনো যেন সব কিছু তালগোল পাকিয়ে আছে। আরো মাইল দুই আসার পর দেখলাম কার্তিকের সাইকেল থেকে পিন্‌ডিদা নেমে দাঁড়ালো। এখন তার লিডারের মুখ।

সাইকেল থামিয়ে আমরাও একে একে নামলাম। পিন্‌ডিদা আমাকেই প্রথম জিজ্ঞেস করল, লোকটা জমিদার বাড়ির পুরুত ঠাকুর, তুই ঠিক চিনেছিস?

—কোনো ভুল নেই।

—রামবাদশা কে? সে এসে মারবে বলল?

মাথা খাটিয়ে কেবলু জবাব দিল, ওনাদেরই কেউ হবেন—রাম মরে বাদশা হয়েছে বা বাদশা মরে রাম হয়েছে।

পিন্‌ডিদা এক মিনিট চিন্তা করে নিল। তারপর অনেকটা নিজের মনেই বলে গেল, মন্দিরের দাওয়ায় ছট্টুলাল খুন হল, আর নিখোঁজ পুরুত হাত-পা মুখ বাঁধা অবস্থায় এখানে পড়ে.....ভূত এভাবে তাকে বাঁধবে কী করে আর মারবেই বা কেন?

কেবলু তবু বলল, পাপস্য পরিণামঃ, গোপালের ইচ্ছে হলে কী না হয়.....।

পিন্‌ডিদা হুকুম করল, সবাই মিলে থানায় চল তো আগে।

দশ মিনিটের মধ্যে আমরা থানায়। সব শোনার পর এখানেও বেশ চমক সৃষ্টি হল। বড়বাবুর হুকুমে তার সশস্ত্র দলবল রেডি। পুলিশ ভ্যানও। পকেটে রিভলভার গোঁজা বড়বাবু নিজেও সঙ্গে চলল। আমাদের বলল, তোমাদের মধ্যে দুজন আমাদের সঙ্গে চলো।

রাইফেল বন্দুক রিভলভার নিয়ে এক গাদা পুলিশ যাচ্ছে, পিন্‌ডিদা এখন দস্তুরমতো সাহসী পুরুষ। আমাকে বলল, তুই আর আমি যাচ্ছি। ওরা সাইকেল নিয়ে চলে যাক, তোর কিছু ভয় নেই, আমি তো সঙ্গে আছি।

আমি চটপটির কানে কানে বললাম, মাকে গিয়ে বলবি পাড়ার বন্ধুকে না পেয়ে ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ সকলে মিলে বাদশামহলে চলে এসেছিলাম—সেখানে এই কাণ্ড।

মস্ত ভ্যানে চেপে খানিকক্ষণের মধ্যেই এসে গেলাম আমরা। পুলিশের দঙ্গল নেমেই বন্দুক রাইফেল বাগিয়ে প্রস্তুত। তাদের মাঝখানে থেকে আমি আর পিন্‌ডিদা পথ দেখিয়ে দোতলায় নিয়ে এলাম। তারপর সেই ঘরে।

তারপরেই স্তব্ধ সকলে।

জমিদার বাড়ির পুরোহিত মরে পড়ে আছে। অবশ্য তখনই আমাদের মনে হয়েছিল লোকটা বাঁচবে না। বাদশামহল মোটামুটি সার্চ করে ঘন্টাখানেকের মধ্যে মৃতদেহ ভ্যানের পিছনে তুলে দেওয়া হল। সেখান থেকে আবার থানায়।

পরদিনের মধ্যে শহরসুদ্ধ আবার একটা হইচই পড়ে গেল। বড়বাবুর নির্দেশে পরদিনও আমাকে আর পিন্‌ডিদাকে থানায় হাজিরা দিতে হল। সেখানে এসে শুনলাম, রামবাদশা হল একজন দুর্দান্ত ডাকাত—তার মস্ত দল আছে। যে ভাবে হোক হিরের খবর পেয়ে ঘুমের মধ্যে ছট্টুলালকে তারাই খুন করেছে সন্দেহ নেই। তারপর আসল হিরে না পেয়ে তারা পুরুত ঠাকুরকেই তুলে নিয়ে এসেছে আর হিরের খবর পাওয়ার জন্যেই অত্যাচার করেছে।

প্রাণান্তকর অত্যাচার যে করেছে তাতে আর সন্দেহ কী। পোস্টমরটেম রিপোর্টে জানা গেছে, চার দিন পুরুত ঠাকুরের পেটে খাবার ছেড়ে জলটুকু পড়েনি। তারপর হাতের আর পায়ের আঙুলের অনেকগুলো ভেঙে দিয়েছে রামবাদশার দল। তা ছাড়াও সমস্ত গায়ে নির্মম আঘাতের দাগ।

আমি ভেবেছিলাম বাবা আমাকে বকাবকি করবে। কিন্তু চারদিকের উত্তেজনা এখন এত বেশি যে বাবা কিছুই বলল না। উল্টে বাবার কাছে পরদিন যারা এলো, তাদেরকে কী দেখলাম না দেখলাম সেই ফিরিস্তি দিতে হচ্ছে।

হঠাৎ দেখি পিন্‌ডিদা আমাদের বাড়ি এসে হাজির। আমি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম।

গলা খাটো করে পিন্‌ডিদা বলল, কাল সমস্ত রাত আমি ঘুমোতে পারিনি। তোর সঙ্গে আমার খুব জরুরি কথা—মানে ডিসকাশন আছে।

বাবার অলক্ষ্যে পিন্‌ডিদাকে নিজের পড়ার ঘরে নিয়ে এলাম।

পিন্‌ডিদা বলল, খুব কড়া করে তিন কাপ চা আনতে বল, আমার দুকাপ তোর এক কাপ।

মা-কে বলে এলাম। বাবা আমাকে কিছুই বলল না দেখে মায়ের এখনো আমার ওপর রাগ। এ-সব কাণ্ডের মধ্যে ছেলের জড়িয়ে পড়াটা তার কাছে আদৌ শুভলক্ষণ নয়। ফলে এ সময় পিন্‌ডিদার আসাটাও পছন্দ নয়। আমরা দিকে শুধু তাকিয়ে বুঝিয়ে দিল, পরে হবে, খন।

পিন্‌ডিদা বলল, সমস্ত ব্যাপার দেখে কিছু ভাবলি?

—ভাবার খুব সময় পেলাম কোথায়—কাল থেকে এ-পর্যন্ত লোককে তো শুধু বলেই যাচ্ছি!

পিন্‌ডিদা বলল, ছট্টুলালকে মেরে রামবাদশার দল মন্দিরে ঢুকল কী করে? লোহার দরজা তো ভাঙা হয়নি—আর রাতে নিশ্চয়ই সেটা বন্ধ ছিল?

আমি একটু ভেবে জবাব দিলাম, তাইতো মনে হয়.....।

তাহলে বুঝতে হবে, ভয় পেয়ে হোক বা যে-জন্যেই হোক পুরুত ঠাকুরই দরজা খুলে দিয়েছে?

—তা হতে পারে।

—ওরা এসেছিল হিরে নিতে—তাহলে পুরুত ঠাকুরকে ধরে নিয়ে গেল কেন? বাদশামহলে নিয়ে গিয়ে কদিন ধরে অত্যাচার করল কেন?

—হিরে পেল না বলে.....হিরের হদিশ পাবার জন্যে—এ ছাড়া আর কী হতে পারে?

—ঠিক, এ-ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

বাড়ির চাকর এসে চায়ের পট পেয়ালা আর এক প্লেট বিস্কুট রেখে গেল।

চায়ে পরপর কয়েকটা চুমুক দিয়ে বিস্কুট চিবুতে চিবুতে পিন্‌ডিদা বলল, তাহলে হিরের চোখ দুটো গেল কোথায়? পুরুত ঠাকুরের কাছে থাকলে তারা তো পেতই। চারদিন ধরে অত অত্যাচার করত না—হিরে দুটো গেল কোথায় তা হলে?

পিন্‌ডিদার দু চোখ জ্বলজ্বল করছে। আমি বললাম, মন্দিরের ভেতর তো পুলিশ তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। তবে.....

একটু বাদে পিন্‌ডিদা হঠাৎ সোজা হয়ে বসল। তোর বাবাকে ডাক একবার—বলবি খুব জরুরি কথা আছে। আচ্ছা থাক, চল আমিই যাচ্ছি। লম্বা চুমুকে চায়ের পেয়ালা খালি করল। পরের কাপ চা ঢেলে নিতেও ভুলে গেল। আমরা আগেই দরজা দিকে পা বাড়ালো। অগত্যা পিছনে ভয়ে ভয়ে আমিও।

পিন্‌ডিদার কথাগুলো বাবা মন দিয়েই শুনল। আমাকে যা বলেছে বাবাকেও ঠিক তাই বলে গেল। শেষে মন্তব্য করল, হিরের চোখ মন্দিরে নেই, আবার পুরুত ঠাকুরের কাছেও ছিল না—আপনি মেসোমশাই দয়া করে একবার জমিদার বাড়িতে ফোন করে জানুন, এসব ঘটনা ঘটে যাওয়াতে তাঁরা কিছু গোপন করছেন কি না—গোপালের হিরের চোখ তাঁদের কাছেই আছে কি না?

বাবা খুব স্থিরভাবেই মাথা নাড়ল। নেই। আমার সঙ্গে আজ সকালেও ফোনে জমিদার গিন্নির কথা হয়েছে। কাল তোমাদের ওই খবরের পর এখনও ও-বাড়ির সকলের বিশ্বাস পুরুত ঠাকুরের কাছ থেকে যে-ভাবেই হোক রামবাদশা হিরের চোখ আদায় করে চম্পট দিয়েছে—যে-ভাবেই হোক ডাকাত পড়েছে টের পেয়ে পুরুত ঠাকুর দরজা খোলার আগে তাড়াতাড়ি গোপালের হিরের চোখ খুলে নিয়ে পাথরের চোখ পরিয়ে দিয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

চাপা উত্তেজনায় পিন্‌ডিদা বলে উঠল, ঠিক ঠিক! কিন্তু মেসোমশাই, রামবাদশার মতো জাঁদরেল ডাকাত চারদিন ধরে অত্যাচার করেও হিরের সন্ধান পেল না, আমরা পুরুতকে ওই অবস্থায় দেখা পর্যন্তও না—কারণ পুরুত ঠাকুর বলেছিল, আবার আসবে, মারবে—তার পরেই আর তার জ্ঞানও ছিল না—এর এক ঘন্টার মধ্যে আমরা পুলিশ নিয়ে গিয়ে দেখলাম সে মরে পড়ে আছে—চারদিনে যা পারল না, রামবাদশা সেই এটুকুর মধ্যে এসে হদিস পেয়ে হিরে নিয়ে চলে গেল? এ কখনো হয় মেসোমশাই?

বাবা সত্যি নড়েচড়ে বসল একটু।

পিন্‌ডিদা বলে উঠল, আপনি মেসোমশায় এক্ষুণি একবার আমাকে আর সোনাকে নিয়ে জমিদারের মন্দিরে চলুন—আমার দারুণ মনে হচ্ছে গোপালের হিরের চোখ আমরা পেয়ে যাব!

বাবাও চিন্তাচ্ছন্ন শুধু নয় একটু অভিভূত মনে হল। উঠে যাবার আগে জমিদার বাড়িতে একটা ফোন করল। তারপর বাড়ির গাড়িতে আমাদের তুলে নিয়ে আধঘন্টার মধ্যে জমিদার বাড়ির গেট দিয়ে ঢুকে মন্দিরের সামনে এলো।

সেখানে পাঁচ সাতজন লোক আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। পিন্‌ডিদার ইশারায় প্রথমে

মন্দিরের দরজা খুলে দিল একজন। সকলেই ভিতরে ঢুকলাম। বাবাও। মন্দিরের চারদিক খুব খুঁটিয়ে দেখে নিল পিন্‌ডিদা।

বাবা বলল, পুলিশ এ-ঘর খুব ভালো করে সার্চ করেছে।

পিন্‌ডিদা চারদিকে চোখ বোলাতে বোলাতে জবাব দিল, তা হলে তো একটু সুবিধেই হল, ধরে নেওয়া যেতে পারে হিরে এ-ঘরে নেই। বলতে বলতে মন্দিরের দেওয়ালের গায়ের একমাত্র খুপরি জানালাটা টেনে খুলল।

জানালার ওধারে নিচে জল-কাদার আবর্জনা একটা। বেশ বড়ই। ওখানে গোপালের চান করানো যায় ভেতরের নালা দিয়ে। আর জানালা দিয়ে বাসি ফুল বেলপাতা সব ফেলা হয়। বছরের পর বছর ধরে সেই সব জমে একটা ভেজা জংলা জায়গা হয়ে উঠেছে। ঝোপ-ঝাড়ও গজিয়েছে।

পিন্‌ডিদার সঙ্গে আমরা নেমে পায়ে হেঁটে সেই নোঙরা জলা জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। পিন্‌ডিদা গভীর মনোযোগ দিয়ে জায়গাটা দেখতে লাগল, আর মুখ তুলে মন্দিরের খুপরি জানালাটা দেখতে লাগল। তারপর বাবার দিকে ফিরে বলে উঠল, মেসোমশাই! অঙ্কের ফল কখনো পাঁচ রকম হয় না শুনেছি—তাড়াতাড়ির মধ্যে গোপালের হিরের চোখ খুলে পুরুত ওই জানালা দিয়ে নিশ্চয় এখানেই ফেলেছে, লোক লাগিয়ে এ জায়গাটা আপনি তন্নতন্ন করে খোঁজার ব্যবস্থা করুন! ও দুটো এখানে থাকতেই হবে!

সেই দিনই বিকেলের আগে গোপালের এক-জোড়া চোখই ওই কাদা-মাটির জঞ্জালের মধ্যে পাওয়া গেছে।

আমরা ফেমাস হয়ে গেছি রাতারাতি। পিন্‌ডিদার তো কথাই নেই। জমিদার বাড়ির মানুষেরা পারলে তাকে মাথায় করে নাচে। আর জমিদার গিন্নির সে-কী আনন্দের কান্না! আমাদের সকলের গায়ে হাত বুলোন আর বলেন, তোমরাই আমার গোপাল বাবা—আমার সত্যিকারের গোপাল—

পরপর দুদিন জমিদার গিন্নি আমাদের দলের সকলকে নেমন্তন্ন করে চর্ব্য-চষ্য-লেহ্য-পেয় খাইয়েছেন।

আমার আনন্দের সীমা-পরিসীমা নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে গোপনে দীর্ঘনিঃশ্বাসও পড়েছে দু একটা। বাদশামহলে যে পিন্‌ডিদা পুরুত ঠাকুরকে দেখে জ্যান্তভূত ভেবে ভয়ে অমন আর্তনাদ করে অজ্ঞান হবার উপক্রম করেছিল—সেই পিন্‌ডিদাই শেষে এমন কিস্তিমাত করল! অথচ ওই সহজ জল-ভাত ব্যাপারটা অনায়াসে আমার মাথায়ও আসতে পারত।

এর মধ্যে কাগজে আবার ফলাও করে সব খবর ছাপা হয়েছে। পিন্‌ডিদার সঙ্গে আমার নামও আছে দুই-এক জায়গায়। কাগজে সব থেকে বেশি লেখা হয়েছে দুর্ধর্ষ ডাকাত রামবাদশাকে নিয়ে। এ-রকম একটা ভয়ংকর ডাকাত পুলিশকে কলা দেখিয়ে সকলের ত্রাসের কারণ হয়ে উঠেছে অথচ পুলিশ তাকে ধরতে ছুঁতে পারছে না এ কেমন কথা! ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কাগজওয়ালা পুলিশকে ঠাট্টার হুল ফোটাতে ছাড়েনি। তারা থাকতে জমিদার বাড়ির গোপালের হিরের চোখ দুটোও উদ্ধার করল কিনা কটা নাবালক ছেলে! বলিহারি পুলিশ আমাদের!

আমাদের নাবালক বলাটা কেবল পছন্দ হয়নি, নইলে বেশ মজাই লাগছিল।

কিন্তু কপালে কী আছে জানা থাকলে মজার বদলে কাঁপুনি ধরত। বাঘে ছুঁলে শুনি আঠারো ঘা। আর পুলিশকে কলা দেখানো ডাকাত রামবাদশা ছুঁলে সে-যে কত ঘা তা কি ভাবতে পেরেছি?

তখনো জানি না, ওই খুনী ডাকাতের সঙ্গে আমাদের প্রাণান্তকর খেলার সবে শুরু এটা, শেষ নয়।

# দুই

নিজের গুণ-কীর্তন করতে কে না একটু ভালবাসে? কিন্তু তাই করতে গিয়ে গুনে গুনে একগুলো ফ্যাসাদ ঘাড়ে এসে চাপবে কে ভাবতে পারে? ব্যাপার আর কিছু নয়, মাস কয়েকের হাড়-ভাঙা খাটুনির পর হায়ার সেকেনডারি পর্ব শেষ করে সবে হাঁপ ফেলেছি। শুধু হাঁপ ফেলে বাঁচা নয়, ভিতরে ভিতরে একটু চাপা আনন্দও ছিল। পরীক্ষা কেমন দিয়েছি জানি, আর বাড়িতে আমাকে যে মাস্টারমশায় পড়ায় সে জানে। ওই মাস্টারমশাইটি পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে যে আশার কথা শুনিয়েছে তা আবার আমি আড়াল থেকে শুনে ফেলেছি। বাবাকে বলছিল, সোনা (অর্থাৎ আমি) ডিসট্রিক্ট স্কলারশিপ তো পাবেই, প্রথম দশ জনের একজন না হলেই দুঃখের কথা হবে।

এর পর সদা গম্ভীর বাবার খুশি মুখ দেখেছি। আর মওকা বুঝে বাবার কানে যায় এমন করে মায়ের কাছে পঁচিশ টাকা চেয়ে বসেছি। মা যথারীতি খেঁকিয়ে উঠেছিল। ঠাকুমা অবশ্য আমার পক্ষ নিয়েছিল। বলেছিল, এমন একটা পরীক্ষা দিয়ে উঠল, এখন তো একটু আধটু ফুর্তি করবেই—পঁচিশ না পারো পনেরোটা টাকা দিয়ে দাও।

একমাত্র নাতির জন্য তার দরদ ছাড়া ভয়ও একটু ছিল। টাকা না পেলে তার বাক্স থেকে টাকা উধাও হবার সম্ভাবনা। যাক, আধ ঘন্টার মধ্যে দেখা গেল, পনেরো নয়, কড়কড়ে পঁচিশটা টাকাই মায়ের মারফত আমার হাতে এসেছে। আমি তক্ষুনি বেরিয়ে গিয়ে চটপটি আর কার্তিককে ধরেছি! কোয়েশ্চেন পেপার নিয়ে দুজন বসে কে কত নম্বর পেতে পারে হিসেব করছিল। কার্তিকের ধারণা ওর সেকেন্ড ডিভিশন কেউ রুখতে পারবে না। আর চটপটির আশা, থার্ড ডিভিশনের বেশ ওপরের দিকেই নম্বর থাকবে ওর। ওদের এই নিবিষ্ট আলোচনার মধ্যে পিছন থেকে নিঃশব্দে আমি হাজির হতে দুজনেই অপ্রস্তুত একটু। কার্তিক মুখ মচকে ঠেস দিল, তোমার আর কী, তুমি সোনার ছেলে, পরীক্ষার নম্বরেও সোনার জেল্লা ঠিকরোবে।

ওদের ভাবনা-চিন্তা উড়িয়ে দিয়ে বললাম, ছাড় তো ও-সব কথা, আজ বিকেলে মাঠে বসার ইচ্ছে আছে কি নেই? পিন্‌ডিদাকে ডাক আর কেবলুকে খবর দে—

হাবুল হোঁতকার নামটা ইচ্ছে করেই করলাম না। পিন্‌ডিদা এলে ও আসবে জানা কথা। পিন্‌ডিদার এমন চামচে আর দুটি নেই। আর সংস্কৃত বিশারদ কেবলু তো খবর পেলেই ছুটে আসবে। তার তো আর পরীক্ষার ফলাফলের ভাবনা নেই। এক সংস্কৃততে ফেল করে করে ও দু বছর পিছিয়ে আছে। সেই রাগে কথায় কথায় অনুস্বার বিসর্গ চন্দ্রবিন্দু লাগিয়ে সংস্কৃতের ওপর ঝাল ঝাড়ে। মোট কথা, আমাদের পরীক্ষার দরুন দুদুটো মাস মাঠের আড্ডা বন্ধ থাকার জন্য ওই তিন জনেরই পেট ফুলছে জানি। না, পিন্‌ডিদার পেট ঠিক ফুলছে না বোধহয়, তার পেটে চড়া পড়ছে।

আমার প্রস্তাব শুনে চোখ পিটপিট করে চটপটি বলল, এতদিন বাদে পিন্‌ডিদাকে খবর দিচ্ছিস—পকেটে মালকড়ি আছে নিশ্চয়?

সকলেই জানে, শকুনির চোখ যেমন ভাগাড়ের দিকে, পিন্‌ডিদার চোখও সর্বদাই তেমনি আমার পকেটের দিকে। পঁচিশ টাকা প্রাপ্তির ব্যাপারটা ওদের কাছেও চেপে গিয়ে বললাম, খবর তো দে, একটু আধটু মুখ চলার মতো ব্যবস্থা করা যাবে।

কার্তিক চটপটি আর আমার কাছাকাছি বাড়ি। বিকেলে তিনজনে একসঙ্গে মাঠে বসার জায়গাটিতে এসে জুটেছি। এতদিন পরের আড্ডা, সতৃষ্ণ চোখে সামনের উঁচু টিপিটার দিকে তাকাচ্ছি। আগে ওই আসনে আমি বসতাম, পিন্‌ডিদার সঙ্গে মাখামাখির পর সসম্মানে তাকে ওটা

ছেড়ে দিয়েছি। আমি গুণীর কদর জানি কিন্তু ফাঁক পেলে পিন্‌ডিদাই আমাকে ঠাসতে ছাড়ে না। তাই মাঝে মাঝে রাগ হয়ে যায়, আরো বেশি রাগ হয় ওই পোঁ-ধরা হোঁতকা হাবুলটার জন্য। পিন্‌ডিদা ওর চোখে আমাকে নস্যি বানিয়ে নাকে পুরতে পারার মতো মানুষ। কিন্তু এতদিন বাদে পিন্‌ডিদার জন্যেই ভিতরটা উসখুস করছে। মানুষটা যে কত উঁচুদরের, তা তো-অস্বীকার করার জো নেই।

একটু বাদে হাবুলকে সঙ্গে করে কেবলু হাজির। ওর সংস্কৃত কচকচি শুনলে যেমন কান কড়কড় করে, না শুনলেও তেমনি ভালো লাগে না। ও এসেই শুভেচ্ছা জানালো, শুভম্ অস্তু, শুভম্ অস্তু—অমৃতস্য পুত্রঃ পিন্‌ডিদা কুত্র?

কার্তিক বলল, ঘুরিতং যত্রতত্র। হেবো খুঁজে দেখ্‌গে, যা না—

তার আর দরকার হল না। অদূরের রাস্তায় রোগা ঢ্যাঙা মূর্তির দর্শন পেলাম। আমাকে বাড়িতে যে মাস্টারমশায় পড়ায়, তার সঙ্গে কথা কইতে কইতে ঢিমে তালে আসছে। অবাক কাণ্ড, পিন্‌ডিদার হাতে ছোট টিফিন ক্যারিয়ারের মতো একটা কি।

একটু বাদে মাস্টারমশাই এগিয়ে গেল, পিন্‌ডিদা মাঠের দিকে পা চালালো। হাতে দুবাটির একটা টিফিন ক্যারিয়ারই বটে। পিন্‌ডিদা ট্যাকের পয়সা খরচ করে সকলের জন্য খাবার এনেছে, এমন তাজ্জব ব্যাপার কখনো দেখিনি। নিস্পৃহ মুখে সে তার ঢিপির আসনে বসার সঙ্গে সঙ্গে চটপটি চটপট জানতে চাইলো, ওতে কী পিন্‌ডিদা?

ভুরু কুঁচকে পিন্‌ডিদা জবাব দিল, অত খাই-খাই দিশা কেন তোদের—খোল দেখলেই নোলায় জল? আমার দিকে ফিরল, কিরে সোনা, পরীক্ষা কেমন দিলি—পাস টাস করবি?

যেভাবে জিজ্ঞেস করল, কানে বিঁধতেই একটু গম্ভীর গলায় জোর দিয়ে জবাব দিলাম, তা করব।

—কোন ডিভিশন আশা করছিস, থার্ড না সেকেন্ড?

পিত্তি-জ্বালানো কথা। বললাম, দুটোর একটাও না।

চটপটি ফসফস করে উঠল, তুমি বলছ কী পিন্‌ডিদা—সোনা স্কুলের ফার্স্ট বয়, ভুলে গেলে? সব্বাই ধরে বসে আছে, ও স্কলারশিপ পাবে!

—হুঁ? পিন্‌ডিদার দু চোখ আমার মুখের ওপর আরো তেরছা হয়ে বসল।—তাহলে একটা বাজি হয়ে যাক, কি বলিস সোনা—হিম্মত আছে?

পিন্‌ডিদার কাছে বার কয়েক বাজিতে হেরেছি। কিন্তু স্কলারশিপ পাওয়ার আশা আমার মাথায় ঠেসে আছে। এবার যদি হারি তো সেটা না পাওয়ার দণ্ড ভাবব। জবাব দিলাম, এদের কারো সঙ্গে নয়, শুধু তোমার সঙ্গে বাজি ধরতে রাজি।

তাহলে বাজিটা আজ থেকেই শুরু?

সঠিক না বুঝেই মাথা নাড়লাম। অর্থাৎ আজ থেকেই শুরু।

অলস চোখে পিন্‌ডিদা এবারে বাকি সকলের মুখগুলো দেখে নিল।—তোরা সব শুনলি তো?

সকলে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল। চটপটি বলল, সোনা কখনো কথার খেলাপ করে না পিন্‌ডিদা—এখন কী বাজি বলো।

কিন্তু এর পর বাজির ফিরিস্তি শুনে আমরাই দু চোখ ছানাবড়া। পিন্‌ডিদা বল, আমি বাজি ধরলাম সোনা স্কলারশিপ পাবে আর পাবে ধরে নিয়ে আজ থেকে ও মাঝে মাঝে আমাদের খাওয়াবে। আর আমি বাজি হারলে অর্থাৎ সোনা স্কলারিশপ না পেলে ফল যেদিন বেরুবে সেদিন আমি ওকে খাওয়াবো।

শর্ত শুনে প্রথমে সকলে হকচকিয়ে গেল। তারপর ব্যাপার বুঝে ওরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, থ্রি চিয়ার্স ফর পিন্‌ডিদা! কেবলু আমার দিকে ফিরে চেঁচিয়ে বলে উঠল, পিন্‌ডিদা তব শুভং যাচতি—বাজিং ধরং সোনা!

পিন্‌ডিদা ওকেই ধমকে উঠল, ডোন্ট্ ফড়ফড়ং—সোনা তোদের মতো নাকি, ও সোনার ছেলে—এ বাজি না ধরার মতো দুর্বল ভাবিস ওকে?

পিন্‌ডিদার কথায় সায় দিয়ে হেবো হাতিটা চোখ পাকিয়ে কেবলুকে একটা গাঁট্টা দেখালো।

বাজি না ধরা মানেই স্কলারশিপ না পাওয়ার ভয়—আর আমার কাছে সেটা সব থেকে অলুক্ষণে ব্যাপার। স্কলারশিপ না পেয়ে পিন্‌ডিদার কাছ থেকে আমি বাজি জিততে চাই না। কিন্তু এমন উল্টো বাজির জন্য কে তৈরি থাকে?

একটা হাই তুলে পিন্‌ডিদা টিফিন ক্যারিয়ারটা সামনে টেনে নিল। সেটা খুলতে খুলতে বলল, আজ থেকে যখন বাজি শুরু—শুরু হয়েই যাক্। আসার সময় খোঁজ নিয়ে দেখি বিনোদ ব্যাটা আস্ত আস্ত ডিম ফেলে ঘুগনি বানিয়েছে। কি আর করি, বাড়ি ফিরে টিফিন ক্যারিয়ার এনে সব মজুত করে তবে এলাম— আসতে সাধে দেরি হল!

বড় দুটো বাটি খোলা হতে দেখা গেল, এক বাটিতে পাঁচটা ডিমে ঠাসা ঘুগনি, অন্য বাটির অর্ধেকটায় দুটো ডিম সমেত ঘুগনি। আর তার ওপর ছোট পাঁচটা ডিশ পাঁজা করা। পকেট থেকে ছটা চামচে বার করে একটা রেখে বাকি পাঁচটা আমাদের হাতে দিল। তারপর ডিশ পাঁচটা। তারপর পাঁচ ডিমের ভরা বাটিটা কেবলুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, ভাগং কুরু—কেউ কম-বেশি নিস্ না।

পিনডিদার ডিশের দরকার নেই। দুটো ডিম আর অর্ধেক ঘুগনির বাটি তার। খাওয়ার ব্যাপারে লিডারের ডবল তিন ডবল দাবিটা আমরা মেনে নিয়েছি। কেবলু চামচে দিয়ে মেপে ডিশে ঘুগনি সাজাচ্ছে। আমার হিসেব হয়ে গেছে, বিনোদ ছজনের সাত ডিশের দাম কম করে সাত টাকা হাঁকবে।

বাজির দায়ে আমার পকেটের পঁচিশ টাকা দেখতে দেখতে উবে গেল! তার পরে মড়ার উপর পিন্‌ডিদার খাঁড়ার ঘা। সেদিন প্রস্তাব করল, এরকম খেয়ে আশ মিটছে না—আমরা তোকে বাজিতে হারানোর জন্য অর্থাৎ তোকে স্কলারশিপ পাওয়ানোর জন্য প্লেনটি অফ্ শুভেচ্ছা খরচ করছি—বাড়িতে একদিন রাম খ্যাঁটের ব্যবস্থা কর। কী বলিস রে তোরা?

সকলে হইহই করে সায় দিল। এমন কি চটপটি আর কার্তিকও। ওরা কে কেমন পাস করবে ঠিক নেই বলে ওদেরও হয়তো আমার ওপর চাপা আক্রোশ।

আপত্তির সুরে বললাম, রেজাল্ট বেরোক।

সঙ্গে সঙ্গে পিন্‌ডিদার হলু ফোটানো ঠেস।—তার মানে তুই বাজিতে হারলি স্বীকার করছিস? স্কলারশিপ পাবি না?

—তা কেন.....

—তাহলে তা-না-না-না করে সামনের রোববারেই ব্যবস্থা কর্।

বিরক্তি চেপে পিন্‌ডিদা উঠে হনহন করে চলে গেল।

অগত্যা আমি ঠাকুমার শরণাপন্ন হলাম। বললাম, আমি যাতে স্কলারশিপ পাই তার জন্য বন্ধুরা সব কালীবাড়িতে পুজো দিচ্ছে, রোজ দল বেঁধে শুকনো মুখে প্রার্থনা করছে—ওদের ডেকে একদিন পেট পুরে খাওয়ানো উচিত।

ঠাকুমা আনন্দে গদগদ।—বলিস কিরে, তোর স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য মায়ের কাছে ধরনা দিচ্ছে! ওদের খাওয়াবি না তো কাকে খাওয়াবি? বউমাকে বলে আমি সব ব্যবস্থা কচ্ছি।

ব্যবস্থা হয়ে গেল। এই আনন্দে আমার বাড়ির মাস্টারমশাইকেও নেমন্তন্ন করা উচিত ভাবলাম। ভদ্রলোক কত প্রাণ ঢেলে পড়ান সেটা আমার থেকে বেশি কে জানে?

মাস্টারমশাইকে বলতে এসে বোঝা গেল, এমন উদ্ভট বাজি ধরার জোরটা পিন্‌ডিদা কোত্থেকে পেল। কথায় কথায় মাস্টারমশাই জিজ্ঞেস করল, তোদের ওই প্রদীপ ছেলেটা চমৎকার, এত জানেশোনে কিন্তু একটুও অহংকার নেই।

কার কথা বলছে আমি প্রথমে বুঝতেই পারিনি। পরে অবশ্য খেয়াল হল, মাস্টারমশাই পিন্‌ডিদার খুব প্রশংসা করছে। মাস্টারমশাই আবার বলল, তোকে ভালবাসে খুব, তোর পরীক্ষার জন্য কত চিন্তা···কতবার করে জিজ্ঞেস করেছে জেনারেল স্কলারশিপ পাওয়ার চান্স আছে কি না।

সকলের সব নেমন্তন্ন-টেমন্তন্ন বাতিল করে দিতে ইচ্ছে করল প্রথম। কিন্তু স্কলারশিপ পেলে বাজি হারবার এমন একটা হারার লোভ সামলানোও সহজ নয়। আমাকে তাক লাগিয়ে দিয়ে মাস্টারমশাই জিজ্ঞেস করল, তোরা কোথাও যাবি ঠিক হয়েছে? কবে বেরোচ্ছিস?

আমাকে অমন হাঁ হয়ে যেতে দেখে মাস্টারমশাইও অবাক একটু! বলল, তোর বাবার সঙ্গে তো আমার কথা হয়ে গেছে, তিনি এখনো বলেননি কিছু, না?

কী কথা বা কী নিয়ে কথা পরে শুনলাম। পিন্‌ডিদা মাস্টারমশাইকে বলেছে, সব দেশের সোনার টুকরো ছেলেরা—ভবিষ্যতে যারা বড় হবেই—পরীক্ষার পর তারা ঘরে বসে থাকে না—সব ক্লান্তি ধুয়ে মুছে ফেলার জন্য কোথাও বেড়াতে চলে যায়। তারপর চার ডবল উৎসাহ আর উদ্যম নিয়ে নতুন করে শুরু করে। কিন্তু এ দেশে শুধু ঘরে বসে থেকে আর পরীক্ষা দিয়ে দিয়ে ক্লান্ত স্নায়ু নিয়ে ভালো ভালো ছেলেগুলো সব নুয়ে পড়ে। মাস্টারমশাইও পিন্‌ডিদার সঙ্গে একমত। তাই পিন্‌ডিদা উদার প্রস্তাব দিয়েছে, সোনাও সোনার ছেলে, সে যদি বাইরে কোথাও যায়, হাজার কাজ ফেলে পিন্‌ডিদাও সঙ্গে যেতে রাজি আছে। খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা থাকলে বন্ধুদের আর যারা যাবে তারাও খুশি হয়ে নিজেদের যাতায়াতের খরচ দিতে রাজি হবেই। পিন্‌ডিদার সঙ্গে একেবারে একমত বলেই মাস্টারমশাই এর পর বাবার সঙ্গে আলোচনা করেছে। বাবা বলেছে, ভেবে দেখি।

বাবার চোখে মাস্টারমশাই একজন ছাত্রপাগল আদর্শ মানুষ, তাই তার কথা বাবার কাছে একটুও হেলাফেলার কথা নয়, জানি। কিন্তু পিন্‌ডিদা কি দুষ্টু! কি দুষ্টু! আর বাবার পয়সায় এই মওকায় যদি দল বেঁধে কোথাও বেড়াতে যেতে পারি তো তার ওপর রাগই বা হয় কী করে?

তারপর রোববারের সেই বিকেল। খাওয়ানো হবে ঠিক করলে মায়ের কার্পণ্য নেই। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মেনুটা আমিই মায়ের মাথায় ঢুকিয়েছি। লুচি, আলুর দম, মাছের ফ্রাই, মাংসের কোর্মা, চাটনি, আইসক্রিম। হাবুল হোঁতকারও গলা দিয়ে প্রশংসা বুলি বেরুলো। তুই সোনা বছরে ছবার করে স্কলারশিপ পা মাইরি!

পিন্‌ডিদা একমনে খেয়ে চলেছে। খাওয়ার সময় বাজে বকে এনারজি নষ্ট করার মানুষ নয় সে। আর একটা বিরাট সম্ভাবনার খবর আমি কারো কাছে ফাঁস করিনি। বাবা রাজি হবে কি হবে না কে জানে! তাই পিন্‌ডিদার কাছেও কিছু না জানার ভান করে বসে থাকা ভালো।

বাবা আর মাস্টারমশাই ওদিকের একটা ঘরে বসে খাচ্ছিল। পিন্‌ডিদা তখন তিন নম্বর আইসক্রিম নিয়ে বসেছে। হাসি মুখে বাবা এসে হাজির, পিছনে মাস্টারমশাই। পিন্‌ডিদা ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালো, চোখমুখ দিয়ে ভক্তিশ্রদ্ধা উছলে পড়ছে। তার দেখাদেখি বাকি সকলেও উঠে দাঁড়ালো। সকলের এত ভক্তি দেখে আমিই বা বসে থাকি কী করে?

বাবা বলল, থাক, বোসো সব—বোসো, খাওয়া ফেলে উঠে দাঁড়ায় না। তা কোথায় বেড়াতে যাবে সব ঠিক করলে?

জবাবে পিন্‌ডিদার দু চোখ বাবার পায়ের দিকে। হাত এঁটো, চোখ দিয়েই প্রণামটা সেরে নিচ্ছে যেন। ওদিন থেকে হেবো হাতিটা ফস করে জবাব দিয়ে বসল, বেজায় খাওয়া হয়েছে মেসোমশাই—এর পর একটু খোলা মাঠের দিকে—

—হাবুল! পিন্‌ডিদার খুব চাপা ধমক হেবোর মাথায় বজ্র হয়ে নামল। —ভব্যতা জানো না? গুরুজনেরা থাকতে কোথায় যাওয়া হবে সেটা তুমি ঠিক করবে? পিন্‌ডিদার দু' চোখ আবার বাবার পায়ের দিকে নেমে এলো—আপনিই ঠিক করে দিন, আমরা ভালোমন্দ কী বুঝি।

জমিদার বাড়ির গোপালের হিরের চোখ উদ্ধার হবার পর থেকে পিনুডিদাকে বাবা দারুণ বুদ্ধিমান ছেলে ভাবত। সেই ছেলে কত বিনয়ী আজ তা-ও দেখছে।

খুশি মুখে বাবা বলল, আমার ঠিক করাই আছে। দিন পনেরো দেওঘরে কাটিয়ে এসো তোমরা। সেখানে আমার বন্ধুর বিশাল একটা বাড়ি খালি পড়ে আছে, চারদিকে মস্ত কম্পাউন্ড—বন্ধুর সঙ্গে ফোনে কথা বলে রেখেছি। আধবুড়ো মালী আছে একটা, খাসা রাঁধে। ভালোই লাগবে তোমাদের।

পিনুডিদার দু চোখে ভক্তিশ্রদ্ধা চুঁয়ে পড়ছে। গলা দিয়ে স্বর বেরুলো না বলে মাথা নাড়ল। আমি ছাড়া বাকি সকলে হাঁ।

বাবা আর মাস্টারমশাই চলে যেতে পিনুডিদাই আগে বসে পড়ে আইসক্রিমের ঢাকনা খুলতে খুলতে হাবুলের দিকে একবার অগ্নি-দৃষ্টিতে তাকিয়ে চাপা গলায় বলল, ইডিয়েট্! তারপর নির্লিপ্ত দু'চোখ দুর্বোধ্য মুখের ওপর চক্কর খেয়ে আমার চোখে এসে আটকালো। জিজ্ঞেস করল, তোর মাথায় ঢুকেছে কিছু?

আমি আর বোকা বনতে রাজি নই। হালকা করে জবাব দিলাম, না ঢোকার কী আছে, কদিন ধরে তো এ-জন্যে আমি ঠাকুমার পিছনে লেগে আছি। তার কৃতিত্বটা আত্মসাৎ করে সামলে দেবার জন্য তাড়াতাড়ি বললাম, তোমাকে আর দুটো আইসক্রিম দেবে পিনুডিদা?

জব্দ হয়ে পিনুডিদা দু' চোখে ভস্ম করতে চাইল আমাকে। এদিকে এত খাওয়ার ওপরে এই কৌতূহলে ডবল হাঁসফাঁস দশা সকলের। কেবলু বলেই উঠল, দোহাই পিনুডিদা, রহস্য ফাঁসং কুরু!

এক চামচ আইসক্রিম মুখে পুরে পিনুডিদা জানান দিল, সোনার রেস্ট আর রিক্রিয়েশনের জন্য সকলে মিলে পনেরো দিনের জন্য দেওঘর যাওয়া হবে—মাস্টারমশাইকে ধরে আমিই সব ব্যবস্থা করেছি, ক্রেডিটটা এখন সোনা নিতে চাইছে। তা নিক গে, ওর ভালই তো চাই। তোরা সব যে-যার যাতায়াতের ট্রেন ভাড়া দিবি, বাকি সব খরচ সোনার বাবার। টিকিট আর হাতখরচ সমেত তোদের গোটা তিরিশ করে টাকা সঙ্গে নিলেই হবে।

তিরিশ টাকায় দল বেঁধে দশ-পনেরো দিনের জন্য সকলের দেওঘর বেড়ানো! চটপটি কার্তিক আর কেবলু আনন্দে বাঁ হাতে টেবিল চাপড়ালো। কিন্তু তার পরেই হাবুলের আর্তনাদ। —আমি তিরিশ টাকা ছেড়ে তিরিশটা সিকিও যোগাড় করতে পারব না পিনুডিদা!

মওকা পেয়ে আমি ফোড়ন ছাড়লাম, সকলের সব জায়গায় যেতেই হবে তার কী মানে, অসুবিধে থাকলে যাবি না—ফিরে এসে আমরা কি বোবা হয়ে থাকব নাকি—গপ্প শুনতে পারবি না?

হেবো হাতি কুতকুতে করুণ চোখে পিনুডিদার দিকে তাকালো। পিনুডিদাও ঠান্ডা ধমকের চোখে তার দিকে চেয়ে আছে দেখে আমরা বাকি চার জনই খুশি। সুযোগ পেলেই ও গুরুর পায়ে তেল ঢালে। অর্বাচীনকে ধমকানোর সুরেই পিনুডিদা বলল, সোনার কথাই ঠিক, তোর মতো হাঁদাকে ফেলে যাওয়াই উচিত। আমি গেলে তুই যাবি না এমন চিন্তা তোর মাথায় আসে কী করে? আমার ভার নেওয়া মানেই তোরও ভার নেওয়া, এই বুদ্ধিটুকুও নেই?

পিনুডিদা কোন্ দিকে ঢিলটা ছুড়ল হাড়ে হাড়ে বোঝা গেল। সবসময় এ-রকম পক্ষপাতিত্ব দেখলে কার না গা জ্বলে। নিজের আহাম্মুকির লজ্জায় হেবোর মুখেও হাসি ধরে না।

ঠাকুমার পাঁজির দিন ক্ষণ অনুযায়ী দুর্গা দুর্গা করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। ট্রেনের সকলের টিকিটই বাবা করে রেখেছিল। সকলের ফেরার ভাড়াও দিয়ে রেখেছে। বলেছে, এটুকু পথ, কত আর ভাড়া, কারো কাছ থেকে নিয়ে কাজ নেই। বেরুনোর আগে ঠাকুমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে পিনুডিদা অভয় দিয়েছে, নাতির জন্য ভাববেন না, প্রাণ থাকতে ওর গায়ে কোনো আঁচড় পড়বে না।

কিন্তু বড়সড় একটা আঁচড় এই রাতেই পড়ল আর সেটা বসালো স্বয়ং পিনুডিদা। রাতের মোগলসরাই প্যাসেঞ্জারে দেওঘর বদ্যিনাথ ধামের একটা বগি থাকে, জসিডি থেকে সেটা কেটে নিয়ে জুড়ে দেওয়া হয়। তাই জসিডিতে আমাদের নামতেও হবে না। ট্রেনে উঠে আমরা হইহই করে যে-যার বিছানা করে নিলাম। একেবারে ঠোঁট সেলাই শুধু পিনুডিদার। মুখে খুশির চিহ্ন নেই। সে যেন আমাদের সঙ্গের যাত্রীই নয়। ট্রেন ছাড়ার আধ ঘন্টা পর্যন্ত একই ব্যাপার।

আমাকে নিয়েই এই ফুর্তির ট্রিপ। তাই ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কী হল পিনুডিদা?

আমার দিকে একবার বরফ চোখে তাকিয়ে পিনুডিদা বাকি সকলের দিকে ফিরল। তেমনি ঠান্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল, তোদের নতুন লিডারকে তোরা কংগ্র্যাচুলেট করেছিস?

সকলে আকাশ থেকে পড়ল। পিনুডিদার দু' চোখের ছুরি আবার আমার মুখের ওপরে কেটে বসল। শানানো গলায় বলল, কংগ্র্যাচুলেশনস!

আমি হতভম্ব।—বারে, তুমি থাকতে আমি লিডার হতে যাব কেন?

—কি বললি? রোগা ঢ্যাঙা শরীরটা টান করে পিনুডিদা খেঁকিয়ে উঠল, এই অপমানের পরেও আমি তোদের লিডার? আমি পরের স্টেশনেই নেমে ফিরে যাচ্ছি, এটাও তোদের বলে দিতে হবে?

আবার আমরা শুকনো ডাঙায় বিষম আছাড় খেলাম। সংস্কৃত ভুলে কেবলু বলে উঠল, দোহাই পিনুডিদা, এমন আনন্দের মধ্যে হঠাৎ কী হল খুলে বলো—আমাদের মধ্যে কে তোমাকে অপমান করতে পারে?

পিনুডিদা আগের মতোই নীরস ঠান্ডা আবার। জবাব দিল, এত বড় ফুর্তির সব ব্যবস্থা করলাম আমি, অথচ খরচের সব টাকা সোনার পকেটে—মুখে বলছিস আমি লিডার?

আমার মুখ শুকিয়ে আমসি। বাকি সকলেও চুপ! হাবলুই প্রথম হাঁসফাঁস করে উঠল। আমার দিকে ফিরে বলে উঠল, ছি-ছি সোনা—এই কান্ডজ্ঞান তোর! সদারি করার সব টাকা তোর পকেটে আর মুখে বলছিস পিনুডিদা লিডার! এর থেকে অপমান আর কী হতে পারে? ক্ষমা চেয়ে নে, আর পকেটে যা আছে এক্ষুনি দিয়ে ফ্যাল!

উপায় থাকলে হেবো হোঁতকাটাকে আমি ঘাড় ধাক্কা দিয়ে চলন্ত ট্রেন থেকে ফেলে দিতাম। মিনমিন করে বললাম, প্যান্টের ভিতরের পকেটে সেফ্‌টিপিন আঁটা আছে.....প্যাসেঞ্জারের সামনে বার করা ঠিক হবে?

ঘাড় ফিরিয়ে পিনুডিদা আমাদের খুপরির মুখোমুখি জানলার বেঞ্চটার দিকে তাকালো। সেখানে অল্পবয়সী দুজন ফিট্‌ফাট ভদ্রলোক বসে গল্প করছে। দেখে মনে হল বিহারী হবে।

চোরধরা পুলিসের মতো পিনুডিদার দু চোখ আবার আমার মুখের ওপর। জিজ্ঞেস করল, ট্রেন ভাড়া মাথা পিছু কত করে লেগেছে?

—ন টাকার মতো।

—যাতায়াতে তাহলে হল গিয়ে আঠারো টাকা। সকলের ভাড়া তোর বাবাই দিয়েছে তো?

মাথা নাড়লাম। দিয়েছে।

পিনুডিদার চাউনি আরো নির্মম...হাতখরচের বারো টাকা রেখে বাকি সব টাকা আমাকে দিবি। পিনুডিদা অত কাঁচা ছেলে নয়, প্যাসেঞ্জারের ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না!

তার শোন দৃষ্টি এবারে কেবলু চটপটি আর কার্তিকের দিকে ঘুরল।—ট্রেন ভাড়া লাগবে ধরে নিয়ে তোরাও তিরিশ টাকা করে এনেছিস তো?

আমি ওদের ওপরেই হঠাৎ হিংস্র হয়ে উঠলাম। কেউ জবাব দেওয়ার আগেই বললাম, নিশ্চয় এনেছে—বাবা ট্রেন ভাড়া দিয়ে দেবে ওরা জানবে কী করে?

—ঠিক আছে। পিনুডিদা শেষ রায় ঘোষণা করল, তোরাও হাত খরচের বারো টাকা রেখে বাকি আঠারো টাকা করে আমাকে দিয়ে দিবি—ফান্ড্ হাবুলের মতো মোটাসোটা না হলে চলে!

উঠে দাঁড়ালো। ফাঁসির আসামিকে ডেকে নেবার মতো করে আমার দিকে চেয়ে হুকুম করল, আয়!

গটগট করে কামরার পিছন দিকে চলল সে। টাকার শোকে এত মুষড়ে পড়েছিলাম যে এক্ষুনি ডাকার অর্থও মাথায় এলো না। তার পিছনে চললাম।

কামরায় ভিড় বেশি নেই। ল্যাভেটরি মানে বাথরুমের দিকের বেঞ্চের লোক দুটো ঝিমুচ্ছে আর এ ওর গায়ে ঠোক্কর খাচ্ছে। বাথরুমে ঢুকে পড়ে পিন্‌ডিদা চোখ ইশারা করল। আমিও ঢুকতে দরজা বন্ধ করে বলল, বার কর্!

আমি রেগেই গেলাম।—দেওঘরে গিয়ে দিলে হত না?

পিন্‌ডিদা এক গাল হেসে বলল, টাকার গরম ছাড়া ট্রেনে আমার ভালো ঘুম হয় না, কী করি বল্, চটপট বার কর্।

আসলে কোনো ফাঁকে আমি কিছু টাকা সরিয়ে ফেলি সেই জন্যই এমন জুলুম। সেই ইচ্ছা আমার মনে মনে ছিল এও ঠিক। ঘেন্নায় আমি আর কিছু না বলে মাত্র বারো টাকা রেখে বাকি সব তাকে দিয়ে দিলাম। বাবা মোট চারশো টাকা দিয়েছিল। তার মধ্যে তিনশো অষ্টাশি টাকা পিন্‌ডিদার খপ্পরে—বারোটি টাকা মাত্র আমার সম্বল।

টাকা হাতের মুঠোয় নিয়ে পিন্‌ডিদা হুকুম করল, একে একে ওদের তিনজনকে পাঠিয়ে দে!

অর্থাৎ ওরাও কেউ তিরিশ টাকার বেশি এনেছে কি না সেই অবিশ্বাস।

আমি ফিরে এলাম। তারপর হুকুম মতো একে একে চটপটি কেবলু আর কার্তিক গেল আর বিরস মুখে ফিরে এলো। একমাত্র হাবুলের চোখেমুখে হাসি চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছে। আর আমাদের চারজনের ওর মুন্ডটা ছিঁড়ে নিতে ইচ্ছে করছে।

একটু বাদে শিস দিতে দিতে পিন্‌ডিদা ফিরল। যেন ট্রেনের মধ্যেই হাওয়া খেতে বেরিয়েছিল একটু। তাকে দেখেই আমাদের চারজনের চোখ জানলা দিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে।

মিষ্টি গলায় ভাঙা বাংলায় প্রশ্ন শুনে পিন্‌ডিদার শিস থামল। আমরাও ঘাড় ফেরালাম। আলাপের সুরে পিন্‌ডিদাকেই জিজ্ঞেস করছে জানলার দিকের বেঞ্চির সেই দুই ভদ্রলোকের একজন—সাহেব ছেলেরা, কুথা যেতেছেন?

দু'জনেরই আঠাশ তিরিশের মতো হবে বয়েস। শৌখিন দামী ট্রাউজারের ওপর টেরিকটের বুশশার্ট। প্রশ্ন যার, সে পরিপুষ্ট জোয়ান মানুষ, কিন্তু গলার স্বর মেয়েছেলের মত কচি-কাঁচা। এই বেশবাস আর চেহারার এমন স্বর বা এ-ধরনের গ্রাম্য ভাঙা বাংলায় প্রশ্ন মানায় না। দেখে মনে হল, অল্প লেখাপড়া জানা পয়সাঅলা ব্যবসায়ী হবে। সাহেব ছেলেরা শুনে পিন্‌ডিদা অখুশি নয়। বলবেই তো, আমাদের তো বটেই, লিকলিকে পিন্‌ডিদা আর হেবোহাতির পরনেও ট্রাউজার আর শার্ট, পায়ে মোজার ওপর শু।

পিন্‌ডিদা বলল, দেওঘর। আপনারা?

সঙ্গে সঙ্গে দুজনেই তারা জোড়হাত কপালে ঠেকালো এবং জোয়ান লোকটাই জবাব দিল, হামারা বাবা বদ্যিনাথ জিউর দাস, উখানেই মোকান আছে, কাজেই ধান্ধায় কোলকাত্তা অউর বর্ধমানে আসা-যাওয়া আছে।....তা আপনারা বদ্যিনাথ দর্শনে যেতেছেন না বেড়াতে?

বদ্যিনাথ ধাম বলতে দেওঘরই। পিন্‌ডিদা বলল, দুই-ই।

লোকটি বেশ অমায়িক। জিজ্ঞেস করল, উখানে সাহেবদের জানপয়চান আদমি আছে তো... ওসুবিধা হোবে না?

ফের সাহেব শুনে পিন্‌ডিদা পরিতুষ্ট এবং গম্ভীর। জবাব দিল, ওখানে আমাদের জামাই আদরের ব্যবস্থা আছে।

দুজনেই ওরা হেসে উঠল। লোকটা বলল, জামাই আদর বুঝতে পারে—হামার নাম বংশী পান্ডে, অওর উ চিমনলাল—দেওঘর বাজারে যাকে পুছবেন, হামার মোকান দেখলায়ে দিবে।

পিনুডিদার মাথায় তক্ষুনি একটা নেমন্তন্নের আশা জাগল বোধ হয় পিটপিট করে তাকিয়ে মাথা নাড়ল, তারপর জিজ্ঞেস করল, দেওঘরে খাওয়া-দাওয়া ভালো পাওয়া যায়?

—বহুত খুব—বহুত খুব। মছলি মাংস মিঠাই ফ্রেস আনাজ বহুত সস্তা। কোলকাত্তা অউর বর্ধমানে তো সব কুছ সড়া আছে।

পিনুডিদা এদিক ফিরে গলা খাটো করে জিজ্ঞেস করল, সড়া কিরে?

আমরাও জানি না। সঙ্গে সঙ্গে ওদিক থেকে লোকটার কচি গলার হাসি শোনা গেল।—সড়া বুঝিয়েছেন না? পোচা আছে—পোচা।

কলকাতার সঙ্গে বর্ধমানেরও সব কিছু পচা শুনে আমাদের ভালো লাগল না। ভাবলাম দিই দু'কথা শুনিয়ে। কিন্তু লোকটার সঙ্গী চিমনলাল টিফিন ক্যারিয়ার খুলতেই চোখে পড়ল একটাতে বর্ধমানের সীতাভোগ অন্যটাতে মিনিদানা। বড় বড় দুটো বাটিই বেশ ঠাসা। সামনে বড় দুটো মোটা কাগজের ডিশ সাজিয়ে চিমনলাল চামচ দিয়ে এক এক ঠিকি সীতাভোগ মিহিদানা নামালো। পিনুডিদা জুলজুল করে দেখল একটু, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে খুব চাপা খেদে মন্তব্য করল, বর্ধমানের পচা সীতাভোগ আর মিহিদানা সাবড়াবে এবার। তারপরেই আমার ওপর তিরিক্ষি।—বাড়িতে খেয়ে আসা হয়েছে বলে তুই টাকাকড়ি সব আগলে বসে রইলি, সীতাভোগ মিহিদানা পর্যন্ত তোর চোখে পড়ল না?

ওদিকের ওই বংশী পান্ডে বাংলা যেমনই বলুক, বোঝে পরিষ্কার। আর কানেও যে খুব ভালো শোনে পরের মুহূর্তেই সেটা বোঝা গেল। ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালো একেবারে।—সাহেব বাবুজীরা, সীতাভোগ মিহিদানা খিলাবেন? হামার অনেক আছে, পেপার-ডিশভি আছে—চিমনলাল জল্‌দি করো—বাবুজীরা খাবেন—

চিমনলালও তক্ষুনি উঠে দাঁড়িয়ে পরপর আরো ছটা কাগজের ডিশ সাজালো তারপর চামচে দিয়ে টিফিন ক্যারিয়ারের সীতাভোগ মিনিদানা ভাগ করতে লাগল। পাছে জিভের জল গড়ায় তাই আমরা ঠোঁট চেপে আছি। দুজনেই আমাদের দিকে এখন পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে—তাই ভাগটা কেমন হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু ভাগ করতে সময় লাগছে দেখে ভাবলাম, ব্যবসাদার মানুষ, ভাগে উনিশ-বিশ হওয়াটা পছন্দ নয় বোধ হয়।

এবারে দুজনেই এক-একটা করে কাগজের ডিশ আমাদের হাতে দিল। এমন সমান সমান ভাগ পিনুডিদার কস্মিনকালে পছন্দ নয়। তার ভয়েই ডিশ হাতে আসার দু'মিনিটের মধ্যে আমাদের খাওয়া সারা। পিনুডিদা, বংশী পান্ডে আর চিমনলাল ধীরে-সুস্থে খাচ্ছে। আমরা যে যার জল খেয়ে এলাম। একটু বাদে ওদেরও খাওয়া আর জল খাওয়া শেষ হল।

সীতাভোগ মিহিদানা খেয়ে জিভ ঠান্ডা হল বটে, কিন্তু টাকার শোকে মেজাজটা আমার সেই থেকে খিঁচড়ে আছে। ট্রেনে সমস্ত রাত হই-হুল্লোড় করে জেগে কাটিয়ে দেব ভেবেছিলাম, কিন্তু টাকার শোকেই সম্ভবত একটু বাদেই ঘুম পেতে লাগল। শরীরটারও হঠাৎ কেমন গা-ছাড়া ভাব। কিন্তু এক্ষুণি শুয়ে পড়াটা এরা বরদাস্ত করতে চাইবে কিনা কে জানে? হঠাৎ দু' কান সজাগ, চেয়ে দেখি কার্তিকটাও হাঁউ-হাঁউ করে বড়সড় একটা হাই তুলল। ওদিকে কেবলু জানলায় ঠেস দিয়ে দু'চোখ বুজে বলল, আর ভালো লাগছে না, শুয়ে পড়ি।

ছোট হাই তুলে চটপটি তক্ষুনি সায় দিল, সেই সকাল থেকে ধকল তো আর কম কম যায়নি, আমারও ঘুম পাচ্ছে।

আমি মনে মনে ভাবলাম, আমার মতো অত না হোক, টাকার শোক তো ওদেরও মনে গেঁথে আছে—ঘুম পাওয়া অস্বাভাবিক কিছু না। ওদিকে গদগদ বংশী পান্ডে পিনুডিদাকে বলছে, মিঠাই সাহেব-বাবুজীদের ভোগে আসল, হামাদের বহুত পূণ (পুণ্যি) হল।

আমি অবাক হয়ে দেখলাম, হেসে সায় দিতে গিয়ে পিন্‌ডিদাও তুড়ি বাজিয়ে হাই তুলল একটা। তারপর জবাব দিল, আপনাদের পুণ্যির জন্যেই তো, নইলে অত খাওয়ার লোভ আমাদের নেই।

কথা শেষ হবার আগেই বসা থেকে তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো পিন্‌ডিদা। তারপর আপার বার্থ-এর শেকলটা শক্ত মুঠি করে ধরে দু চোখ বুজে নিশ্চল নিস্পন্দের মতো দাঁড়িয়ে রইল খানিক। হঠাৎ অব্যক্ত যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গিয়ে শেকল ছেড়ে দু'হাতে পেট চেপে ধরল। যন্ত্রণা চাপার চেষ্টা সত্ত্বেও গলা দিয়ে অস্ফুট গোঙানি বেরিয়ে এলো।

—কী হল, কী হল, কী হল? আমরা ভ্যাবাচেকা খেয়ে যে-দিক থেকে পারলাম পিন্‌ডিদাকে ধরলাম।

—বেজায় ব্যথা, ভিতরটা ছিঁড়ে যাচ্ছে! বেঞ্চিতে বসে পিন্‌ডিদা পেট চেপে ধরে কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করতে লাগল। ওদিকে বংশী পান্ডে আর চিমনলালও বিমূঢ়। বংশী পান্ডে বলল, মিঠাই তো ভালো ছিল বাবুজীরা, হামরা খেলাম, আপনারা সোকলে খেলেন—এ বাবুজীর পেটে এতো দরদ হোলো কেন?

যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে পিন্‌ডিদা টেনে টেনে বলল, মিঠাই খারাপ ছিল কে বলেছে? আমার কপাল খারাপ। উঃ! মরে গেলাম—

ব্যাপার দেখে আমার মাথাটা এমন ঝিমঝিম করে উঠল হঠাৎ যে ভালো করে তাকাতে পারছি না। এর মধ্যে ঝুঁকে পিন্‌ডিদার গায়ে পিঠে হাত বোলাতে গিয়ে হাবুল হোঁতকাটা হঠাৎ তার ওপরেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

—উঃ! গেছি গেছি! পিন্‌ডিদা চিঁ-চিঁ করে আর্তনাদ করে উঠল একটা। অপ্রস্তুত হাবুল সোজা হতেই পিন্‌ডিদা উঠে দাঁড়িয়ে বাথরুমের দিকে ছুটল।

আমরা হতভম্বের মতো এ-ওর দিকে তাকাচ্ছি। কিন্তু এই বিপত্তির ফলেই হয়তো চোখে সরষেফুল দেখছি—ভালো করে তাকাতে পারছি না।

হাবুল হেঁড়ে গলায় বংশী পান্ডাকে জিজ্ঞেস করল, আপলোকের পাশ দাওয়াই-টাওয়াই আছে কুছ?

উতলা বংশী পান্ডে মাথা নাড়ল—দাওয়াই তো হামাদের কাছে থাকে না বাবুজী, হামাদের হেলথ্ তো বংগালী বাবুদের মতো এতো খারাপ হোয় না।

মিনিট আট দশের মধ্যে পিন্‌ডিদা টলতে টলতে ফিরে এসে ধপ করে নিচের বেঞ্চটায় শুয়ে পড়ল। ওটাতে তারই বিছানা পাতা। শুয়েই কাঁপতে কাঁপতে সুজনি গায়ে চড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে ককিয়ে উঠল ব্যথা··· শীত···তোদের কী আছে আমার গায়ে চাপা দে না—

আমি তাড়াতাড়ি আমার সুজনিটা তুলে তার গায়ে চাপা দিলাম। তা সত্ত্বেও সে শীত আর যন্ত্রণায় এক একবার কুঁকড়ে গুটিসুটি মেরে যেতে লাগল। দু মিনিটের মধ্যে মুখ বিকৃত করে উঠে বসল আবার, সঙ্গে সঙ্গে সকলের উদ্দেশে ধমক, জুতো মোজাটা পর্যন্ত খুলে নিস নি—তোদের নিয়ে কেন যে মরতে বেরুলাম—

রাগে যন্ত্রণায় বিরক্তিতে সুজনির তলায় হাত ঢুকিয়ে পিন্‌ডিদা নিজেই জুতো আর মোজা জোড়া টেনে খুলে, মোজা দুটো দুপাটি জুতোয় ঢুকিয়ে বেঞ্চির তলায় ছুড়ে দিয়ে আবার শুয়ে পড়ল। যন্ত্রণায় এখনো কুঁকড়োচ্ছে, কাতরাচ্ছে। চটপটি তাড়াতাড়ি সুজনি জোড়া আবার তার গলা পর্যন্ত টেনে দিল।

ওদের অবস্থা কী বলতে পারব না, আমি আর দু'চোখ খোলা রাখতে পারছিলাম না। মাথার মধ্যে ঝিমুঝিমুনি পাঁচ গুণ বেড়েছে। নিচের আপার বার্থে আমার শয্যা! সটান শুয়ে পড়ে চোখ বুজলাম। সঙ্গে সঙ্গে কোথায় যেন তলিয়ে যেতে লাগলাম।

চোখ খুলে দেখি কামরার মধ্যে রোদের ছড়াছড়ি। কামরাটা অনড়। উঠে বসতে গিয়ে মনে হল, মাথার মধ্যে কেউ থান ইট পুরে দিয়েছে এত ভার। এই মাথায় কিছু ঢুকছে না বলেই কষ্ট করে উঠে বসলাম। কামরাটা ওয়েসাইডে পড়ে আছে। অর্থাৎ জসিডিতে এই বগিটা কাটা হয়ে পড়ে আছে। হাতঘড়িতে দেখলাম, বেলা আটটা। হিসেব মতো মোগলসরাই প্যাসেঞ্জার আধ ঘন্টা আগে এই বগি কেটে রেখে চলে গেছে। নটা নাগাদ বদ্যিনাথ ধামের গাড়ির সঙ্গে এটা জুড়ে দেওয়ার কথা।

মেঝের দিকে চেয়ে আমার চক্ষুস্থির। হাবুল আর চটপটি মাঝের বার্থ খুলতে পারেনি বা খোলার সুযোগ পায়নি। ওরা মেঝেতে পড়ে ঘুমোচ্ছে। চটপটির দু পা হাবুলের বুকের ওপর। ওপরের বাঙ্কে কেবলু আর কার্তিক যেমন অঘোরে ঘুমোচ্ছে, নিচের বার্থে পিন্‌ডিদাও তেমনি ঘুমে বেহুঁশ।

জানলার দিকের বেঞ্চ দুটো শূন্য। ভাবলাম, চুরি হবার ভয়েই হয়তো বংশী পান্ডে আর চিমনলাল তাদের ব্যাগ আর টিফিন-ক্যারিয়ার-সুদ্ধ নেমে গেছে। তারাও বদ্যিধাম যাবে যখন সময় হলেই আবার ফিরে আসবে। এদিক-ওদিক থেকে দুই-একটা বাচ্চা আর মেয়েছেলেও দেশোয়ালী কিচির-মিচির শোনা যাচ্ছে—নইলে কামরাটা প্রায় খালি মনে হচ্ছে!

পরের পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে আমার দু'চোখ ছানাবড়া। ঠিক দেখছি না ভুল দেখছি? পিন্‌ডিদা টাকা নিয়ে নিলেও টিকিট ছটা আমার প্যান্টের ভিতরের পকেটেই ছিল! সেগুলো বেরিয়ে এসে আমার বালিশের ওধারে হাওয়া খাচ্ছে কী করে? আর আমার প্যান্টের বেল্টই বা এত ঢিলে কেন?

তাড়াতাড়ি ভিতরের পকেটে হাত ঢোকালাম।

শূন্য। বারোটা টাকাও উধাও।

মাথায় যেন মুগুরের ঘা পড়ল। বুকের ভেতরটা ছ্যাঁত করে উঠল। চেঁচামেচি করে আর ধাক্কা মেরে চটপটি পরে হাবুলকে তুললাম। ব্যাপার শুনে চটপটি তার প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকালো। তারও বারো টাকা উধাও। হাবুলটা তখনো হাঁ করে মুখের দিকে চেয়েই আছে, মাথায় কিছু ঢুকছেই না। কেবলু আর কার্তিককে টেনে নামাতে দেখা গেল, তাদেরও যার যার পকেটের বারো টাকা হাওয়া। হাবুল এতক্ষণে ঘটনা বুঝেছে। এবার ওরও হেঁড়ে গলা ফেটে পড়ল, আমার পকেটে সাত টাকা ছিল—কাউকে বলিনি—সব চিচিং ফাঁক!

পিন্‌ডিদাকে আর ডাকতে হল না। চেঁচামেচিতে নিজেই চোখ তাকিয়ে পিটপিট করে দেখছে সবাইকে। টেনে টেনে বলল, অত চেঁচাচ্ছিস কেন সব?

জবাব না দিয়ে আমি পাগলের মতো হ্যাঁচকা টানে তার গায়ের সুজনি ফেলে দিয়ে ওপর থেকে তার প্যান্ট চেপে পরীক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু হাতে কাগজপত্র অর্থাৎ টাকার মতো কিছু ঠেকছে না। আতঙ্কগ্রস্তের মতো আমরা তার দিকে তকালাম।

ফোঁস করে একটা বড় নিশ্বাস ফেলে পিন্‌ডিদা বলল, নেই।

—নেই। আমাদের চারজনের গলা দিয়ে সমস্বরে আর্তনাদ বেরিয়ে এলো, নেই! আর কেবলুর গলায় কান্না ঠিকরে বেরুলো, সর্বনাশ সমুৎপন্নে!

দিনের আলোয় চোখে অন্ধকার দেখছি আমরা। কারো পকেটে কানাকড়ি নেই—নতুন জায়গায় কী উপায় হবে?

তেমনি কাতর স্বরে টেনে টেনে পিন্‌ডিদা বলল, আমার জুতো জোড়া আছে কি না দ্যাখ তো…।

আমাদের পিত্তি জ্বলে গেল। আমিই চেঁচিয়ে উঠলাম, এত বড় সর্বনাশ হয়ে গেল আর তুমি তোমার ছেঁড়া জুতোর খোঁজ করছ?

মিনমিন করে পিন্‌ডিদা এবার হাবুলকে বলল, দ্যাখ্ না, আছে কি না?

এ অবস্থায়ও হাবুল গুরুর আদেশ অমান্য করতে পারল না। বেঞ্চির তলা থেকে আধ-ছেঁড়া শু জোড়া টেনে বার করল। পিন্‌ডিদা কোনরকমে উঠে বসেছে ততক্ষণে। হাবুল জুতো জোড়া সামনে ধরতে পিন্‌ডিদা হাত বাড়িতে তার ভিতর থেকে মোজা দুটো টেনে নিল। তারপর একবার করে টিপে দেখল। তারপর দু চোখ আমাদের মুখের ওপর চক্কর খেতে লাগল। সকলেই যেন আসামি আমরা।

—তোদের চারজনের পকেট থেকে চার বারং আটচল্লিশ টাকা গেছে।

পিন্‌ডিদার হঠাৎ এই মেজাজের কূল-কিনারা পেলাম না। আমরা চারজন মাথা নাড়লাম। গেছে।

পিন্‌ডিদার কঠিন দু চোখ এবার হাবুলের মুখের ওপর। —আর তোর পকেটে সাত টাকা ছিল, তা-ও গেছে?

কাঁদ-কাঁদ গলায় হাবুল জবাব দিল, হ্যাঁ পিন্‌ডিদা, এই কান মুলছি আর কখনো তোমার কাছে কিছু গোপন করব না।

একটু আগেও কাতরাচ্ছিল পিন্‌ডিদা, কিন্তু এরই মধ্যে মেজাজ তিরিক্ষে একেবারে। হাবুলের কথায় ঠান্ডা দূরে থাক্, রাগের চোটে মোজা দুটো উল্টো করে ধরে সজোরে দু-তিন বার ঝাড়া দিল। তারপরেই জোড়া জোড়া চোখ গোল আমাদের।

দুটো মোজা থেকেই ভাঁজ করা নোট পড়তে লাগল। দেখেই বুঝলাম, কাল রাতে বাথরুমে আমাদের দেওয়া সেই টাকা।

পিন্‌ডিদা খেঁকিয়ে উঠল, ল্যাবাকান্তের মতো হাঁ করে দেখছিস কি সব—কাল রাতে সোনার দেওয়া তিনশ অষ্টাশি আর তোদের তিন-আঠারোয় চুয়ান্ন—মোট চারশ বিয়াল্লিশ টাকার কানাকড়িও খোয়া গেছে কি না গুনে দ্যাখ।

আমরা বোবা। হাবুলই শুধু আনন্দে নেচে উঠল, গুনব আবার কী, আছে দেখতেই পাচ্ছি।

টাকাগুলো একভাঁজে গুছিয়ে পকেটস্থ করে সকলকে ছেড়ে পিন্‌ডিদা আমাকে নিয়ে পড়ল। বলল, লিডার হতে হলে মাথায় বাড়তি সাদা জিনিস কিছু থাকা চাই—বুঝলি? টাকাগুলো আমার হাতে দিতে হল বলে কাল তো শোকে দুঃখে একেবারে হেদিয়ে পড়েছিলি—তোর কাছে থাকলে বিদেশ বিভুঁইয়ে এসে কী হতে পারত সেই জ্ঞানচক্ষু খুলেছে?

আমার জবাব দেবার মুখ কোথায়? পিন্‌ডিদার চোখ আবার সকলের মুখের ওপর চক্কর খেল একপ্রস্থ। বলে উঠল, আশ্চর্য! তোদের কারো একবার সন্দেহ পর্যন্ত হল না!...ওই সীতাভোগ মিহিদানা পেটে চালান করার দু'মিনিটের মধ্যে মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠতে আর সোনার এরই মধ্যে ঘুম-ঘুব মুখ দেখেই আমি বুঝেছিলাম আমরা শয়তাদের ফাঁদে পা দিয়েছি—সবাইকে ঘুমের সমুদ্দুরে তলিয়ে যেতে হবে। তক্ষুনি বাথরুমে গিয়ে যা করার করে এলাম, ফিরে এসে পেট ব্যথার অভিনয় করে দুমড়ে-মুচড়ে গেলাম—তারপর মোজাসুদ্ধু জুতো জোড়া খুলে বেঞ্চির নিচে চালান দিলাম। শুধু আশা, শয়তানরা আমার চালাকি টের পায়নি যখন, ওতে হাত দেবে না। মা কাকে রক্ষা করে দেখলি? পিন্‌ডিদার খেদমাখা দু'চোখের চাবুক আবার আমার মুখের ওপরে। —উঃ! চারবারং আটচল্লিশ আর সাতে পঞ্চান্ন টাকা ওই শয়তানের পেটে চলে গেল! এমন পাঁঠা সব তোরা? পাঁঠাই বা বলি কেন, কোর্মা কারি চপ কাটলেট বানিয়ে খাওয়া যায়—পাঁঠারও জীবন সার্থক—তোরা সব কী? দেওঘরে পা দেবার আগেই এমন একটা অশুভ লোকসানের ব্যাপার ঘটিয়ে ফেললি, সেখানে গিয়ে কপালে কী আছে, ঠিক আছে কিছু? তোদের কারো এক ছটাক বুদ্ধির ওপর নির্ভর করা যাবে?

সত্যিই একটা বড় ফাঁড়া কেটেছে। কিন্তু পিন্‌ডিদার কথার চাবুকে কেবলু কার্তিক চটপটি আর বিশেষ করে আমার গায়ের চামড়া জ্বলতে লাগল। মা যদি সদয় হয় তো দেওঘরে গিয়ে এই

পিন্‌ডিদাকে বুদ্ধির চমক দেখাবার কিছু একটা সুযোগ নিশ্চয় পেয়ে যাব। তার আগে পর্যন্ত মুখ বুজে সব হজম করাই ভালো।

এতক্ষণে আর কোনোদিকে মন দেবার ফুরসত মেলেনি। চায়ের তেষ্টায় আমার অন্তত গলা কাঠ হয়ে আছে। এক পিন্‌ডিদা ছাড়া আমাদের কারো পকেটে কানাকড়িও নেই। কিন্তু পিন্‌ডিদাকে বললে সে নির্ঘাৎ দুই চোখ দিয়ে আমার মুখের ওপর গরম চায়ের ঝাপটা মেরে বসবে। সতৃষ্ণ চোখে অদূরের প্ল্যাটফরমের দিকে তাকালাম। আমাদের বগি ওয়েসাইডে পড়ে আছে, মেন প্ল্যাটফরম চল্লিশ-পঞ্চাশ গজ ফারাকে, সেদিকে তাকাতে চা-অলার বদলে যে দৃশ্য চোখে পড়ল তাতে বেশ একটু খটকা লাগল। ওখানে অত পুলিশ কেন রে বাবা! আরে স্টেশনে যারা দাঁড়িয়ে, এমন কি কুলিগুলোর পর্যন্ত কেমন একটু চঞ্চল হাবভাব। পিন্‌ডিদাকে ডেকে আঙুল তুলে প্ল্যাটফরমের দিকটা দেখালাম।

পিন্‌ডিদাও অপলক চোখে খানিক দেখে নিয়ে বলে উঠল, চল তো কোনো চোর ছ্যাঁচড় ধরা পড়ল কি না দেখে আসি—কপাল জোরে যদি বংশী পান্ডে হয়, তো বর্ধমানের মিহিদানা কাকে বলে দেখিয়ে দেব—এই তোরা এই কামরা ছেড়ে নড়বি না, আমি আর সোনা দেখে আসছি।

কয়েকটা লাইন টপকে পিন্‌ডিদার পিছন পিছন ওই মেন প্ল্যাটফরমে গিয়ে উঠলাম। পুলিশের দল গুটিগুটি তখন বাইরে বেরুনোর গেটের দিকে চলেছে।

পিন্‌ডিদা দৌড়ে একটা খাবার স্টলের লোককে জিজ্ঞেস করতে যা শুনলাম তাতে আমাদেরই দু'জোড়া চোখ ছানাবড়া।...ওই পুলিশের দঙ্গল মোগলসরাই প্যাসেঞ্জার ইন্ করার আগে বাইরে ওত পেতে অপেক্ষা করছিল। মোগলসরাই প্যাসেঞ্জার ছেড়ে যেতেই ভিতরে এসে সমস্ত যাত্রীদের আটকেছে। কারণ তারা ফোনে খবর পেয়েছিল হাড়-কাঁপানো ডাকাত রামবাদশার দল খুব সম্ভব এই গাড়িতে জসিডি বা দেওঘরে আসছে। সবই ধোঁকাবাজি ব্যাপার। তাদের টিকির দেখাও মেলেনি।

...এত বড় একটা ব্যাপার ঘটে গেছে যখন, পুলিশ আমাদের বদ্যিনাথধামের কামরাও নিশ্চয় সার্চ করেছে। আর আমরা তখনো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মিহিদানার জের সামলাচ্ছিলাম।

চায়ের চেষ্টা মাথায় উঠেছে, এ-ধারে সরে এসে পিন্‌ডিদাকে ফিসফিস করে বললাম, ওই বংশী পান্ডে আর চিমনলাল রামবাদশার দলের লোক না তো?

ভুরু কুঁচকে পিন্‌ডিদা খেঁকিয়ে উঠল, যত অলুক্ষণে কথা তোর। রামবাদশার চ্যালারা অত কাঁচা ছেলে নয়—তা হলে ঠিক বুঝে নিত আমরাই সেই দল যারা জমিদার গিন্নির গোপালের হিরের চোখজোড়া উদ্ধার করে দিয়েছি, আরে আমাদের জন্যেই রামবাদশার নাম ফাঁস হয়ে গেছে। সেই রামবাদশার চ্যালা হলে আমাদের অজ্ঞান করে শুধু পঞ্চান্ন টাকা নিয়ে সটকে পড়ত না, দু'জনের মুন্ড কেটে রেখে যেত।

পিন্‌ডিদা বলল বটে, কিন্তু তারও মুখ ফ্যাকাশে একটু। রামাবাদশার দলের জসিডি বা দেওঘরের দিকে আসার সম্ভাবনাই বোধহয় তার অস্বস্তির কারণ।

আমারই বা স্বস্তি কোথায়। বদ্যিনাথের পুণ্যিধামে পা দেবার আগেই বংশী পান্ডে আর চিমনলালের খপ্পরে পড়লাম। তার ওপরে আবার এই দুঃসংবাদ।

## তিন

দেওঘরের বাতাস গায়ে লাগতেও পিন্‌ডিদার মাথা একটুও ঠান্ডা হল না। হাতে সুটকেস আর বিছানা বগলদাবা করে আমরা ট্রেন থেকে নামলাম। হেবো হোঁতকার হাতে সুটকেস আর কাঁধে ডবল বিছানা। কারণ পিন্‌ডিদার বিছানাও ওর ঘাড়ে চাপানো হয়েছে। এই মুহূর্তে সবেতে পোঁ-ধরা হাবুলের ওপরেও পিন্‌ডিদার দয়ামায়া নেই। সে-ও আমাদের মতো সমান দোষী, পিন্‌ডিদার ভাষায় সমান হাঁদা। নিজের ছেঁড়া সুটকেসটা যে পিন্‌ডিদা নিজের হাতে নিয়েছে এই ঢের।

কাঁধের বিছানা দুটো আর হাতের সুটকেস হাবুল প্ল্যাটফর্মে নামাতে যেতেই পিন্‌ডিদা খেঁকিয়ে উঠল, আবার এখানে নামানোর কী দরকার, ননীর পুতুল নাকি সব?

লম্বা প্ল্যাটফরমের ওধারে ব্রিজ টপকালে তবে শহরের রাস্তা। দুটো কুলি করলেই সকলে আমরা খালি হাতে-পায়ে যেতে পারি। কিন্তু বোঝা গেল পিন্‌ডিদা কুলি করতে রাজি নয়। বেড়াতে বেরিয়ে এ-রকম মেহনতি আমারও পছন্দ নয়। মওকা পেয়ে ইচ্ছেটা হাবুলের ওপর দিয়েই চালালাম। বললাম, হেবো ভেবেছিল তুমি দুটো কুলি করবে—

থাকবেই। আমাদের প্ল্যান লছমনকে বলা মানেই ওদের কানে খবর পৌঁছে দেওয়া। আর যে বিশাল বড়লোকের ছেলে, আমার বাবা যে ইচ্ছে করলেই এ-রকম তিনখানা বাড়ি কিনে ফেলতে পারে—পিন্‌ডিদা ইচ্ছে করেই এটা লছমনকে শুনিয়ে রেখেছিল—যাতে এ খবরটাও রাম বাদশার কানে যায়। এখন খবর শুনলে রাম বাদশা মোটা মুক্তিপণের লোভে আমার পিছনে লেগে থাকবেই জানা কথা। হাজারীলালের সঙ্গে পরামর্শ করে আঁটঘাট বেঁধেই পিন্‌ডিদা আসরে নেমেছে।

এবারে আমি ফস করে জিজ্ঞাসা করে বসলাম, রাম বাদশাকে ধরার জন্যে সরকার থেকে যে দু'হাজার টাকা ঘোষণা করা হয়েছে—সেটা কে পাবে?

মুখ কাঁচুমাচু করে পিন্‌ডিদা জবাব দিল, হাজারীলাল তো বলছিল, সে কিছুই নেবে না···তা তুই কী বলিস?

আমি বললাম, এই দু হাজার টাকা দিয়ে আমাদের ফান্ড হবে। বাবার দেওয়া টাকা তুমি বর্ধমানে গিয়ে বাবাকে ফেরত দেবে—আর কেবলু কার্তিক চটপটির যে আঠেরোটা করে খরচের টাকা তোমার কাছে আছে পুরস্কারের টাকা পেলে তা ওদের ফেরত দিয়ে দাও।

পিন্‌ডিদা সঙ্গে সঙ্গে খেঁকিয়ে উঠল, কেন—এই পুরস্কারের টাকায় ফান্ড হবে কেন। হাজারীলাল তার ভাগ নেবে না—আর তোকে দিয়ে কাজ হয়েছে যখন—তুই একটা অংশ অবশ্যই দাবি করতে পারিস—ধর দু'হাজার টাকার দশ আনা তুই ছ'আনা—তা বলে এ টাকা দিয়ে আমাদের ফান্ড হবে কেন? আর কে কী করেছে?

আমি বললাম, ঠিক আছে, তুমি ষোলো আনাই নাও। কাল তো খবরের কাগজে তোমার প্রশংসা বেরুবেই। কিন্তু বর্ধমানে ফিরে গেলে আমার বাবা-মা আর যেখানে যত চেনা-পরিচিত লোক আছে সকলেই জানবে, মাত্র দু'হাজার টাকার লোভে আমাকে কিছু না জানিয়ে তুমি যমের হাতে ঠেলে দিয়ে আমাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছ। হাজারীলালের হিসেবে এতটুকু গড়বড় হলে আমার কপালে অনিবার্য মৃত্যু লেখা ছিল—আর তা না হলে মুক্তিপণ দিতে গিয়ে আমার বাবার সর্বস্বান্ত হওয়া ছাড়া আর গতি ছিল না।

পিন্‌ডিদা আমার দিকে ড্যাবড্যাব করে চেয়ে রইল। ঘরের আর সকলের বুকের মধ্যে দম আটকে আছে! তারপরেই সচকিত সকলে। পিন্‌ডিদা হঠাৎ এত বড় ঘরটা ফাটিয়ে হা-হা শব্দে হেসে উঠল। তারপর উঠে এসে আমার কাঁধে হাত দিয়ে আনন্দে রাম ঝাঁকানি—সোনারে, তুই একেবারে খাঁটি সোনা—এই পরীক্ষায়ও উতরে গেলি।

আরে আমি তোকে পরীক্ষা করছিলাম বুঝলি না?...ঠিক আছে বাবা, পুরস্কারের দু হাজার টাকাতেই আমাদের গ্র্যান্ড ফান্ড হবে—তোর বাবার দেওয়া খরচের টাকা তাঁকে ফেরত দেব—অবশ্য তোর এত সাহস দেখে তিনি আনন্দে কখনো আর এ টাকা নেবেন না—না নিলে ফান্ডের সঙ্গে এ তিনশো অষ্টাশি টাকাও যোগ হবে—আর তিন জনের আঠেরোটা করে টাকাও আমি ফেরত দেব —হল?

আমিও এবার হেসেই মাথা নাড়লাম—হল।

শোনামাত্র পিন্‌ডিদার মেজাজ আরো তিরিক্ষি। —কুলি! কুলির মাথায় মাল চাপিয়ে হাওয়া খেতে খেতে শ্বশুরবাড়ি যাবি সব—কেমন? কড়কড়ে পঞ্চান্ন টাকা শয়তান দুটোর পেটে দিয়ে আরামের কথা মুখে আনতে লজ্জাও করে না? ওই পঞ্চান্নটা টাকা উশুল না করা পর্যন্ত আরাম করাচ্ছি তোদের—এখনই হয়েছে কী!

নিজের পলকা সুটকেস হাতে পিন্‌ডিদা গটগট করে আগে আগে চলল, তার পিছনে আমি, কার্তিক, কেবলু, চটপটি। সকলের পিছনে হেবো হোঁতকা। ভাবলাম স্টেশন থেকে বেরিয়েও রাগের চোটে পিন্‌ডিদা হয়তো আমাদের তিন মাইল পথ হাঁটিয়েই বাবার বন্ধুর বাংলোয় নিয়ে তুলবে। মনে মনে আমার বেজায় রাগ হচ্ছে। কিন্তু কিছু বলার মুখ নেই। লিডারগিরি ফলাবার জন্যে ল্যাভেটারিতে ডেকে নিয়ে পিন্‌ডিদা আমার কাছ থেকে বাবার দেওয়া তিনশো অষ্টাশি টাকা আর কেবলু, কার্তিক চটপটির কাছ থেকে তিন-আঠারো চুয়ান্ন টাকা—অর্থাৎ মোট চারশ বিয়াল্লিশ টাকা কেড়ে নিয়ে নিজের হেপাজতে না রাখলে এই বিদেশে এসে আজ আমাদের পথে বসতে হত সন্দেহ নেই।

ভাবতে গেলেও কাঁপুনি!

তা সত্ত্বেও রাগ হচ্ছে কারণ, এখন পর্যন্ত একটুও চা জোটেনি! এরপর দু'পয়সার চানাচুর খেতে ইচ্ছে করলেও পিন্‌ডিদার কাছে হাত পাততে হবে। ওই তহবিলের বাইরে কারো কাছে কানাকড়িও নেই। রাগ হচ্ছে কারণ, ওই ব্যাপারটা নিয়ে পিন্‌ডিদার আরো কত হম্বিতম্বি বরদাস্ত করতে হবে ঠিক নেই! সব থেকে বেশি রাগ হচ্ছে ওই দুই শয়তান—বংশী পাণ্ডে আর চিমনলালের ওপর। ওদের দু'দুটো মাথাই আস্ত চিবিয়ে খেতে ইচ্ছে করছে! উঃ, অমন ভদ্রলোকের মতো চেহারা অমন ফিটফাট পোশাক—আর ভিতরে কী শয়তান কী শয়তান! জোয়ান বংশী পাণ্ডের কচি মেয়েলি গলার সেই স্বর এখনো যেন মুখ ভেংচাচ্ছে আমাকে।...নাঃ, ওই ছিঁচকে দুটো রামবাদশার মতো ডাকাতের চ্যালা হতে পারে না।

যাক বাইরে এসে পিন্‌ডিদা দরদস্তুর করে একটা টাঙ্গা ভাড়া করল। তারপর একরকম মুখ বুজেই আমরা তিন মাইল পথ ভেঙে উইলিয়াম রোডের সেই বিরাট বাংলোর ফটকে ঢুকে পড়লাম।

বাবার বন্ধুর এই বাংলোটা মস্ত বড় আগেই শোনা ছিল। কিন্তু তা বলে এমন বিশাল ধারণা ছিল না। প্রায় দশ বিঘা ঘেরানো জমির মধ্যে দোতলা প্রাসাদ একখানা। চারদিকে গাছগাছড়া। বাংলোয় পা দেওয়া মাত্র মনে হল আমরা এক নিঝুম ঘুমন্ত পুরীতে এসে হাজির হলাম। টাঙ্গাঅলা দাওয়ার মাল নামিয়ে ভাড়া নিয়ে চলে গেল।

চারদিকে চেয়ে কেবলু বলে উঠল, বাবা, দিনের বেলাতেই গা ছমছামস্তি।

পিন্‌ডিদার রুষ্ট দৃষ্টি তার মুখের উপর এঁটে বসার আগেই কোথা থেকে তালগাছের মতো একটা ঢ্যাঙা কালো লোক সামনে হাজির। গোল-গাল রক্তবর্ণ দু চোখ। অথচ ঢুলুঢুলু। তাকে দেখে সকলেরই চমকে ওঠার দাখিল। লোকটা ঢ্যাঙা শরীর আধখানা নুইয়ে সবিনয়ে অভিবাদন জানাতে স্বস্তি বোধ করলাম। লিডার পিন্‌ডিদা অভিবাদনের জবাবে একটু মাথা নেড়ে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল, তুমি কে?

—লছমন হুজৌর। হামি মালি আছে, মোকামের কিয়ারটেক আছে (কেয়ারটেকার) অওর বাবুর্চি ভি আছে। রইসবাবুরা বিড়াতে এলে হামাকে লিটিল ম্যান্ বোলে।

লিটল ম্যান অর্থাৎ খুদে মানুষই বটে। ওকে লিট্‌ল বললে আমাদের বিট্‌ল অর্থাৎ সুপুরি বলতে হয়!

বাবুর্চি ভি আছে শুনেই পিন্‌ডিদা পেট চুঁইচুঁই করে উঠল বোধ হয়। অন্তরঙ্গ হাসিমুখে বলল, আচ্ছা আমরাও তোমাকে আদর করে লিট্‌ল ম্যানই ডাকব—তুমি তো খুব ভালো রান্না করো শুনেছি!

বছর পঞ্চাশ বয়েস হবে লছমনের। কিন্তু বেশ শক্ত-সমর্থ। জবাবে ফোঁস করে একটা বড় নিঃশ্বাস ছাড়ল আগে। তারপর বলল, বাবু লোকেরা সবাই খুব তারিফ করে, বোলে কোলকাতার গ্র্যান্ডিমে বাবুর্চির কাম মিলিয়ে দিবে—লেকিন চলে গেলেই বেমালুম ভুলে যায়।

পিন্‌ডিদাও তক্ষুণি সদয় গলায় বলল, আমরা কলকাতার লোক হলে ভুলতাম, আমরা বর্ধমানের লোক। আমাদের ভালো খাওয়ালে তুমিও বাদ যাবে না।···তা বাবা লিট্‌লম্যান, আমরা আসছি খবর তো পেয়েছ···চা-টায়ের জোগাড় আছে তো, না এসেই আবার দোকানে ছুটতে হবে?

খেতে আমাদেরও খারাপ লাগে না, কিন্তু পিন্‌ডিদার যেন তর সয় না। এখন পর্যন্ত ঘরে ঢুকিনি, মালগুলোও দাওয়ায় পড়ে। বিরক্ত হতে যাচ্ছিলাম কিন্তু লছমনের জবাব শুনে কান জুড়লো। লছমন জানান দিল, সব রিডি আছে, বাবুজিদের মুখ হাত ধোয়া হলে প্রথমে ডবল ডিমের পোচ টোস্ট আর চা মিলবে। তার এক ঘন্টা পরে গরম হালুয়া আর গরম পুরি পাকানো হবে—মানিজার সাব সব বন্দোবস্ত করিয়ে গেছেন।

কে ম্যানেজার জানি না। কিন্তু লোকটার সুবিবেচনা আছে সন্দেহ নেই। পিন্‌ডিদার দু'চোখ খুশিতে চিকচিক করে উঠতে দেখলাম। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই খেঁকিয়ে উঠল, খ্যাঁটের কথা শুনলেই জিভে জল গড়ায় যে সব—বলি ঘরে ঢুকবি না এখানে দাঁড়িয়েই পেট-পুজো শুরু করবি?

দাবড়ানি শুনে বেচারা লছমনই বেশি ঘাবড়ালো। চোখের পলকে আমাদের মালগুলো কাঁধে পিঠে তুলে নিয়ে সবিনয়ে বলল, আসেন বাবুজীরা—

যেমন কম্পাউন্ড তার তেমনি প্রাসাদ। এক তলার দুটো হল ঘর খুলে দিল লছমন। দোতলাটা নাকি মালিকদের জন্য তালা বন্ধ থাকে। নিচের দুটো হল ঘরই পেল্লায় মাপের। এক-এক ঘরের তিন কোণে তিনটি করে গদি মোড়া বড় খাট পাতা। প্রত্যেক খাটের মাথায় ঝকঝকে সিলিং ফ্যান। একটা হল ঘরে আমি কেবলু আর চটপটি থাকব, অন্যটাতে পিন্‌ডিদা হেবো আর কার্তিক। আর কার্তিক যদি আপত্তি করে তাকেও না-হয় আমাদের ঘরেই নিয়ে নেব। খাটগুলো তো পেল্লায় বড়।

মনের আনন্দে আমরা যে-যার স্নান সেরে ফেললাম। যা বাথরুম, চান করেও আনন্দ। লছমনের ব্রেকফাস্ট রেডি ততক্ষণে। ডাক পড়তে আমরা চারজনই তাড়াতাড়ি ডাইনিং হলে চলে গেলাম, পিন্‌ডিদা তখনো বাথরুমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পরিপাটি করে মাথা আঁচড়াচ্ছিল। সে ডাইনিং হলে ঢোকার আগেই আমরা যে-যার ডবল-ডিমের পোচের ডিশ আগলে নিয়ে বসেছি।

পিন্‌ডিদা এসে গম্ভীর মুখে সকলের ডিশগুলো একবার দেখে নিল। পাঁচ জনের মধ্যে পিন্‌ডিদাই সব থেকে বেশি রোগা। তারপর কেবলু আর চটপটি। পিন্‌ডিদা আসতেই চটপটি খাওয়া শুরু করে দিল। ফলে কেবলুর উদ্দেশে পিন্‌ডিদা ঝাঁঝালো গলায় বলল, এর পর পুরি আর হালুয়া আছে—দুটো করে ডিমের পরে সহ্য হবে?

জবাব দেবার আগে কেবলু তাড়াতাড়ি একেবারে একটা পোচ মুখে চালান করে দিল। সেটা তল করে দ্বিতীয় পোচে চামচে ঠেকিয়ে আমতা আমতা করে বলল, পন্ডিতেরা কেবল অর্ধং ত্যজন্তি পিন্‌ডিদা—তা আমাদের দলে তুমি আর সোনা ছাড়া পন্ডিত আর কে আছে বলো।

কেবলুর কথায় আমার একটুও রাগ হল না। কারণ আমার ততক্ষণ পোচের তিনভাগই পেটে। অতএব অর্ধেক ত্যাগ করতে হলে শুধু পিন্‌ডিদাকেই করতে হয়। ফোড়ন কাটার মতো বিনয় করে বললাম, আমার সঙ্গে তুলনা দিচ্ছিস কি রে—আমার তুলনায় পিন্‌ডিদা ডবল পন্ডিত—তোর কথা শুনে পিন্‌ডিদাকে তাহলে অর্ধেক ছেড়ে সবটাই ত্যাগ করতে হয়।

আমাদের দিকে একবার কটমট করে তাকিয়ে পিন্‌ডিদা শুধু বলল, অসহ্য! তারপর চেয়ার টেনে বসে রাগটা কড়কড়ে টোস্টের ওপর ঝাড়তে লাগল।

কেবলুর সংস্কৃত অসহ্য কি আমার মন্তব্য, ঠিক বোঝা গেল না। তাকে আরো তাতিয়ে তোলার জন্য তার পেয়ারের চেলা হেবো বলল, পিন্‌ডিদার কথার ওপর কথা বলিস, তোদের বড় বেশি বাড় বেড়েছে।

চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে আমরা নিঃশব্দে হেবোর মুন্ডুপাত করলাম। পোচ আর টোস্টের পরে পিন্‌ডিদা পরপর দু'পেয়ালা চা সাবাড় করার আগে মুখ খুলল না। তারপর আমার দিকে ফিরে গম্ভীর মুখে বলল, পুরি আর গরম হালুয়া বেলা বারোটার সময় দিতে বললে সোনার শরীরে সইবে?

সুযোগ পেলে পিন্‌ডিদা আমাকেই বেশি ঠেসে কথা বলে। কিন্তু পুরি হালুয়া বেলা বারোটায় দিতে বলা হবে কেন ভেবে পেলাম না। কিন্তু জিগ্যেস করার আগেই হেবো হোঁতকার মুখ ফসকে বেরিয়ে এলো, ব্যা-ব্যা-বেলা বারোটায়!

হেবোর হাতির মতো শরীরে দুটো টোস্ট আর দুটো পোচ নস্যি। বরং এক ধামা মুড়ি পেলে ওর সুবিধে হত। ওর ঘাবড়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। পিন্‌ডিদা ওর দিকে ফিরে খেঁকিয়ে উঠল, ছাগলের মতো ব্যা-ব্যা করছিস কেন, মাথায় কিছু থাকলে সাত সাতটা টাকা ডাকাতের সেবায় লাগাবি কেন—বেলা বারোটায় পুরি হালুয়া হলে এ-বেলায় বাজার খরচটা বাঁচে না? যে খ্যাঁটের বহর সব, চারশো বিয়াল্লিশ টাকা হাওয়া হতে কটা দিন লাগবে?

পিন্‌ডিদার মতলব বোঝা গেল। কিন্তু সায় দেওয়া দূরে থাক, ভিতরটা রাগে রি রি করতে লাগল। কারণ ট্রেনে বংশী পান্ডের পাল্লায় পড়ে আমাদের পাঁচজনের হাত খরচের মোট পঞ্চান্ন টাকাই শুধু খোয়া গেছে—খাওয়া-দাওয়ার বাবদ সমস্ত টাকা তো থোক পিন্‌ডিদার কাছে। পিন্‌ডিদার বুদ্ধির জোরেই ওই টাকাটা বেঁচেছে সেটা অস্বীকার কেউ করছে না—কিন্তু তা বলে এই কিপ্টেমি কেন!

ওদের কারো সাহসে কুলোবে না, যেভাবে হোক প্রতিবাদ আমাকে করতে হবে। কিন্তু ভেবেচিন্তে মুখ খোলার আগেই যেন আলাদিনের প্রদীপে ঘষা পড়ল। বাইরে থেকে হাঁক শোনা গেল—লিট্‌লম্যান!

সঙ্গে সঙ্গে যে মূর্তি ঘরে ঢুকল তাকে দেখে নয়, তার পিছনের ঢ্যাঙা লোকটাকে দেখে আমাদের জোড়া জোড়া চক্ষু স্থির। সে একজন মুটে। তার মাথায় মস্ত ঝাঁকা। আর এক হাতে বেশ বড়সড় থলে একটা। থলেতে কী আছে জানি না, ঝাঁকাতে তরিতরকারি—পাশে ঠ্যাঙ বাঁধা তিনটে হৃষ্টপুষ্ট মুরগি স্পষ্টই দেখা গেল। আমাদের ছ জনের ছ জোড়া চোখ ওই মুরগি তিনটের দিকেই আটকে আছে।

সামনের ভদ্রলোকের কথায় চমক ভাঙল। —এই যে বাবাজীরা এসেই গেছ, আমার বাজারটা সেরে আসতে একটু দেরি হয়ে গেল। এই ব্যাটা ঝাঁকাটা নামা না, লিট্‌লম্যান, তুই মাছের থলেটা ধর—

লছমন এসে হাজির হয়েছিল তাও খেয়াল করিনি। সে থলেটা নিতে মুটে তার ঝাঁকা নামালো। ঝাঁকায় চালের ঠোঙা, ডাল তরি-তরকারি, ঘিয়ের টিন ইত্যাদির সঙ্গে ওই তিনটি কুক্কুট নন্দন। লছমনের হাতের মাছের থলেটাও বেশ ভারী মনে হল। এখন আমাদের সকলের চোখে নির্বাক

প্রশ্ন এ বাজার যাদের জন্য সেরে আসা হল সেই ভাগ্যবান কারা। অথচ ভদ্রলোকটি যে কে তখনও পর্যন্ত তাও জানি না।

পর মুহূর্তেই ভাগ্যবান কারা বোঝার আনন্দ পেলাম। ভদ্রলোক মোটাসোটা বেঁটে খাটো—নাকের নিচে ঝাঁটার মতো গোঁফের ঝোপ। হাসলে ওই গোঁফের ফাঁক দিয়েও তার জেল্লা ঠিকরোয়। বলল, বাজারে খাসা চেতল মাছ দেখে তার পেটির দিকটা নিয়ে এলাম। এই লছমন, মাছটা বার কর না—

লছমন চোখের পলকে ভিতর থেকে একটা গামলা এনে থলেটা উপুড় করল। দু আধখানা করা একটা পেটির মতো পেটিই বটে। কম করে তিন কিলো হবে। জমাট বাঁধা তেল থকথক করছে। হৃষ্ট বদনে ভদ্রলোক আমাদের দিকে ফিরল, চেতল মাছ পছন্দ করো তো তোমরা?

জবাব দেবার আগে পিন্‌ডিদা আবার ঢোঁক গিলে নিল। অর্থাৎ আগে জিভের জল তরল করল। তারপর অমায়িক হেসে বলল, হ্যাঁ মুরগির পরেই চেতল মাছ আর বড় চিংড়ি মাছ সোনার খুব পছন্দ—আপনি নিশ্চয় ম্যানেজারবাবু? (আমাকে দেখিয়ে) আর ওই হল সোনা, এ-বাড়ির মালিকের বন্ধুর ছেলে—

আমার দিকে চেয়ে ভদ্রলোকের খুদে চোখ জোড়া আর সেই সঙ্গে গোঁফ জোড়া খুশিতে যেন চান করে উঠল। —বেশ বেশ, খুব আনন্দ পেলাম, তোমার বাবা মালিকের বন্ধু বলে বন্ধু—একেবারে হৃদয়ের বন্ধু। মালিক আমাকে কলকাতা থেকে ফোনে বলে দিয়েছেন, বন্ধুর ছেলে আর তার বন্ধুরা যাচ্ছে, কোনোরকম অসুবিধে না হয়। তা বাবারা আমি চেষ্টা করব যেন কোনোরকম অসুবিধে না হয়। আমার নাম ভুজঙ্গ বোস, এখানে সকলে আমাকে ভজু বোস বলে ডাকে।

এবারে লিডারের কর্তব্য পালনের কথা মনে পড়ল পিন্‌ডিদার। বলল, আপনাকে পেয়ে আমরাও খুব খুশি হলাম ভজুবাবু। চলুন বাইরে গিয়ে বসি—লছমন ততক্ষণে পুরি আর হালুয়া নিয়ে আসুক। তারপর লছমনকেই হুকুম করল, এতসব রান্নাবান্না আছে, তুমি আর দেরি কোরো না, আমাদের যা দেবার চটপট দিয়ে দাও, আর ভজুবাবুকেও দিও—

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। ভজুবাবু লছমনের দিকে ফিরল।

—শোন্ এ কদিন দিনের বেলায় নেশাভাঙ করবি না খবরদার। বাবুদের খাইয়ে খুশি করা চাই। এবেলা ভাত ডাল ভাজা তরকারি চেতল মাছের কালিয়া চাটনি করবি। একটু ভালো দইও নিয়ে আসিস। আর রাতে মুরগির কষা আর ফ্রায়েড রাইস···কী বলো বাবারা?

জল গড়াবার ভয়ে বুদ্ধিমান পিন্‌ডিদা কাঁধের সঙ্গে লম্বা ঘাড় ঠেকিয়ে সায় দিল। কেবলু সানন্দে বলে উঠল, *শ্রবণেন অর্ধ ভোজনম্!*

গম্ভীর মুখে পিন্‌ডিদা ওর দিকে তাকালো। বলল, খাবার সময় মনে রাখিস—আমারও মনে থাকবে, বাকি অর্ধেকই জুটবে তোর।

বেফাঁস উক্তির জন্য কেবলুর মুখখানা চুপসে গেল। ফলে আমি হেসে সান্ত্বনা দিলাম, ঘাবড়ে গেলি যে, পিন্‌ডিদা বলল বলেই তোকে অর্ধেক খেতে হবে না—ঠাট্টা বুঝিস না, পিন্‌ডিদা নিজেই কি বেলা বারোটায় পুরি হালুয়া খাচ্ছে!

ভজু বোস সামনে থাকায় পিন্‌ডিদা আমাকে শুধু দু'চোখ দিয়েই একদফা চাবকে দিল। বাইরের বারান্দায় সোফা সেটটি সাজানোই আছে। আমরা সেখানে এসে বসলাম।

মালিকের বন্ধুর ছেলে, তাই ভজু বোসের বিবেচনায় আমিই সব থেকে বেশি খাতিরের পাত্র। সস্নেহে আমার দিকে চোখ বুলিয়ে বলল, তোমার নাম বুঝি সোনা?

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম, ভালো নামটা আর বললাম না। পিন্‌ডিদা কেন যেন আমাকে একটু তারিফ করার ঝোঁক চাপল। বলল, ও নামে গুণে সবেতেই সোনা, ওর জন্যেই এখানে আসা।

বাবা-মা ছেড়ে কখনো বেরোয়নি, তাই আমার একটু চিন্তা ছিল···আপনাকে দেখে নিশ্চিত হওয়া গেল।

ভজুবাবু বিগলিত। বলল, কিছু চিন্তা নেই, আমি রোজ তোমাদের খবর নেব। আবার আমার দিকে ফিরল, তা পথে তোমাদের কোনো কষ্ট হয়নি তো?

আমি মাথা নাড়তে যাচ্ছিলাম, তার আগেই পিন্‌ডিদা প্যাঁচার মতো মুখখানা করে বলল, খুব কষ্ট না, যে-যার প্রাণটুকু নিয়ে এসে পৌঁছুতে পেরেছি। সর্বনাশ হয়ে গেলে কী যে করে সোনার বাবাকে মুখ দেখাতাম···

ভজুবাবু সচকিত। –কেন? কী হয়েছিল?

তেরছা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে পিন্‌ডিদা বলল, সোনা তুই বল্। আমি তোর মতো অত গুছিয়ে বলতে পারি–

অগত্যা ট্রেনে বংশী পাণ্ডে আর চিমনলালের কথা বলতে হল। সীতাভোগ মিহিদানা খাইয়ে আমাদের অজ্ঞান করে টাকাকড়ি নিয়ে পালানোর কথা আর পিন্‌ডিদার কাছে গচ্ছিত টাকা কীভাবে বাঁচল সেই কথা বলতে গিয়ে লিডার পিন্‌ডিদার প্রশংসাই করতে হল।

ঘটনা শোনার পরে ভজুবাবু আঁতকে উঠল। –কী সর্বনাশ! এখানে একটা ডাকাত দলের উৎপাত খুব বেড়ে গেছে! ওই দলই কি না কে জানে, তোমাদের থানায় একটা খবর দিয়ে রাখা উচিত।

ওই দল বলতে ভজুবাবু কোন দলের কথা বলল বুঝলাম না। মনে মনে বললাম, রাম বাদশার দল নয় নিশ্চয়। যা হবার তো হয়েই গেছে। তাই আমিই বললাম, কী দরকার, থানা পুলিশ করলেও ওদের কি আর পাত্তা পাব···আপনি কিছু ভাববেন না, পিন্‌ডিদার কাছে যে টাকা জমা আছে তাতেই আমাদের চলে যাবে।

–চলে যাবার কথা কে ভাবছে। গোল মুখ চিন্তার মেঘে ঢেকে ভজুবাবু বলল, তোমাদের আবার খরচ কী, যে কদিন এখানে থাকবে মালিক তো সব ব্যবস্থা করার হুকুম আমাকে দিয়েই রেখেছে...তোমাদের দুই-একজনকে সঙ্গে নিয়ে হাটবাজার রোজ আমিই করে দেব। আমার অন্য ভাবনা হচ্ছে, তোমরা একটু সাবধানে থেকো, আর যখন বেরুবে এক সঙ্গে বেরিও, ডাকাতরা ঠকেছে বুঝতে পারলে আরো ডেঞ্জারাস হয়ে ওঠে···তোমাদের ফলো-টলো করেছে কি না কে জানে।

ভজুবাবুর দুশ্চিন্তা আমাদের মাথায় তখনকার মতো অন্তত ঠাঁই পেল না। মালিকের হুকুমে প্রত্যেক দিনের হাটবাজার সেই করে দেবে শোনার পর অন্য দুশ্চিন্তার জায়গা মাথায় হবে কী করে। যে কদিন এখানে থাকব খাওয়া-দাওয়ার পর্বটা কেমন হবে ভাবতেও জিভে জল। আমাদের প্রত্যেকের চোখে চোখে নিঃশব্দে আনন্দ বিনিময় হয়ে গেল। পিন্‌ডিদা তো যেন আনন্দের গভীর থেকে আস্তে আস্তে ওপরে ভেসে উঠল। চিনি ভেজানো গলায় ভজুবাবুর উদ্দেশে বলল, আপনার সব থেকে বেশি দুশ্চিন্তা তো সোনাকে নিয়ে, নিশ্চিন্তে থাকুন, আমরা এই পাঁচজন ওকে প্রাণ দিয়ে আগলাব।

এত বড় কথার পরেও ভজুবাবু খুব ভরসা পেল মনে হল না। এমন কি লছমনের তৈরি খাঁটি ঘিয়ের গরম হালুয়া আর পুরিও অন্যমনস্কের মতোই জঠরে চালান দিল। সামনে পেয়ে লছমনকেই আবার শাসালো, বাবুরা যতদিন থাকবেন, খবরদার বেশি নেশা-টেশা করবি না, বাজে লোকের সঙ্গে আড্ডা দিবি না, আর কাউকে এই চত্বরের ভিতরে ঢুকতে দিবি না–মনে থাকবে?

–জী হুজুর! অতি বাধ্য মুখটি করে লিট্‌লম্যান সরে পড়ল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ-ভাবে বললেন, এই লোকটা বিশ্বাসী তো?

ভজুবাবু জবাব দিল, খুব বিশ্বাসী, কিন্তু নেশার দাস যে! নেশার দলের যত বাজে লোকের সঙ্গে

আড্ডা ওর। ছ আনা আট আনার নেশা জুগিয়ে কতবার শয়তান ছোঁড়ারা এই কম্পাউন্ডের গাছের আম ডাব কলা ফাঁক করে দিয়ে গেছে। কেউ নেশার জিনিস এনে দিল তো ও তার কেনা হয়ে গেল। মালিক ভালবাসেন তাই টিকে আছে।

ভজুবাবু বিদায় হবার সঙ্গে সঙ্গে চোর ডাকাতদের ভাবনা আমাদের মাথা থেকে উবে গেল। দু'চোখে আমেজ ছড়িয়ে পিন্‌ডিদা সোফায় মাথা রাখল, তারপর ঢুলুঢুলু চোখে আমার দিকে চেয়ে বলল, সোনা রে, তুই সোনা, তোর বাবা এক-তাল সোনা আর তোর বাবার বন্ধু তাল-তাল সোনা। দু'চোখ বুজে ফেলে আবার বলল, চপ কাটলেট কালিয়া কোর্মা আছে এমন একটা গান কর না তোরা—

চটপটি বে-ফাঁস বলে ফেলল, আর সীতাভোগ মিহিদানা?

চোখ খুলে পিন্‌ডিদা কটমট করে তাকালো তার দিকে। হাবুল এ-যাত্রায় লিডারের মন পাচ্ছিল না। সুযোগ পেয়ে ও উঠল চোখ পাকিয়ে। চটপটির উদ্দেশে হুংকার ছাড়ল, পিন্‌ডিদার সঙ্গে ঠাট্টা? তার কড়ে আঙুলের বুদ্ধিও আমরা রাখি কি না ওই সীতাভোগ মিহিদানা দিয়ে বুঝতে পারিসনি? সাত-সাতটা টাকা আমি নিজের কাছে রেখেছিলাম বলে আমার তো সাত হাত নাকে খত দিতে ইচ্ছে করছে—কিন্তু তোদের কোনো অনুশোচনা আছে?

পিন্‌ডিদা এতক্ষণে তার মোসায়েবের ওপর খুশি। চোখে স্নেহ ঢেলে পিটপিট করে তাকালো। হাবুল তাইতেই কৃতার্থ।

এবার ফ্যাসাদ বাধালো কেবলু। বলল, গতস্য অনুশোচনাং মা কুরু···বাকি সব টাকাই তো এখন বেঁচে গেল···এ টাকাটার কী হবে?

পিন্‌ডিদা খেপেই উঠল সঙ্গে সঙ্গে। খবরদার! ত্বং ফচফচং মা কুরু! টাকা বেঁচে গেল? এ টাকার ওপর তোদের কোনো রাইট আছে? চোখ লাল করে পিন্‌ডিদা আমার দিকে ফিরল, সোনা তুই কী বলিস?

আমি তাড়াতাড়ি কার্তিকের ঘাড়ে চাপলাম—কার্তিক তুই কী ভাবছিস বল না?

বিপাকে পড়ে কার্তিক জবাব দিল, কী করা যাবে আমি কিছু ভেবেই পাচ্ছি না—চটপটি তুই?

চটপটি আরো সেয়ানা। সে আবার দায়টা আমার ওপরেই চাপালো। —পিন্‌ডিদাকে পরামর্শ একমাত্র তুইই যা একটু-আধটু দিতে পারিস—তাই পিন্‌ডিদা তোকেই জিজ্ঞেস করেছে।

পিন্‌ডিদা আবার খেঁকিয়ে উঠল। —সোনা কী পরামর্শ দেবে তাও বলে দিতে হবে? সোনার বাবা সোনারই বাবা, একবার যা দিয়েছেন তার কি তিনি হিসেব চাইবেন? আমাদের যা দিয়েছেন তা আমাদেরই—এই টাকায় আমাদের একটা ভালো ফান্ড হল—দিনের পর দিন মাঠের আড্ডা এরপর কত জমবে—এই ভবিষ্যৎ ভাবনাটাও তোদের মাথায় নেই? আমি তো সোনার মুখের দিকে চেয়েই বুঝেছি ও এই-ই বলবে—কী রে সোনা, তুইও এই ভেবেছিস তো? সব টাকা তো যেতেই বসেছিল—

অগত্যা আমিও মাথা নেড়ে সায় দিলাম। তারপর আমতা আমতা করে বললাম, আমি আরো একটু ভেবেছিলাম পিন্‌ডিদা—

বল্, বলে ফ্যাল, অত রাখা-ঢাকার কী আছে!

—ইয়ে, ফান্ডটা শুধু বাবার টাকাতেই হোক, চটপটি কেবলু কার্তিকের কাছ থেকে যে আঠারো টাকা করে নিয়েছ, হাত খরচার জন্যে সেটা ওদের দিয়ে দাও, আর আমাকেও আঠারোটা টাকা দিলে তোমার কাছে থোক তিনশো সত্তর টাকা থাকবে—পকেটে দু-দশ টাকা না থাকলে ভালো লাগে না!

পিন্‌ডিদা যেভাবে চেয়ে রইল যেন আমি এমন কথা বলতে পারি ভাবাও যায় না! তারপর ফোঁস করে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বলল, শেষ পর্যন্ত তুইও ছোট স্বার্থের কথাই ভাবলি?

আমার কাছে ফান্ড ছাড়া নিজের বলতে কিছু নেই, হাবুলের কাছেও কিছু নেই—তার মধ্যে তোদের তিন জনের পকেটেই শুধু টাকা থাকা দরকার? এমন স্বার্থপরের মতো কথা তুই বললি সোনা!

ফোঁস করে আরো বড় নিঃশ্বাস ফেলে হেবো হোঁতকা তাল ঠুকল, ঘেন্না ধরে গেল, না এলেই হত···

রাগে পিত্তি জ্বলে গেল। কিন্তু পিন্‌ডিদাও তেমনি সেয়ানা। আমি কিছু বলার আগে হাবুলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। —শাট আপ! তোর জিভ নেড়ে কথা বলতে লজ্জা করে না? ওরা তবু যে যা এনেছে বলেছে, তুই কাউকে কিছু না বলে চোরের মতো সাতটা টাকা সঙ্গে রেখেছিলি মনে নেই? সাত টাকাতেই এই, সোনার মতো তিনশো অষ্টাশি টাকা ছাড়তে হলে কী করতিস? সোনার পায়ের নখের যুগ্যি তুই?

ঘেন্নায় শিষ্যের মুখ দেখতেও আপত্তি এমন মুখ করে পিন্‌ডিদা উঠে ঘরে চলে গেল। হাবুলের মুখ চুন। পিন্‌ডিদার আমাকে তোয়াজের কারণটা ওর মোটা মাথায় ঢোকেনি। আমি বিগড়লে অর্থাৎ বাবাকে দিয়ে বলালে পিন্‌ডিদার ফান্ড করার ফানুস দুম করে ফেটে যাবে। হাবুলের মুখখানা দেখার মতো হয়েছে বটে কিন্তু বিনে পয়সায় থাকা-খাওয়ার এমন রাজসিক ব্যবস্থার পরেও আর চাওয়া সত্ত্বেও মাত্র আঠারোটা করে টাকা পেলাম না বলে আমার রাগ একটুও কমল না। ভিতরে ভিতরে আমি ফুঁসতেই লাগলাম।

দুপুরটা ঘুমিয়েই কেটে গেল। বিকেলেও আর আমরা কেউ বেরুলাম না। এত বড় কম্পাউন্ডে ছুটোছুটি করে যে-যার খিদে বাড়িয়ে নিলাম। রাতের মেনু মুরগির কষা আর ফ্রায়েড রাইস। বিকেলে লিট্‌লম্যান যখন রান্না চাপিয়েছিল তখন থেকেই গন্ধে আমাদের মন মাতোয়ারা। খিদে বাড়ানোর তাগিদে হাতি হেবো খেলার ছলে ধোঁত ধোঁত করে চটপটির পিছনে গুয়োরের মতো ছুটছে। আর পিন্‌ডিদা গম্ভীর মুখে ওয়াকিং চালিয়ে যাচ্ছে। বেচারা কী-ই বা করবে, ব্রেজিলের এক কালের ফুটবল স্টারের আজ হাঁটুর মালাইচাকি জখম।

রাতের খাওয়াও সময়ের আগেই নির্বিঘ্নে মিটল। তবে লিট্‌লম্যান লছমন সার্ভ করার সময় দেখলাম তার দু'চোখ টকটকে লাল। আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বেশ দুলছে। সন্ধ্যার পর এক-দেড় ঘন্টা আর ওকে দেখা যায়নি।

খাওয়ার ব্যাপারে পিন্‌ডিদাও হামলা-টামলা করেনি। করবেই বা কেন। লোকের অভাবে স্বভাব নষ্ট। এই ভোজে অভাব বলে কোনো কথা নেই।

কিন্তু পিন্‌ডিদা গোল বাধালো রাতে শোবার সময়। তার হুকুম সকলে অর্থাৎ ছ'জনেই একটা হল্ ঘরে শোবে। বড় খাটই যখন, আর একটা হল ঘর দখল করার কী দরকার। এক একটা খাটে দিব্বি দু'জন করে শোয়া যাবে। আমি চটপটি কার্তিক আর কেবলু—এই চারজনের মুখে অন্তত আপত্তির ছায়া দেখে পিন্‌ডিদা কেবলুর ওপরেই খেঁকিয়ে উঠল। —অমন করে চেয়ে আছিস কী, সাবধানস্য মারং নাস্তি কথাটা শুনিসনি? সোনাকে আমাদের আগলে রাখার দায়িত্ব আছে না—ফ্রায়েড রাইস আর মুরগির কষার সঙ্গে ভজুবাবু যে সাবধানে থাকতে বলে গেছে তাও হজম করে বসে আছিস? সোনা হাবুলের সঙ্গে এক খাটে শোবে।

শুনে আমিই মরিয়া হয়ে উঠলাম, আমি কারো সঙ্গে শুতে পারি না, আমাকে কারো আগলে রাখারও দরকার নেই। তোমরা পাঁচজন এক ঘরে শোও, আমি পাশের ঘরে ঘুমুবো।

কৌতুক ছোঁয়া গম্ভীর মুখে পিন্‌ডিদা যেন আমার সাহসের বহর-খানাই আগে উপভোগ করে নিল। তারপর স্নেহ-গলানো গলায় টেনে টেনে বলল, তুই হলি গে আমাদের প্রিন্স, তুই সুইসাইড করতে চাইলেই আমরা করতে দেব—লক্ষ্মী সোনা, আমার কথা শোন্—বিদেশ বিভুঁইয়ে

গোঁয়ারতুমি করিস না। আচ্ছা হাবুলের সঙ্গে শুতে না চাস, কেবলুর সঙ্গে শো—ওর নিঃশ্বাসেও সংস্কৃতের ঠান্ডা বাতাস তোর গায়ে লাগবে।

অগত্যা তাই। এক মাথা মোটা হাবুল ছাড়া সকলেই বুঝল, ছাড়াছাড়ি হয়ে শুতে ভয়টা আসলে পিন্‌ডিদারই। কিন্তু সে-কথা মুখে আনার মতো বুকের পাটা কারো নেই।

বিছানা নেবার দশ মিনিটের মধ্যেই যে-যার ঘুমে বেহুঁশ। শুধু আমার চোখেই ঘুম নেই। ওদের নানা সুরে নাক-ডাকানির চোটে আমার কাহিল অবস্থা। শেষে ঘুমের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে মনটা অন্য চিন্তার মধ্যে ঢোকাতে চেষ্টা করলাম।

বংশী পান্ডে আর তার সাগরেদ চিমনলালের কথা মনে পড়ল। ...ভজুবাবু অত ঘাবড়াচ্ছেন কেন? ওরা কি সত্যি ওই সাংঘাতিক ডাকাত রাম বাদশার লোক হতে পারে? উঁহু মনে হয় না। কিন্তু কী পাজি কী পাজি! পিন্‌ডিদার কাছে আমার মুখটা একেবারে পুড়িয়ে ছেড়েছে। প্রতিজ্ঞা করতে ইচ্ছে করছে, সীতাভোগ মিহিদানা আর জীবনে খাব না। কিন্তু ও রকম প্রতিজ্ঞা করাটা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সীতাভোগ মিহিদানার কী দোষ। কেউ ঘুমের ওষুধ মেশালে সীতাভোগ মিহিদানারা তো আর প্রতিবাদ করতে পারে না। ভজুবাবু সাবধান করে দিয়ে গেছে বার বার, কিন্তু ওই দুটো লোকের সঙ্গে সত্যি যদি আবার দেখা হয় তো ওদের বরাত মন্দ কি আমাদের, জানি না। মোট কথা, অত হেনস্তার জবাব আমি দেবই, আর কিছু না পারি, বুদ্ধির চমক দেখিয়ে পিন্‌ডিদার মুখ আমি কিছুটা ভোঁতা করে দেবই।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

কেবলু যখন ঠেলে তুলল, দিব্বি বেলা। লিটলম্যানের নাকি ব্রেকফাস্ট প্রায় রেডি।

সকলের খাওয়া সারা হতে ভজুবাবু হাজির। বলল, আজ তোমাদের পছন্দ মতো বাজার হোক, চলো—

আমরা হইহই করে বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু ভজুবাবুকে একটু গম্ভীর গম্ভীর মনে হল। একসময় জিজ্ঞেস করল, কাল কোনো আজে বাজে লোককে বাড়ির চত্বরে ঢুকতে দেখোনি তো?

পিন্‌ডিদা তার বিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি ফুলিয়ে বলল, নাঃ, অত বুকের পাটা কার?

ভজুবাবুকে তার পরেও একটু বিমনা মনে হল।

পিন্‌ডিদা তার ইচ্ছেমতো বাজার করল। বিশেষ কিছু নয়, ছটা পেল্লায় চিংড়ি দেড় কিলো, আর এক হাত প্রমাণ পাবদা মাছ গোটা বারো। এই হল দিনের ব্যবস্থা। রাতের মেনু মুরগির রোস্ট আর পোলাও। তবে দিনের মেনুতে আরো কিছু সংযোগ হল। চাটনি আর প্যাঁড়া। দেওঘরের প্যাঁড়ার নাকি খুবই সুনাম।

কিন্তু ফেরার মুখে ভজুবাবু ফ্যাসাদ বাধালো। আমাকে আর পিন্‌ডিদাকে দেখিয়ে বলল, তোমাদের একবার থানায় যেতে হবে, এরা চারজন বাজার নিয়ে একটা টাঙ্গায় উঠে চলে যাক—

পিন্‌ডিদা আঁতকে উঠল, কেন, থানায় কেন?

ভজুবাবু জবাব দিল, দিনকাল ভালো নয়, সাবধানের মার নেই, তোমাদের ট্রেনের ব্যাপারটা তাই থানা অফিসারকে বলে রাখতে গেছলাম। সব শুনে অফিসার বলল, ওদের লিডার আর আপনার মনিবের বন্ধুর ছেলেকে একবার থানায় নিয়ে আসুন।

বাড়িতে পেল্লায় চিংড়ি, পাবদা, দেওঘরের প্যাঁড়া আর রোস্টের মুরগি যাচ্ছে—আর আমাদের কিনা যেতে হবে থানায়। আচ্ছা ভীতু মানুষ বটে এই ভজুবাবু। কিন্তু কী আর করা যাবে, যেতে হল।

একটা টাঙ্গায় বাজার আর বাকি চার জনকে তুলে দিয়ে আর একটা টাঙ্গায় আমি পিন্‌ডিদা আর ভজুবাবু। পিন্‌ডিদার মুখ দেখেই বোঝা গেল, থানা জায়গাটা তার আদৌ পছন্দ নয়। আমি একটু

টিপ্পনি কাটার লোভ সামলাতে পারলাম না। বললাম, অত ঘাবড়াচ্ছ কেন, আমরা তো আর আসামি নই?

পিন্‌ডিদা কড়কে উঠল, ফ্যাচ ফ্যাচ করিস না, চিংড়ি আর পাবদা মাছ দিয়ে কী হবে বলে দেওয়া হল না, লিট্‌লম্যান কী দিয়ে কী করে বসে থাকবে আমি আছি সেই দুর্ভাবনায়।

পিনডিদার দুশ্চিন্তা ভজুবাবুর কানে যেতে এক গাল হেসে বলল, তার জন্যে কিছু ভেবো না। লিট্‌লম্যান গাঁজা খায় আর আড্ডা দেয় বটে, কিন্তু হেঁসেলে ঢুকলে স্বয়ং দ্রৌপদী।

থানায় পৌঁছুতেই বড়বাবু অর্থাৎ অফিসারের ঘরে আমাদের ডাক পড়ল। তাকে ঘিরে বসে আছে আরো চার-পাঁচজন ছোট-বড় অফিসার। আমাদের বসার জন্য চেয়ার এনে দেওয়া হল। বড়বাবুটি বয়স্ক লোক। ভণিতা বাদ দিয়ে বলল, তোমাদের ট্রেনের ঘটনা ভজুবাবুর মুখে শুনেছি। তোমাদের লিডার কে?

পিন্‌ডিদা সবিনয়ে জবাব দিল, আজ্ঞে আমি।

—বেশ বেশ, তোমার বাহাদুরি আছে বটে, অঞ্জন হবার আগেই ব্যাপার বুঝতে পেরে মাথা খাটিয়ে টাকাগুলো বাঁচিয়েছ!

পিন্‌ডিদা বিগলিত হবার আগেই বড়বাবুর পাশ থেকে দাড়ি গোঁফ-চাঁছা কদম-ছাঁট তরুণ অফিসারটি ঝাঁঝালো গলায় বলল, লিডারের অত লোভ কেন? কোনো যোগ্য লিডার অজানা অচেনা লোকের দেওয়া খাবার খেয়ে এমন কেলেংকারি বাধায়!

পিন্‌ডিদার মুখ আমসি। বড়বাবু হেসে বলল, আ হা-হাজারীলাল, এমন করে বলছ কেন, ছেলেমানুষের একটু-আধটু লোভ হতেই পারে।

ছেলেমানুষ শুনে পিন্‌ডিদার মুখখানা আরো প্যাঁচা-মার্কা হয়ে গেল।

বড়বাবু এরপর ড্রয়ার থেকে এক গাদা ছোট বড় ফোটো বার করে আমাদের সামনে রাখল। —দ্যাখো তো ট্রেনের ওই দুটো লোক এর মধ্যে আছে কি না।

আমি আর পিন্‌ডিদা দু'জনেই দেখতে লাগলাম। হঠাৎ দুটো মুখ আমার চেনা-চেনা মনে হতে লাগল। একজনের মুখে গোঁফ দাড়ি, আর একজনের মাথায় পাগড়ী। ফোটো দুটো পিন্‌ডিদাকে দেখিয়ে আমি উত্তেজিত ফিসফিস গলায় বললাম, দ্যাখো তো বংশী পাণ্ডে আর চিমনলাল কি না?

ভালো করে খুঁটিয়ে দেখে পিনডিদাও সায় দিল, তাইতো রে!

ফোটো দুটো দেখেই বড়বাবু গম্ভীর। —তোমরা ঠিক বলছ? ওদের একজনের গোঁফ দাড়ি আর একজনের মাথায় পাগড়ী ছিল?

আমি জবাব দিলাম, ছিল না, কিন্তু ওরাই যে তাতে কোনো ভুল নেই।

বড়বাবুর পাশের সেই হাজারীলাল মুখ মচকে বলল, এত শিওর হচ্ছ কী করে, অমন গোঁফ দাড়ি লাগালে নিজেকে তুমি চট করে চিনতে পারবে?

কি দুর্মুখ রে বাবা লোকটা! বড়বাবু কিন্তু চিন্তাচ্ছন্ন। বলল, যদি ঠিক হয় তো বলতে হবে তোমরা সাংঘাতিক লোকের পাল্লায় পড়েছিলে। কী রকম সাংঘাতিক লোক পরে ভজুবাবুর কাছ থেকে শুনে নিও। মোট কথা তোমাদের একটু সাবধানে থাকার দরকার আছে, ঠকেছে বুঝলে রাম বাদশার দল তোমাদের ছাড়বার পাত্র নয়—গোঁফ দাড়িওয়ালা যে লোকটাকে তোমরা বংশী পাণ্ডে বলছ সেই রাম বাদশা। শুনে আমার আর পিন্‌ডিদার দু'জোড়া চোখ ছানাবড়া। এরা বলে কী! স্বয়ং রাম বাদশার খপ্পরে পড়েছিলাম আমরা! মাত্র পঞ্চান্ন টাকা পাবে ভেবে সে নিশ্চয় আমাদের অজ্ঞান করেনি, আরো অনেক বেশিই পাবে ভেবেছিল। পিন্‌ডিদার বুদ্ধির জোরে টাকাগুলো বেঁচেছে কিন্তু ওই লোকটা যদি জানতে পারত জমিদার বাড়ির গোপালের হিরের চোখ আমরাই উদ্ধার করেছি, আমাদের জন্যেই তার নাম আর এক দফা পুলিশের খাতায় উঠেছে তাহলে ওই ঘুমন্ত অবস্থায় আমাদের ছ'জনকেই যে কাবাব বানিয়ে রেখে যেত তাতে কি কোনো সন্দেহ আছে!

বড়বাবু আবার বলল, ওই ধুরন্ধর লোকটা নিজেই নিজেকে বাদশা বানিয়েছে। বাদশার মতোই তার চালচলন। সে ছোট কাজে হাত দেয় না, নেহাৎ স্পোর্ট হিসেবেই হয়তো তোমাদের সঙ্গে লাগতে গেছল—ঠকে গেছে জানার পরে আর স্পোর্ট না-ও ভাবতে পারে। সব জায়গাতেই তার চর আছে মনে রেখো—আমাদের এই পুলিশের মধ্যেও হয়তো তার লোক আছে, নইলে আমাদেরও ভিতরের খবর সে পায় কী করে? বেড়াতে এসেছ—সাবধানে থেকো।

পাশ থেকে মুখ মচকে হাজারীলাল বলল, ফের সীতাভোগ মিহিদানার নেমন্তন্ন পেলেও আবার না ছোটে বলে দিন সার—

বড়বাবুর সঙ্গে অন্যেরাও হেসে উঠল।

পিন্‌ডিদার মুখখানা এবার লিডারের মতোই গম্ভীর। জবাব দিল, নেমন্তন্ন পেলে ছুটব আর তার হদিশ পেলে আপনাদের কাছে এনে দেবার জন্য তাকে নেমন্তন্ন করতেও ছুটব। সেবারে বর্ধমানে জমিদার বাড়ির গোপালের হিরের চোখ জোড়া উদ্ধার করলাম আর সেই সুবাদে রাম বাদশার হদিশও দিলাম আমরাই—কিন্তু পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে সে দিব্বি দলবল নিয়ে পালালো···

মুহূর্তের মধ্যে ঘরের বাতাসই বদলে গেল বুঝি। সকলের জোড়া জোড়া উৎসুক চোখ পিন্‌ডিদার মুখের ওপর! হাজারীলাল তার চেয়ারটা দুহাত টেনে নিয়ে পিন্‌ডিদার দিকে ঝুঁকল। থমথমে গলায় বলল, বর্ধমানের সেই কেস-এর ফাইল আমরাও রেখেছি—রামবাদশার সব খবরই আমাদের রাখতে হয়—সেই হিরের চোখ তাহলে আপনারা উদ্ধার করেছিলেন—তার আগে পোড়োবাড়ি থেকে মন্দিরের পুরোহিত ঠাকুরকে হাফডেড অবস্থায় আপনারাই খুঁজে বার করেছিলেন?

পিন্‌ডিদা সবিনয়ে মাথা নেড়ে জবাব দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ সার।

—আপনার নাম কী?

পিন্‌ডিদা তার পোশাকি নামই বলল। আমি জানান দিলাম সমস্ত বর্ধমানের ছেলেরা ওঁকে পিন্‌ডিদা নামে জানে···

পুলিশের লোকেদের চোখে মুখে আমাদের প্রতি একটু শ্রদ্ধার ভাব দেখা গেল। কেবল হাজারীলাল বাদে। ভুরু কুঁচকে চেয়ার ঠেলে উঠে দেওয়ালের দিকের আলমারিটা খুলে একটা ফাইল বার করল। আমাদের দিকে পিছন ফিরে ফাইলের পাতা উল্টে মিনিট দুই তিন কী পড়ল। ফাইল যথাস্থানে রেখে ঘুরে দাঁড়িয়ে বড়বাবুর দিকে চেয়ে একবার মাথা নাড়ল শুধু।

তারপর কাছে এসে থমথমে মুখে পিন্‌ডিদাকে বলল, শুনুন, নিজেদের এরপর খুব নিরাপদ ভাবার কারণ নেই আপনাদের। আমাদেরও খবর ছিল রাম বাদশা তার দলবল নিয়ে এদিকেই আসছে—কিন্তু জসিডির আগেই কোথাও নেমে পড়ে গা ঢাকা দিয়েছে। আপনারা যে বাড়িতে এসে উঠেছেন তাই থেকেই এতক্ষণে বোধহয় আপনাদের পরিচয় জানতেও তার বাকি নেই। রসিকতা করতে গিয়ে ঠকেছে জানলেই তার মতো ডাকাতের ঠান্ডা থাকার কথা নয়—এর ওপর আপনাদের সেই হিরে উদ্ধার আর তার নাম ফাঁস করার কেরামতির কথা জানলে সে-ও চরম কিছু কেরামতিই দেখাতে চাইবে।

এই শোনার পর পিন্‌ডিদার সমস্ত মুখ ফ্যাকাশে। আমরও বুক ঢিপ-ঢিপ। জিভ দিয়ে ঠোঁট দুটো একটু ভিজিয়ে নিয়ে পিন্‌ডিদা বলল, আপনারা থাকতে আমাদের ভয়ের কী আছে—

ঈষৎ বিদ্রূপের সুরে হাজারীলাল জবাব দিল, আমরা আছি কোথায়—আমাদের কেরামতির কথা তো আপনি একটু আগেই বললেন—হিরে উদ্ধার করেছেন আর হদিশ দেওয়া সত্ত্বেও রাম বাদশা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে। তাছাড়া, রাম বাদশার খোঁজ পেলে তাকে নেমন্তন্ন করে আমাদের কাছে এনে দেবার কথাও বলেছেন—আমরাই উল্টে এখন আপনার ওপর নির্ভর করছি।

কলে পড়া ইঁদুরের দশা পিন্‌ডিদার। আর আমি ভাবছি বেড়াতে এসে এ কী ফ্যাসাদে পড়লাম। এই পুলিশের বিশেষ করে হাজারীলালের হাবভাব একটুও সদয় মনে হল না। আর পিন্‌ডিদাই বা কেন যে ওদের আঁতে ঘা দিতে গেল! মগজে বুদ্ধি রাখে কেউ অস্বীকার করে না—কিন্তু সাহস যে কত তাতে আমার অন্তত সন্দেহ আছে।

বড়বাবু সামনে বসে থাকলেও এখানে আসল দাপট হাজারীলালের সেটা বেশ বোঝা গেছে। করুণ গলায় আমি তারই মন ভেজাতে চেষ্টা করলাম। বললাম, আমরা একেবারে নতুন তো এখানে, বর্ধমানে হলে অতটা ভাবতাম না···যে কটা দিন আছি এখানে আপনার উপদেশ মতোই চলব, আপনি একটু বলে-টলে দিন!···

হাজরীলাল ভুরু কুঁচকে আমার দিকে চেয়ে রইল খানিক। লিডার পিন্‌ডিদাকে আপনি করে বললেও আমার বেলায় সেটুকু চোখের পরদাও রাখল না। তিরিক্ষি জবাব দিল, উপদেশের জোরে রাম বাদশাকে ঠেকানো যায় না—বুঝলে? গোপালের হিরের চোখ না পাওয়ার খেদ সে এরই মধ্যে ভুলে গেছে ভাবো? তোমাদের জন্যে তার নাম ফাঁস না হয়ে গেলে সে কি ওই হিরের চোখ পাওয়ার আশা ছাড়ত? ভেবেচিন্তে মাথা খাটিয়ে সে-ও ঠিক মন্দিরের পিছনের ওই জঞ্জাল ঘেঁটে হিরের চোখে দুটো হাতের মুঠোয় পুরে সটকান দিত। তোমাদের জন্যে সে মাথা খাটাবার সময়ই পেল না, উল্টে নাম ফাঁস হয়ে গেল বলে গা-ঢাকা দিতে হল। কপাল ভালো যে ট্রেনে সে তোমাদের চিনতে পারেনি। যাক, এখন পরামর্শ দেবার কিছু নেই, যতটা পারো সাবধানে থাকো।

ভজুবাবুর সঙ্গে আমরা বেরিয়ে এলাম। ভদ্রলোকের থলথলে মুখ দুশ্চিন্তায় কালো। বাইরে এসেই বলল, কী বিপত্তি বলো দেখি—অতবড় একটা কান্ডর পর তোমরা এ-ভাবে ফুর্তি করতে বেরুলে কেন!

আমি বললাম, সেই কান্ড তো প্রায় দু-মাস আগে হয়ে গেছে—এখনো তার জের চলতে পারে ভাবব কী করে!

গুরুগম্ভীর গলায় পিন্‌ডিদা বলল, শাট ইওর মাউথ। তার পর ভজুবাবুকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা আপনি কী মনে করেন আমরাই যে গোপালের হিরে উদ্ধার করেছি আর আমাদের জন্যেই পুলিশের কাছে রাম বাদশার নাম ফাঁস হয়ে গেছে—এ-খবর সে জানতে পারবে?

—জানতে পারবে কি, ব্যাটা দেওঘরে পা দিয়েছে যখন এতক্ষণে জেনে গেছেই। বড়বাবু বললেন শুনলে না পুলিশের মধ্যেও তার চর আছে—তাই ভিতরের গোপন খবর পেতেও তার সময় লাগে না। তাছাড়া হাজারীলালও ঠিক কথাই বলেছে, কর্তার এ বাড়িতে এসে ওঠা মানেই দশজনের চোখ টানা—রাম বাদশার মতো দুঁদে ডাকাত কি আর খোঁজ নেবে না এখানে কারা এলো—সোনার বাবা যে বর্ধমানের নামকরা ডাক্তার এটুকু জানলেই তো হয়ে গেল—তারপর দু-এ-দু-এ চার কী করে করতে হয় এ কি আর তাকে বলে দিতে হবে?

ফোঁস করে একটা দুশ্চিন্তার নিঃশ্বাস ফেলে ভজুবাবু আবার বলল, দেড় মাস আগেও এখানে সকলের নাকের ডগায় বসে কী রকম একখানা হামলা করে গেছে জানো না—কেউ তার টিকির নাগাল পেল না—কাল বলবখন, এখন আমার একটু দরকারি কাজ আছে—তোমরা সোজা বাড়ি চলে যাও—আমি টাঙ্গা ঠিক করে দিচ্ছি—মাঝখানে কোথাও নামবে না।

ভজুবাবু আমাদের দুজনকে তার একটা চেনা টাঙ্গায় তুলে দিল। টাঙ্গাঅলাকে হুকুম করল ফটক দিয়ে ঢুকে একেবারে বাড়ির সিঁড়ির গায়ে আমাদের নামিয়ে দিতে।

টাঙ্গা চললেই গম্ভীর মুখে পিন্‌ডিদা বলল, পুলিশের মধ্যেও রাম বাদশার চরটি কে চিনলি?

আমি সচকিত। —সে-কি? সে-ও বড়বাবুর ঘরেই ছিল নাকি?

—তার পাশেই ছিল। ওই হাজারিলাল ছাড়া আর কে হতে পারে? গোড়া থেকেই তার

ব্যাভারখানা লক্ষ্য করলি না? ফোটো দেখে আমরা লোক দুটোকে শনাক্ত করার পরেও তোকে কী বলল শুনলি না? আসলে আমাদের সন্দেহটা নাকচ করে দিতে চাইছিল–

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, লোকটা আমাকে ঠেস দিয়ে বলেছিল বটে, এত শিওর হচ্ছ কী করে, অমন গোঁফ দাড়ি লাগালে নিজেকে তুমি চট করে চিনতে পারবে? সত্যি এ ছাড়াও লোকটা গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত দুর্ব্যবহার করেছে আমাদের সঙ্গে। তাই পিন্‌ডিদার কথা উড়িয়ে দেওয়া গেল না। তবু বললাম, কিন্তু পুলিশের লোকেরাও তাকে বুঝতে পারছে না?

ভারিক্কি চালে পিন্‌ডিদা জবাব দিল, হুঁঃ, পুলিশের লোক সর্বদাই হাত-পা আর ডান্ডা দিয়ে কাজ করে, মাথা দিয়ে নয়–বুঝলি?

বুঝে মনে মনে বেশ দমেই গেলাম।

যাক, দুপুরের খাওয়ার হিড়িকে দুশ্চিন্তার কথা খুব মনে থাকল না। অত গুরুভোজনের পর বিকেলেও আর বাড়ির চত্বরে ভালো লাগল না। সামনে এক মাইলের মধ্যে নন্দন পাহাড়। সকলে মিলে ওই পাহাড়েই চলে গেলাম। এই বয়সের ছ'ছটা ছেলে একসঙ্গে থাকলে দিনে দুপুরে কে আর কী করবে! তা ছাড়া, নিজেদের মধ্যে আলোচনার পর আমাদেরও সাহস বেড়েছে। আমরা কাপুরুষ না দুধের শিশু? হাবুল তো বুক ফুলিয়ে বলেছে রাম বাদশাকে খালি হাতে পেলে কিং-কং-এর খেল দেখিয়ে দেবে।

নন্দন পাহাড় নামেই পাহাড়। আসলে বড় টিলা একটা পাথর নেই। ঘাসে মোড়া। ওপরটা আবার সমান। নিচু থেকে ওপরে ওঠারও কষ্ট নেই–গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত বাঁধানো ধাপ। ওই টিবির ওপর একদিকে গোটা শহরের জল সাপ্লাইয়ের ট্যাঙ্ক।

ধাপ বেয়ে নয়, পাহাড়ের গা বেয়েই আমরা হুটোপুটি করে উঠে ওপরে গেলাম। জায়গাটা নির্জন খুব। চারদিক ফাঁকা। অনেক দূরে দূরে এক-একটা বাড়ি। এমন একটা খেলার জায়গা পেয়ে আমাদের আনন্দ ধরে না। পিন্‌ডিদা বলে উঠল, হুঁস, বর্ধমানে আমাদের বসার জায়গাটা যদি এ-রকম হত।

রাতের কথা ভেবে খিদে বাড়ানোর তাগিদ আছে সকলেরই। চটপটি প্রস্তাব দিল, এক দৌড়ে নিচে নেমে যেতে হবে আর এক দৌড়ে ওপরে উঠে আসতে হবে। নামার পরে একটু দম নেওয়া যেতে পারে–কিন্তু নামা-ওঠার মাঝে থামা চলবে না।

পিন্‌ডিদা বলল, ঠিক আছে, আমার হাঁটু খারাপ, আমি জাজ। নামা ওঠায় কার কত সময় লাগে আমি ঘড়ি দেখব।

পিন্‌ডিদার পেটে ভস্মকীট আছে বোধহয়! তার খিদে বাড়ানোর দরকার হয় না। আর যে কোনো পরিশ্রমের প্রস্তাবে তার হাঁটু খারাপ। হাবুল মিনমিন করে বলল, তুমি একলা থাকবে, আমি তোমার কাছেই থাকি–

এ যাত্রায় তার বরাতই খারাপ। পিন্‌ডিদা খেঁকিয়ে উঠল, আমি কি মেয়েছেলে যে আমার কাছে থাকতে হবে–যা লাইনে দাঁড়া!

সকলে সার বেঁধে লাইন করলাম। পিন্‌ডিদা 'রান'! বলতেই নিচে ছুটলাম আমরা। নিচে পৌঁছে এক মিনিট দাঁড়িয়েই আবার ওপরে দৌড়। কিন্তু দৌড়ে ওপরে ওঠা সত্যি পরিশ্রমের ব্যাপার! চটপটি প্রথম হল। হবে আমি জানতাম। আমি সেকেন্ড, কার্তিক থার্ড, কেবলু ফোর্থ। কিন্তু কেবলু যখন ফিরে আবার পাহাড়ের মাথায়, হাবুল তখন তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র উঠে বসে পড়ে মোষের মতো হাঁপাচ্ছে।

পিন্‌ডিদা এবারে নির্মম বিচারক। বিশ্রাম করে আধ ঘন্টা বাদে হাবুল উঠে আসতে রায় দিল, দিনকে দিন তুই একটা গন্ডার হচ্ছিস–আজ রাত থেকেই তোর ডায়েট কনট্রোলের ব্যবস্থা করতে হবে।

হাবুলের মুখ আমসি। আমরা হইহই করে সায় দিলাম, হাবুলের ভালোর জন্যেই এটা করা উচিত।

এই সময়ে আর কোনোদিকে আমাদের লক্ষ্য ছিল না। হঠাৎ দেখলাম নিচে একটা জিপ দাঁড়িয়ে আছে। আর পাঁচজন লোক ধীরেসুস্থে ওপরে উঠে আসছে। তাদের চারজনের পরনে চকচকে প্যান্ট-শার্ট। আর একজনের পরনে ব্রহ্মচারীর মতো সাদা আলখাল্লা, মাথায় খদ্দরের টুপি, কপালে পুরু তিলক, নাকেও। প্যান্ট পরা চারজনের মধ্যে একজনের ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, চোখে নীল গগ্‌লস।

আমরা গোল হয়ে বসে তাদের দেখছি। ধরেই নিলাম বেড়াতে এসেছে, আর ওই সাদা আলখাল্লা তিলক-কাটা লোকটা পান্ডাটান্ডা হবে। তারা ওপরের দিকে তাকাচ্ছেও না। নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে ওপরে উঠে আসছে।

ওপরে উঠে আসার পরে তাজ্জব ব্যাপার। সোজা এসে ওরা আমাদের ঘিরে দাঁড়ালো। ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি লোকটার হাতে রিভলভার আর চারজনের হাতে ঝকঝকে ছোরা। রিভলবার দুলিয়ে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আর গগ্‌লস পরা লোকটা মিটি মিটি হেসে বলল, কি সাহেব ছেলেরা চেনা চেনা মালুম হোচ্ছে?

আমরা আঁতকে উঠলাম। জোয়ান মানুষের মেয়েছেলের মতো কচিকাঁচা গলা শুনেই আমার গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো, বংশী পান্ডে মানে রা-রা-রাম বাদশা!

রিভলভার হাতে লোকটা কায়দা করে সামনে ঝুঁকল। তার গলা দিয়ে বিদ্রূপ ঝরল, সায়েব ছেলে ঠিক পচান গেলেন। তারপরেই সেই গলার স্বর তীক্ষ্ণ। —রাম বাদশা ট্রেনে তোমাদের সঙ্গে ছেলেখেলা করেছিল—কিন্তু তোমাদের মতো দুধের ছেলেদের কাছে সে ঠকতে রাজি নয়। তোমরা থানার বড়বাবুর কাছে রিপোর্ট করে পার পাবে ভেবেছ? এখানে যে হালে তোমরা আছ খবর পেয়েছি—অন্ততপক্ষে পার হেড এক হাজার টাকা অর্থাৎ কম করে ছ'হাজার টাকা তোমাদের সঙ্গে আছেই।

সেই কটা হাড়-কাঁপানো মুহূর্তের মধ্যেই আমার মনে হল, গোপালের হিরের চোখ উদ্ধারের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগটা রাম বাদশা এখনো জানে না। জানলে তার অন্য মূর্তি দেখা যেত।

তবু রাম বাদশার সেই কচি গলা ধারালো ছুরির মতোই আমাদের বুকে বসতে লাগল। সে হিসহিস করে বলল, টাকা কার কাছে আছে বার করো—নইলে টাকাও যাবে, ছ'জনই এখানে খতম হবে।

আমরা কাঠ। আমরা স্তব্ধ। নিজেদের অগোচরে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়েছি। সামনে যমদূত দেখছি।

রাম বাদশা আবার ফুঁসে উঠল। —নিকালো রুপেয়া—ছে হাজার হাম মাঙতা—চিমনলাল তৈয়ার হো!

সাদা আলখাল্লা-পরা আর তিলককাটা লোকটাই চিমনলাল। ঝকঝকে ছোরা উঁচিয়ে সে দু পা এগিয়ে এলো।

মুহূর্তের মধ্যে আমার মাথায় কী খেলে গেল কি। মাথায় ভূতই চাপল বলা যেতে পারে। ট্রেনে ওদের হাতে জব্দ হয়ে পিন্‌ডিদার ধাতানি আর কথার চিমটি খেয়ে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, মা যদি সদয় হয়, মানে আবার যদি কোনো সুযোগ আসে তো পিন্‌ডিদাকে বুদ্ধির চমক দেখাবো। শুধু তাই নয়, পিন্‌ডিদারই এক বিষম বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার চাতুরীর ব্যাপারটাও মনে পড়ে গেল।

রাম বাদশা আবার হিসহিস করে উঠল। —এক মিনিট! চিমনলাল! এক মিনিট বাদ এক আদমিকো খতম করো! কিসকো পাস হায়—নিকালো রুপেয়া!

দলের সকলে কাঁপছে। কিন্তু আমার মাথার ভূতটা আরো নড়েচড়ে উঠেছে। মন বলছে, লোকটা আওয়াজের ভয়ে গুলি করবে না—আর চোখের পলকে ছুটতে পারলে গুলি ছুঁড়লেও নিশানা করে আমার নাগাল পাবে না। যেমন ভাবা তেমনি কাজ! আচমকা সোজা আমি পাঁই পাঁই করে ছুটলাম। তারপর প্রাণের দায়ে বিদ্যুৎবেগেই নিচের দিকে নামতে লাগলাম! চকিতে একবার মাত্র পিছন ফিরে দেখে নিলাম পাঁচ জনের চার জনই তীরের মতো আমার দিকে ছুটে আসছে। ওই দেখতে গিয়েই কাল হল। কারণ ঢালুতে ছুটছি। মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পিঠে মাথায় সেকি ঘুষির বৃষ্টি! চোখে অন্ধকার দেখছি। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি। দূরে কোথায় একটা গুলির আওয়াজ···তারপরেই তীক্ষ্ণ একটা বাঁশির আওয়াজ। তারপর আর কিছু জানি না।

চোখ মেলে দেখলাম, আমি একটা বিছানায় শুয়ে আছি। সকাল। আমাকে ঘিরে কতগুলো উদ্‌গ্রীব মুখ। পিনুডিদা···চটপটি···কেবলু···কার্তিক··হাবুল···পুলিশের হাজারীলাল আর ভজুবাবু।

সমস্ত শরীরে যন্ত্রণা। জিজ্ঞেস করলাম, আমি কোথায়?

ভজুবাবু মুখের ওপর ঝুঁকে এলো। —তুমি হাসপাতালে—এখন ভালো আছ তো?

আমি মাথা নাড়লাম। —আর ওরা?

পিনুডিদা বলল, ওই ডাকাতের দল? অল্পের জন্য হাজারীবাবুর হাত থেকে ফস্কে গেল। হাজারীবাবু সমস্ত দিন আমাদের পিছনে চর লাগিয়ে রেখেছিলেন, কিন্তু খবর পেয়ে তাঁর আসতে একটু দেরি হতে এই বিপত্তি! আমাদের বিপদের ভয়ে তিনি দূর থেকে গুলি ছুড়তে ওরা হুইসিল মেরে দলবল ডেকে নিয়ে জিপে করে পালিয়ে গেল।

নার্স এক এক পেয়ালা দুধ খাইয়ে যেতে দশ মিনিটের মধ্যে আমি আরো একটু চাঙ্গা হয়ে উঠলাম। কিন্তু যন্ত্রণা কমেনি। আমার মাথায় কপালে ব্যান্ডেজ। শুধু কিল আর ঘুষি নয়, আমি পড়ে যেতে ওই ডাকাতের একজন আমার চুলের মুঠি ধরে কপালটা মাটিতে ঠুকছিল মনে পড়ল।

হাজারীলাল বলল, কিন্তু টাকা তো তোমাদের কাছে ছিল না শুনলাম, তুমি হঠাৎ ও-ভাবে পড়ি-মরি করে ছুটতে গেলে কেন—খুব ভয় পেয়ে গেছলে?

সকলের মুখের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললাম, না, পিনুডিদাকে বাঁচানোর জন্যে ···টাকা তো পিনুডিদার কাছে, আমি ছুটলে আমার কাছেই টাকা আছে ধরে নিয়ে ওরা আমার পিছনে ধাওয়া করবে—ওরা তাই করল···আমাকে ধরতে পারবে ভাবিনি···কিন্তু পড়ে যেতে ফেঁসে গেলাম।

এই প্রথম পুলিশ অফিসার হাজারীলালের মুখে দরাজ হাসি দেখলাম। বলল, তুমি সত্যিকারের চালাক ছেলে তো, এই বুদ্ধি না খাটালে আমরা আসার আগেই হয়তো রাম বাদশার দল কাজ হাসিল করে চলে যেত, তোমার জন্যে আমরা খানিকক্ষণ টাইম পেয়েছি।···কিন্তু অত সাহস করে ভালো করোনি···আমরা সময়ে এসে না গেলে খুন হয়ে যেতে। তোমাদের পেছনে আমাদের প্লেন ড্রেসের স্পাই লাগানো ছিল···খবর পেয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে আসতে গিয়ে এক দঙ্গল মোষের অবস্ট্রাকশনে পড়ে গিয়ে মিনিট তিন-চার দেরি হয়ে গেল, নইলে আজ সব কটাকে হাত-কড়া পরানো যেত—ওই মোষের দল এতবড় একটা সুযোগ নষ্ট করে দিল! এমন শিকার ফসকে গেল।

তার খেদ দেখে আমি তো মনে মনে লজ্জা পেলামই, পিনুডিদার আরো বেশি পাওয়ার কথা। পিনুডিদা একেই কিনা রাম বাদশার চর ভেবে নিয়েছিল, আর আমিও তাই বিশ্বাস করেছিলাম।

ভজুবাবুর চোখে মুখে এখনো ত্রাস! বলে উঠল, হাজারীবাবু এসেই গুলি ছুড়তে শুরু না করলে কী অঘটনই না ঘটে যেত—আমি কর্তাকে মুখ দেখাতাম কী করে!

হাজারীলাল উঠে দাঁড়ালো। বলল, এরা যে কদিন এখানে আছে মুখ দেখানোর ভাবনাটা আপনার একেবারে চলে যায়নি। দু'দুবার বিশেষ করে এবারে জব্দ হয়ে রাম বাদশার খেপে যাওয়াই স্বাভাবিক। এসব ক্রিমিন্যালরা এ-ভাবে হেরে যাওয়াটা অশুভ লক্ষণ মনে করে। তাছাড়া

রাম বাদশার ধারণা হয়েছে এদের কাছে ভালো টাকাই আছে, আপনি এদের একটু চোখে-চোখে রাখুন।

ভজুবাবুকে উপদেশ দিয়ে হাজারীলাল আমার দিকে ফিরল। বলল, তুমি অত্যন্ত দুঃসাহসিক কাজ করেছ ব্রাদার, কিন্তু এ-যাত্রায় শুধু তুমি নও, তোমার বন্ধুরাও সব তোমার বুদ্ধির জোরেই বেঁচে গেছে। আই কংগ্রাচুলেট ইউ!

সে চলে গেল। ভজুবাবু তাকে এগিয়ে দিতে চলল। থেকে থেকে লক্ষ্য করলাম, সেই থেকে পিন্‌ডিদা অপলক আমার দিকেই চেয়ে আছে। ওরা ঘর ছাড়তে এগিয়ে এসে শোয়া অবস্থাতেই উবুড় হয়ে আমাকে দু হাতে জাপটে ধরে বলে উঠল, সোনা রে, তুই যা করেছিস তার জবাব নেই, যদিও জানি, ব্রেজিলে সেই গেম ওয়ার্ডেনের নামে জঙ্গলের প্রহরীর হাত থেকে আমার বন্ধুকে রক্ষা করার ট্যাকটিসটাই তুই কাজে লাগিয়েছিস (পিন্‌ডিদার গপ্‌প)! তবু সোনা রে, তুই-সত্যিকারের সোনার টুকরো একখানা—তোর তুলনা নেই।

আমার গায়ে মাথায় দারুণ যন্ত্রণা তখনো। তবু মনে হচ্ছে এমন অসহ্য কিছু নয়।

## চার

সেই বিকেলেই হাসপাতাল থেকে আমাকে বাড়ি নিয়ে আসা হল। ডাক্তারদের সেদিন আমাকে ছাড়ার ইচ্ছে ছিল না। আর একটা দিন তারা রাখতে চেয়েছিল। আমিই বেঁকে বসলাম। হাসপাতালে আমার আর এক দন্ডও থাকার ইচ্ছে নেই। কোথায় বাবার মক্কেল বন্ধুর প্রাসাদের মতো বাড়ি আর মক্কেল বন্ধুর ম্যানেজার ভজুবাবুর রাজসিক খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা আর কোথায় এই হাসপাতাল আর তার রোগীর পথ্য! ডাক্তাররা একটা দিন আরো এখানে আমাকে রাখতে চায় শুনেই মেজাজ বিগড়ে গেল। মনে পড়ল গত রাতের মেনু ছিল ফ্রায়েড রাইস আর চিকেন রোস্ট। আমি তো অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে পড়ে। আমাকে ওরা যতই ভালোবাসুক, কিন্তু রাতে বাড়ি ফিরে লিট্‌লম্যানের (লছমনের) হাতের ফ্রায়েড রাইস আর চিকেন রোস্ট কি ছেড়েছে।

তাই পিন্‌ডিদা যখন এসে বলল, ডাক্তার তো আজ রাতটাও তোকে এখানে রাখার কথা বলছে, শালারা এমন মার মেরেছে এখনো নাকি তোর নার্ভাস শক্ ভালো করে কাটেনি।

হেবো হাতিটা ফরফর করে বলে উঠল, তা হলে তো সোনার আজ বাড়ি যাওয়ার কথাই ওঠে না—একটা দিন আর কি, তার থেকে সোনার প্রাণটা আমাদের কাছে হাজার গুণ বড়।

পিন্‌ডিদা বলা এক গল্পের বুদ্ধি খাটিয়ে রাম বাদশার আর তার দলের হাত থেকে আমি সকলকে বাঁচিয়েছি, পিন্‌ডিদার হেপাজতের টাকাও আমার জন্যেই রক্ষা পেয়েছে—আমার বুদ্ধি আর সাহস দেখে চতুর পুলিশ অফিসার পর্যন্ত আমাকে দারুণ প্রশংসা করে গেছে। পিন্‌ডিদার বুদ্ধি বা মগজ ধার করে হলেও সে আমাকে সেই থেকে গলানো গলায় সোনা সোনা করছে—লিডারের আমার প্রতি হাবভাব দেখেই হেবো হোঁতকারও এই গদগদ কথা! শুনে আমার পিত্তি জ্বলে গেল।

একটু গুম হয়ে থেকে পিন্‌ডিদাকেই জিজ্ঞেস করলাম, কাল রাতে আমার জন্যে তোমাদের খাওয়াই হল না বোধহয়?

আর খাওয়া, পিন্‌ডিদা ফোঁস করে লম্বা একটা নিশ্বাস ফেলল, তুই রইলি হাসপাতালে আর আমরা বসে গিলব! কোনোরকমে নাকে মুখে গুঁজে সবাই আবার হাসপাতালে ছুটেছি—

ফ্রায়েড রাইস আর চিকেন রোস্ট কেমন নাকে মুখে গুঁজেছে আমি বেশ আঁচ করতে পারি। আমার রাগ বাড়ছেই। বুঝতে না দিয়ে ঠান্ডা গলায় আবার জিজ্ঞেস করলাম, আজ দুপুরেও কেউ খাবার ফুরসত পাওনি বোধহয়?

পিন্‌ডিদা ধামাচাপা দেবার চেষ্টা। জবাব দিল, ওই নামেই খাওয়া।

তবু জিজ্ঞেস করলাম, কী খেলে?

–তুই এখানে হাসপাতালে পড়ে, আমার কি কিছু খেয়াল আছে কী খেলাম আর না খেলাম। বাকি কজনের দিকে ঘাড় ফেরালো। –তোদের মনে আছে কী খেলাম?

পিন্‌ডিদার এই প্রশ্নের অর্থ সকলেই বুঝেছে, কেবল হেবো হোঁতকা ছাড়া। চটপটি কেবলু আর কার্তিক চুপ। হাবুল বলে উঠল, আমার মনে আছে পিন্‌ডিদা, ফিশ রোল, চিংড়ির মালাইকারি আর মালাই দই দিয়ে প্যাঁড়া।

পিন্‌ডিদা কটমট করে তাকালো তার দিকে। তারপর সাফাই গাইল, ভজুবাবুর কি লঘু-গুরু জ্ঞান আছে, আজও একরাশ বাজার করে ফিরল! আমরা তো ঠিক করেছিলাম তোর কল্যাণ কামনায় একটা বেলা আমরা উপোসই দেব–তাই না রে কেবলু?

সুযোগ পেয়ে কেবলু তখুনি সংস্কৃত ঝাড়ল, তীর্থস্য কাকঃ যথা–পেটে খিদে, সামনে এত খাবার কিন্তু তোর জন্যে দুশ্চিন্তায় খেতেই পারলাম না রে সোনা।

যন্ত্রণা চেপেই আমি কেবলুকে ধমকে উঠলাম কাকের সংস্কৃত বায়স! পিন্‌ডিদার দিকে ফিরলাম আবার–আজ তোমাদের রাতের মেনু কী?

আমতা আমতা করে পিন্‌ডিদা বলল, কী জানি···লিট্‌লম্যান বলছিল, রাতে শুধু মুরগির বিরিয়ানি করবে···কিন্তু সোনারে, আমার কি নাওয়া-খাওয়া জ্ঞান আছে কিছু!

এবার আমার গলা দিয়ে একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এলো। –তোমরা বাড়ি গিয়ে বিরিয়ানি সাঁটাবে, আর আমি এখানে পড়ে থেকে বার্লির মতো স্টু গিলব? দোহাই পিন্‌ডিদা, আমি খুব ভালো আছি এখন, আমাকে এখুনি তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করো–তা না হলে মনে মনে আমি আত্মহত্যাই করে ফেলব।

শুনে পিন্‌ডিদার বোধহয় বুকের তলায় মোচড় পড়ল একটু। হাজার হোক, আমার বুদ্ধি আর সাহসের ফলে সকলের প্রাণ আর টাকা বেঁচেছে এ-তো অস্বীকার করার উপায় নেই! চটপটিকে ডেকে নিয়ে সে আবার ডাক্তারের কাছে চলে গেল। একটু বাদেই বিজয় গর্বে ফিরল। বিজয় গর্বে বলল, পারমিশন মিল্ গয়া–আমি যখন বললাম সোনাকে আমরা সোনার মতোই আগলে রাখব, ডাক্তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তখন পারমিশন দিয়ে দিলে।

আমি মহা খুশি। চিকেন বিরিয়ানি ভাগ্যে জুটবে ভেবে গায়ের ব্যথাও কম লাগছে।

যাক, হাসপাতালের গাড়ি করেই আমাদের বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হল। আর লছমন মানে লিট্‌লম্যানের হাতের বিরিয়ানির দৌলতে অত ব্যথা সত্ত্বেও রাতটা আমার ভালোই কাটল।

পরদিন সকালেই ম্যানেজার ভজুবাবুর গোমড়া মুখ। আমি গত সন্ধ্যায় একরকম জোর করে চলে এসেছি হাসপাতাল থেকে এ খবর শুনে অখুশি। এসেই বলল, ভালো করোনি, ভালো করোনি–হারামজাদা রাম বাদশার দল যদি ফলো করত!

তাচ্ছিল্যের সুরে পিন্‌ডিদা বলল, হুঃ কালকের ওই ব্যাপারের পর সে এখন চাচা আপনা প্রাণ বাঁচা!

–হুঁঃ, তা হলে তো তোমরা খুব জানো তাকে। ভজুবাবু চামচিকের মতো সাঁই সাঁই করে উঠল। –তোমরা ভয় পাবে বলে বলা হয়নি, কি সাংঘাতিক ডাকাত ওই রাম বাদশা যদি জানতে! এই সেদিন এক বড়লোকের ছেলেকে কিডন্যাপ করে তার বাবার কাছে র‍্যানসম মানি মানে মুক্তিপণ চেয়ে চিঠি পাঠালে–ওমুক দিন ওমুক জায়গায় ওমুক সময় তিরিশ হাজার টাকা দেবে তো দাও–নয়তো তারপরেই ছেলের মরা মুখ দেখতে হবে। আর পুলিশে খবর দিলে ছেলের হাত পা খণ্ড খণ্ড করে কেটে তোমার কাছে পাঠানো হবে।···তা ছেলের বাপ প্রাণের দায়ে পুলিশকে একটা

খবর দেয়নি—ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় তিরিশ হাজার টাকা পৌঁছে দেবার দু ঘন্টা বাদে ছেলে ফিরে পেয়েছে।

শুনে আমরা সকলে স্তম্ভিত। ভজুবাবু আবার বলল, ওই রাম বাদশার মাথার জন্যে সরকার থেকে দু'হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে কি সাধে? আর হাজারীলাল তো তোমাদের জন্য খুব চিন্তিত দেখলাম, আমাকে বার বার করে বলে দিল, ওই ছেলেগুলোকে খুব সাবধানে রাখবেন মশাই—রাম বাদশার দল ওদের বিশেষ করে ওই সোনা ছেলেটাকে সহজে ছাড়বে বলে মনে হয় না—ওর জন্যেই দলসুদ্ধ ওদের এত নাকাল হতে হয়েছে।

শুনে সকলেই থমকে গেল। এমন কি আমিও। কেবলু বলে উঠল, দুর্জনং দূর পরিহর—দূর পরিহর! চলো আমরা পালাই এখান থেকে, য পলায়তি স জীবতি।

—তোর মগজে জ্বাল লাল বাতি! পিন্‌ডিদা কড়কে উঠল। —বুদ্ধির ঢেঁকি একেবারে—যে দল সেই বর্ধমান থেকে আমাদের সঙ্গে এসেছে, দু'দুবার জব্দ হবার আক্রোশে তারা এই দেওঘর থেকে সঙ্গ নিয়ে বর্ধমানে যেতে পারে না? ট্রেনে চাপতে গেলেই এখন বেশি বিপদের সম্ভাবনা এটা বুঝিস না? সামনে এসে দাঁড়ালে ওদের ছোরা রিভলভার কি দিয়ে রুখবি—চ্যাটাং চ্যাটাং সংস্কৃত বুলি দিয়ে? এখন বরং যাওয়া আরো পিছিয়ে দেওয়া দরকার। এখানে তবু ভজুবাবু আছে, হাজারীলাল আছে।

যুক্তিটা সকলেরই অকাট্য মনে হল। হেবো মোসায়েব তো বলেই ফেলল, এই বুদ্ধি না হলে লিডার!

কেবলু তক্ষুনি সায় দিয়ে তাল ঠুকল—বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য।

ওদিকে এখানে থেকে যাওয়ার ব্যাপারে পিন্‌ডিদার যুক্তির কথা শুনে ভজুবাবুর মুখ গোমড়া। তাড়াতাড়ি আমাদের ট্রেনে তুলে দিয়ে বর্ধমান চালান দিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে ভেবেছিল হয়তো। আমাদের দায়দায়িত্ব তো সব তারই। ওদিকে আমি ভাবছি, এখুনি এখান থেকে না নড়ার ব্যাপারে পিন্‌ডিদার যুক্তি অকাট্য বটে, কিন্তু সেটাই সব নয়। এখানে এসে এমন রাজার হালে থাকা, চার বেলা চর্ব্য চোষ্য পেয় সাপটানো—এমন মওকা আর কবে কোথায় পাবে? পিন্‌ডিদার বিবেচনায় মরতে হলেও খেয়ে মরা ভালো।

ভজুবাবু বলল, তাহলে যতটা পারো সাবধানে থাকো, বাড়ির মধ্যেই খেলাধুলো করো—বেরিও-টেরিও না!

ভদ্রলোকের দায়টা পিন্‌ডিদা কারো থেকে কম বোঝেনি। তখুনি আধা দাবড়ানি দিয়ে উঠল, বলেন কি মশাই! বর্ধমান থেকে বেড়াতে এসে এখানে ঘরবন্দি হয়ে থাকব! আর এসে তক তো এক বাজার ছাড়া আর কিছু দেখলামও না—শেষে পেটুক নাম নিয়ে ফিরে যাব! সোনা ভালো হয়ে উঠলে আমরা কাল-পরশুর মধ্যে ইচ্ছেমতো ঘুরব ফিরব বেড়াব—আপনি হাজারীলালকে আমাদের পিছনে প্লেন ড্রেসের আর্মড লোক রাখতে বলুন, হয়তো বা আমাদের জন্যেই রাম বাদশার দল ধরা পড়ে যেতে পারে।

ভজুবাবুর দুশ্চিন্তা বাড়ল বলেই ক্ষুব্ধ একটু। বলল, পুলিশ তো আর আমার প্রজা নয় বাবারা যে যা বলব শুনবে। তারা তাদের ইচ্ছেয় কাজ করবে... আমি বলে দেখতে পারি এই পর্যন্ত।... তোমরা যখন না বেরিয়ে ছাড়বেই না, এক কাজ করা যাক তা হলে। কলকাতায় একটা ফোন করে কর্তার কাছ থেকে গাড়িটা বার করার পারমিশন নিয়ে নিই, আর বলবীর ড্রাইভারকে একটা খবর দিই।

পিন্‌ডিদা নড়েচড়ে সোজা হল একটু।

—কর্তার গাড়ি কোথায়?

...এই বাড়ির গ্যারেজেই তো.....দরজায় তালা লাগানো থাকে। দেখবে কী করে?

—কী গাড়ি? যেন সব গাড়িই চেনে জানে।

—নতুন মডেলের অ্যামবাসাডার।

পিনুডিদা এবারে একটু ক্ষুণ্ণ যেন।

—কী আশ্চর্য গাড়িটা গ্যারেজে পড়ে আছে, আর আমরা আসার আগেই আপনি পারমিশনটা নিয়ে রাখেননি! বর্ধমানে আমাদের সোনা তো গাড়ি ছাড়া এক পা নড়ে না.....।

শুনে আমিই বোকার মতো হাঁ করে ফেলেছিলাম প্রায়। ওদিকে পিনুডিদার মন্তব্যের আগেই লিটলম্যান লছমন ব্রেকফাস্ট সাজাবে কি না জিজ্ঞেস করতে ঘরে ঢুকেছিল। এতদিনে তার সোনা কে জানা হয়ে গেছে। আর আমার জন্যে —'মানিজার'-বাবুর উতলা ভাবও লক্ষ্য করেছে, গাড়ি ছাড়া আমি এক পা নড়ি না শুনেই সে সম্ভ্রমভরে আমার দিকে তাকালো। তার ওপর আবার 'মানিজার'-সাব ওকে হুকুম করল, এই লছমন, বলবীরকে খবর দিবি, বাবুদের জন্যে গাড়ি বার করতে হবে!

লছমন মাথা নেড়ে ডবল সম্ভ্রমে আমার দিকে তাকালো। পিনুডিদাও মনে হল, সেটা লক্ষ্য করল। ওর ঘরে ঢোকার উদ্দেশ্য বুঝে পিনুডিদাই বলল, বাবা লিটলম্যান, আমাদের ব্রেকফাস্ট আজ এখানেই নিয়ে এসো। আমাদের সোনামণি অসুস্থ, উঠে আর ওর ডাইনিং হলে গিয়ে কাজ নেই।

লছমন 'জি হুজুর' বলে তক্ষুনি প্রস্থান করল। নেশা ভাঙ না করলে তার মতো যাকে বলে সেবার লোক আর হয় না।

পিনুডিদা বলল, তোর শরীর ভালো নয় বলে আজ ব্রেকফাস্টের সিম্পল মেনু। প্রথমে দুটো করে ডিমের পোচ, তারপর খাঁটি ঘিয়ের লুচি আর হালুয়া।

লিটলম্যান যা করে তা-ই অমৃত! সত্যি ওর কলকাতার গ্র্যান্ড হোটেলে চাকরি হওয়া উচিত ছিল। ওর হাতের হালুয়া আর অমৃততে কতটা তফাত আমি অন্তত জানি না। কিন্তু এই লছমনকেই (লুচি হালুয়া গিলতে গিলতে ) তড়পে উঠল ভজুবাবু। —এই হারামজাদা, তোর নেশার আড্ডায় গিয়ে কোনো অজানা-অচেনা লোকের সামনে এই বাবুদের সম্বন্ধে কিছু বাকতাল্লা করিস না তো?

লছমন সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করল, বাকাতাল্লা কে আছে হুজুর!

—তোর মাথা! এই বাবুদের সম্পর্কে কারো কাছে গপ্প-টপ্প করিস না তো?

মাথা চুলকে লছমন জবাব দিল, রোজই তো করি হুজুর—এই বাবুরা তো বহুত ইমানদার আছেন—সবাই জানতে চায় ইবার কেমন পার্টি আসলেন।

—সবাই জানতে চায় আর তুই গলগল করে বলিস?

—এই গলা দিয়েই তো বাত নিকলায় হুজুর—তবে গলা-গলা নহী, যা বলি একটো গলা দিয়ে বলি।

লছমনের কথা শুনে আমরা হাসি চাপতে চেষ্টা করছি। কিন্তু ভজুবাবু রেগে আগুন।—ব্যাটা বুদ্ধু কোথাকার, যা ভাগ এখান থেকে!

—মুখ-ব্যাজার করে লছমন চলে গেল। ভজুবাবু বলল, তোমরা হাসছ কি, ব্যাটার সব ভালো, কিন্তু চার পয়সার নেশা পেলে নিজেকে বিকিয়ে দেয়—তোমরা ওর সামনে কখনো সীরিয়াস কিছু আলোচনা কোরো না।.....উঠি, তোমাদের বাজারটা সেরে ফেলি—তোমরা কেউ যাবে, না সবাই সোনার কাছে থাকবে?

পিনুডিদা তক্ষুনি তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল। বলল, বয়স্ক মানুষ, আপনি একা যাবেন কি—চলুন আমিও যাই। তবে সোনার এই বেহাল অবস্থা, খাওয়া-দাওয়ায় রুচি কি আর আমাদের আছে!

আমি বললাম, কিছু ভেবো না পিনুডিদা, তুমি মাথা খাটিয়ে মেনু করলে আমি আজই হয়তো চাঙ্গা হয়ে উঠব।

ঠাট্টা বুঝে পিন্‌ডিদা অভ্যাস অনুযায়ী আমার ওপর রাগতে গিয়েও রাগল না। ভজুবাবু বলল, ও কী বলতে চায় বুঝলেন তো—খাসীর দো-পেঁয়াজি ছাড়া আজ ওর গায়ের ব্যথা মরবেই না। সেই সঙ্গে চেতল মাছের কালিয়া ওর ফেভারিট আইটেম তো বটেই।

ভজুবাবু উঠে দাঁড়াল, সে আর বেশি কথা কী, সব হবে—তবে চিন্তা-ভাবনায় খাওয়া-দাওয়া উবে গেছে।

দুপুরে খ্যাটের পর বিকেলে চারটে পর্যন্ত আমরা যে-যার বিছানায় শুয়েই আই-ঢাই করছিলাম। ওদিকে মালিকের ড্রাইভার বলবীর ঝকঝকে গাড়ি বার করে রেডি। আমার গায়ের ব্যথা সত্যি অনেক কমেছে, তাই আমিও সকলের সঙ্গে বেরুবার জন্যে মনে মনে তৈরি। আমাকে বাড়িতে একলা ফেলে ওদের তো বেরুনোই হবে না। বিকেলে চায়ের আশা নেই, কারণ লছমন তার বৈকালিক নেশা ছেড়ে বিকেল ছ-টার আগে বাড়িমুখো হবেই না। বিকেলের জলখাবার আর রাতের খানা তৈরি করে তবে সে আড্ডায় বেরোয়। আজ তার ওপর পিন্‌ডিদা ওকে কাজ থেকে সামান্য রেহাই দিয়েছে। বলেছে, অত বেলায় খেয়েছি বিকেলের জলখাবার আর দরকার নেই—তুমি নিশ্চিন্ত মনে নেশা করোগে যাও।

এত খাওয়ার হিড়িকে পিন্‌ডিদাও একটু গ্যাপ চাইছে।

যাক, বেরুতে তো আমাদের হবেই, নইলে রাতের মেনুর সর্বনাশ। রাতে সত্যিই প্রায় সিম্পল খাওয়া। পিন্‌ডিদার বিবেচনায় দু'বেলাই মাংস চলতে পারে না—দুপুরে খাসীর দো-পেঁয়াজি আকণ্ঠ জঠরে চালান দেওয়া হয়েছে—তার আগে চেতল মাছের বিশাল এক-একখানা পেটি। পেট তো বটে এক-একজনের, হোল্ড-অল তো নয়। তাই পিন্‌ডিদার রাতের ব্যবস্থা সুগন্ধী চাল আর ভাজামুগের খিচুড়ি ব্যাসন দিয়ে বেগুন ভাজা আর ডিমের বড়া—ব্যস। পিন্‌ডিদা বলেছে, এর বেশিটি রাতে আর কিছুটি পাচ্ছ না—তোদের তো সব কোমর থেকে গলা পর্যন্ত পেট।

যাক্ ওই খিচুড়ি এন্তার ঘি-সহ বেগুন ভাজা আর ডিমের চিন্তায়ও মনে মনে সকলের বেরুনোর তাগিদ। কিন্তু আলস্যের দরুন উঠতেও পারছে না কেউ। বেরুলেও আমাকে অবশ্য এক জায়গায় বসেই থাকতে হবে। ছোটাছুটির তাগত এখনো হয়নি।

এমন সময়ে হন্তদন্ত হয়ে ভজুবাবু হাজির। বেশ চিন্তাচ্ছন্ন। কোনো ভনিতা না করে পিন্‌ডিদাকে বলল, তোমাকে পুলিশ অফিসার হাজারীলাল একবার ডেকেছে, বিশেষ দরকার নাকি, এক্ষুনি একবার যেতে হবে।

পিন্‌ডিদা হকচকিয়ে গেল।—আমাকে! আমাকে নিয়ে আবার টানাহেঁচড়া কেন? কেন যেতে হবে কিছু বলেছে?

—কি জানি কিছু বুঝলাম না। ওই যে তুমি সকালে বলেছিলে তোমাদের পিছনে প্লেন-ড্রেস আরমড লোক রাখতে—হয়তো বা তোমাদের জন্যেই রাম বাদশার দল ধরা পড়ে যেতে পারে—সেই কথা বলতে ভদ্রলোক হঠাৎ যেন কোন চিন্তার রাজ্যে তলিয়ে গেল। বলল ছেলেটাকে মানে ওদের ওই লিডারকে এক্ষুনি একবার নিয়ে আসুন তো। বলবেন খুব দরকার। আপনি বরং সঙ্গে করে একেবারে নিয়েই আসুন।

ফলে এই দিন আর কারো বেরুনোই হল না। বলবীরকে সারথি করে সেই ঝকঝকে গাড়িতে চেপে পিন্‌ডিদা একাই চলে গেল পুলিশ অফিসার হাজারীলালের সঙ্গে দেখা করতে। যাবার আগে বলে গেল, বাড়ি ছেড়ে কেউ এক পা নড়বি না—আমি যতক্ষণ না ফিরি তোরা সব সোনার কাছে থাকবি!

পিন্‌ডিদা ফিরল প্রায় ঘন্টা দেড়েক বাদে। সকলে আমরা উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু পিন্‌ডিদার মুখে কথা নেই। মুখ কালো করে জানালা দিয়ে বাইরের রংচটা আকাশের দিকে চেয়ে বসে রইল।

শেষ পর্যন্ত আমিই ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কিছু খারাপ খবর নাকি পিনুডিদা?

ফোঁস করে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে পিনুডিদা জবাব দিল, ভালো আর কী করে বলি। এই সব পুলিশ অফিসারগুলো সব উপদেশামৃত বিশারদ। আয়েস করে নিজে যাচ্ছে এক মাসের ছুটিতে, যাচ্ছি, যা—কিন্তু আমাদের এ-ভাবে ভয় পাওয়ার মতো খবর দেবার দরকার কী ছিল?

কেবলুর ভয় যেমন বেশি, তড়বড়ানিও তেমনি বেশি। গলা শুকিয়ে জিজ্ঞেস করল, ভয় পাওয়ার মতো খবরটা কী পিনুডিদা? অকস্মাৎ বজ্রপাত-এর সম্ভাবনা নাকি?

পিনুডিদা হঠাৎ খেপেই গেল, দ্যাখ্ কেবলু, কথার মধ্যে অমন ফ্যাচং ফ্যাচং করবি তো তোকে আমি একেবারে নিপাতযাতং করে ছাড়ব!

পুলিশ অফিসারের সঙ্গে দেখা করে আসার পর পিনুডিদার এই মেজাজ দেখে আমরা একটু ঘাবড়েই গেলাম। খবর ভালো নয় তাতে আর সন্দেহ কী।

অনেকক্ষণ গুম হয়ে থাকার পর পিনুডিদা নিজেই একসময় মুখ খুলল। বলল, হাজারীলালের খবর নন্দন পাহাড়ে ওভাবে নাকাল হয়ে রাম বাদশা উড়ো চিঠি পাঠিয়েছে। লিখেছে, ওই সব ছেলেদের হাঁড়ির খবর আমরা পেয়ে গেছি। ওরাই বর্ধমানের জমিদার বাড়ির গোপালের চোখ উদ্ধার করেছে, আর সেই সঙ্গে আমাদের নাম ফাঁস হয়ে গেছে। আগে এই খবর জানলে আমরা ওদের খাসীর মতো ছাল ছাড়িয়ে ঝুলিয়ে রাখতাম। যাক, এখন বিশেষ করে যে ছেলেটার জন্য নন্দন পাহাড়ে আমরা জব্দ হলাম—তাকে আমরা দেখে নেব—তোমরা পারো তো রুখো। ওই ছেলে আমাদের সব লোকসান পুষিয়ে দেবে এমন ব্যবস্থা আমরা করব। বলে বিষণ্ণ চোখে পিনুডিদা আমার দিকে তাকালো।—কার কথা লিখেছে বুঝলি তো?

শুনে ভয় একটু পেলাম বটে, আমাকে দিয়ে ওদের লোকসান পুষিয়ে নেবে কী করে তাও ভেবে পেলাম না। কিন্তু আমাদের দলের কাছে আমার কদরও যেন একটু বেড়ে গেল। গায়ে মাথায় এখনো কিছু যন্ত্রণা আছে, তবু সদর্পে বললাম এমনও হতে পারে আমার পিছনে লাগতে গিয়ে ওদেরই কাল ঘনাবে। আমরা একসঙ্গে ছ'জন আছি, এত ঘাবড়াবার কী আছে—কাল ভজুবাবুর সঙ্গে বাজারে গিয়ে মাছ মাংস যা কিনবে কিনবে—সেই সঙ্গে পাঁচটা ধারালো ছোরা আর একটা টয় রিভলভার কিনে নিয়ে এসো—আমার মনে হচ্ছে ওদের মৃত্যুবাণ আমাদেরই হাতে।

পিনুডিদা উঠে এসে আমাকে বুকে জাপটে ধরল। তারপর সে-কী জড়াজড়ি। আমার মনে হল, আনন্দে পিনুডিদা কেঁদেও ফেলতে পারে। বলে উঠল, তোর মধ্যে কী আছে রে সোনা—এমন সাদা আগুন তো আমি বিদেশেও দেখিনি। তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক রে সোনা!

তারপর আমাকে ছেড়ে অন্য সকলের দিকে তাকালো। প্রায় গর্জন করে উঠল, দ্যাখ্ দ্যাখ্, সোনার ভিতরে কী আছে দেখে নে তোরা—খুব ভালো করে দেখে নে!

বাকি চার জোড়া চোখ আমার মুখের ওপর। আর হাবুল হোঁতকা আমাকে দেখছে না কোনো ছদ্মবেশী দেব-কিশোরকে দেখছে। আমার তাইতেই অস্বস্তি।

উত্তেজনা একটু কমতে পিনুডিদা আবার বলল, কিন্তু ওই হাজারীলাল হারামজাদা ওপর আমার দস্তুরমতো রাগ হয়েছে। রাম বাদশার মতো সাংঘাতিক দল এই দেওঘরেও ঘাপটি মেরে বসে আছে, এই রকম উড়ো চিঠি দিয়েছে—এ সময় তোর এক মাসের ছুটি নিয়ে বসার কী দরকার শুনি? আসলে সব লোক দেখানো দরদ—বুঝলি?...আর এসব শুনে আমি যখন প্লেন ড্রেসের দুজন আর্মড বডিগার্ড চাইলাম, তক্ষুনি স্রেফ নাকচ—বলল, সেটা সম্ভব নয়—যত্তো সব।

পরদিন সকালে এসে ভজুবাবু আমাদের আরো একটু উতলা করে তুলল। মুখ দেখেই বোঝা গেল দুশ্চিন্তায় রাতে ভালো ঘুম হয়নি। পিনুডিদা চলে আসার পর সে-ও হাজারীলালের বাড়ি গেছল তার সঙ্গে দেখা করতে। পিনুডিদাকে কেন ডাকা হল সেই দুশ্চিন্তা তারও ছিল।

নিজের মাথার চুল টানতে টানতে বলল, যত ঝামেলা কি এখন আমাকেই পোহাতে হবে? শুনেছ তোমরা, হাজারীলাল লম্বা এক মাসের ছুটিতে যাচ্ছে!

নিস্পৃহ মুখে পিন্‌ডিদা বলল, আপনি এত ঘাবড়াচ্ছেন কেন, গেলই বা ছুটিতে—সোনা কি আমাদের দুধের ছেলে? তার সাহসের খবর আপনি রাখেন?

পিন্‌ডিদার কথা শুনে আমার বুকের ছাতি ফুলে উঠল! বললাম, ভজুবাবু আপনি ভয় পাবেন না—দু-দুবার আমরা রাম-বাদশার চোখে ধুলো দিয়েছি—এবারে হয়তো তার কুপোকাত হবার পালা!

পিন্‌ডিদা চেঁচিয়ে বলে উঠল, শাবাশ! শাবাশ! সোনা আমাদের চিজ্‌খানা কী এবারে টের পেলেন?

ভজুবাবু তবু বিরসবদন, বললেন, তোমাদের সাহস আছে মানছি, কিন্তু আমার যে ওদিকে রাতের ঘুম গেল। কী দরকার ছিল হাজারীলালের এই সময়েই আবার লম্বা ছুটিতে যাওয়া—তার নামেই চোর ডাকাত টিট—সে ছুটিতে চলল শুনলে তো চোর ডাকাতের পোয়াবারো—পুলিশের মধ্যেও ওই রাম বাদশা হারামজাদার চর আছে যখন, তারও কি আর এমন সুখবরটা জানতে বাকি আছে! ওদের দলের লোক এখন ধেই ধেই করে নাচছে বোধ হয়। ডাকাতটার ওই উড়ো চিঠি পেয়েও হাজারীলালের ছুটি ক্যানসেল করা উচিত ছিল। যাক, বাবারা আমার মুখ চেয়েও তোমরা যতটা পারো সাবধানে থাকো—আমাকে আর ফ্যাসাদে ফেলো না।

দুশ্চিন্তায় সেই সকালে ভজুবাবুর মুখে ব্রেকফাস্টও ভালো রুচল না।

কিন্তু সেই দিন দুপুর থেকেই পিন্‌ডিদার একটু অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম আমি! শুধু আমি কেন, পরে চটপটি কার্তিক ওরাও লক্ষ্য করেছে। কারো সঙ্গে কথা নেই, চুপচাপ নিজের মনে বসে থাকছে, আর গভীর কিছু ভাবছে। তারই মধ্যে মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাচ্ছে। প্রথমে ভেবেছিলাম, আমার জন্যে দুশ্চিন্তায় এমন করছে। কিন্তু পরে কেমন খটকা লাগল। এক আমি ছাড়া এ ব্যাপারটা আর কেউ লক্ষ্য করেনি। বিমনার মতো আমার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে পিন্‌ডিদার চোখ জোড়া এ-রকম হয়ে উঠছে কেন? পাতে ফাউল রোস্ট চিকেন বিরিয়ানি কোর্মা কাটলেট পড়তে থাকলে যেমন হয়, অনেকটা সেই রকম। নিজের অগোচরে তার দু'চোখ জ্বলজ্বল করতে থাকে। কী রে বাবা! আমার মাথাটা কি পোকা পোনার মাথা, না মোগলাই কাটলেট, না ভরা-প্লেট চিকেন কাবাব না মালাইকারির আস্ত একখান গলদা চিংড়ি? ওরকম চাউনি দেখে আমি অবাক হচ্ছি পিন্‌ডিদার যেন তাও খেয়াল থাকছে না।

আর থাকতে না পেরে বলেই ফেললাম, আমার দিকে চেয়ে এ-ভাবে দেখছ কী পিন্‌ডিদা?

চট করে নিজেকে সামলে নিল। জবাব দিল, দেখছি না ভাবছি।

এ-ভাবে বলতে কী-ভাবে সেটা আর কারো মনে হয়নি। তারা কেবল লক্ষ্য করেছে, পিন্‌ডিদার দু-চোখ মাঝে-মাঝে আমার মুখের ওপর আটকে থাকছে। পিন্‌ডিদার জবাবের পর হাবুল তাকে একটু গ্যাস দেবার জন্যে বলল, পিন্‌ডিদা তোকে কত যে ভালোবাসে এখনো বুঝলি না—আর কবে বুঝবি?

মনে মনে আমি হাবুলের মুন্ডুপাত করলাম। পিন্‌ডিদার চাউনিটা আমার কাছে চপ কাটলেট কোর্মা কালিয়া বা প্যাঁড়া রাজভোগ ক্ষীরের পুলি দেখার মতো লাগছে—এ তো আর বলতে পারি না!

পরদিন পিন্‌ডিদার কথাবার্তায় আবার বেশ ফুর্তি। দুপুরের ভারী লাঞ্চে বসেছি। লিটলম্যান লছমন কার পাতে কী দিচ্ছে বা কতটা দিচ্ছে সে দিকে পর্যন্ত লক্ষ্য নেই (যা সচরাচর হয়ই না)।

হঠাৎ পিন্‌ডিদা বলে উঠল, সোনা রে, এই দেওঘর ছেড়ে আর নড়তে ইচ্ছে করছে না—তোর বাবাকে চিঠি লেখ, এই বাড়িটা কিনে ফেলুক।

শুনে আমি কেন, কেবলু কার্তিক চটপটি আর হাবুলও হাঁ। আমি কি জবাব দেব ভেবে পেলাম না। হাসিমুখে পিন্‌ডিদা লছমনের ওপর চড়াও হল, কী হে লিট্‌লম্যান সোনাবাবুর বাবা এ বাড়িটা কিনে নিলে আর আমরা এখানে থেকে গেলে তুমিও আমাদের এমনি রেঁধে খাওয়াবে তো?

জবাব দেবে কি, লছমনের দু চোখ কপালে। জিজ্ঞেস করল, সোনাবাবুর বাবুজী ইতো বড়ো বাগানবাড়ি কিনে নিতে পারে?

তাচ্ছিল্যের সুরে পিন্‌ডিদা জবাব দিল, হাতের আঙুল নেড়ে—এ-রকম তিনখানা বাড়ি কিনে নিতে পারেন।

মুগ্ধ চোখে লছমন আমার দিকে ফিরল, আপনার বাবুজীকে বোলে এ মোকান কিনে লেন সোনাবাবু, আপনারা বহুত ইমানদার আদমী আছেন—আমি আপনাদের দিল খুশ করে খিলাবো।

লছমনের সঙ্গে পিন্‌ডিদার এ কী রকম রসিকতা বুঝলাম না। খেয়ে তো আর আশ মেটে না, যে কটা দিন আর আছে এখানে রান্নাটা যাতে এই রকমই মন দিয়ে করে এই জন্যেই এমন টোপ ফেলা ভাবলাম। অগত্যা আমিও বললাম, বাবাকে লিখে দেখি!

এর পরেও দিন দুই পিন্‌ডিদাকে ওই লছমনের সঙ্গে একটু বেশি ফুসফুস গুজগুজ করতে দেখলাম। ও রান্না চড়ালে সামনে পিঁড়ি পেতে বসে আর গপ্‌প ফেঁদে বসে। আজই পিছন থেকে চুপি চুপি শুনলাম, পিন্‌ডিদা গপ্‌প করছে, আমার বাবার দৌলতে তারা সকলে মিলে কী রকম রাজার হালে থাকে।

লছমন এমন মোহিত হয়ে গেছে যে আমি উপস্থিত তাও প্রথমে লক্ষ্য করেনি। আমাকে দেখেই প্রচন্ড খাতির। শশব্যস্তে আর একটা পিঁড়ি পেতে দিল, বসেন সোনাবাবু বসেন।

ওর চোখে আমিই এখন নবাব সিরাজউদ্দৌলা। পিন্‌ডিদা বলল, খুব ভালো করে রেঁধে সোনাবাবুকে খুশি করো লছমন, তোমার বিকেলের নেশার পয়সাটা তাহলে আমরাই দিয়ে দেব। আমার দিকে ফিরে পিন্‌ডিদা চোখ টিপল, কী বলিস রে সোনা?

লছমন এমনিতেই দারুণ রাঁধছে, তবু আরো ভালোর আশায় পিন্‌ডিদা ও রকম টোপ ফেলছে ভাবলাম। গম্ভীর মুখে জবাব দিলাম, সে রকম ভালো হলে নেশার পয়সা দেওয়া যেতে পারে।

খুশিতে লছমনের কালো মুখ যেন গলে গলে পড়তে লাগল।

আগের দিন আমরা গেছলাম চিত্রকূট পাহাড়ে বেড়াতে। গাড়িতে আমরা ছজন আর ড্রাইভার বলবীর। বলবীরের চেহারাখানা বীরের মতো তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ভজুবাবু শুধু ওর ওপর বা আমাদের ওপর ভরসা করে নিশ্চিত থাকতে পারেনি। আগে থাকতে দুটো পালোয়ান ভাড়া করে চিত্রকূটে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তাদের কোমরে ছোরা-টোরা গোঁজা ছিল নিশ্চয়। আমাদের পিছনে পিছনে তারা ঘুরঘুর করছে দেখে ওদেরই রাম বাদশার লোক ভেবে আমাদের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। গাড়ি লক্ করে বলবীরও আমাদের সঙ্গ ছাড়েনি। তার ওপর ভজুবাবুর এই রকমই নির্দেশ। বলবীরই চুপি চুপি জানিয়ে দিয়েছে, এরা দুজন ভজুবাবুর লোক, আমদের ওপরে চোখ রাখার জন্যে ওদের পাঠানো হয়েছে।

পরদিন আবার সেইভাবেই আমরা বেড়াতে এলাম তপোবন পাহাড়ে। বেশ নির্জন জায়গায় এই পাহাড়টা। ছোট পাহাড় অবশ্য। কিন্তু এ পাহাড়ের মধ্যে অনেক ব্যাপার আছে। পাহাড়ের ভিতরে গুহা আছে কয়েকটা—সেই সব গুহায় ঢুকতে বা ঢুকলে বেরুতে বেশ কসরতের ব্যাপার। পাথর কেটে কেটে ওই রকম গুহা বানানো হয়েছে। বলবীরের দেখা গেল এই পাহাড়টার ওপর ভারি ভক্তি। সে বলল, গুহার এইখানে বসে মহাসাধক বালানন্দ ব্রহ্মচারীজি সিদ্ধিলাভ করেছিল! আরো কত সাধু-সন্ত এসব গুহায় এসে বছরের পর বছর তপস্যা করে গেছে ঠিক নেই। তপোবন

পাহাড়টাই হল সিদ্ধির পাহাড়! এখানে এসে আসন পেতে সাধন-ভজন করলে সকলের সব বাসনা সফল হয়।

আমরা আগ্রহ ভরে গুহা দেখছিলাম আর শুনছিলাম। পিন্‌ডিদার বুঝি হঠাৎ কিছু হয়ে গেল। সে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে দুলছে, হঠাৎ যেন তাকে কিছু ঘোরে পেয়েছে। না ধরে ফেললে পড়েই যেত! ধরে ফেলতে দোলা আরো বেড়ে গেল।

এরপর এমন অবস্থা, ওই পালোয়ান দুটো না থাকলে গুহা থেকে তাকে বার করে এনে গাড়িতেই তোলা যেত না। তারা প্রায় পাঁজাকোলা করে তাকে মাঝ-পাহাড়ের গুহা থেকে নামিয়ে গাড়িতে এনে তুলল।

বাড়ি ফিরেও পিন্‌ডিদা সারাক্ষণ প্রায় গুম। নয়তো আপন মনেই বিড়বিড় করছে কিছু। পরদিন কেবল বাজারে বেরুনোর আগে খানিকক্ষণের জন্য সুস্থ দেখা গেল। চুপি চুপি আমরা ভজুবাবুকে পিন্‌ডিদার ভাবান্তরের কথা বলেছিলাম। শুনে ভজুবাবু থ খানিকক্ষণ। পরে মন্তব্য করল, বিদেহী সাধু-সন্তদের ওর ওপর কৃপা বোধ হয়। কারণ, তপোবন পাহাড়ে গিয়ে কারো ক্ষতি কিছু হতে পারে না।

আর দেখা গেল, পিন্‌ডিদার কথাবার্তা যা একটু কেবল লিট্‌লম্যান লছমনের সঙ্গেই কইছে। আড়ি পেতে শুনেছি, তপোবন পাহাড় সম্পর্কে পিন্‌ডিদার ওর কাছ থেকে জ্ঞানার্জনের বাসনা। ভালো শ্রোতা পেয়ে লছমনেরও জিভ রেলগাড়ির মতো গড়গড় করে চলেছে। এখন আমাকে ছেড়ে পিন্‌ডিদার প্রতিই লছমনের ভক্তিশ্রদ্ধা বেশি। উদার পিন্‌ডিবাবু ছোট এক বোতল মদের দাম দেবে এ কি ওর পক্ষে বিশ্বাস করার কথা! রাতে আমাদের খেতে দেবার সময় লছমনকে পিন্‌ডিদার দু পা জড়িয়ে ধরে আনন্দে কাঁদতে দেখে ওই এক বোতল শরাব দেবার কথা বলতে শুনে আমরা ব্যাপারখানা বুঝলাম।

কিন্তু পিন্‌ডিদার ভাবগতিক আমাদের মোটেই ভালো লাগছে না। কতবার যে আশ্চর্য তন্ময়তায় তাকে বিভোর হতে দেখলাম তার ঠিক নেই। খানিকক্ষণ পরে পরে বেহুঁশের মতো হয়ে যাচ্ছে। ধাক্কাধাক্কি দিতে তন্ময়তা ভাঙে! বলে, তপোবন পাহাড়ে গেছলাম।

পরদিন বিকেলে পিন্‌ডিদা হুংকার দিয়ে উঠল, তপোবন ডাকছে, আমি যাই সেখানে।

অগত্যা ওই প্লেন ড্রেসের পালোয়ান দুজনকে আগে পাঠিয়ে দিয়ে বলবীরের গাড়িতে আমরা আবার চললাম তপোবন পাহাড়ে। এ দিনেও প্রায় সেই অবস্থা। প্রায় বললাম, কারণ এই দিনে ঘোর লাগতে পিন্‌ডিদার দুলে দুলে পড়ার অবস্থা হল না। ঘোরের মাথায় বালানন্দ ব্রহ্মচারীর গুহা ছেড়ে সে আর একটা গুহায় ঢুকে আসন নিয়ে ধ্যানস্থ হয়ে গেল। সেই ধ্যানের মধ্যে কখনো অল্প-অল্প হাসছে, কখনো বা গম্ভীর।

সন্ধ্যার আগে তাকে কোনোরকমে বাড়ি ফিরিয়ে আনা হল। পিন্‌ডিদার জন্যে এখন আমরা সত্যি চিন্তিত। সত্যি কি তার ওপর কোনো ঠাকুর-দেবতা বা কোনো বিদেহী সাধু-সন্ত ভর করল! এটা অবশ্য ভাগ্যের কথা কিন্তু এমন ভাগ্য আমাদের একটুও ভালো লাগছিল না। হাসে কেবলু কার্তিক চটপটি আর আমি রাতে পরামর্শ করলাম, সত্যি এবার বর্ধমানের টিকিট কেটে ঘরের ছেলেরা সব ঘরে ফিরে যাব কি না? আমরা যখন এই পরামর্শ করছি, পিন্‌ডিদা তখন একলা বারান্দায় বসে ধ্যানস্থ।

আরো আশ্চর্য, পরদিন সকালে পিন্‌ডিদা ভজুবাবুর সঙ্গে বাজারে গেল না। বলল, ভালো লাগে না, তোরা যা—কেবল সোনা থাক আমার কাছে। আর হাবুল তুই বারান্দায় বসে বাজে লোক না ঢোকে দ্যাখ।

কেবলু কার্তিক আর চটপটি বাজারে চলে গেল। হাবুল বাইরের বারান্দায়। পিন্‌ডিদা আমাকে ঘরে ডেকে নিয়ে ভাবতন্ময় চোখে চেয়ে রইল আমার দিকে যে আমি ঘাবড়েই যেতে লাগলাম। অনেকক্ষণ বাদে গভীর কান্না-ভেজা গলায় বলল, সোনা আমার তোকে চাই।

হকচকিয়ে গিয়ে বললাম, আমি তো সর্বক্ষণ তোমার কাছেই আছি পিন্‌ডিদা।

–সে রকম নয়, তপোবনের আসনে আমি তোকে আমার পাশে চাই।

আমি অবাক। তপোবনের আসনে–সে আবার কী ব্যাপার!

পিন্‌ডিদা নিস্পন্দের মতো চোখ বুজে বসে রইল খানিক। তারপর তার সমস্ত গায়ে রোমাঞ্চ হতে লাগল। আনন্দে কাঁপছে, আনন্দে হাসছে। কিন্তু কিছুই যেন হুঁশ নেই। তারপর পিন্‌ডিদা সোজা তাকালো আমার দিকে। বলল, সোনা কাল বাদে পরশু দুপুরে তুই আর আমি যাচ্ছি তপোবন পাহাড়ে, বলবীরের গাড়িতে নয়, সাইকেল রিকশায়–সেখানে গিয়ে রিকশাও ছেড়ে দিতে হবে আমরা···যাচ্ছি কাকপক্ষীও যেন না জানে।

আমি হতভম্ব। –কেন পিন্‌ডিদা, কেন? যদি কোনো বিপদ হয়···ইয়ে মানে রাম বাদশার দল যদি ফল্যো-টলো করে?

–করবে না। ওদের আর নিস্তার নেই। আমি মহাসাধক স্বয়ং পাকড়াওনন্দজীর আদেশ পেয়ে গেছি--

–পাকড়াওনন্দজী! সে আবার কেমন সাধক! আমার বিস্ময় ধরে না।

পিন্‌ডিদার ভাব-তন্ময় চোখে মধুর হাসি। –আমিও কি জানতাম! ওখানে যেতে ওই বালানন্দজীর পাশের গুহার দিকে কে যেন আমাকে ঠেলে নিয়ে গেল। আমি সেখানে গিয়ে কেমন হয়ে গেলাম–নিজের চোখেই তো দেখেছিস। কেউ যেন কানের কাছে ফিসফিস করে গর্জন করছে, কাপুরুষ কোথাকারের, দুর্জনকে এভাবে তোরা নাগালের মধ্যে পেয়েও ছেড়ে দিচ্ছিস! তোদের নরকেও ঠাঁই হবে?

আমি হাঁ করে পিন্‌ডিদার মুখের দিকে চেয়ে আছি। আর পিন্‌ডিদার ঝকঝকে দুটো চোখ আমাকে যেন চুম্বকের মতো টানছে! পিন্‌ডিদা আবার বলল, কী হল, কেন এমন হল, আমি কিছুই বুঝলাম না। পরদিন ঘুমের মধ্যে বজ্র-কণ্ঠে শুনলাম, আমি স্বামী পাকড়াওনন্দজী, কাল তপোবনের গুহায় গিয়ে আমার আসনে বোস। তোরা অবাক হয়েছিলি, সেই গুহায় গিয়েই আমি আসনটি চিনলাম। গিয়ে বসলাম, সঙ্গে সঙ্গে সে কী অবস্থা রে আমার সোনা!

আমি কী বলব ভেবে পাচ্ছিলাম না। কোনো সাধুর নাম স্বামী পাকড়াওনন্দজী হয় কেমন করে তাও মাথায় আসছিল না। ভাব গদগদ স্বরে পিন্‌ডিদা আবার বলল, তারপর কালই রাতে–বুঝলি সোনা--কালই রাতে!

কালই রাতে কী পিন্‌ডিদা? আমি যেন অভিভূত।

কাল রাতে সেই জ্যোতির্ময় পুরুষকে ঘুমের মধ্যে দেখলাম আমার সামনে দাঁড়িয়ে। সমস্ত মুখে রুপোর মতো সাদা গোছা গোছা দাড়ি। বুক পর্যন্ত। গা দিয়ে জ্যোতি ঠিকরোচ্ছে। গর্জন করে উঠলেন, আমাকে চিনতে পারছিস?

ঘুমের মধ্যে আমি জোড় হাত করে বললাম, না বাবা, কে আপনি?

–আমি স্বামী পাকড়াওনন্দজী! দেশের সমস্ত দুর্জনদের যম। নিজের উন্নতির জন্যে আমি কখনো তপস্যা করিনি, তপস্যা করেছি, দেশের সমস্ত দুর্জনদের পাকড়াও করে যোগ্য শাস্তি দেবার, তাই আমি স্বামী পাকড়াওনন্দজী! স্বয়ং মহাদেব তপস্যায় তুষ্ট হয়ে আমাকে এই টাইটেল দিয়েছেন। তোদের লজ্জা করে না, রাম বাদশার মতো একজন শয়তান কত কচি ছেলের জীবন নষ্ট করছে, তাদের ধরে মুক্তি-মাশুল আদায় করছে, না পেলে তাদের মেরে ফেলছে–আর তোরা কিছুই করছিস না, কেবল চপ কাটলেট পোলাও কালিয়া সাঁটাচ্ছিস? এখন তাদের চোখ তোদের প্রাণের সোনার দিকে–সে খবর রাখিস?

ঘুমের মধ্যে কেঁদে ফেলে আমি বললাম, সোনাকে বাঁচাবার উপায় বলুন স্বামী

পাকড়াওনন্দজী! সোনা ওদের খপ্পরে পড়লে আমি আত্মহত্যা করব! সোনাকে রক্ষা করার জন্য আমি জীবন দিতে রাজি।

শুনে স্বামী পাকড়াওনন্দজী প্রীত হলেন। হেসে বললেন, আমার ক্রোধে পড়ে রাম বাদশার দল তো ধরা দিয়েই বসে আছে—তোরা একটু চেষ্টা করলেই হয়, তোরা বলতে তুই আর সোনা।

—আমি স্বপ্নে কেঁদে কেঁদে বললাম, কী করতে হবে মহারাজ হুকুম করুন—জীবন গেলেও সোনাকে বাঁচানোর জন্যে আমি তাই করব।

মুখ মচকে স্বামী পাকড়াওনন্দজী বললেন, যাক, জীবন আর দিতে হবে না। তুই আমার গুহায় আর সোনা বালানন্দজীর গুহায় আসন নিয়ে শুধু জপ করবি, রাম বাদশা সদলে ধরা পড়ুক—ধরা পড়ুক। তিন দিনের মধ্যে দেখবি দলবল নিয়ে রাম বাদশার দল ধরা পড়ে পুলিশের হাতকড়া পরার জন্য সুড়সুড় করে নিজেরাই হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। কাল নয়, পরশু মঙ্গলবারের বারবেলায় প্রথম আসন নিয়ে বসবি।

বলার পরেই পিন্‌ডিদার সর্বাঙ্গে থরথর রোমাঞ্চ। আমারও আর যেন হুঁশ নেই।

পরদিনও পিন্‌ডিদার খাওয়া-দাওয়ার রুচি নেই। এত বড় বাড়ির নিরিবিলিতে কোথাও চুপচাপ বসে ধ্যানস্থ। অন্য কোনো কোণ দেখে আমিও। পিন্‌ডিদা বলে রেখেছে, কাউকে কিছু বলবি না—মঙ্গলবারের জন্যে ভিতরে ভিতরে শুধু নিজেকে তৈরি কর, ভেতরটা শুচিশুদ্ধ করে।

কিন্তু ওই পরদিন আমি লক্ষ্য করেছি, বাড়ির মধ্যে লছমনের সঙ্গেই পিন্‌ডিদা বেশ সহজভাবে কথাবার্তা কইছে। কী কথা জানি না, আমাদের দেখলেই থেমে যায়। হেসে হেসে লছমনকে বলে, বিশ্বাসে মিলায় হরি—এ কি শুনেছ? বিশ্বাস যাদের নেই তাদের সঙ্গে তর্ক করতে যেও না—ফল দেখলেই তখন সব্বাই হাড়ে হাড়ে টের পাবে—তবে আমাদের সোনাবাবুর কথা আলাদা, তার তুলনা নেই—কী বলো?

লছমন ঘনঘন মাথা নাড়ল। বলল, সোনাবাবুর ওপর হনুমানজিকো বহুত কিরপা—

সেই মঙ্গলবার। সকাল থেকেই আমার ভিতরে ভিতরে একটা উত্তেজনা চলছে। সেটা টের পেয়েই যেন পিন্‌ডিদা সকলের অজান্তে আমাকে সাহস দিয়েছে, কিছু ভাবিস না—কালও রাতে স্বামী পাকড়াওনন্দজী আমার কাছে এসেছিলেন। বলেছেন, কিচ্ছু ঘাবড়াস না—আমি তোদের সঙ্গেই আছি।

এ-কথা শুনে আমার রোমাঞ্চ আরো বেড়েছে।

বেলা ঠিক দুটোর একটু আগে পিন্‌ডিদা সকলকে ডেকে নিয়ে বলল, সোনার শরীরটা একটু চেক করানোর জন্য ওকে নিয়ে আমি হাসপাতালে যাচ্ছি—তোরা এক পা কোথাও নড়বি না।

বলবীরের গাড়িতেই আমি আর পিন্‌ডিদা বেরুলাম। খানিকটা এসে পিন্‌ডিদা গাড়ি থেকে নেমে বলবীরকে শুনিয়ে বলল, বড় গুরুভোজন হয়ে গেছে, এ পথটুকু হেঁটেই যাব। তুমি গাড়ি গ্যারাজ করে দাও, ফেরার সময় আমরা ট্যাক্সি ধরে নেবখন।

বলবীরের গাড়ি চোখের আড়াল হতেই পিন্‌ডিদা আমাকে একটা রিকশায় তুলে নিয়ে সোজা তপোবন পাহাড়ের পথে। তারপর থেকে দুজনেই আমরা উত্তেজনায় স্তব্ধ। তপোবন পৌঁছে ভিতরের চাপা উত্তেজনা আরো বেড়ে গেল। আমি চারদিকে চেয়ে দেখলাম, কেউ কোথাও নেই।

পাহাড়ের বেশ খানিকটা উঠলে তবে সেই গুহা। আমরা নিঃশব্দে উঠে গেলাম। আমার বুকের ভেতরে যেন ঠকঠকে শব্দ হচ্ছে। স্বামী পাকড়াওনন্দজী বলেছেন, দুজনে দুই গুহায় বসে স্বামীজীর নাম করে এক মনে জপ করতে হবে 'রাম বাদশা সদলে ধরা পড়ুক—ধরা পড়ুক'। কিন্তু আমরা জপ করলেই সে ধরা কখন কীভাবে কোথায় পড়বে মাথায় আসছে না।

যাক, পিন্‌ডিদা আমাকে বালানন্দজীর গুহায় বসিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বলল, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ধ্যান করে যাবি, চোখ মেলে তাকাবি না—স্বয়ং স্বামী পাকড়াওনন্দজী আমাদের সহায়—ভাবনা কী!

কথা শেষ করেই চোখের আড়াল হয়ে গেল। তার গুহা, অর্থাৎ স্বামী পাকড়াওনন্দজীর আসন ঠিক কোথায় ঠাওর করা গেল না।

সময় নষ্ট না করে আমি জপ শুরু করে দিলাম। প্রথমে মনটা স্থির করতে একটু সময় লাগল। কিন্তু এরপর বেশ একটু রোমাঞ্চকর নেশা এসে গেল।...নন্দন পাহাড়ে আমি একবার সকলকে রাম বাদশার হাত থেকে রক্ষা করে পিনুডিদার চোখের মণিটি হয়ে বসেছি, আবার পিনুডিদার সঙ্গে আমারই সাহায্যে স্বামী পাকড়াওনন্দজীর কৃপায় যদি দুর্ধর্ষ রাম বাদশা ধরা পড়ে। মন, তুমি স্থির হয়ে এক মনে জপ করে যাও। জপ করতে করতে সদলে রাম বাদশার হাতে হাতকড়া দেখো।

.....হ্যাঁ, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি সেই ধ্যানে বেশ তলিয়ে গেলাম। বোধহয় ঘন্টাখানেক বা দেড়েক কেটেছে। কোমরটা একটু টনটন করছে টের পাচ্ছি। তবু ধ্যানের ব্যাঘাত ঘটালাম না, চোখ পর্যন্ত খুললাম না।

হঠাৎ সচকিত হয়ে তাকালাম কেন জানি না! তারপরেই দু চক্ষু স্থির আমার। সামনে জটাজুটধারী গেরুয়া বসন পাঁচজন সন্ন্যাসী। সকলেই আমার দিকে চেয়ে মুখ টিপেটিপে হাসছে।

...তবে কি স্বয়ং পাকড়াওনন্দজী আমার ধ্যানে তুষ্ট হয়ে চেলাদের নিয়ে এলেন দেখা দিতে। যাকে স্বামী পাকড়াওনন্দজী ভাবছি, তার কথা শুনেই আমার সাত জন্মের পিলে চমকে উঠল। লোকটা এক গাল হেসে কচি ছেলের গলায় জিজ্ঞেস করল, কি খোকা সাহেব—স্বামী পাকড়াওনন্দজীকে চিনতে কোষ্ঠি হচ্ছে না তো?

আমি কাঠ প্রথমে। তারপরেই গা দিয়ে গলগল করে ঘাম ছুটল—চিৎকার করে উঠতে গেলাম, কিন্তু গলা দিয়ে শব্দ বেরুলো না।

রাম বাদশা তার আলখাল্লার তলা থেকে ঝকঝকে রিভলভার বার করল একটা। অন্য চারজনের হাতেও চকচকে ছোরা। রিভলভারটা আমার কপালের কাছে ধরে রাম বাদশার সে কী হাসি। —হামি স্বামী পাকড়াওনন্দজী আছে—পাকড়াও তো তুমাকে হামি জরুর করব সোনাবাবু। হামি শুনেছে, তুমি বহুত বড়া আদমির এক ছেলে আছো—তুমার জন্যে আমার এক লাখ টাকা র‍্যানসম মানি (মুক্তিপণ) চাই। না পেলে তুমার হাত পা মাথা সব টুকরা টুকরা হোয়ে পার্সেলে তুমার বাবার কাছে চলে যাবে! বলেই আবার হি-হি হাসি।

তারপরেই সঙ্গীদের দিকে চেয়ে ইশারা করল কিছু। সঙ্গে সঙ্গে তারা এসে আমার দু হাত পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল! শেষ শক্তিটুকু উজাড় করে আমি আর্তনাদ করে উঠলাম, পিনডি-দা-আ-আ-আ!

বৃথা আর্তনাদ। চোখের পলকে ওরা আমার মুখটাও—বেঁধে ফেলল! আর রাম বাদশার সে কী হাড় গলানো হাসি!

তেমনি চোখের পলকে ওরা আমার মাথা গলিয়ে একটা সন্ন্যাসীর গৈরিক আলখাল্লা পরিয়ে দিল। আর মাথার ওপর দিয়ে গলা পর্যন্ত একটা গৈরিক টুপি গলিয়ে দিল। যে সন্ন্যাসীরা অনেকদিন কোনো লোকের মুখ দর্শন করে না—আমি তেমনি একজন বালক সন্ন্যাসী। বুঝলাম, নিয়ে যাবার সময় এই সন্ন্যাসীবেশী ডাকাতরাই গুহা থেকে বেরিয়ে আমার ভক্ত সাজবে। তোয়াজ করতে করতে আমাকে পাহাড় থেকে নামিয়ে কোনো গাড়িতে তুলে হাওয়া হয়ে যাবে।

আমাকে গুহা থেকে বার করতেই তোয়াজের মতো তো ওদের করতেই হলো। কারণ, নিজের দুটো পায়ের ওপরে দাঁড়িয়ে আর আমার গুহা থেকে বেরনোরও শক্তি নেই। গেরুয়া কাপড়ে আমার মুখ ওরা না ঢাকলেও পারত। চোখে আমি এমনিতেই অন্ধকার দেখছিলাম।

গুহা থেকে বেরিয়েছি কি না জানি না, হঠাৎ বজ্রনির্ঘোষে আমারই অন্তরাত্মা আবার কেঁপে উঠল।—হ্যান্ডস আপ! হাত তোলো সবাই নয়তো কুকুরের মতো গুলি করে মারব! রাম বাদশা! তোমার খেলা শেষ!

না, এবার আর আমার ভুল হয়নি। পুলিশ অফিসার হাজারীলালের গলা। ঠিক শুনছি না স্বপ্ন দেখছি জানি না। এখন আমি উত্তেজনায় কাঁপছি। আমার দু'হাত পিছনে বাঁধা—সত্যি হলে আমার মুখের ঢাকনা সরাবে না কেন কেউ—হাতের বাঁধন খুলে দিচ্ছে না কেন?

এদিকে লোহার ক্লিক-ক্লিক শব্দ পাচ্ছি। এবার কেউ আমাকে জড়িয়ে ধরল—গলা শুনে বুঝলাম পিনডিদা। —সোনারে সোনা! তোর কিছু ভয় নেই—রাম বাদশার দল ধরা পড়েছে। বলতে বলতে আমার মুখের ঢাকনা সরিয়ে দিল।

আমি বিস্ফারিত চোখে দেখলাম রাম বাদশাসহ দলের সকলকে পিছমোড়া করে হাতকড়া লাগানো হয়েছে। ওরা সকলেই চোখ দিয়ে ভস্ম করছে আমাকে। পারলে ওই অবস্থাতেই আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু তিন জোড়া রিভলভার ওদের তাক করে আছে। গুহার বাইরে পুলিশে ছেয়ে আছে।

হাজারীলাল আমার দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছে। চোখাচোখি হতে বলল, ব্রেভ বয়—তোমার নার্ভের ওপর দিয়ে খুব টেনশন গেছে বুঝতে পারছি।

ততক্ষণে এদেরই কেউ আমার হাতের শক্ত বাঁধন খুলে দিয়েছে। কিন্তু কী করে এমন আশ্চর্য ব্যাপারটা ঘটল এখনো কিছুই আমার মাথায় আসছে না। সব গুলিয়ে যাচ্ছে।...তবে কি স্বামী পাকড়াওনন্দজী সত্যি কিছু ম্যাজিক দেখালেন!

রাম বাদশার দলকে পুলিশের গাড়িতে তুলে নিয়ে হাজারীলাল আর একদফা আমার পিঠে চাপড়ে দিয়ে চলে গেল। আর পুলিশের আর একটা জিপ আমাকে আর পিনডিদাকে বাড়ি পৌঁছে দিল।

বাড়ি ফিরেই আমি শুয়ে পড়লাম। মাথার ভেতরটা ভয়ংকর ঝিমঝিম করছে। তারপর ঘন্টা দুই আর কিছুই জানি না।

তারপর চোখ চেয়ে দেখি সকলে আমাকে ঘিরে বসে আছে। পিনডিদা, কেবলু, কার্তিক, চটপটি, হাবুল-হোঁতকা—একটু দূরে দাঁড়িয়ে লিট্‌লম্যান লছমন। আমি চোখ মেলে তাকাতে সকলে হইচই করে উঠল। লছমন ছুটে গিয়ে আমার জন্যে এক পেয়ালা গরম দুধ নিয়ে এলো। খেয়ে আমি আর একটু চাঙ্গা হলাম।

আরো খানিক বাদে আমার মাথা সাফ। পিনডিদা সানন্দে জানান দিল, শহরসুদ্ধু রটে গেছে রাম বাদশা দলবল সুদ্ধু ধরা পড়েছে। এরই মধ্যে কম করে দু'ডজন লোক এসে আমাদের দেখে গেছে—বুঝলি সোনা?

আমি চুপচাপ খানিক তার দিকে চেয়ে রইলাম। তারপর বললাম, হাজারীলাল তাহলে ছুটিতে যায়নি পিনডিদা?

আমতা আমতা করে পিনডিদা জবাব দিল, তাই তো দেখছি...ওই রটিয়ে দিয়ে ব্যাটা ঘাপটি মেরে বসেছিল।

আমার চোখ তার মুখের ওপর থেকে নড়ছে না—বললাম, আমার মুখের দিকে তুমি অমন রোস্ট কাটলেট পোলাও কালিয়া দেখার মতো করে চেয়ে থাকতে কেন—পুরস্কারের দু'হাজার টাকা দেখতে?

কাঁদ-কাঁদ গলা পিনডিদার—কী যে বলিস তুই সোনা...তোর মাথার দাম দু'হাজার টাকা—দু'লক্ষ টাকাও তো নস্যি!

তার মুখখানা আমি দু'চোখে আটকে রেখেছি!—কদিন ধরে তুমি লছমনের সঙ্গে কি গুজগুজ করতে...আমরা তপোবনের গুহায় গিয়ে স্বামী পাকড়াওনন্দজীর ধ্যানে বসব আর তার ফলে রাম বাদশার দল ধরা পড়বেই—এই কথা?

এতক্ষণে পিনডিদা একটু সামলে উঠেছে! জবাব এড়িয়ে প্রথমে লছমনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ

হয়ে উঠল। লছমনের তুলনা হয় না বুঝলি শুধু নেশা পেটে পড়লে ওর মুখ দিয়ে গলগল করে কথা বেরোয় এই যা দোষ।

গলগল করে পেটের কথা যাতে বেরোয় এই জন্যেই পিনুডিদা ওকে নেশার পয়সা জুগিয়েছে বুঝতে একটুও সময় লাগল না। পিনুডিদা বেশ জানে, রাম বাদশার দল আমাদের খবর জানার জন্যে লছমনের অজান্তে ওর সঙ্গে নেশার আসরে লেগে থাকবেই। আমাদের প্ল্যান লছমনকে বলা মানেই ওদের কানে খবর পৌঁছে দেওয়া। আর যে বিশাল বড়লোকের ছেলে, আমার বাবা যে ইচ্ছে করলেই এ-রকম তিনখানা বাড়ি কিনে ফেলতে পারে—পিনুডিদা ইচ্ছে করেই এটা লছমনকে শুনিয়ে রেখেছিল—যাতে এ খবরটাও রাম বাদশার কানে যায়। এখন খবর শুনলে রাম বাদশা মোটা মুক্তিপণের লোভে আমার পিছনে লেগে থাকবেই জানা কথা। হাজারীলালের সঙ্গে পরামর্শ করে আঁটঘাট বেঁধেই পিনুডিদা আসরে নেমেছে।

এবারে আমি ফস করে জিজ্ঞাসা করে বসলাম, রাম বাদশাকে ধরার জন্যে সরকার থেকে যে দু'হাজার টাকা ঘোষণা করা হয়েছে—সেটা কে পাবে?

মুখ কাঁচুমাচু করে পিনুডিদা জবাব দিল, হাজারীলাল তো বলছিল, সে কিছুই নেবে না···তা তুই কী বলিস?

আমি বললাম, এই দু হাজার টাকা দিয়ে আমাদের ফান্ড হবে। বাবার দেওয়া টাকা তুমি বর্ধমানে গিয়ে বাবাকে ফেরত দেবে—আর কেবলু কার্তিক চটপটির যে আঠেরোটা করে খরচের টাকা তোমার কাছে আছে পুরস্কারের টাকা পেলে তা ওদের ফেরত দিয়ে দাও।

পিনুডিদা সঙ্গে সঙ্গে খেঁকিয়ে উঠল, কেন—এই পুরস্কারের টাকায় ফান্ড হবে কেন। হাজারীলাল তার ভাগ নেবে না—আর তোকে দিয়ে কাজ হয়েছে যখন—তুই একটা অংশ অবশ্যই দাবি করতে পারিস—ধর দু'হাজার টাকার দশ আনা তুই ছ'আনা—তা বলে এ টাকা দিয়ে আমাদের ফান্ড হবে কেন? আর কে কী করেছে?

আমি বললাম, ঠিক আছে, তুমি ষোলো আনাই নাও। কাল তো খবরের কাগজে তোমার প্রশংসা বেরুবেই। কিন্তু বর্ধমানে ফিরে গেলে আমার বাবা-মা আর যেখানে যত চেনা-পরিচিত লোক আছে সকলেই জানবে, মাত্র দু'হাজার টাকার লোভে আমাকে কিছু না জানিয়ে তুমি যমের হাতে ঠেলে দিয়ে আমাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছ। হাজারীলালের হিসেবে এতটুকু গড়বড় হলে আমার কপালে অনিবার্য মৃত্যু লেখা ছিল—আর তা না হলে মুক্তিপণ দিতে গিয়ে আমার বাবার সর্বস্বান্ত হওয়া ছাড়া আর গতি ছিল না।

পিনুডিদা আমার দিকে ড্যাবড্যাব করে চেয়ে রইল। ঘরের আর সকলের বুকের মধ্যে দম আটকে আছে! তারপরেই সচকিত সকলে। পিনুডিদা হঠাৎ এত বড় ঘরটা ফাটিয়ে হা-হা শব্দে হেসে উঠল। তারপর উঠে এসে আমার কাঁধে হাত দিয়ে আনন্দে রাম ঝাঁকানি—সোনারে, তুই একেবারে খাঁটি সোনা—এই পরীক্ষায়ও উতরে গেলি।

আরে আমি তোকে পরীক্ষা করছিলাম বুঝলি না?···ঠিক আছে বাবা, পুরস্কারের দু হাজার টাকাতেই আমাদের গ্র্যান্ড ফান্ড হবে—তোর বাবার দেওয়া খরচের টাকা তাঁকে ফেরত দেব—অবশ্য তোর এত সাহস দেখে তিনি আনন্দে কখনো আর এ টাকা নেবেন না—না নিলে ফান্ডের সঙ্গে এ তিনশো অষ্টাশি টাকাও যোগ হবে—আর তিন জনের আঠেরোটা করে টাকাও আমি ফেরত দেব —হল?

আমিও এবার হেসেই মাথা নাড়লাম—হল।

# পিন্‌ডিদার গল্প

PATHAGAR.NET

# পিন্‌ডিদার ফুটবল

—পি-ই-ন-ডি! পি-ই-ন্‌ডি! পিন্‌ডি-ই! পিন্‌ডি!

বর্ধমান ছাড়িয়ে বাংলাদেশ ছাড়িয়ে ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে কেমন করে আমি ব্রেজিলের সেই মাঠে উপস্থিত হয়ে চোখের সামনে দৃশ্যটা দেখছি—আমার মাথায় আসছে না। পিন্‌ডিদার পায়ে বল, জাদুকরের মতো সেই বল পায়ে আটকে নিয়ে তীরের মতো বিপক্ষের দুর্গ ভেদ করে ছুটছে আর ছুটছে। বিপক্ষ দল বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে তার ওপর, কিন্তু কেউ তাকে স্পর্শও করতে পারছে না—বল নিয়ে আর পাতলা শরীরটাকে নিয়ে সে যেন বেরিয়ে যাচ্ছে, তারপর আবার ছুটে চলেছে।

হাজার হাজার মেয়ে পুরুষ দিশেহারা আনন্দে তারস্বরে তাকে উৎসাহ দিয়ে যেন বিপক্ষের গোলের দিকে সবেগে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। সেই মাতোয়ারা চিৎকারে আকাশ-বাতাস টইটম্বুর।

—পি-ই-ন্‌-ডি—পিন্‌ডি-ই—পিন্‌ডি।

আমি একটুও অবাক হচ্ছি না, দেখছি আর পিন্‌ডি-পিন্‌ডি করে চেঁচিয়ে ওদের সঙ্গে গলা ভেঙে ফেলছি। এই নামের সার্থক উৎপত্তির কথা আমাদের শোনা আছে। পি. এন্‌.ডি—মানে প্রদীপনারায়ণ দত্ত স্বল্প ইংরেজি জানা ওই বিদেশিদের উচ্ছ্বাসে 'পিন্‌ডি'তে এসে ঠেকেছে। 'পিন্‌ডি' ওখানকার ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষের জপের নাম—পিন্‌ডি তাদের চোখের মণি। পিন্‌ডি বলতে সমস্ত ব্রেজিল উত্তাল।

কিন্তু আমি ওই দৃশ্য স্বচক্ষে দেখছি কী করে জানি না। দেখছি আর চিৎকার করছি আর উত্তেজনায় কাঁপছি।

বড়সড়ো একটা ধাক্কা খেয়ে ধড়মড় করে উঠে বসলাম। ঠাকুমার সঙ্গে শুই, ঠাকুমা আমাকে জোরে জোরেই ঠেলছে, আর মাকে ডাকছে, ও বউমা ওঠো শিগ্‌গির! দেখো কী হল, রাত দুপুরে ছেলে পিন্ডি পিন্ডি করে চিৎকার করছে—কী অলুক্ষণে কাণ্ড—ঘুমের মধ্যে বাছার উপর আবার কোন দেবতা এসে ভর করলেন গো!

ঠাকুমার মুখ চাপা দেবার ফুরসত পেলাম না। ও-ঘর থেকে মা ছুটে এল। আর তার পরেই ব্যাপার বুঝে খপ করে আমার কানটা ধরে মাথাটা ঝাঁকিয়ে দিল। আর ক'টা মাস গেলে আমি হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দেব, তার ওপর ঠাকুমার একমাত্র আদরের নাতি—তার কান ধরে মাথা ঝাঁকালে মা সহজে রেহাই পেত না। কিন্তু আমার ভ্যাবাচাকা খাওয়া মূর্তি তখন, আর ঠাকুমা বুড়ি ভাবল মা বুঝি ওই করে আমার থেকে অপদেবতা তাড়াচ্ছে।

কান ছেড়ে দিয়ে মা রাগত মুখে এক গেলাস জল এনে মুখের সামনে ধরল। বলার আগেই আমি ঢক-ঢক করে খেয়ে নিলাম। উঠে দাঁড়িয়ে মা গজগজ করে উঠল, পাজি ছেলে, সমস্ত দিন দস্যিগিরি করে এসে রাত পর্যন্ত সোয়াস্তি নেই—শুয়ে পড়, কাল থেকে তোর ওই দলে মেশা বার করছি!

মা চলে গেল। ঠাকুমার চোখ থেকে ঘুম উঠে গেছে, তাজ্জব বনে গিয়ে পিটপিট করে তাকাচ্ছে আমার দিকে। সটান উবুড় হয়ে শুয়ে পড়লাম আমি,—অর্থাৎ মুখ ঢাকলাম। আমাদের দলের হিমালয়-সদৃশ নেতা পিন্‌ডিদার নামটা মায়ের কানেও এসেছিল আর ঠাকুমারও অজানা ছিল না।

কিন্তু ঘুমের ঘোরে ওই চিৎকার শুনে ঠাকুমা ভুলে মেরে দিয়েছিল নিশ্চয়, কিন্তু মা অত সহজে ভোলবার মেয়ে নয়।

শুয়ে শুয়ে ঠাকুমা বুড়ির ওপরেই রাগ হতে থাকল আমার। এত বারের শোনা সেই রোমাঞ্চকর দৃশ্যটা স্বচক্ষে দেখছিলাম। এর পর আরও কী দেখতাম, কতটা দেখতাম কে জানে! হয়তো বা এই স্বপ্নের মধ্যেই আমার প্রাণান্তকর সমস্যাটার সমাধান হয়ে যেত। হয়তো বা স্বপ্নের মধ্যেই এক অজানা রহস্যের চাবিটা একেবারে হাতের মুঠোয় পেয়ে যেতাম। পেলে পিন্‌ডিদাকে অত আর তোয়াজ তোষামোদ করতে হত না, ঠাকুমার কাছ থেকে পয়সা আদায় করে আর মায়ের বাক্স ফাঁক করে তার চপ-কাটলেটেরও খরচ জোগাতে হত না। এই বুড়ি খুড়খুড়ি যে কতবড় সর্বনাশ করে দিল আমা সে-কি কল্পনাও করতে পারবে!

গতকাল সমস্ত দিনটা যে কী উৎকণ্ঠা আর যন্ত্রণার মধ্যে কেটেছে সে শুধু আমিই জানি। ভিতরে ভিতরে কত যে পুড়ছে দুদিন ধরে ঠিক নেই। দুঃখের চোটে এমনও মনে হয়েছে লম্বা যদি ঠিক-ঠিক পাঁচ ফুট না হয়ে আধ ইঞ্চি-এক ইঞ্চি বেশি হতাম তাহলেও এভাবে মাথা কাটা যেত না। অর্থাৎ জুভেনাইল শিল্ড খেলা থেকে আমিই বাদ পড়ে যেতাম। যারা এই শিল্ড-এ খেলবে লম্বায় তাদের পাঁচ ফুটের মধ্যে হতেই হবে। বাদ পড়া দূরের কথা, আমিই স্কুল টিমের ক্যাপ্টেন—আমার হাইট্ পাঁচ ফুটের বেশি বিপক্ষ দল সেটা প্রমাণ করার কত চেষ্টা করেছে। সে-যে কত বার করে মাপামাপি!

সেই ফাঁড়া কাটানোর পরে কিনা এই ফাঁড়া! লজ্জা মাথা কাটা যাবার দাখিল আমার। তার ওপর কিনা ব্রেজিলের প্রায় চিরস্মরণীয় প্লেয়ার পিন্‌ডিদা স্বচক্ষে দাঁড়িয়ে আমার সেই খেলা দেখেছে। ফাইন্যাল খেলা টাউন স্কুলের সঙ্গে—আমাদের চিরকালের শত্রু। এর আগে ড্যাং ড্যাং করে আমরা একদিক থেকে ফাইন্যালে উঠেছি অন্য দিক থেকে ওরা। প্রায় প্রতিবারই এই রকম হয়। বর্ধমানের সব কটা স্কুলের ছেলে ভেঙে পড়ে এই খেলা দেখতে।

সেই ফাইন্যাল খেলা ছিল গত পরশু দিন। আর তারপর আমার মুখেই সব থেকে বেশি চুন-কালি। পিন্‌ডিদা সশরীরে দাঁড়িয়ে খেলা দেখলে, খেলার সময়েও সেটা ভোলা যাচ্ছিল না। সেই জন্যই অমন বিতিকিচ্ছিরি খেলা খেললাম কি না কে জানে। হাফ-টাইমে এক গোলে হারছিলাম। মাথা গরম হয়েই ছিল। তার ওপর বরফ দিতে এসে হাবুল হতভাগাটা 'চিয়ার-আপ' করার অছিলায় দু-কাঁধ ধরে সমস্ত শরীরটা এমন ঝাঁকিয়ে দিয়ে গেল যে সর্বাঙ্গ রি-রি করে উঠল আমার। একে তো হাতির মতো চেহারা ওর, ধরে ঝাঁকুনি-টাকুনি দিলে মোটেই আরাম হয় না—তার ওপরে হুল ফোটানো কথা—খেলায় হারজিত আছেই, মরদের মতো লড়ে যা—পিন্‌ডিদা বলেছিল, তোকে একবার ব্রেজিলের কানমলা খাওয়াতে পারলে খেলার ফলাফলের চেহারা চার ডবল উলটে যেতে পারত, কিন্তু তুই এখনও সে-তুলনায় দুগ্ধপোষ্য শিশু একটা, অত জোরালো ওষুধ তোর বেলায় ধরানো শক্ত।

এই সংকট থেকে উদ্ধারের জন্য আমি ব্রেজিলের কানমলা কেন, কাম্‌সকাট্‌কার নাক-খত বা হনুলুলুর চড় খেতে রাজি আছি। কিন্তু সেই হাফটাইমে ওর মুখে এই কথা শুনে আমার পিত্তি জ্বলে গেছল। কারণ ম্যাচ জেতার জাদু-মন্ত্র পিন্‌ডিদার সেই ব্রেজিলের কান-মলার রহস্যটা তার মুখ থেকে বার করার জন্য কত তেল দিয়েছি ঠিক নেই। কিন্তু এখন পর্যন্ত ঘুরে ফিরে আমি যে তিমিরে সেই তিমিরে—ব্রেজিলের সেই কানমলার আশীর্বাদ আমরা বরাতে জুটল না।

সেকেন্ড হাফে যাকে বলে একেবারে আদা জল খেয়ে লেগেছিলাম। খেলা কাকে বলে পিন্‌ডিদাকে দেখিয়ে দিতে হবে।

দিচ্ছিলামও। কিন্তু মাথার মধ্যে সাদা পদার্থগুলো টগবগ করে ফুটছিল বলেই সব গন্ডগোল

THAGAR.NET

হয়ে গেল। রাগের প্রথম কারণ কেবলু হতভাগা একেবারে ক্যাবলার মতো গোলটা খেয়ে বসেছিল। সংস্কৃততে বরাবর ফেল করে বলে সংস্কৃতের ওপর ওর যে একটু বেশি ঝোঁক আছে সেটা বিপক্ষ দলেরও অনেকে জানে। বল নিয়ে তেড়ে আসতেই ওদের সাপোর্টাররা এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল গো-ও-লং ভক্ষঃ! গো-ও-লং ভক্ষঃ! আর হাত ফসকে সেই জল ভাত বল কিনা গোলেই ঢুকে গেল!

হাফটাইমের পর আমার মেজাজ আরও বিগড়ে গেছল চটপটি গাধাটার হ্যাংলাপনার জন্য। বীর বিক্রমে শত্রুর বাধা ভেঙে বল গোলে সট করতে যাব আর তুই কিনা চোখের মাথা খেয়ে আমারই পা থেকে বল কেড়ে নিয়ে বারপোস্টের তিন হাত উঁচু দিয়ে মেরে বসলি! তারপর মাথা আর কারও ঠিক থাকে? জলের মতো দুদুটো অব্যর্থ গোল এর পর আমিই মিস্ করে বসলাম। রাগে দুঃখে আমাদের দলের লোকেরাই তখন বাইরে থেকে টিটকিরি ছুড়তে লাগল। লজ্জায় আমার মাথা হেঁট।

হারব ধরেই নিয়েছিলাম। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ওদেরই গবেট ব্যাকটার কল্যাণে মুখরক্ষা হল। পেনাল্টি এরিয়ার মধ্যে বলসুদ্ধ আমাকে একটা ল্যাং মেরে বসল সে। ও-বলে গোল কিছুতেই হত না, কারণ দেয়ালের মতো ওদের চার-পাঁচজন সামনের পথ আগলে দাঁড়িয়ে গেছল। ব্যাকটার মাথায় কুবুদ্ধি ঢুকিয়ে দুষ্টু সরস্বতী ঠাকরুন যেন নিজের হাতে আমাদের মুখ রক্ষা করলেন।

পেনাল্টি কিক্ পেয়ে গেলাম। আমার তখন নিজের ওপর আস্থা উবে গেছে। চটপটিকে শট নিতে হুকুম করে আমি চোখ বুজে গণেশ-গণেশ জপ শুরু করে দিলাম।

—গো-ও-ও-ল্!!

চোখ তাকিয়ে দেখি চটপটি তিড়িং তিড়িং করে মাঠের ওপর লাফাচ্ছে।

যাক, খেলা ড্র হল। একটা টাইম খেলানো হল। সেও নিষ্ফলই থেকে গেল!

অতএব আর একদিন অর্থাৎ আগামী পরশুদিন সেই খেলা।

মাঠের উঁচু ঢিবিটাতে বসে আছে পিন্ডিদা—তার সামনে আমরা পাঁচ মক্কেল—আমি হাবুল চটপটি কেবলু আর কার্তিক। এর মধ্যে আমার আর চটপটির মন-মেজাজ ভালো নয়, কারণ আসছে দিনের রি-প্লেতে স্কুল টিমকে জেতানোর সব দায়-দায়িত্ব আমাদের। কেবলু গোল-কিপার, দুই একটা উপদেশ দেবার সুযোগ পেলেই ওর জিভ সুড়সুড় করে। হেবো হোঁতকাটা যেন আমরা হারলেই মনে মনে খুশি হয়। পিন্ডিদা চুকলি কাটবে আর ও তাতে মজা পাবে। কার্তিকই যা সদয় একটু। অনুরোধের সুরে ও-ই বলল, সোনাকে একটা দুটো প্যাঁচ-ট্যাঁচ বাতলে দাও না পিন্ডিদা, বেচারা কেমন মন-মরা হয়ে রয়েছে দেখছ না!

সোনা, অর্থাৎ আমি।

নিরাসক্ত মুখ করে পিন্ডিদা জবাব দিল, ওকে এবার থেকে পেতল বলে ডাকিস তোরা—কী খেলাই খেললে সেদিন। ব্রেজিলের কানমলাই ওর উপযুক্ত দাওয়াই। কিন্তু এই ঘণ্টার দেশে সে-রকম অ্যাটমসফিয়ারই নেই—তাছাড়া বয়েসটাও যে বড় কাঁচা তোদের—ব্রেজিলের কানমলা বুঝবিই না।

অর্থাৎ ব্রেজিলের কানমলা খেতে আবহাওয়া দরকার হয় আর আর আমাদের থেকে একটু পাকা বয়েসও দরকার হয়।

পেতল বলাতে আমারও মেজাজ ঠিক থাকল না। রাগত মুখেই জবাব দিলাম, তুমি বলবে না তাই বলো, নইলে আবহাওয়া এখানকার খারাপ নয় আর স্বাস্থ্যও তোমার থেকে অন্তত ভালো আমার।

হেবো হাতিটা নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল। পিন্‌ডিদার মুখের ওপর এ-রকম কথা—তার একটু ইশারা পেলেই আমার মাথায় একটা কড়া গোছের গাঁট্টা বসিয়ে দিতে পারে।

পিন্‌ডিদা ঘুম-ঘুম চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল খানিক। তারপর আলতো করে জিজ্ঞাসা করল, তোরা জিতলে আমার কী লাভ, ফাউল কাটলেট খাওয়াবি?

বিনোদের দোকানের এক একটা ফাউল কাটলেটের দাম দেড় টাকা—অর্থাৎ ছয়-দেড়ে নটাকা খসবে। অন্য সময় হলে আমার রাগ হয়ে যেত, কারণ, পিন্‌ডিদাকে খুশি করতে গিয়ে এরই মধ্যে আমার কয়েকটা টাকা খসেছে। শাইলক আর কাকে বলে। কিন্তু কাল খেলা তাই আজ আমার প্রাণের দায়। বললাম, আলবাত খাওয়াব, তুমি বলো।

সকলে হইহই করে উঠল আনন্দে।

পিন্‌ডিদা হাবলুকে বলল, হেবো, সোনাকে দিয়ে লিখিয়ে সই করিয়ে নে তো। সোনা লিখে দিক, কাল শিল্ড ফাইন্যালে জিতলে কালই দলের স্বাক্ষরকারীসহ ছয় জনকে ছয়টি বিনোদের দোকানের গরম ফাউল কাটলেট খাওয়াবে।

পিন্‌ডিদার অবিশ্বাস দেখে গা জ্বালার কথা, কিন্তু এখন গন্ডারের চামড়া আমার। হাবুল তার নোট বই এগিয়ে দিতে খসখস করে ওই কথাগুলোই লিখে সই করে দিলাম।

তারপর দুরুদুরু বক্ষে অপেক্ষা করছি আমরা। খেলায় জেতার জাদুমন্ত্র ব্রেজিলের কানমলার কথা শুনব।

কিন্তু কিছু বলা দূরে থাক, পিন্‌ডিদা উদাস চোখে দূরের আকাশের দিকে চেয়ে রইল।

কার্তিকের আর তর সইল না।—কি হলো পিন্‌ডিদা, শুরু করো।

পিন্‌ডিদার দুচোখ আকাশ থেকে তার মুখের ওপর ফিরে এল—কিসের শুরু?

—বা রে, সোনাকে দিয়ে যে ফাউল কাটলেট খাওয়ানোর কথা লিখিয়ে নিলে!

—ও...ওর সেই শিল্ড জেতার ব্যাপার? শিল্ড তো সোনার হাতের মুঠোয় এসে গেছে, আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি!

—কী রকম? কী রকম? শুধু আমি ছাড়া সকলে সমস্বরে প্রশ্ন করল।

পিন্‌ডিদা বলল, তোদের চোখ থাকলে তো দেখবি! আমি স্পষ্ট দেখছি সোনা একের পর এক বল নিয়ে বিপক্ষের গোলে ঢোকাচ্ছে। চটপটিও দুটো চারটে গোল দিচ্ছে। এ-দিকে কেবলু নিজের গোল পোস্ট-এ ঠেস দিয়ে ঘুমুচ্ছে—কারণ, বল তো আর এদিকে আসছে না।

সকলে হাঁ করে পিন্‌ডিদার মুখের দিকে চেয়ে আছি।

পিন্‌ডিদা আবার বলল, হ্যাঁ, আমি স্পষ্ট দেখছি সোনা আর চটপটিকে ছোট মেয়েগুলো কিছুতেই রুখতে পারছে না—আর সবসুদ্ধ এক ডজন গোলে জিতে ক্যাপ্টেন সোনা বীরবিক্রমে শিল্ড নিয়ে চলে আসছে।

—অ্যাঁ! ছোট মেয়েগুলো রুখতে পারছে না মানে!

—হ্যাঁ, ছোট ফ্রক-পরা এগারোটা মেয়ে।

কেবলু মরিয়া হয়ে বলে উঠল, কি চপল-ভাষ্যং করছ তুমি পিন্‌ডিদা, মাঠে আবার ফ্রক-পরা মেয়ে আসবে কোত্থেকে?

এবারে পিন্‌ডিদাও খেঁকিয়ে উঠল, তবে কি সোনা টাউন স্কুলের খেড়ে ছেলেগুলোর সঙ্গে খেলে শিল্ড নিয়ে আসছে ভেবেছিস নাকি! ওর যোগ্য বিপক্ষ দল পেলে তবে তো কেরামতি দেখাবে—তোরা বড় আকাশ-কুসুম কল্পনা করিস।

আমার দিকে একটা ব্যঙ্গভরা তেরছা দৃষ্টি হেনে পিন্‌ডিদা উঠে চলে গেল।

আমরা বাকি সকলে হতভম্বের মতো বসে। হঠাৎ হাবুলের খিকখিক হাসির শব্দ কানে আসতে হুঁশ ফিরল। দাঁত বার করে ও বলল, পিন্‌ডিদার রসিকতা বটে মাইরি। উল্টো দিকে এগারোটা ফ্রক-পরা মেয়ে থাকলেই তবে সোনা বীরবিক্রমে শিল্ড জিতে নিয়ে আসতে পারে! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

আমার মাথায় রক্ত উঠতে লাগল। এত রাগ আর জীবনে হয়েছে কি না জানি না। রাগ চটপটিরও কিছুটা হয়েছে! হ্যাঁচকা টানে তাকে তুলে নিয়ে আর কেবলুকে একটা ইশারা করে উঠে চলে এলাম!

নিরিবিলিতে এসে ওদের দু'জনকে বললাম, এ অপমান সহ্য করবি?

এরা বলল, সহ্য তো করতে ইচ্ছে করছে না।

—শোন্, জীবন যাক আর থাক, কালকের খেলায় আমাদের জিততেই হবে! জিততেই হবে! শিল্ড আমাদের পেতেই হবে! এ অপমানের জবাব দিয়ে পিন্‌ডিদার পিন্তি চটকে ছাড়ব আমরা—ছাড়ব ছাড়ব ছাড়ব—বুঝলি?

চটপটি বলল, বুঝেছি। এ অপমানের জবাব না দিতে পারলে ফ্রক-পরা মেয়েদের সঙ্গেই আমাদের খেলা উচিত—তার মানে এরপর খেলাই ছেড়ে দেওয়া উচিত আমাদের।

পরদিন।

খেলা শেষ হল। এমন মরণ-পণ খেলা আর জীবনে খেলেছি কি না জানি না। শুধু আমি কেন—চটপটি আর কেবলুও। আমরা তিন গোলে জিতেছি। আমি দুটো গোল করেছি আর চটপটি একটা। তারপর বীরবিক্রমে শিল্ড নিয়ে স্কুলে এসেছি!

সন্ধ্যার পর মাঠে।

পিন্‌ডিদা আসেনি তখনও। হয়তো পালিয়েই থাকবে আজ। মাঠে গিয়ে তো নিজের চোখে আমার কেরামতিখানা দেখেছে। মুখে কী বলবে জানি না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে দর্পচূর্ণ হয়েইছে।

পিন্‌ডিদা এল একটু দেরি করে, রাত হয়েছে, পরস্পরের মুখ দেখার জন্য আমরা ঘন হয়ে বসেছি। পিন্‌ডিদা তার উঁচু ঢিবির আসন নিয়ে ভারিক্কি চালে বলল, কী রে, ফাউল কাটলেটের ব্যবস্থা-ট্যবস্থা করে এসেছিস তো?

শোনামাত্র আমার রাগ হয়ে গেল। বললাম, ব্রেজিলের কানমলার কথা বললেই না যখন, ফাউল কাটলেটও শূন্যে মিলিয়ে গেল।

—তার মানে? ভুরু কুঁচকে পিন্‌ডিদা খেঁকিয়ে উঠল, তার মানে? ব্রেজিলের কানমলা ছাড়াই তুই শিল্ড-এ জিতেছিলি নাকি? মুখ নেড়ে কথা বলতে লজ্জাও করে না! খেলায় জেতালাম, ছি-ছি-ছি!

আমরা সকলেই হতভম্ব? এ আবার কী বলে পিন্‌ডিদা!

সাহস সঞ্চয় করে কার্তিক বলল, কিছুই যে মাথায় ঢুকছে না পিন্‌ডিদা...তুমি কখন কী করলে? ব্রেজিলের কানমলা ব্যাপারখানা কী তাহলে?

ঢিবির ওপর পা গুটিয়ে বসল পিন্‌ডিদা। —তোদের মাথায় গোবর, বুঝবি কী করে? শোন্ তাহলে—

পিন্‌ডিদা বলে চলল, তখন আমার হাঁটুর চাকতি খুলে গেলে, ছুটতেও পারি না, খেলতেও পারি না! ব্রেজিলের লোক কত চিকিৎসা করেছে আর হায় হায় করেছে ঠিক নেই। শেষে আমাকে ক্লাবের ট্রেনার করে দিল ওরা। আমার ট্রেনিং-এ খেলোয়াড়গুলো এক-একটা ফাইটিং বুল হয়ে উঠল। একবার সেই টিমের ফাইন্যাল খেলা পড়ল মেক্সিকোর এক দুর্ধর্ষ টিমের সঙ্গে। ব্রেজিলেই খেলা। খেলায় কী-হয় কী-হয় ভেবে ব্রেজিলের লাখখানেক মেয়ে পুরুষের খাওয়া-দাওয়া ঘুচে

গেছে। ...খেলা আরম্ভ হল। উত্তেজনায় সমস্ত ব্রেজিলের বাতাস থরথর করে কাঁপছে। কিন্তু হায় হায়, হাফটাইমের মধ্যেই আমাদের টিম এক এক করে চার-চারটে গোল খেয়ে বসল।

পিন্‌ডিদা একটু দম নিয়ে আবার বলে চলল, হাফ-টাইমে তো আমাদের এগারোটা প্লেয়ার ক্লাবের রেস্টরুমে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে আছে। প্রেসিডেন্ট আর সেক্রেটারিকে সঙ্গে করে গম্ভীর মুখে আমি চললাম রেস্টরুমে—প্লেয়ারদের কাছে। প্রেসিডেন্ট আর সেক্রেটারিও ভয়ে কাঁপছে গিয়ে আমি ওদের চাবকাতেই শুরু করি কিনা কে জানে! প্লেয়াররাও প্রমাদ গুনছে। কিন্তু আমি ওদের ঘরে গিয়ে আর মাথা নিচু মূর্তিগুলো দেখে কী করলাম?

উত্তেজনায় হাবুল জিজ্ঞাসা করল, কী করলে পিন্‌ডিদা, কী করলে?

--সকলের দিকে তাকালাম একবার। তারপর লজ্জিত সুরে বললাম, ও.....আই অ্যাম সরি..এ-ঘরে সব মেয়েরা বসে আছেন জানতুম না। বলেই একটু মুচকি হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

—তারপর? তারপর? দু তিনজন সমস্বরে জিজ্ঞাসা করল।

পিন্‌ডিদার নির্লিপ্ত মুখ। —তারপর আর কী। হাফটাইম ফুরাতে মাঠে এগারোটা প্লেয়ার নামল না যেন এগারোটা দুরন্ত ষাঁড় নামল। ওদের রুখতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে গেল বিপক্ষ দল। ব্রেজিলের টিম সাত গোলে অর্থাৎ সেভেন-টু-ফোর এ জিতল!

অন্ধকারে আমার দিকে একটা তির্যক দৃষ্টি হেনে পিন্‌ডিদা আবার বলল, সেই ব্রেজিলের কানমলাই একটু ঘুরিয়ে ছেড়েছিলাম আমাদের সোনার ওপর--ফ্রক-পরা এগারোটা মেয়ের দলের সঙ্গে খেলার কথা বলে—ফলাফল তো নিজের চোখে দেখলি তোরা। বড়সড়ো একটা হাই তুলল পিন্‌ডিদা, যা রে হেবো, কাটলেটগুলো নিয়ে আয়, আসার সময় বিনোদকে আমি অর্ডার দিয়েই এসেছিলাম--

ওরা সব হইহই করে উঠল। এমন কি চটপটিও। আমিই শুধু চুপ একেবারে।

## পিন্‌ডিদার বিচার

রাগের চোটে হাবলুটাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে দল থেকে তাড়াব প্রতিজ্ঞা করে ফেললাম আমি। সাধে হাবা বলে ডাকে সব্বাই ওকে! মাথায় যদি এক ছটাক সাদা জিনিস থাকত, গায়ে-গতরে ষাঁড়টার মতোই যা বেড়েছে! পিন্‌ডিদা এর পরেও যদি ওর পিন্ডি চটকে দল থেকে বার না করে তো আমিই একটা এসপার-ওসপার করে ফেলব। কী করব ঠিক-ঠাক জানি না অবশ্য, কারণ, দলের আর কেউ ওই পিন্‌ডিদাকে ছেড়ে তো আমার দিকে আসবে না, কিন্তু হাড়ে হাড়ে যে চটেছি আমি, আর এরকম 'ডাল' ছেলে দলে থাকলে যে পিন্‌ডি অ্যান্ড কোম্পানির সমস্ত চটক নিভু-নিভু হল বলে সেটা অন্তত স্পষ্টই বুঝিয়ে দেব।

কিন্তু অতটার দরকার হবে না বোধহয়, আমার খুব আশা সমস্ত সমাচার শোনার পর পিন্‌ডিদা নিজেই ফোঁস করে বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে মাঠ থেকে এক খাবলা ঘাস ছিঁড়ে হেবোটার মুখের কাছে ধরে বলবে, বৎস! এটুকু সেবন করে তুমি তোমার সগোত্রসন্ধানে যাও।

হ্যাঁ, পিন্‌ডিদা এমনিই মোলায়েম আর মিষ্টি করে হুল ফুটিয়ে কথা বলতে অদ্বিতীয়। বরাত যেদিন যার মন্দ সেদিন তাকে পিন্‌ডিদার ওই কথার হাড়িকাঠে গলা পেতে দিতে হয়। সেই

একজনেরই শুধু প্রাণান্ত দশা তখন, বাদ বাকি সকলে সেই নরম-গরম কথার চাবুক তপতপে চপ-কাটলেটের থেকে কম উপভোগ করে না।

পিন্‌ডিদা শুনে অনেকের মনে মনে অবাক লাগছে বোধহয়। ভাবা স্বাভাবিক এ আবার কী বিদঘুটে নাম রে বাবা! কিন্তু যারা তাকে জানে, জানে তো দেশ-বিদেশের অজস্র মানুষ—ওই নাম তাদের সকলের জপের নাম বললেও বেশি বলা হবে না। আর আমাদের তো কথাই নেই, এত বড় বর্ধমান শহরে পিন্‌ডিদার নিবাস কিনা এই বাবুগঞ্জে আমাদেরই মধ্যে! পরীক্ষার ঝামেলা না থাকলে দিন-রাতের কম করে সাত-আট ঘণ্টা কেটে যায় তাকে ঘিরে—আমাদের মতো গর্বিত এ-অঞ্চলে আর কে আছে? কেবল, তার ওই কথার চাবুক আর বিচারের চাবুক পিঠে পড়লে একটু-আধটু মেজাজ বিগড়ায়, কিন্তু রোগা ছিপছিপে ওই মানুষটা যে আমাদের তুলনায় হিমালয় বিশেষ, সেটা মনে মনে অন্তত সকলেই স্বীকার করে থাকি। পিন্‌ডিদার সবটা দেখতে হলে ঘাড় উঁচিয়ে অর্থাৎ মাথাটাকে আকাশ-মুখো করে দেখতে হয়—কিন্তু তার পরেও সেই দেখার থই মেলে না।

আমাদের মধ্যে কেবলু অর্থাৎ কান্তিভূষণ লাহার আবার সর্বব্যাপারে গবেষণা করার ধাত। গোড়ায় গোড়ায় আমরা যখন পিন্‌ডি নামের তলকূল খুঁজে পেতাম না কেবলু তখন মাথা খাটিয়ে বলেছিল, আমার মনে হয় পি পূর্বক ইন্ ধাতুকে ডি-প্রত্যয়-করে পিন্‌ডি বানানো হয়েছে।

বেচারা কেবলু সংস্কৃততে কোনওদিন তেরোর বেশি নম্বর পায়নি বলে ফাঁক পেলেই ও সংস্কৃত চিবিয়ে খেতে চায়।

কিন্তু হেবো হোঁতকাটা যে আবার কেবলুর এই মৌলিক গবেষণাটুকু পিন্‌ডিদার কানে তুলে দেবে সে কি আর ও জানত? তখনও পিন্‌ডিদার সঙ্গে অত দহরম-মহরম হয়নি আমাদের। কেউ আমরা হায়ার সেকেন্ডারি পাস করিনি তখনও, পিন্‌ডিদার চোখে তখন আমরা সব এক-একটি সদ্যোজাত শিশুর মতো, ভালো করে দেখতে হলে দূরবিন লাগিয়ে দেখতে হয় এমন হাবভাব পিন্‌ডিদার। কিন্তু অমন সাধের নামটাকে ধাতু আর প্রত্যয়ের জাঁতায় ফেলে চটকানোর ফলে ভিতরে ভিতরে পিন্‌ডিদার মেজাজ একটু বিগড়ে গেছল বোধহয়। এমন শূন্য দৃষ্টিতে কেবলুর মুখের দিকে চেয়েছিল যে মনে মনে ঘাবড়েই গেছলাম। পরে অবশ্য বোঝা গেছল কারও ওপর চটলে বা কাউকে আচ্ছা করে ঠাসতে হলে পিন্‌ডিদা ওই রকম করে চেয়ে চেয়ে দেখে তাকে।

পিন্‌ডিদার কুতকুতে চোখ জোড়া শেষে কেবলু বেচারার মুখখানা ছেড়ে হাবুলের দিকে ফিরে ছিল—কান্তির 'কে' আর ভূষণের 'বি' সন্ধি করলে কী দাঁড়ায়?

—কেবি।

—তার থেকে 'ি' বিচ্ছেদ করলে?

—কেব্। —হাবলু হাঁ করে থাকায় ভয়ে ভয়ে কার্তিক জবাবটা দিয়েছিল।

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে পিন্‌ডিদা প্রশ্ন করে গেল, আর তার গায়ে লক্ষ্মৌয়ের লু লাগলে?

—কেবলু! —সোৎহাসে লু লাগার ফল ঘোষণা করেছিল হোঁৎকা হাবুল।

ঠোঁটের ফাঁকে হাসি মাখিয়ে তার পরেও প্রশ্ন করেছিল পিন্‌ডিদা, —লু লাগলে মাথার ঘিলু সর্বদা ওঠা-নামা নড়া-চড়া করে—সেটা ঠাণ্ডা হয় কোন ওষুধে?

আমরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করেছি, আর কেবলুর তো প্রাণান্ত দশা।

শেষে আমিই জিজ্ঞাসা করেছি, কোন ওষুধে পিন্‌ডিদা?

—ওর সংস্কৃত পণ্ডিতের নস্যি টানা হাতের গোটাকায়েক কড়া-মিঠে চাঁটি-প্রত্যয়।

পিন্‌ডি নামের রহস্য আমরা পরে শুনেছি আর শুনে মুগ্ধ হয়েছি। গোটা নামটা হল প্রদীপনারায়ণ দত্ত। পি—এন্—ডি। বাপ দাদার সব মস্ত লোক ছিল এককালে। হলে কী হবে,

ঠাকুরদাটি ছিল এক নম্বরের ভবঘুরে। নাতি অর্থাৎ প্রদীপনারায়ণেরও বাচ্চা বয়েস থেকে সেই ঝোঁক দেখে বাবা তাকে সটান একেবারে মায়ার দেশ ম্যানটশএ পাঠিয়ে দিলে—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কত গিলবে প্রাণ ভরে গেলো। ম্যানটশ হল গিয়ে ব্রেজিলের একটা নামকরা জায়গা। পাহাড় সমুদ্র বন জঙ্গল—কিছুরই অভাব নেই। স্কুল কোর্স শেষ করে ইচ্ছে করলে মেরিন এঞ্জিয়ার হতে পার, ইচ্ছে করলে কাঠের এঞ্জিনিয়ার।

কিন্তু রক্তে যার ভবঘুরের নেশা সে এক জায়গায় তিষ্ঠোবে কী করে? পিন্‌ডিদা গোটা পৃথিবীটা প্রদক্ষিণ করেছে বলতে গেলে আফ্রিকা-আমেরিকা-ইংল্যান্ড- জার্মানি-রাশিয়া—কোনও জায়গা বাদ নেই। তবে ঘুরে ফিরে ওই ব্রেজিলই সব থেকে ভালো লেগেছিল—ঘুরে ফিরে সেখানেই বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছে।

আমাদের মনে অনেক প্রশ্নের উদয় হয়েছিল—যেমন, পিন্‌ডিদা সেখানে কী পড়াশুনা করেছে, কী খেয়েছে, খরচপত্র কে চালাত ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কিন্তু কথার মাঝে বিঘ্ন ঘটালে পিন্‌ডিদা বেজায় চটে যায়। এক এক সময় এমন খটমট ভাষায় কথা বলে যে আমরা ভ্যাবাচাকা—সেটা ব্রেজিলের ভাষা কী আফ্রিকার কে জানে।

অতএব কৌতূহলের টুটি চেপে আমরা শুধু শুনে গেছি। পিন্‌ডিদা বলেছে, বর্ধমানের এই মামা-মামির কান্নাকাটিতে অতিষ্ঠ হয়ে সে যখন দেশে পাড়ি দেবে ঠিক করল, তখন ব্রেজিলের ছেলে-বুড়ো মেয়ে-পুরুষ কী কান্না কী কান্না! সকলে গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদে আর বলে, পিন্‌ডি, তুমি চলে গেলে আমরা থাকব কী করে, আর তোমার হাতে-গড়া ক্লাবেরই বা কী হবে?

হ্যাঁ, ওই ক্লাবের দৌলতেই পিন্‌ডিদা ফেমাস হয়ে পড়েছিল সেখানে। বল একবার তার পায়ের ছোঁয়া পেলে আঠার মতো লেগে থাকত। এক গোলে বল ধরে কতবার আর এক গোলে গিয়ে শেষে করেছে ঠিক নেই। ব্রেজিলের ছেলে-বুড়ো-মেয়েরা তখন ওর নাম ধরে মাতোয়ারা হয়ে চেঁচাত—পি-ইন্-ডি! ব্রেজিলের জনসাধারণ ইংরেজি আর কতটুকু জানে? ওদের মুখে মুখে পি-ইন্-ডি আর পি-ইন্-ডি শেষে পিন্‌ডি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বল তার পায়ের ছোঁয়া পেলেই তারস্বরে সবাই 'পিন্‌ডি! পিন্‌ডি!' করে চেঁচাত। বল নিয়ে তীরের মতো একবার ছুটতে গিয়ে বাঁ হাঁটুর চাকতিটা গেল খুলে—তারপর কত অপারেশন কত কাণ্ড। কিন্তু হাঁটু আর ঠিক হল না। তবু পিন্‌ডি নামটা অমর হয়ে থাকল।

পাড়ার ফুটবল খেলায় আমার আবার একটু নাম-ডাক ছিল। তাই যদি কিছু দুর্লভ মার-প্যাঁচ শিখে নেওয়া যায় ভেবে পিন্‌ডিদাকে অনেক দিন তোয়াজ তোষামোদ করেছি। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনও 'সিক্রেট' হস্তগত থুড়ি পদগত হয়নি।

এবারে হাবুলের ওপর আমার রাগের কারণটা বলি।

হাবুলকে পিন্‌ডিদা একটু বেশি আশকারা দেয় বলেও ওর উপর আমাদের তলায় তলায় একটু হিংসে ছিল। এদিকে পিন্‌ডিদার ব্যবহারের জন্যেও আমার ভিতরে ভিতরে একটু ক্ষোভ জমা হয়েছিল। দলের সকলের মধ্যে আমার ওপরেই পিন্‌ডিদা যেন একটু অকরুণ। আমার একমাত্র অপরাধ, পিন্‌ডিদা শুনেছে আমার বাবার কিছু টাকা-কড়ি আছে, আর, বুড়ি ঠাকুমার কাছ থেকে আমি যখন তখন দু-পাঁচ টাকা আদায় করে আনতে পারি। টাকা-কড়ি বাবার কী আছে না আছে নিজেই জানি না, তবে এটা ঠিক যে আমি তার একমাত্র ছেলে আর ঠাকুমার একমাত্র নাতি। তাই, টাকা-পয়সা অন্য বন্ধুদের তুলনায় চেষ্টা করলে কিছু বেশিই নাড়া-চাড়া করতে পারতাম।

...কিন্তু পিন্‌ডিদার অবুঝপনার জন্য কতবার যে আমাকে ঠাকুমার তহবিল শূন্য করে দিতে হয়েছে, আর কত সময় প্রাণের দায়ে মায়ের হাতবাক্স ফাঁক করার জন্য ওই ঠাকুমা-বুড়ির সাহায্য নিতে হয়েছে, সে শুধু আমিই জানি। কোনও কাজে বা কোনও ব্যাপারে খরচের প্রশ্ন থাকলেই

পিন্‌ডিদা অম্লানবদনে সেটা আমার ঘাড়ে চাপাবে। বড় খরচের কোনও ব্যাপারে মেতে উঠলে সেটা ভাগে-সাগে হয় (পিন্‌ডিদাকে বাদ দিয়ে), কিন্তু টুকটাক ছোটখাটো খরচগুলো সর্বদাই আমার কাঁধে এসে চাপে। আপত্তিটা গলা বেয়ে ঠোঁট পর্যন্ত উঠে এলেও শেষ পর্যন্ত আর বার করতে পারি না। আপত্তির কোনরকম আভাস পেলেও পিন্‌ডিদা এ মন করে তাকাবে আর চুপচাপ উঠে চলে যাবে যে শেষ পর্যন্ত নাজেহাল অবস্থা আমারই।

সবে শীতের আমেজ পড়েছে। সামনে কী জন্যে যেন দিন দুই ছুটি আসছে। পিন্‌ডিদা হঠাৎ প্রস্তাব করল, একঘেয়েভাবে আর ভালো লাগছে না, চল্ সকলে মিলে একটু এক্সকারশনে বেরুনো যাক। সামনের রবি সোম মঙ্গল তো ছুটি তোদের, দুই-একটা দিন ভালো কাটবে।

সকলে হুইহই করে সমর্থন করল। আমার মাথায় একটা দ্রুত চিন্তা খেলে গেল, খরচের মোটা দিকটা না আমার ঘাড়েই চাপে। চটপটির গোল মাথাটার দিকে চোখ পড়তে একটা বাঁচোয়া বুদ্ধিও মাথায় এল। পিন্‌ডিদা যখন আমাকে আর কখন সখনও কার্তিককে খরচের ফেরে ফেলে, তখন ও ছোঁড়াই সব থেকে বেশি সায় দেয়, আর লোভে তখন ওর চোখ দুটো চকচক করতে থাকে। কিন্তু নিজের ঘাড়ে কোনও দায় আসছে বুঝলেই মুখখানা এমন করে ফেলে যেন সবে কাল জন্মেছে ও।

আমি সোৎসাহে বলে উঠলাম, খুব ভালো প্রস্তাব পিন্‌ডিদা, চলো গাঁয়ের দিকে যাই—গ্রামে চটপটিদের মস্ত বাগান সেই বাগানে সে কী কচি-কচি শশা আর মিষ্টি জল-ঠাসা জামরুল আর এন্তার ডাব-নারকেল। তারপর পুকুরের মাছ, একবার জিভে ঠেকালে সেই মাছের স্বাদ আর ভুলতে পারবে না—

প্রস্তাব শোনামাত্র কার্তিক তো উঠে এক-দফা নাচ সেরে নিল। বাকি সকলেও বলল, ওয়ানডারফুল আইডিয়া—সেখানে ওদের থাকার আস্তানাও আছে একটা!

পিন্‌ডিদা তার খুদে সার্চলাইট চক্ষুজোড়া লক্ষ্যের দিকে ঘোরাল, —কি রে চটপটি, কথা বলছিস না যেন?

আমতা-আমতা করে চটপটি বলল, তা না, ভাবছি পুকুরের মাছ কী এর মধ্যে তেমন বেড়েছে..।

কেবলু বলে উঠল, খুব বেড়েছে, আশ্বিনের মাঝামাঝি ...পুজোর বাতাস গায়ে লাগলে মাছেরা আগে থাকতে চটপট বেড়ে ওঠে, এ সময় কত লোকের জিভকে খুশি করতে হয়—ওদের একটা দায়িত্ব আছে তো!

পিন্‌ডিদা তুমি এই ব্যবস্থাই পাকা করে ফেলো, চমৎকার হবে, ওয়ানডারফুল হবে—আমি বলি।

আনন্দের চোটে কেবলু সংস্কৃতের অলঙ্কার জুড়তেও ভুলে গেল।

একটু ভেবে নিয়ে পিন্‌ডিদা জিজ্ঞেস করল, তোদের সেই গাঁয়ের বাড়ি এখান থেকে কদ্দুর রে চটে?

আশান্বিত হয়ে চটপটি জবাব দিল, অনেক দূর পিন্‌ডিদা, কম করে ছাব্বিশ-সাতাশ মাইল হবে।

চিন্তাচ্ছন্ন পিন্‌ডিদা মন্তব্য করল, আর একটু দূরে হলে ভালো হত।

মরিয়া হয়ে এবারে শেষ অস্ত্র ছুড়ল চটপটি, কিন্তু যাবে কী করে, সেই গাঁয়ের স্টেশনে নেমেও কম করে আট মাইল পথ, হয়, গরুর গাড়ি নয় পা-গাড়ি ভরসা, এমন ধাড়ধেড়ে গাঁ, পিন্‌ডিদা—

পিন্‌ডিদা আবার চিন্তান্বিত, ফলে চটপটি একটু আশান্বিত। কিন্তু পিন্‌ডিদা যে তখন কোন জগতে বাস করছে আমরা ভাবতেও পারিনি। বলল, দুটো দিন তো আর শশা জামরুল চিবিয়ে আর মাছ খেয়ে কাটতে পারে না—

হাবুল বলে উঠল, কেন, চটেদের গোলার চালও তো চমৎকার।

পিন্‌ডিদা বিরক্ত একটু, তোর মাথাটা এখন পাকল না হেবো, কোনদিন বলবি সেখানকার বাতাসও চমৎকার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হবে না। বলি, সেখানে পাঁঠা-খাসি কি-রকম পাওয়া যায়?

দ্বিগুণ উৎসাহে নিজের ভুল শুধরাতে চেষ্টা করল হাবুল, এন্তার এন্তার—একেবারে জলের দরে খাসা পাঁঠা-খাসি মেলে—

চটপটি এবারে রেগেই গেল হাবুলের ওপর,—তুই সেখানে গে-গে-গেছিস কখনও যে পিন্‌ডিদার কাছে ভাঁ-ভাঁওতা ঝাড়ছিস?

হোঁতকা হাবুল চটপটির রাগের পরোয়া করে না। জবাব দিল, যেতে হবে কেন, গাঁয়ের পাঁঠা-খাসির আবার দাম কী, তাছাড়া গাঁয়ের জীব মাত্রেই অতিথিপরায়ণ, আমরা গেলে দুই একটা পাঁঠা-খাসি হয়তো নিজের থেকেই এসে ব্যা-ব্যা করে গলা পেতে দেবে—

মাথা ঝাঁপিয়ে সায় দিয়ে মোলায়েম করে কার্তিক বলল, তাছাড়া অত বড় বড় বাগান তোদের, দু-দশটা পাঁঠা-খাসি-ছাগল-ভেড়া কি তোদেরই নেই ওখানে—

ব্যস, চটপটির মুখ আমসি।

চিন্তা-গম্ভীর পিন্‌ডিদা আমার দিকে ফিরল,—কী রে সোনা, যাবার ব্যবস্থা কী হবে, আমার বাপু গোরুর গাড়িও পোষাবে না, হাঁটাও না—

চটপটি ঘায়েল হয়েছে, এবার আর একজনকেও ঘায়েল করার মওকা পেয়েছি আমি। হেবোকে।

জবাব দিলাম, একমাত্র উপায় সাইকেল, সাইকেল সফর জমজমাট হবে—আমার, কার্তিকের, চটপটির আর কেবলুর চারজনের চারটে সাইকেল তো আছেই।

পিন্‌ডিদা বলল, আমার হাঁটুর চাকতি খোলা আমি সাইকেল-টাইকেল চালাতে পারব না।

হড়বড় করে বললাম, ওই তো প্যাঁকাটির মতো—মা-মা-মানে বেশ ঝরঝরে হালকা শরীর তোমার, আমরা চারজনে পালা করে অনায়াসে তোমাকে পিছনে নিয়ে চলে যাব—তাছাড়া তুমি লিডার মানুষ, তুমি সাইকেল চালাতে যাবে কেন?

পিন্‌ডিদা মাথা নেড়ে বলল, ঠিক আছে—

হাবুল করুণ আর্তনাদই করে উঠল যেন, কিন্তু আমি যে সাইকেল চালাতে জানি না পিন্‌ডিদা!

কেবলু টিপ্পনী কাটল, একটা সাইকেল ভাড়া করে পশ্চাতং হন্টনং কুরু।

সে-কথায় কান না দিয়ে হাবুল সকরুণ দৃষ্টিতে পিন্‌ডিদার দিকেই চেয়ে আছে,— কী হবে পিন্‌ডিদা?

নির্লিপ্ত মুখে পিন্‌ডিদা বলল, কী আবার হবে—

আমিও খুব মোলায়েম করে তক্ষুনি বলে উঠলাম, হ্যাঁ, কী আর হবে, অমন কত এক্সকারশনে বেরুব আমরা, সবই তো আর সাইকেলে হচ্ছে না—তাছাড়া দিনকে দিন তোর শরীরখানা যা হচ্ছে হেবো—অত পাঁঠা-খাসির দিকে লোভ করিস না।

গা-ঝাড়া দিয়ে পিন্‌ডিদা সোজা হয়ে বসল— কেন ওর পিছনে লেগেছিস, সত্যিই তো ওকে ফেলে আমরা যেতে পারি না।

কার্তিক আঁতকে উঠল,—ওকে পিছনে নিয়ে কে টানবে?

কাউকে টানতে হবে না, ও নিজেই নিজেকে টানবে। —আমার দিকে ফিরল পিন্‌ডিদা, শোন্ সোনা, কালই নিজের সাইকেলে ওকে সাইকেল চড়াটা শিখিয়ে দে, আজ মঙ্গলবার, সেই রবিবারে তো বেরুবো আমরা—এর মধ্যে সাইকেল ছেড়ে এরোপ্লেন চালানোয় এক্সপার্ট হওয়া যায়—তারপর এক্সকারশনের দিনে একটা সাইকেল ভাড়া করে নিলেই হবে।

আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। অত সাধের সাইকেল আমার। কিন্তু আর বাধা দেবার অবকাশ না দিয়েই পিন্‌ডিদা উঠে চলে গেল। যাবর সময় বলে গেল, কালকের মধ্যেই শেখা হয়ে যাওয়া চাই, পরশু চটপটির সাইকেল নিয়ে একবার ট্রায়েল দিতে বেরুবি, ব্যস, তাহলেই ল্যাঠা চুকে গেল!

নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে উচ্ছে করছিল। চটপটিরও মেজাজ খারাপ, কিন্তু আমার থেকে ওর অবস্থা ভালো। আসল ঝড়টা তো আমার সাইকেলের ওপর দিয়েই যাবে। হেবো হাসছে মিটিমিটি। ওর ওই হোঁতকা মুখ ভোঁতা করে দিতে ইচ্ছে করছিল।

যাক, প্রাণপণ পরিশ্রম করে পরদিন ওকে সাইকেল চড়ানো শেখালাম। হেবোর চোট লাগে লাগুক, সাইকেলে চোট না লাগে সেদিকেই আমার সজাগ দৃষ্টি। তবু যতবার ও পড়ে, ততবার ইচ্ছে করে, ওর ওই হাতির শরীর মাটিতে পুঁতে ফেলি।

সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর চড়াটা একরকম রপ্ত করল হেবো। আনন্দ ধরে না, ওর ধারণা, একদিনেই ও এক্সপার্ট সাইক্লিস্ট হয়ে উঠেছে।

আমার সাইকেলের ফাঁড়া কাটল। পরদিন দুপুরে হেবোই চটপটির সাইকেল আদায় করে নিয়ে এল। পিন্‌ডিদার হুকুম, না দিয়ে যাবে কোথায়?

ট্রায়েল দিতে বেরুলাম। আমার সাইকেলে আমি। চটপটির সাইকেলে হাবুল। বার বার ওকে সাবধান করেছি, খবরদার ধারে যাবি না, ঠিক মাঝখান দিয়ে চালাবি।

কিন্তু শুরু থেকে সেই ধার দিয়েই চলেছে। যতবার বলি, এই মাঝখানে যা!

ঘেমে নেয়ে হাবুল জবাব দেয়, আমি কি ইচ্ছে করে ধার দিয়ে যাচ্ছি, শালা হ্যান্ডেল কথা শুনলে তো—

বলতে বলতে রাস্তার একেবারে ধারের একটা বাবলা গাছের সঙ্গে সোজা কলিশন।

—সোনা রে, গেছি রে!

ভগবান রক্ষা করলেন যে রাস্তার পাশের ঢালের দিকে গড়ায়নি। যাই হোক, টেনে টুনে তুললাম ওকে। বললাম, তুই একটা গাধা, তুই একটা হাঁদা—এত বড় রাস্তাটা পড়ে আছে আর তুই কিনা—

হাবুলু বলল, কী করব বল, গাছটা যেন চুম্বকের মতো টেনে নিলে আমায়, যাকগে আর ভুল হবে না, দেখে নিস—

চটপটির সাইকেলের হ্যান্ডেলের যা দশা হয়েছিল দেখলে ও বোধহয় হার্টফেল করত। টেনেটুনে ঠিক করে দিলাম। তারপর আবার রওনা হলাম দুজনে।

এরপর ফাঁকা রাস্তার মাঝখানে বিশাল একটা গোরু শুয়ে। আমি সতর্ক করলাম, এই হেবো, চাপা দিসনে যেন।

ও বলল, পাগল!

কিন্তু তারপরে দুই চক্ষু ছানাবড়া আমার। হাবুল সোজা গোরুটার পেটের ওপর দিয়ে সাইকেল চালিয়ে দিল। প্রথম চাকা পার হল, দ্বিতীয় চাকাও। তাপর হাবুল সাইকেল থেকে তিন হাত ছিটকে গিয়ে মাটি নিল।

আশ্চর্য! গোরুটা তেমনি শুয়ে আছে।

হাবুলের থেকেও আমার গোরুর জন্য চিন্তা হল বেশি। মরে গেল না তো!

এগিয়ে গিয়ে দেখি, গাভী মহাজ্ঞানী শুয়েই আছেন আর জাবর কাটছেন। বড় বড় চোখ দুটো একবার শুধু আমার দিকে ফিরিয়ে যেন বলল, এ-সব কী ইয়ারকি হচ্ছে!

হাবুলকে বললাম, তুই একটা উল্লুক!

হাবুল বলল, কী করব, এবারে শালার সাইকেল ঠিক মাঝখান দিয়ে চলল যে! চটপটি নিশ্চয় কিছু তুকতাক করেছে।

—তোর মাথা করেছে। চল, এবারে পিন্‌ডিদাকে বলে তোর এক্সকারশনে যাওয়া বার করছি।

হাবুল সকরুণ আবেদন জানাল, সোনা ভাই, এই শেষ বার, আর কখনও যদি এমন ভুল করি। রবিঠাকুর তো বলেছেন, ট্রাই ট্রাই ট্রাই এগেন—

আমি খিঁচিয়ে উঠলাম, রবিঠাকুর বলেছেন!

—না না, ইয়ে, কবি মাত্রেই ঠাকুর আমার কাছে, কোনও এক কবি তো বলেছেন। তাছাড়া ভেবে দ্যাখ্ পিন্‌ডিদা তোকেও দুষতে পারে, বলতে পারে তুই শেখাতে পারিসনি বলেই এমনটা হয়েছে—

— তা বলতে পারে বটে। অগত্যা তৃতীয় দফা বেরুলাম ওকে নিয়ে। এবারে ও যথার্থই একটু সংযত হয়ে চালাতে লাগল। ফলে আমারও একটু উৎসাহ বাড়ল।

জিজ্ঞেস করলাম, এই, বাজারের রাস্তায় যেতে পারবি?

হাবুল জবাব দিলে, এখন সব রাস্তাই আমার কাছে ওয়াটার।

কী কুক্ষণে যে ওই পথে এসেছিলাম। লোকজন বেশি না থাকলেও কিছু আছেই। চার মাথার মোড়ে পুলিশ দাঁড়িয়ে। তার সামনেই বিরাশি বছরের এক বুড়িকে চাকার নিচে ফেলে লণ্ড-ভণ্ড কাণ্ড।

—ও বাবা গো! গেলাম গো! মেরে ফেললে গো!

বুড়ির আর্তনাদে আমার সর্বঅঙ্গ হিম। লোকজন দৌড়ে এল। ওদিকে হাবুলেরও পা মচকে গেছে, সে যন্ত্রণায় গড়াগড়ি করছে। কিন্তু তার ওপরেই লোকেরা তাকে এই মারে তো সেই মারে।

কিন্তু বুড়ি সত্যিই মারাত্মক আঘাত কিছু পায়নি। একটু বাদেই তার আর্তনাদ থামল। ওদিকে পুলিশ এসে হাবুলকে জনতার মারের হাত থেকে রক্ষা করল। আমি সেই ফাঁকে ওকে টেনে তুলতে চেষ্টা করলাম।

ও ককিয়ে উঠল, সোনা রে গেছি রে—লোকজন ডেকে এবারে আমাকে কাঁধে তোল রে!

ওকে তো কোনওরকমে টেনে বসালাম। রাগের চোটে দাঁত কড়মড় করে বললাম, তোকে কাঁধে তুলতে হলে যে হাতির অর্ডার দিতে হবে একটা।

ইতিমধ্যে লোকজন সরিয়ে পুলিশ মহারাজ সামনে এসে গোঁফে চাড়া দিয়ে দাঁড়াল,—এ বদমাস! দো রুপয়া ছোড়ো!

আমি হতভম্ব। সভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন বাবা?

ও গাঁক গাঁক করে জবাব দিল, ও বুঢ়িকো তুম জান নিকাল দিয়া!

আমি ঢোক গিলে বললাম, কিন্তু বুড়িকে তো ওরা হাঁটিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে বাবা।

পুলিশ চোখ রাঙাল, ও ঠিক হ্যায়, মগর উনকি হাড্‌ডি জরুর মটক্ গিয়া। তুম দো রুপয়া দেগা কি নহীঁ?

লাল চোখ দেখে আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া। বলি, দেগা বাবা, নিশ্চয় দেগা। এই হেবো, শিগগির দু-টাকা বার করে দে!

মচকানো গোড়ালিতে হাত বুলোতে বুলোতে হাবুল ডুকরে উঠল, সোনা রে, আমার কাছে যে দু-পয়সাও নেই রে!

রাগের চোটে ওর মুণ্ডুপাত করতে করতে নিজের ট্যাঁক থেকে দুটো টাকা বার করে পুলিশের হাতে দিলাম।

তারপর?

তারপর হোঁতকাটাকে একটা রিকশয় তুলে দিয়ে নিজের সাইকেলে চেপে আর চটপটির সাইকেল হাতে নিয়ে জ্বলতে জ্বলতে বাড়ি ফিরলাম।

এখন একটি মাত্র সংকল্প হেবোকে দল থেকে তাড়াতে হবে। পিন্‌ডিদাকে বলে একটা এসপার-ওসপার করতেই হবে। ওর মতো গবেটকে দলে রাখা মানেই পিন্‌ডিদার নামের কলঙ্ক—এ-কথা এবারে জোর গলাতেই বলব আমি। যদি তাড়াতে পারি তবেই টাকা দুটোর শোক ঠান্ডা হবে আমার।

পরদিন বিকেলে আমাদের বসার নির্দিষ্ট জায়গাটিতে গোল হয়ে বসেছি সকলে। একটু উঁচু ঢিবির মতো জায়গাটিতে পিন্‌ডিদা, তার সামনে গোল হয়ে বাকি সকলে। কেবলু কার্তিক চটপটি আমি—আর একটু ফারাকে হাবুলও। পায়ে বেশ করে চুন হলুদ লাগিয়ে আর ফেটি বেঁধে লাঠি ভর করে আসতে হয়েছে তাকে। এসেছে কারণ, মাথার ওপর বিপদ, সেটা ও ভালই টের পেয়েছে। এই ব্যথা নিয়েও এল দেখে যদি একটু মায়া হয় পিন্‌ডিদার, এই আশা। করুণ চোখে মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাচ্ছে।

কিন্তু আমিই সব থেকে অকরুণ, নির্মম। আজ পার পেয়ে গেলে কাল আর ওর কিছু মনে থাকবে না। তারপর আমাদের নামেই পিন্‌ডিদার কাছে লাগন-ভাগান দেবে। তলায় তলায় দলের সকলেই আমাকে ফুসলেছে, এবার আর কিছুতে হোঁতকাটাকে ছাড়া হবে না।

আমরা অপেক্ষা করছিলাম। পিন্‌ডিদার আসার মিনিটখানেকের মধ্যে লাঠি-ভর করে খোঁড়াতে খোঁড়াতে হেবো এল। দেখে আমার মেজাজ আরও খিঁচড়ে গেল—এই কসরত করে কে তোকে আসতে বলেছে?

পিন্‌ডিদা আড় চোখে ওকে দেখে নিল একটু। পায়ে চুন-হলুদ লাগানো ফেটি আর হাতে লাঠি দেখেই গম্ভীর। ওর এক্সকারশনে বেরুনোর বারোটা বেজে গেছে বুঝেই বিরক্ত বোধহয়। হেবোর লেগেছে খবর পেয়েছিল, কিন্তু এমন অবস্থা ভাবেনি। ভিতরে ভিতরে আমার আরও আনন্দ হল।

পিন্‌ডিদা আমার দিকে তাকাল, এরকম কাণ্ড হয়ে গেল কী করে?

নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলাম আমি। হেবোর মুখের ওপর একটা নির্মম দৃষ্টি হেনে দুদিনের ঘটনা আদ্যোপান্ত বললাম পিন্‌ডিদাকে—বুড়িকে চাপা দিয়ে মারের হাত থেকে বেঁচে পুলিশের খপ্পরে পড়া পর্যন্ত।

আমার বলা শেষ হতে না হতে পিন্‌ডিদা আঁতকেই উঠল প্রায়। চেঁচিয়ে বলে উঠল, পুলিশকে দু-টাকা দিলি তুই—দিয়ে দিলি?

শুধু আমি কেন, পিন্‌ডিদার কথা শুনে আর মুখ-চোখ দেখে সকলেই ভ্যাবাচাকা। বললাম, না দিয়ে করব কী, গুঁতিয়ে আদায় করত নয়তো থানায় নিয়ে যেত।

—উঃ, হায়রে হায়রে হায়রে হায়...নাঃ, তোদের সঙ্গে আর আমার পোষাবে না! —ক্ষোভে দুঃখে পিন্‌ডিদার যেন চোখে জল আসার উপক্রম।

ভয়ে ভয়ে কার্তিক জিজ্ঞাসা করল, টাকা না দিয়ে বীরের মতো থানায় চলে গেলে ভালো হত বলছ?

সঙ্গে সঙ্গে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠল পিন্‌ডিদা—তোদের মাথায় কিছু আছে? গ্যাধার মাথার ঘিলুর থেকে তোদের মাথার ঘিলুর কতটুকু তফাত? না রে বাবা না, তোদের সঙ্গে আর না— শেষ পর্যন্ত দু-দুটো টাকা কিনা পুলিশ নিলে ওর কাছ থেকে! উঃ, ভিতরটা জ্বলে যাচ্ছে আমার—

বে-গতিক দেখে কেবলু ঠান্ডা করতে চেষ্টা করল তাকে। সানুনয়ে বলল, আ-আমরা তো-তোমার তুলনায় প্রায় অ-অর্বাচিন পিন্‌ডিদা, এ অবস্থায় কী করা যেত বলো না? তোমারই যদি এ-রকম হত কী করতে?

চোখ পাকিয়ে পিন্‌ডিদা বলল, হত মানে? হয়েই ছিল—আর তারপর যা করার আমি করেছি।

কার্তিক আর চটপটি একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, তার মানে তুমিও কি কাউকে চাপা দিয়েছিলে নাকি?

—আলবৎ দিয়েছিলাম।

—কাকে? কাকে পিন্‌ডিদা?

—পুলিশকে।

—পুলিশকে! বলো কী?

—হ্যাঁ পুলিশকে, আচমকা সাইকেলের ধাক্কায় বেচারা উঁচু ড্রাম থেকে উলটে পড়েছিল একেবারে। সেও এখানকার পুলিশ নয়, কলকাতার পুলিশ।

শুধু আমি বাদে সকলে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, এমনকি ব্যথা ভুলে হাবুলও,—তারপর? তারপর?

—তারপর আর কী? পুলিশ আমাকে ধরে এই মারে তো সেই মারে। আমি বললাম, আমার দোষ নয় বাপু সাইকেলের চাকার দোষ—আর তোমার কলকাতার রাস্তার দোষ। পুলিশ তখন আমাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, হিন্দিমে বোলো! শোনার আগেই ব্যাটা যারা ভিড় করে এসেছিল চোখ পাকিয়ে তাদের তাড়িয়ে দিলে। তারপর আর আমার হিন্দি কৈফিয়ত শুনতে চাইলে না, হুকুম করল, চার রুপয়া নিকালো আব্‌ভি, নহী তো তুমকো হাড্ডি চুর-চুরায়ে দেগা—

কার্তিক মন্তব্য করল, ও-বাবা, সোনা তো এর থেকে ঢের ভদ্র পুলিশের পাল্লায় পড়েছিল!

হাবুল খাপ্পা,—আঃ, কেতো! ইনটারেস্ট নষ্ট করছিস কেন, পিন্‌ডিদাকে বলতে দে না! তারপর তুমি কী করলে পিন্‌ডিদা?

গম্ভীর মুখে পিন্‌ডিদা জবাব দিল, পুলিশের ওই চোখ রাঙানিকে এ শর্মা থোড়াই পরোয়া করে। কিন্তু যেন বেঁচে গেলাম এমনি মুখ করে পকেটে হাত ঢোকালাম। তারপর ওর চোখে চোখ রেখে খুব তাৎপর্যের সুরে জিজ্ঞাসা করলাম, এই দিনের বেলায় সকলের চোখের ওপর টাকা নেবে? ভেবে দ্যাখো।

ব্যাটা কাজের বেলায় বাংলা দিব্যি বোঝে। আমার বলার ধরন দেখে চারদিকে তাকাল একবার। ধাক্কা দেবার ফলে পুলিশ কী করে দেখার জন্য তখনও দূরে দাঁড়িয়ে কেউ কেউ এদিকেই তাকিয়েছিল। ও তক্ষুনি বুদ্ধি ঠিক করে ফেলল। রাস্তার পাশের পানের দোকানটা দেখিয়ে দিয়ে হুকুম করল, ওই পানওয়ালার কাছে চার রুপেয়া রেখে এস।

ঘাড় বাঁকিয়ে পানওয়ালাকে দেখলাম।—পিন্‌ডিদা বলে যেতে লাগল, দোকানের সামনে তিন-চারটে খদ্দের, লোকটার মাথাটুকু শুধু দেখা গেল। গটগট করে সাইকেল নিয়ে আমি ফুটপাথে পানের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। পুলিশ ব্যাটা ড্রাম সোজা করে আবার তার ওপরে উঠে দাঁড়াল—কিন্তু চোখ জোড়া এই দিকে।

তারপর? তারপর?—কেবলুর আর তর সয় না—পলায়নং নাকি পিন্‌ডিদা?

—গাধা আর কাকে বলে, পালাতে গেলে ও দৌড়ে এসে আবার ধরলে হাড়গোড় আস্ত রাখবে? শোন্, অন্য খদ্দের চলে যেতে গম্ভীর মুখে পানওয়ালাকে বললাম, এই! ওই পুলিশ চারটে টাকা দিতে বলেছে—জল্‌দি!

—পানওয়ালা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল, তারপর ড্রামের ওপর দাঁড়ানো বুক চিতানো পুলিশের দিকে। পুলিশের শ্যেন দৃষ্টি তখনও এদিকে। বিমূঢ় মূর্তি পানওয়ালার সঙ্গে চোখাচোখি হতে পুলিশ চট্ করে একটা হাত তুলে চারটে আঙুল দেখিয়ে দিল, অর্থাৎ চার রুপয়া।

—বিমর্ষ পানওয়ালা তখন কাঠের বাক্স খুলে চারটে টাকা দিল, আর সে-টাকা পকেটে ফেলে আমি সাইকেলে চেপে হাওয়া!

পিন্‌ডিদার কথা শেষ হতে আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। বিপদকালে এমন বুদ্ধি কেউ কি কল্পনা করতে পারবে!

ফোঁস করে একটা বড় নিশ্বাস ফেলল পিন্‌ডিদা। –শোন্ তোরা, এ-রকম বোকামি দেখলে সহ্য করা শক্ত, তাই আমার একটু অকরুণ না হয়ে উপায় নেই। ...সোনা করকরে ছ-টাকা লোকসান করেছে–দু-টাকা পকেট থেকে গেছে, আর চার টাকা লাভ হতে পারত তাও গেছে–এই মোট ছ-টাকা ফাইন করা হল সোনাকে। ...চটপটি, কাল সোনার কাছ থেকে টাকা ছটা নিয়ে বিকেলে আসার আগে বিনোদের দোকান থেকে গরম কাটলেট ভাজিয়ে নিয়ে আসবি।

আমি আর আবেদন করারও ফুরসত পেলাম না। আমার হতভম্ব মূর্তির ওপর একটা ক্ষুব্ধ তির্যক দৃষ্টি হেনে পিন্‌ডিদা উঠে চলে গেল।

## পাঁটার ঘুগনি

মাঠে এসে পর্যন্ত পিন্‌ডিদা কেমন যেন একটু অন্যমনস্কের মতো, তার আধ-হাত উঁচু জায়গাটিতে বসেছিল। আমরা পাঁচ মক্কেল, অর্থাৎ আমি, হোঁতকা হাবুল, চটপটি, কেবলু আর কার্তিক তার সামনে একটা হাফ-সার্কেল করে ব্রেজিলের চমকপ্রদ নতুন কিছু শোনার আশায় বসে আছি। পিন্‌ডিদার ওপর ভিতরে ভিতরে অনেক সময় আমার মেজাজ বিগড়য় সত্যি কথা, কিন্তু পিন্‌ডিদা, মুখ না খুললে আসর যে একটুও জমে না এটা তার থেকে ঢের বড় সত্যি কথা। রকম-সকম দেখে মনে হচ্ছে আজ পিন্‌ডিদার এক ফোঁটাও মুড নেই।

আমরা সকলেই পিন্‌ডিদার ভক্ত বটে, কিন্তু হাবুলের মতো কেউ নয়। ওই হোঁতকার মর্ম কেবল পিন্‌ডিদাই বোঝে–এই গর্বে ডগমগ। পিন্‌ডিদার মুড একটু উসকে দেওয়ার আশায় হাবুল তার পুরু ঠোঁটে হাসি মাখিয়ে বলল, আচ্ছা পিন্‌ডিদা, ব্রেজিলে ফুটবল খেলার দাপট দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ ভক্তের কাছে তুমি যেমন পি-এন্-ডি (প্রদীপনারায়ণ দত্ত) থেকে পিন্‌ডি হয়ে গেলে, আমাদের কেবলু তেমনি কাবুলে গিয়ে সংস্কৃতের দাপট দেখাতে পারলে কী হবে?

কেবলু করকরে চোখে হাবুলের দিকে একবার তাকিয়ে আধ হাত সরে বসল। কারণ ওইটুকু অপরাধের জন্যেই হেবোর একটা গাঁট্টা মাথায় এসে পড়তে পারে। বেচারা কেবলু বরাবর সংস্কৃততে একশোর মধ্যে পাঁচ-দশ পায় বলেই সংস্কৃত নিয়ে একটু বেশি মাথা ঘামায় আর কথার ফাঁকে দুই-একটা সংস্কৃত বুলি আওড়ায়–এজন্য পিন্‌ডিদার মতো মানুষকে উস্‌কে দেওয়ার কোনও মানে হয়?

ভয়ে ভয়ে সে পিন্‌ডিদার দিকে তাকাল। আমরাও। কিন্তু পিন্‌ডিদা শুনেছে কী শোনেনি তাই বোঝা গেল না, অন্যমনস্কের মতো তেমনি আর এক দিকেই চেয়ে রইল। কিন্তু একটু বাদে তার জবাব শুনে কেবলু বিষম একটা ধাক্কা খেল, আর আমরাও হকচকিয়ে গেলাম।

ঘাড় না ফিরিয়ে তেমনি বিমনা সুরে পিন্‌ডিদা বলল, পাঁটা।

ছোট-খাটো একটা বোমা ফাটলেও আমাদের এরকম দশা হত কি না সন্দেহ। হাবুল পর্যন্ত তোষামোদের হাসি হেসে উঠবে কি না ভেবে না পেয়ে বড় বড় চোখ করে প্রথমে পিন্‌ডিদা এবং পরে আমাদের দিকে তাকাল।

পিন্‌ডিদার উদাস চোখ দুটো এবার আস্তে আস্তে আমাদের দিকে ফিরল। আমাদের দিকে ঠিক

নয়, কেবলুর মাথার উপর এসে স্থির হল। ও-রকম তন্ময় চাউনি দেখেও আমরা ঘাবড়ে গেলাম—কেবলুর মাথাটাকে সত্যিই পাঁটার মাথা দেখেছে কি না পিন্‌ডিদা কে জানে।

—পাঁটার সংস্কৃত শব্দরূপটা বল দেখি কেবলু?

কেবলুর ঘেমে ওঠার দাখিল, পণ্ডিতমশাই পড়া জিজ্ঞাসা করলে যেমন ঠোঁট নেড়ে বিড়বিড় করে ঝালিয়ে নিতে চেষ্টা করে তেমনি নিজের মনেই লতা শব্দের অনুরূপে অস্ফুট শব্দে আওড়াল, পাঁটা পাঁটে পাঁটা—

ওর পাশেই আমি। লতা লতে লতার মতো পাঁটা পাঁটে পাঁটা কানে আসতে ওকে বাঁচাবার জন্যে উরুতে একটা রামচিমটি কাটলাম আমি। সেই চিমটি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেবলুর মাথা খুলে গেল।

সদর্পে বলে উঠল, ছাগঃ—ছাগৌ—ছাগাঃ—!

—হতভাগাঃ! কটমট করে পিন্‌ডিদা আমার দিকে তাকাল। —চিমটি কেটে এই বিদ্যেটা ওর মুখ দিয়ে তুই ফলালি বুঝি?

চিমটি কাটতে দেখে ফেলেছে। কিন্তু সত্যিই আমি কিছু বলিনি। অতএব প্রতিবাদ করলাম, না, চিমটি কেটেছি ঠিক—কিন্তু কিচ্ছু বলিনি।

ছুরির ফলার মতো দু-চোখ পিন্‌ডিদা এবার আবার মুখের ওপর বসিয়ে দিল। —আচ্ছা, এবার বল্ তাহলে, না পারলে তোর চিমটি কাটা বার করছি।

মাথার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে গেল কেমন। চট্ করে ভেবে নিতে চেষ্টা করলাম, মনে পড়ল না। অতএব এবারে আরও জোর দিয়ে প্রতিবাদ করলাম, বা রে, আমার তো সায়েন্স গ্রুপ!

পিন্‌ডিদার রুষ্ট চাউনি এবারে আমার পাশে চটপটির দিকে ঘুরল। সেও আক্রান্ত হবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। তুই বল্।

চটপটিও আমার মতোই পালাবার পথ খুঁজল। —আমারও তো সায়েন্স গ্রুপ!

—তুই? পিন্‌ডিদা আরও রেগে গিয়ে কার্তিকের ওপর চড়াও হল।

ভ্যাবাচাকা খেয়ে কার্তিক বলে বসল, আমার তো হোমসায়েন্স, জ্যান্ত ছাগলের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক, কেটেকুটে এনে দিলে রান্নার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি।

রাগের চোটে পিন্‌ডিদার রোগাটে মুখ থমথম করছে। হঠাৎ এত রাগের কী এমন কারণ ঘটল ভেবে পেলাম না। দুচোখ যেন জ্বলছে।

—এই হেবো, অজ মানে কী রে?

—মোটা হেবো লাফিয়ে উঠল, ছাগল ছাগল!

—অজৌ মানে?

—ডবল ছাগল। সূত্র ধরে ফেলে হেবো সানন্দে জবাব দিল।

—আর এরা সকলে মিলে কী?

—অজাঃ! ঠাস আনন্দে হেবোর দুমণি চর্বিঅলা শরীরটা ফেটে পড়ার দাখিল?

পিন্‌ডিদার অগ্নিদৃষ্টি আবার আমাদের দিকে ঘুরল। —আজ শনিবার, বিনোদের দোকানে পাঁটার ঘুগনি হয়েছে, দেখে আসা পর্যন্ত মেজাজ বিগড়ে আছে আমার—ভগবান যে কেন তোদের পাঁটা করে পাঠাল না ভেবে পাইনে—তাহলে তো আপসোস থাকত না আমার। পাঁটার বুদ্ধি নিয়ে এসেছিল সব, অথচ নির্ভেজাল পাঁটা নয়!

এতক্ষণে পিন্‌ডিদার সমস্ত আচরণের হেতু বোঝা গেল। পাঁটার ঘুগনির চিন্তাই করছিল, ঘুরে ফিরে তাই পাঁটার প্রসঙ্গ। আমার পা-জামার পকেটে খরখরে দুটো টাকা আছে—সে দুটো যেন নড়াচড়া করে উঠল একদফা। অর্থাৎ পকেটে থাকবে কী থাকবে না সন্দেহ। কিন্তু টাকার চিন্তার থেকেও মেজাজ দ্বিগুণ চড়া এখন। যা বলল, তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে আমরা নির্ভেজাল পাঁটা হলে

তার আর কোনও খেদ থাকত না, ইচ্ছেমতো পাঁটার ঘুগনি খেতে পারত। সংস্কৃত অজ শব্দটা মনে পড়ল না বলে পাঁটা বলবে এতটা সহ্য করার মানে হয় না।

হৌতকা হাবুলের হাত বাঁচিয়ে পিন্‌ডিদার সঙ্গে একটু আধটু তর্ক-বিতর্ক আমিই করে থাকি। চটপটিও বেশির ভাগ সময় আমার দিকেই থাকে। ওরও হাঁড়ি মুখ, অপমান গায়ে লেগেছে।

বললাম, পিন্‌ডিদা, ছাগল-পাঁটার সংস্কৃত বলতে না পারাটা এমন একটা সাংঘাতিক লজ্জার কথা নয়—ইংরেজি বা বিজ্ঞান জানা যে-কোনও অজ পুরুতের ছেলেও বলে দেবে—ওটা চর্চার ব্যাপার, আমাদের চর্চা নেই বলেই চট করে মনে পড়েনি—তা বলে আমাদের তুমি পাঁটা বলতে পার না। কোনও জেনারেল নলেজ অথবা উপস্থিত বুদ্ধির ব্যাপার হলে তখন বলতে পারতে।

পিন্‌ডিদা পিটপিট করে দেখতে লাগল আমাকে। তারপর কথা নয়তো, যেন ঠাট্টার চাবুক। বলল, বর্ধমানের এই খুপরি গণ্ডির মধ্যে পড়ে আছিস, জেনারেল নলেজের কথা থাক—খুব সোজা উপস্থিত বুদ্ধির ঘিলু একটু নাড়াচাড়া করে দেখব? ট্যাঁকে আছে কিছু? উপস্থিত বুদ্ধির দেমাকে ঘা পড়লে পাঁটার ঘুগনি আসবে?

পিত্তি জ্বলে গেল। টাকার জন্য আর কোনও মায়াই থাকল না। স্কুলের মাস্টারদের কাছেও আমার জেনারেল নলেজ আর উপস্থিত বুদ্ধির সুনাম। বললাম, আসবে, তুমি চেষ্টা করে দেখো।

আর জমে উঠল। সকলে মড়েচড়ে বসল। পিন্‌ডিদার মুখে মন-ভুলানো হাসি। বলল, রাগ করিস না রে সোনা, বিনোদের দোকানে ওই পাঁটার ঘুগনির সাইনবোর্ড লটকাতে দেখে আমার মেজাজ ঠিক ছিল না—তাই কী বলতে কী বলেছি। তোর হিম্মত আছে, উপস্থিত বুদ্ধিও নিশ্চয় আছে। তবু একটা সত্যি ঘটনা বলি শোন, অনেকক্ষণ তোরা মুখ বুজে কান ফাঁকা করে বসে আছিস।

মিষ্টি কথায় আর ভোলবার পাত্র নই। ফাঁদে ফেলে কখন কোণঠাসা করে টাকা দুটো বার করে নেয়, সেই কারণে আমি কান খাড়া করে থাকলাম।

আরও মোলায়েম করে পিন্‌ডিদা জিজ্ঞাসা করল, গেম ওয়ার্ডেন কাকে বলে জানিস তো?

আমি জবাব দিলাম, শিকার আছে এমন জঙ্গলের প্রহরীকে।

খুশিতে আটখানা হয়ে পিন্‌ডিদা বলল, তুই একটা হিরের টুকরো ছেলে রে সোনা—ঠিক বলেছিস।

সকলের সশ্রদ্ধ চাউনি সত্ত্বেও আমি উৎকর্ণ। পিন্‌ডিদাকে বিশ্বাস নেই।

পিন্‌ডিদা বলে চলেছে :

তখন ফুটবলের সিজন নয়, আমি বন্দুক কাঁধে বেড়াতে বেরিয়ে পড়েছি। প্রায় দেড়শত মাইল দূরে একটি বন্ধুকে সঙ্গে করে এসে উপস্থিত হয়েছি।

অনেক শিকার আছে এমন একটা জঙ্গলের কাছাকাছি একটা বাংলোয় উঠেছি। মনের সাধে এটা-সেটা শিকার করছি। আর মহাফুর্তিতে দিন কাটাচ্ছি। আমার শিকারের লাইসেন্স আছে কিন্তু বন্ধুর নেই। ও-সব জায়গায় লাইসেন্স ছাড়া শিকার করা গুরুতর অপরাধ। ধরা পড়লে পাঁচ বছরের জন্য শ্রীঘর। কিন্তু বন্ধুর লাইসেন্স না থাকলেও আমার ওপর অগাধ বিশ্বাস ছিল। আমি বলেছি কুছ-পরোয়া নেই—আমি আছি—সেও নিশ্চিন্ত।

সেদিন হরিণের মাংস একটু বেশি খাওয়া হয়ে গেছল। আগের রাতে হরিণের এগারো পদ মাংস রান্না হয়েছিল—পরের দিন লাঞ্চে চোদ্দো পদ। তবু ফেলে ছড়িয়ে লোককে এস্তার দিয়ে থুয়েও কি শেষ হয়!

দুপুরে গলা পর্যন্ত গিলে বন্ধু তো লম্বা ঘুম লাগিয়েছে। আমার রাতেই ভালো ঘুম হয় না তার

আবার দিনে ! আমি বেড়াতে বেরিয়ে পড়লাম। খালি হাতে জঙ্গলের ধার দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে অনেক দূর চলে এসেছি।

হঠাৎ সামনে একজন জোয়ান চেহারার লোকের সঙ্গে দেখা। মুখে মিষ্টি মিষ্টি হাসি। অভিবাদন জানিয়ে খুব ভদ্রতা সহকারে বলল, শ্রীমানকে এখানে নতুন মনে হচ্ছে?

বললাম, তাই বটে।

লোকটা বলল, এখানে শিকারের লক্ষ্য ছাড়া কেউ আসে না—আর শিকারের মতো জায়গাও বটে। নিশ্চয় শিকারেই এসেছ?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

লোকটা সোৎসাহে আরও খাতির জমাতে চেষ্টা করল, তা মনের মতো শিকার-টিকার পাচ্ছ তো?

আমি হাবার মতো বললাম, নিশ্চয়। এই কালই তো দেড়শো পাউন্ড ওজনের একটা হরিণ মেরেছি—খেয়ে আর কুলিয়ে উঠতে পারি না—কী সুন্দর মাংস!

—সত্যি বলছ?

—তোমাকে মিথ্যে বলার কারণ কী?

মহা খুশি হয়ে লোকটা বলল, বাঃ ! বেশ বেশ। ...কিন্তু তুমি কি জঙ্গলের চারদিকে নোটিস টাঙানো দেখোনি—এ জঙ্গলে হরিণ কমে গেছে—এই অফ-সিজনে হরিণ মারা কড়া নিষেধ—এখন হরিণ মারলে কঠিন শাস্তি?

তখনও আমার মাথায় কিছু ঢোকেনি। বললাম, দেখেছি, কিন্তু নিষেধ আর কে মানছে বলো।

লোকটার চোখে-মুখে আনন্দ উছলে পড়ছে যেন। এবার পকেট থেকে একটা চাকতি বার করে সামনে ধরল, সেই সঙ্গে হাতে একটা রিভলবারও। তেমনি অমায়িক রসিকতার সুরে বলল, আমার পরিচয়টা পেলে কি এবারে? এ জঙ্গলের গেম ওয়ার্ডেন আমি।

আমার তো চক্ষু চড়কগাছ। ব্যাটা তো খেয়েছে এবারে আমাকে! প্রাণের দায়েই আমি হা-হা শব্দে হেসে উঠলাম হঠাৎ। হাসি আর থামেই না।

লোকটা হকচকিয়ে গেল কেমন। তারপর ভুরু কোঁচকাল।

হাসি থামিয়ে আমি বললাম, এবার তাহলে নিজের পরিচয়টাও তোমাকে দিই—পৃথিবীর সব থেকে সেরা মিথ্যেবাদী আমি, পর পর তিনবার গোল্ড কাপ পেয়েছি।

লোকটা হাঁ একেবারে। —এরকম কমপিটিশনও আবার আছে নাকি?

আমিও অবাক যেন। —'দি গ্রেটেস্ট লায়ার' উপাধির নাম শোনোনি? জঙ্গলের জানোয়ারদের ছাড়া যাকে খুশি জিজ্ঞাসা করো—তারাও বলে দেবে ব্রেজিলের কোথায় এ কমপিটিশন হয়। আর আমার কেরামতির প্রমাণ তো নিজেই পেলে।

আমি হাসতে হাসতে চলে এলাম। ব্যাটা গেম ওয়ার্ডেন হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ডেরায় ফিরেই তল্পিতল্পা গোটালাম। ব্যাটা এখানে যদি খবর নিতে আসে তাহলে আর রক্ষা নেই। বন্ধুকে নিয়ে একটা জিপে চেপে মাইল কুড়ি দূরে আর এক জায়গায় এসে উঠলাম।

চারটে দিন কেটে গেল। দুই দুই বন্ধুতে তোফা আনন্দে আছি। পাঁচ দিনের দিন ভূত দেখার মতোই চমকে উঠলাম হঠাৎ।

বন্দুক কাঁধে দুজনেই শিকারের চেষ্টায় জঙ্গলে ঢুকতে যাব—সামনেই যমদূতের মতো সেই গেম ওয়ার্ডেন। দেখা মাত্র কঠিন মুখ। ব্যাটা ঠিক চিনেছে আমাকে।

বলল, হ্যালো মিস্টার দি গ্রেটেস্ট লায়ার!

শুকনো মুখে আমি বললাম, হ্যালো মিস্টার গেম ওয়ার্ডেন!

আমার তখন প্যালপিটিশন শুরু হয়েছে, কারণ লাইসেন্স শুধু আমার আছে, বন্ধুর নেই। ব্যাটা

তো এক্ষুনি এগিয়ে এসে লাইসেন্স দেখতে চাইবে। দুজনেরই কাঁধে বন্দুক, পরনে শিকারের পোশাক—যার কাছে লাইসেন্স নেই তাকে ধরে সোজা শ্রীঘরে চালান দেবে পাঁচ বছরের জন্য।

লোকটা কাছে এগিয়ে আসার আগে আমি বন্ধুকে ফিস ফিস করে বললাম, এক পা নড়বে না, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকো—ঠিক সময় ঠিক কাজ করবে।

গেম ওয়ার্ডেন ততক্ষণে কাছে এসে দুজনের মাঝখানে হাত বাড়িয়ে হুকুমের সুরে বলল, দেখি লাইসেন্স?

এই পর্যন্ত বলে সব কটি উৎকণ্ঠিত মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে আমার মুখের ওপর থামাল। হাসছে মিটিমিটি।

হেবো উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল, তারপর? তারপর পিন্‌ডিদা?

মিটমিটি হেসে পিন্‌ডিদা বলল, তারপর কি সেটা সোনা বলবে—ওর তো উপস্থিত বুদ্ধির মাথাখানা কম নয়। আমার লাইসেন্স আছে, বন্ধুর নেই—কিন্তু দুজনকেই বাঁচতে হবে। কী করা যেতে পারে? সোনা বলে ফেল্ চটপট, ওই অবস্থায় তো আর ভাবার সময় ছিল না।

আমি বললাম, তোমরা দুজনেই ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘায়েল করলে?

—গেম ওয়ার্ডেনকে? মাথা খারাপ! ও-দেশের ডিটেক্‌টিভের কেরামতি জানিস? ধরে সোজা ফাঁসিতে লটকে দেবে না?

আমি আবার একটু মাথা ঘামিয়ে বললাম, তোমার বন্ধু তাহলে ধাঁ করে জঙ্গলে সেঁধিয়ে গেল?

—উঃ! হাসালি মাইরি। গেম ওয়ার্ডেনের কাছ থেকে জঙ্গলে ঢুকে পালাবে?

ফাঁপরে পড়ে গেলাম। নিষ্কৃতি পাবার আর একটাই রাস্তা আছে। বললাম, বুঝেছি, তুমি লাইসেন্স দেখাতে সময় নিতে লাগলে, সেই ফাঁকে তোমার বন্ধু চোঁ-চোঁ দৌড়।

পিন্‌ডিদা আক্ষেপে নিজের কপালেই আঘাত করে বসল। —হায়রে হায়, তোদের নিয়ে কোথায় যাব আমি! আরে গাধা গেম ওয়ার্ডেনের কাছ থেকে ছুটে পালানো যায় না—একসময় না একসময় ধরবেই তাকে—বেশি দৌড়লে চেঁচামেচির চোটে অন্য লোকে ধরবে।

আমি বিমূঢ় মুখে বললাম, তাহলে কী করে রক্ষা পেলে?

এবারে একগাল হেসে পিন্‌ডিদা বলল, প্রায় কাছাকাছি এসে গেছলি—আর একটু মাথা খাটালেই হত! হঠাৎ চোঁ-চোঁ একজন দৌড়ালো বটে, কিন্তু আমার বন্ধু নয়—আমি।

—তুমি! আমি হাঁ। কিন্তু তোমার কাছে তো লাইসেন্স ছিল?

—সেই জন্যেই তো আমি তীরের মতো পালাতে চেষ্টা করলাম রে বোকা! গেম ওয়ার্ডেন একেবারে কাছে আসার আগেই ফুটবল খেলার ধাঁচে এঁকে-বেঁকে ছুট। চিৎকার করে গেম ওয়ার্ডেন আমার পিছু ধাওয়া করল। ঘুরে ঘুরে প্রায় আধ মাইল দৌড়ে শেষে ধরা দিলাম। আর বেশি দৌড়ে লাভ নেই, কারণ জঙ্গলের অনেকটা বৃত্তাকারে চক্কর খাওয়া হয়ে গেছে। এরপর ব্যাটা হয়তো পিছন থেকে গুলি করে বসবে। দুই-একবার শাসিয়েওছে।

ধরা পড়তেই বজ্রমুষ্টিতে আমার বুকের জামা চেপে ধরল। হাঁপাচ্ছে! আমি প্লেয়ার, এর পাঁচগুণ দৌড়ে আমার অভ্যাস আছে।

বললাম, একি কাণ্ড, এভাবে অভদ্রের মতো আমার জামা চেপে ধরলে কেন?

—চালাকি পেয়েছ? রাগে কাঁপছে গেম ওয়ার্ডেন। —শিকার করছ যে লাইসেন্স কোথায়?

—কী চাও? লাইসেন্স? তাই বলো, আমি আবার একটু কানে খাটো। ধীরে সুস্থে লাইসেন্স বার করে সামনে ধরলাম। —এই দেখো।

লাইসেন্স আর তার মধ্যে আমার ফোটো দেখে গেম ওয়ার্ডেন হাঁ। —তোমার লাইসেন্স আছে তাহলে এভাবে ছুটে পালাচ্ছিলে কেন?

আমি ভালো মুখ করে বললাম, পালাচ্ছিলাম না তো, একটু দৌড় প্র্যাকটিস করছিলাম।

এতক্ষণে চালাকিটা মাথায় ঢুকল গেম ওয়ার্ডেনের। চকিতে ঘুরে দাঁড়াল। কিন্তু জঙ্গল এতটা ঘুরে দৌড়ানো হয়েছে যে সেখান থেকে বন্ধুর টিকিও দেখা যায় না। আমি নিশ্চিত, বন্ধু ঘুমুতে ঘুমুতে সরে পড়তে পেরেছে। তবু শেষ চেষ্টা করার জন্য গেম ওয়ার্ডেন হনহন করে সেদিকে ফিরে চলল।

হাসি চেপে পিন্‌ডিদা নিরীহ মুখে বড়সড়ো একটা হাই তুলে উঠে দাঁড়াল। ডাকল, চল্ রে সব, বিনোদের পাঁটার ঘুগনি আবার না ফুরিয়ে যায়।

# চিকেন রোস্ট

মেজাজপত্র আমাদের কারওরই ভালো ছিল না। কলকাতার গরম বাতাসটা সবার আগে যেন হু-হু করে এই বর্ধমানেই এসে ঢুকেছে। লাঠি সোঁটা সোডার বোতল অ্যাসিড বোমা আগুন ছোরা মারামারি কাটাকাটির উৎসব লেগেছে। আজ এ পাড়ায় খুন তো কাল ও পাড়ায়, আজ উত্তরে তাণ্ডব তো কাল মধ্যয় আর পরশু দক্ষিণে। মানুষগুলোকে যে কি রক্তের নেশায় পেয়েছে আমরা ভেবে পাই না। এর মধ্যে আমাদের বয়সের ছেলে ছাড়াও অনেক কচি-কাঁচা গিয়ে পর্যন্ত ভিড়েছে। ফলে পুলিশি জুলুমের কড়াকড়ি বেড়েছে। এখানকার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিসট্রেটটি যেমন রাগী তেমনি দুর্ধর্ষ শাসক। এই সব মারমুখী ছেলেদের আর তাদের মুরুব্বিদের তিনি টিট করে ছাড়বেন বলে বদ্ধপরিকর। তা কিছুটা টিট করেও এনেছেন। দলমত নির্বিশেষে কত মস্তান আর তার চাঁইরা জেলের ভাত খাচ্ছে এখন ঠিক নেই। তাছাড়া ঠেঙানি তো আছেই। পুলিশ আর কবে শুধু অপরাধীকে ধরে ঠেঙায়? অপরাধ করা সম্ভব ধরে নিয়েও কতজনকে তারা মনের সুখে ঠেঙিয়ে থাকে। আর, ভবিষ্যতে অপরাধী হয়ে উঠতে পারে এমন সন্দেহ হলেও নাকি অনেক নির্দোষ লোককে ধরে ঠেঙিয়ে থাকে তারা। আমি হাজতে একবার পুলিশের চোর ঠেঙানো দেখেছিলাম, তাইতেই সাত দিন পর্যন্ত আমার গা ঘুলিয়েছে। শুনেছি, ও-সব মার নাকি এখনকার তুলনায় তুলোর চাবুকের মতো নরম ব্যাপার।

ফলে আবহাওয়া মোটামুটি একটু ঠান্ডা ইদানীং। কিন্তু থমথমে ভাবটা যায়নি। খুচখাচ এখনও লেগে যায় দুই এক জায়গায়।

এই অবস্থায় আমাদেরই যেন চরম দুর্দশা। আমার, চটপটির আর কার্তিকের হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা শেষ। সংস্কৃতের জ্বালায় কেবল কেবলু বেচারা মনমরা। একমাত্র ওই শুধু পরীক্ষার ফল জেনে নিশ্চিন্ত কারণ সংস্কৃতর প্রশ্নপত্র পেয়ে আধঘন্টার মধ্যে ও সেটা ভাঁজ করে পকেটে ফেলে ছলছল চোখে পরীক্ষার হল্ ছেড়ে উঠে এসেছে। আমরা কতবার ওকে সংস্কৃত ছাড়তে পরামর্শ দিয়েছি। কিন্তু ওর পণ্ডিত বাবার যেমন গোঁ, ওরও তেমনি। সংস্কৃতয় মার খাচ্ছি বলে সংস্কৃত ছাড়ব! মায়ের কাছে মার খেলে মা-কে ছাড়ব? নাকি আরও বেশি করে 'সাপটং ধরিষ্যামি'। যাক, মোট কথা পরীক্ষার ফলাফল নিয়ে আপাতত ওর মাথায়ও কোনও ভাবনা নেই। আমাদের পাঁচজনের মধ্যে আর বাকি থাকল হোঁতকা হেবো, অর্থাৎ হাবুল। তার পড়াশোনার পাট আগেই

চুকেবুকে গেছে। এখন সে এক ফোটোগ্রাফির দোকানে কাজ শিখছে, আর হাতে কিছু টাকা এলে নিজে একটা ভালো ক্যামেরা কেনার স্বপ্ন দেখছে। আমাদের পড়াশোনা পরীক্ষা ইত্যাদি বরাবরই চক্ষুশূল ওর। অতএব আমাদের পরীক্ষা শেষ হবার ফলে হাবুলও নিশ্চিন্ত--এবার পিন্‌ডিদাকে নিয়ে সকলে মিলে চুটিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে। হাঁটুর মালাই চাকি ভাঙা ব্রেজিলের এককালের দুরন্ত দুর্ধর্ষ ফুটবল প্লেয়ার পিন্‌ডিদাকে (প্রদীপনারায়ণ দত্ত=পি+এন+ডি=পিন্‌ডি) এই বর্ধমানে এখন অনেকেই চেনে, আর আমাদের মতো নিরীহ ছেলে-ছোকরাদের কাছে তার কদর বেড়েই চলেছে। অতএব সকলের কাছ থেকে পিন্‌ডিদাকে নিজেদের গণ্ডির মধ্যে আগলে রাখার তাগিদও আমাদের সকলেরই। একদিন অবশ্য গেছে যখন পিন্‌ডিদা জীবনে কখনও ব্রেজিলে গেছে, না জিওগ্রাফি বই-এর ম্যাপের শুধু জায়গাটা দেখেছে এই সন্দেহ আমার ছিল, আর পিন্‌ডিদা কখনও তার ওই রোগা শরীরের পা দিয়ে ফুটবলে একটা শট্ কষিয়েছে কিনা—সেই সন্দেহও। তার ফলে আমাদের মধ্যে পিন্‌ডিদার সব থেকে বড় ভক্ত ওই হোঁতকা হাবুলের সঙ্গে কতদিন আমার হাতাহাতি হবার উপক্রম। গায়ের জোরে ওর সঙ্গে আমাদের কারওই পারার উপায় নেই, কিছু না করে ও-যদি ধুপ করে গায়ের ওপর আছড়ে পড়ে তাহলেই চ্যাপটা আমরা। পিন্‌ডিদা আসার আগে আমার বুদ্ধি আর বিবেচনার দরুন দল-মতের চাপে ওকে আমার বশ্যতা স্বীকার করে চলতে হত। তাই পিন্‌ডিদা আসার পর থেকে সর্বদাই ওর ভীমসেনের মেজাজ। আমাকে সুদ্ধু ওর হাতের নাগালের বাইরে সরে থাকতে হয়। কিন্তু এখন মনে-প্রাণে আমিও পিন্‌ডিদার গুণমুগ্ধ ভক্ত। অনেকবার ঠেকে আর ঠকে তবে এই সুমতি আমার। যদিও এখনও আমার সঙ্গেই তার রেষারেষি ব্যাপার ঘটে যায় সব থেকে বেশি। তার প্রথম কারণ, আমার পকেটের ওপরেই পিন্‌ডিদার সব থেকে বেশি চোখ। একটু ফাঁক পেলেই আমাকে বাগে ফেলে পকেটের টাকাপয়সা বিনোদের চপকাটলেটের দোকানে চালান দেবার তাল খোঁজে সে। এই কারণে আমার মাসের খরচা বেড়ে গেছে যার জন্য আজকাল ঘন ঘন ঠাকুমা বুড়ির হাত-বাক্স হাতাতে হচ্ছে। আর দ্বিতীয় কারণ, তাতিয়ে দিতে না পারলে পিন্‌ডিদার 'ফর্ম' খোলে না। ঘায়েল হই আর যা-ই হই আমি তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ছাড়ি না। আর এ-কথাও সত্য, পিন্‌ডিদাকে তাতিয়ে দিতে গিয়ে আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে আমি নিজেও প্রায় সময়েই তেতে উঠি, আর একবার অন্তত তাকে জব্দ করতে পারার আশায় কোমর বেঁধে লাগি। ওই হেবোটার মতো জল উঁচু তো উঁচু আর নিচু তো নিচু গোছের সায় দিয়ে তোষামোদ করতে পারি না।

যা বলছিলাম--পাড়ায় পাড়ায় রাজনীতির দলাদলি মারামারি কাটাকাটি বোমা-বাজির গরমে পিন্‌ডিদাকে নিয়ে আমাদের পাঁচ মূর্তির মাঠের আড্ডাটাই মাটি হতে বসেছে! আড্ডার এত অঢেল সময় হাতে এখন, অথচ প্রকাশ্যে পাঁচ-ছজন একত্র হবার উপায় নেই। এই কিছুদিন আগেও তো তিনজনের বেশি একত্র দেখলে হিড়হিড় করে থানায় টেনে নিয়ে যাওয়ার হুকুম বহাল ছিল। সেটা অবশ্য উঠেছে। তা সত্ত্বেও মাঠে গিয়ে বসলে সন্ধ্যা হতে না হতে গা ছমছম করে। বেরুবার আগে কোথায় যাচ্ছি-না-যাচ্ছি মা-ঠাকুমা-বাবা প্রত্যেকের কাছে কৈফিয়ত দিতে হয়। আর নিজেদের বুকের তলায়ও ধুকপুকুনি আছে, দিন-কাল এমন যে কেউ যদি রসিকতা করেও পুলিশকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে, ওস ওদের মতলব ভালো নয়--পুলিশ এসে সরাসরি ঠেঙিয়ে তুলে দেবে, আর হেবোর মতো চেহারায় কাউকে দেখলে হয়তো ঠেঙাতে ঠেঙাতে থানার লক্-আপে নিয়ে ঠাসবে। সেই ভয়ে হেবো বেচারার তো কত দিনের মধ্যে টিকির দেখা ছিল না। কোনওদিন দেখা যেত আমি আর চটপটি শুধু আমাদের বসার জায়গাটিতে গিয়ে হাজির হয়েছি--কোনওদিন বা আমি চঠপটি আর কার্তিক। কেবলু তো স্পষ্টই বলে দিয়েছিল, 'প্রহারেণ' হতে রাজি নই বাবা আমি। আর পিন্‌ডিদা? ভাঙা হাটে তাকে ধরে আনার কোনও মানেই হয় না। তাছাড়া দেশের এই হাল

দেখে সে হাঁ হয়ে গেছে। এর মধ্যে অনেকবার শুনতে হয়েছে আবার তার পালানো ছাড়া উপায় নেই। এখন তাকে মাঠে ধরে আনার পর যদি এতটুকু পুলিশের হামলা হয়, পিন্‌ডিদা আমাদের জ্যান্ত ছাল ছাড়াবে।

ম্যাজিসট্রেটের কড়াকড়িতে আর পুলিশের লাঠি আর বন্দুকের গুঁতোয় অবস্থা যখন একটু থিতিয়েছে, সেই সময় চটপটি একদিন ছুটতে ছুটতে আমার বাড়ি এসে হাজির। একগাল হেসে আমাকে বলল, সোনা রে, আবার বোধহয় খুশির দিন এল রে!

হ্যাঁ, জোর খবরই বটে। এখন সর্বদিকেই আবহাওয়া সহজ এবং স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা জেলা ম্যাজিসট্রেটের। তবে ফতোয়া অনুযায়ী স্কুল-কলেজ হাট বাজার সিনেমা খেলাধুলো সবই আবার আগের সময় ধরে শুরু হয়েছে। আমাদের বয়সি ছেলেদের বর্ধমানে সব থেকে বড় আকর্ষণ এখানকার জুভেনাইল ক্লাবগুলোর স্পোর্টস। সমস্ত বর্ধমানে কম করে পঞ্চাশটা জুভেনাইল ক্লাব আছে। ওই স্পোর্টসের সময় আরও কত গজায় ঠিক নেই। দু তিনজনে মিলে একটা ক্লাবের নাম পেশ করলেই হল। পাঁচ টাকা মাত্র এনট্রি ফি। এই স্পোর্টসের জন্য কর্মকর্তারা মোটা টাকা ডোনেশন তোলে। আর ম্যাজিসট্রেট সাহেবও তাঁর কোনও তহবিল থেকে বেশ ভালো টাকা মঞ্জুর করে থাকেন প্রতিবছর। এখনকার ম্যাজিসট্রেট বড় স্পোর্টসম্যান ছিলেন নাকি এককালে। এবছর সেই স্পোর্টস হবে কেউ আশাও করেনি। মানুষের প্রাণ নিয়ে স্পোর্টসের দাপটে এই স্পোর্টসের অস্তিত্ব ডুবতে বসেছিল মন থেকে।

সেই জুভেনাইল স্পোর্টসের অনুষ্ঠানও নাকি আগামী মাসেই হতে যাচ্ছে। না, সন্দেহের কোনও কিছু নেই, হচ্ছেই। কারণ চটপটি একেবারে ছাপানো ফর্ম হাতে করেই এসেছে।

চটপটির এত আনন্দের কারণ এটা যে আমার কাছে একটা খবরের মতো খবর সেটা ও জানে। এতে ওরও স্বার্থ আছে, কিন্তু আমার স্বার্থটা ওর ডবল। দৌড়ের কমপিটিশনে চটপটি গেল বারে সেকেন্ড হয়েছিল, তার আগের বারে থার্ড। ওর পক্ষে এবারে প্রথম হওয়াটা আশ্চর্য নয়, এত দুর্যোগের মধ্যেও সে রোজ ভোরে দৌড়ের অভ্যাসটি বজায় রেখেছে। কিন্তু আমার স্বার্থ ডবল কারণ একটা খেলায় আমি পরপর দু বছর ফার্স্ট হয়েছি। সোনার মেডেল ঘরে এসেছে কিন্তু মেয়াদ ফুরোলেই সোনার কাজ করা মস্ত কাপটা ফেরত দিতে হয়েছে। এবারেও যদি ওই বাজি আট্রি মেরে দিতে পারি অর্থাৎ ফার্স্ট হতে পারি তাহলে সোনার মেডেলসুদ্ধু ওই কাপ আমার ঘরে থেকে যাবে, ফেরত দিতে হবে না। পরপর তিনবার জিতে হ্যাট্রিক করতে পারলে তাই নিয়ম।

আমাদের ক্লাবের নাম ফাইভ স্টার অর্থাৎ পঞ্চতারকা। নামটা আমার মাথাতেই গজিয়েছিল, আর বাকি চারজন মানে হোঁতকা, হেবো, কার্তিক, কেবলু আর চটপটি খুব তারিফ করেছিল, কারণ পাঁচ তারকার বাকি চারজন তো ওরা। গত দুবছরে হাবুল শুধু ওয়েট লিফটিং-এ নাম দিয়েছে, কিন্তু পাত্তা পায়নি। শুধু আমাদের কাছেই ওর যতো গায়ের জোর ফলানো। কার্তিক কেবলু অনেক আইটেমই চেখে চেখে দেখেছে, কিন্তু তাদেরও হেবোর মতোই অবস্থা। শুধু চটপটিটা যা একটু মুখ রক্ষা করেছে। ফাইভ স্টারের প্রধান আশা আর ভরসা আমি। যে খেলায় আমি দু দুবার প্রথম হয়েছি তার নাম– 'যেমন খুশি তেমন'–'গো অ্যাজ ইউ লাইক'। খেলাটা কী সকলেরই জানা আছে নিশ্চয়। সঙ সেজে হোক বা যে-কোনও ছল-চাতুরিতে হোক উপস্থিত বিচারক আর দর্শকদের ঠকাতে হবে। যার ঠকানোটা সব থেকে বেশি চমকপ্রদ হবে পুরস্কারটি সে পাবে।

এখানে বলে রাখি নিজেকে আমি একজন সেরা অভিনেতা বলে মনে করি। আমার বয়স কম বলেই পাড়ার থিয়েটারে নায়কের পার্ট পাই না। কিন্তু যারা ডাকে আমাকে তারা বেশ ইম্পরট্যান্ট রোলই দিয়ে থাকে। আমার এই অভিনয়ের ক্ষমতাই 'যেমন খুশি তেমন' খেলায় পরপর দুবার আমাকে প্রথম পুরস্কার এনে দিয়েছে।

প্রথমবার আমি নিখুঁত মেয়ে সেজে মাথায় বড় ঘোমটা টেনে পাঁচ বছরের কঙ্কালসার ছেলের হাত ধরে পিছন দিক দিয়ে ঢুকে পড়ে ম্যাজিসট্রেটের সামনে ভিক্ষের হাত বাড়িয়েছিলাম। সকলেই তখন সামনের দিকে নানা মজাদার সঙের খেলা দেখতে ব্যস্ত। ম্যাজিসট্রেট সাহেব হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে সেই দৃশ্য দেখে ভয়ানক বিরক্ত। আর তাঁর আশপাশের গণ্যমান্য জনেরা ডবল বিরক্ত। তারা চেঁচিয়ে উঠল, যাও,–যাও বলছি, এখান থেকে। তুমি এখানে এসে ঢুকলে কী করে?

আমার পরনে লাল পেড়ে ময়লা শাড়ি, মাথায় ঘোমটা, যে রোগা হাতটা বাড়িয়ে আছি ভিক্ষের আশায় সেই হাতে সধবার চিহ্ন বিবর্ণ সরু পলার চুড়ি এক গাছা, অন্য হাতে ছেলের শীর্ণ হাত ধরা। আমার মুখে কথা নেই, কানে তুলো এঁটে হেন হম্বিতম্বি উপেক্ষা করে ভিক্ষের হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়েই আছি। দূর থেকে ম্যাজিসট্রেটের বডিগার্ড ছুটে এল, তার পিছনে কনস্টেবল্। নিকালো, নিকালো গর্জন। হাত বাড়িয়ে আমাকে ঠেলে বার করতে চাইছে, কিন্তু ম্যাজিসট্রেটের সামনে সরাসরি মেয়েছেলের গায়ে হাতও দিতে পারছে না। আধ মিনিটের মধ্যেই মহা বিরক্তিকর পরিস্থিতি।

হঠাৎ মাথার ঘোমটা টেনে খুলে, মাথার পরচুলা ফেলে ভিখিরি ছেলেটার হাত ছেড়ে আমি দে ছুট। সকলেই ভ্যাবাচাকা কয়েক মুহূর্ত, তারপরেই হাসির হুল্লোড়।

দ্বিতীয়বারেও আমি ওই পিছন দিকটা বেছে নিয়েছিলাম। সেজেছিলাম প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার। কোঁচানো ধুতি, গিলে-করা পাঞ্জাবি, গলায় গরদের ভাঁজ করা চাদর। চোখে রিমলেস্ চশমা, নাকের সামনে কাঁচা-পাকা গোঁফ। পায়ে চকচকে পাম্প-শু। সেকালের কলকাতার ফুলবাবুর মতো চেহারা হবহু। গলাটাকে পর্যন্ত কাম্যানো গালের মতো করে তুলেছিলাম মেক-আপের কল্যাণে। গেলবারে সাগরেদ নিয়েছিলাম হেবোকে–ওর লম্বা-চওড়া চেহারাটা প্যান্ট শার্টের আড়ালে কাজ দিয়েছিল। সামনে 'যেমন খুশি তেমন'-এর খেলা সবে ঘোষণা করা হয়েছে–পিছন দিক থেকে হেবো সবিনয়ে ম্যাজিসট্রেটকে ডাকল, স্যার, ইনি আমাদের ওমুক প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার, আপনার কাছে একটা বিশেষ আর্জি নিয়ে এসেছিলেন। –বলেই কেটে পড়ল।

ম্যাজিসট্রেট সাহেব ভ্রূকুটি করে তাকালেন আমার দিকে। প্রাইমারি হেডমাস্টারের কার্তিক মার্কা মূর্তি দেখেই তাঁর মেজাজ খিঁচড়ে গেল বোধহয়।

আমি বেঁকেচুরে বিগলিত হেসে হাতের আবেদন পত্র অর্থাৎ আমন্ত্রণ পত্র তাঁর হাতে দিলাম।

–কী এটা?

জবাব যেন মুখে এলই না আমার, আমি হাত কচলাচ্ছি আর বিনয়ে গলে গলে পড়ছি।

টাইপ করা আমন্ত্রণপত্রের দিকে একনজর তাকিয়েই বিরক্তিতে ফাটো-ফাটো মুখ ম্যাজিসট্রেট সাহেবের। রুক্ষস্বরে ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, এ-সব এখানে কেন? হোয়াই হিয়ার! এ-সব প্রাইজ সেরিমোনিতে আমি যাই না, যান!

আমি তবু হাত কচলাচ্ছি। ওদিকে সামনের খেলা শুরু হয়ে গেছে। ম্যাজিসট্রেট এবারে জোরে দাবড়ানি দিয়ে উঠলেন, স্টুপিড্–যান এখান থেকে! তাঁর পার্শ্বজনেরা আমাকে ঠেলে তাড়াবার জন্য তেড়ে আসার আগেই নির্দেশ মতো হাবুল চটপটি কেবলু আর কার্তিক ছুটে এসে আমাকে শূন্যে তুলে ফেলল, তারপর সকলের চোখের ওপর আমি হাত পা ছুড়তে ছুড়তে চললাম।

এবারেও হাসির হুল্লোড় এবং আমি প্রথম।

তাই তৃতীয়বারেও প্রথম হয়ে হ্যাট্‌ট্রিক করে সোনার মেডেলের সঙ্গে অত বড় কাপ বরাবরের মতো ঘরে, আমার উত্তেজনা কতখানি সেটা সকলেরই বোঝা উচিত।

চটপটি প্রস্তাব দিল, চল আজ সকলকে খবর দিয়ে মাঠে গিয়ে বসা যাক। এখন আর অত ভয়-ডরের কিছু নেই রে, দেখছিস না সব স্বাভাবিক হয়ে আসছে। আর পিন্‌ডিদাকেও ধরে আনতে হবে, সে হয়তো তোকে তাজ্জবগোছের কিছু পরামর্শ দিতে পারে।

দু-দুবার নিজের চেষ্টায় প্রথম হয়েছি, কিন্তু আশায় আগ্রহে আর উত্তেজনায় সত্যিই পিন্‌ডিদার দিকে মন ঝুঁকল। অভিনব কিছু প্ল্যান সে বাতলে দিতেও পারে! চটপটিকে বললাম, ঠিক আছে। যে করে হোক পিন্‌ডিদাকে আজ মাঠে ধরে নিয়ে আয়, আমি গোটা তিনেক টাকা জোগাড় করতে পারি কিনা দেখি।

পিন্‌ডিদাকে আনতে হলে টাকা কেন দরকার চটপটি জানে। এত দিন বাদে শুধু মুখে আসর জমাতে চাইলে পিন্‌ডিদা বিরক্ত হয়েই উঠে চলে যাবে। গরজ যখন আমার তখন খসবেও কিছু আমার পকেট থেকেই।

বিকেলের মাঠের আসরে একে একে সকলেই এসে উপস্থিত হয়েছে। সবার শেষে হাবুলের সঙ্গে পিন্‌ডিদাও এল! হাবুল বাহাদুরি সুরে বলল, পিন্‌ডিদাকে কী সহজে ধরে আনা যায়, কেবল এ-বই থেকে সে-বই আর সে-বই থেকে এ-বই করছিল।

হাবুলের তোষামোদের কথা শুনতে শুনতে আমার অন্তত কান পচে গেছে। চটপটি চটপট কাজের কথায় এল, দেড় মাস বাদে সকলে একত্র হলাম, আগে একটু মুখ চালাবার ব্যবস্থা হোক পিন্‌ডিদা। কি বলো?

পিন্‌ডিদা তার উঁচু ঢিবির আসনে বসে বিমনা চোখ দুটো দূর থেকে টেনে চটপটির মুখের ওপর তুলল, তারপর আমার দিকে ফিরল—কত বাজেট?

আমি আমতা আমতা করে জবাব দিলাম, গোটা তিনেক টাকা পকেটে আছে।

শোনামাত্র মেজাজ তিরিক্ষি পিন্‌ডিদার, হাবুলকে ধমকে উঠল, কাজের মধ্যে ছিলাম, কেন আমাকে মিথ্যে টেনে নিয়ে এলি বল্ তো।

রুষ্ট নেত্রে হাবুলও তক্ষুণি আমার দিকে তাকালো। ভাবখানা, এমন কাণ্ডজ্ঞানশূন্য তুই!

পিন্‌ডিদার কোঁচকানো ভুরুর নিচের দুই চোখ আবার আমার উপর চড়াও হল। দেড় মাস আসর বসেনি বলে কম করে তোর পঁচিশ টাকা বেঁচেছে কিনা?

আমি রাগ চেপে জবাব দিলাম, কোথায় আর বাঁচল, খরচের শেষ আছে নাকি!

—ও! চোখে মুখে ব্যঙ্গ ঝরল এবার পিন্‌ডিদার। —আমাদের বঞ্চিত করে তুমি অন্য খরচ চালিয়ে নিচ্ছ! এই বুদ্ধি বিবেচনা নিয়ে তুই 'গো অ্যাজ ইউ লাইক' কমপিটিশনে ফার্স্ট হবি আশা করিস?

ব্যস, মেজাজ বিগড়তে শুরু করেছে আমার। জবাব দিলাম, দু-দুবার তো তাই হয়েছি।

কেবলু তাড়াতাড়ি সামলে দিতে চেষ্টা করল, গতস্য শোচনাং ছাড়ো পিন্‌ডিদা, আবার তো আসর শুরু হল, সোনা শনৈঃ শনৈঃ ঠাকুমার হাতবাক্স সাফ করবে খন।

কেবলুর আবেদনে কাজ হল। পিন্‌ডিদা ওর সংস্কৃতর মাথাটার দিকে চোখ আটকে অর্ডার দিল, এক টাকার আলুকাবলি, এক টাকার ঝাল-মুড়ি আর এক টাকার আমার জন্য একটা চপ বিনোদের দোকান থেকে।

এই রকম ভাগ-বাঁটোয়ারা করে থাকে পিন্‌ডিদা। আমার পকেট থেকে টাকা তিনটে বার করে নিয়ে কার্তিক হুকুম তামিল করতে ছুটল। চপটা শুধু কিনে আনতে হবে—আলুকাবলিঅলা আর ঝালমুড়িকে খবর দিলে তারাই এখানে আসবে।

পনেরো মিনিটের মধ্যে আমাদের মুখ চলতে লাগল। পিন্‌ডিদা তার নিজের চপটা আলাদা সরিয়ে রেখেছে, সব শেষে ধীরে-সুস্থে খাবে। এ-ব্যাপারে পিন্‌ডিদার বিন্দুমাত্র চক্ষুলজ্জা নেই।

যথাসময়ে মাংসের চপে কামড় বসিয়ে পিন্‌ডিদা বলল, রামছাগলের মতো অভিনয় করে তোর দু দুবার ফার্স্ট হওয়ার কথা আমি শুনেছি রে সোনা–

মন্তব্য শুনে শুনে হাবুলই সব থেকে মজা পেল যেন। রামছাগলের মতো অভিনয়! সে আবার কী পিন্‌ডিদা?

–তোরও তো সেই রকমই বুদ্ধি, রামছাগলের গন্ধ যেমন সক্কলে টের পায়, সোনার ফার্স্ট হওয়ার মধ্যেও সেই রকম অভিনয়ের বোটকা গন্ধ পাচ্ছি। আর বিচার করাও তেমনি–

আমি তেরিয়া হয়ে বললাম, তোমার ওই মাংসের চপের মধ্যেও রামছাগলের মতো গন্ধ পাচ্ছ অথচ খাচ্ছ–বিচারকরাও তেমনি গন্ধ পেয়েও স্বাদের চোটে টোপ গিলছে।

পিন্‌ডিদাকে অপমান করা হল কিনা না বুঝে হোঁতকা হেবো ঘোরালো চোখে একবার আমার দিকে আর একবার পিন্‌ডিদাকে দেখতে লাগল। কিন্তু পিন্‌ডিদা নির্বিকার–তোর রাগ হতেই পারে, অভিনয় কাকে বলে তাতো আর জানিস না, ব্রেজিলে একবার একটা লোক খুনের অভিনয় করার ফাঁকে সত্যি সত্যি খুন করে বসল, এতগুলো দর্শকের কেউ টেরও পেল না।

আমি বাধা দিয়ে উঠলাম, এ তো একটা ইংরেজি ছবির গল্প।

নিতান্ত বালখিল্যের প্রতিবাদ শুনল যেন পিন্‌ডিদা। বলল, কী দিয়ে যে তোর মাথাটা ভগবান তৈরি করেছে রে সোনা! ছবির গল্পের আইডিয়া কি আকাশ থেকে পড়ে? গল্পের আইডিয়াটা এল কোত্থেকে? সেই জন্যেই বলছিলাম, অভিনয় জিনিসটা হল খাঁটি বাস্তব। 'টু+টু=ফোর'-এর মতো সরল অথচ অব্যর্থ–বুঝলি?

চটপটি তাড়াতাড়ি সায় দিয়ে বলল, এবার সোনার জন্য একটা অব্যর্থ প্ল্যান বাতলে দাও না পিন্‌ডিদা।

পিন্‌ডিদা মাথা নাড়ল, ওর দ্বারা হবে না–কোনও সহজ স্বাভাবিক অব্যর্থ প্ল্যান সোনার মোটা মাথায় ঢুকবে না।

ব্যস, আর ধৈর্য থাকল না। চিড়বিড় করে বলে উঠলাম, তাহলে তোমার গাওয়া ঘি বোঝাই মাথার বুদ্ধির খেলাটা দেখিয়ে নিজেই প্রাইজটা মেরে দাও–দেখি তোমার দৌড় কত!

ওরা ভেবেছিল পিন্‌ডিদাও এবার রেগে যাবে আর হোঁতকা হেবো মাথার ওপর গাঁট্টা তুলবে। কিন্তু আমার দিকে চেয়ে পিন্‌ডিদা এই প্রথম মিটিমিটি হাসতে লাগল। বলল, তুই সত্যিই সোনা ছেলে রে সোনা–কিন্তু খাদ বোঝাই। আমি কমপিটিশনে নামলে তোর যে আর কোনও আশাই থাকে না।

আমি আরও তেতে উঠে বললাম, আমার আশার দরকার নেই, তুমি তোমার বাহাদুরিটা দেখিয়ে আমাদের কৃতার্থ করো তোমাদের সাহায্যের ধার ধারি না।

হাসি-হাসি মুখে পিন্‌ডিদা এবার ওদের দিকে তাকাল, তোরা সাক্ষী থাকলি কিন্তু, আমার কোনও দোষ নেই।

চটপটি আর কেবলু অন্তত তলায় তলায় আমার দিকে। হাবুলটা চোখ পাকিয়ে বলে উঠল, তুমি যদি এবার সোনাকে একটু শিক্ষা দিতে পার পিন্‌ডিদা, তাহলে ইঁদুরের মতো ঘাড়টা ধরে আমি ওর মুখটা তোমার পায়ে ঘসে দেব।

হেসে হেসে পিন্‌ডিদা বলল, তা কেন রে পাগলা, পুরুষের ক্ষমাই তো আসল গুণ।

সায় দিয়ে কেবলু তক্ষুনি মাথা নাড়ল, ক্ষমাহি পরমং তপঃ।

রাগের চোটে আমিই ওর মাথায় একটা চাঁটি বসিয়ে দিলাম। –তুই হেবোর মতে আগে ভাগে মো-সাহেবি করিস কেন–পিন্‌ডিদা কেমন পুরুষ দেখা হয়ে গেছে?

পিন্‌ডিদার হাসিমাখা চাউনি দেখে হেবো এবারও রাগ সামলাল।

এরপর চটপটি আর কেবলুর সঙ্গে পরামর্শ করে আদা জল খেয়েই লাগলাম আমি। একদিকে তিন-তিন বার জিতে চ্যামপিয়ন হবার তাগিদ, অন্য দিকে পিন্‌ডিদার হুল ফোটানোর জবাব।

যতদূর সম্ভব চোখ-কান খোলা রেখেছি। পিন্‌ডিদা সত্যিই কমপিটিশনে নামার কোনও তোড়জোড় করছে মনে হয় না। বাগাড়ম্বরই সার বোধ হয়। কিন্তু আমাকে জেতার চেষ্টা করতেই হবে। আমি হারলেই পিন্‌ডিদার জিত যেন এমনই একটা ভাব করবে সে, জানা কথা।

মাঝে আর একদিন মাঠের আসর বসেছিল, কিন্তু তেমন জমেনি। চটপটি শুধু জানান দিয়েছিল, সোনা বলেছে, এবারেও জিতলে সোনা আমাদের বিনোদের দোকানে চিকেন রোস্ট্ খাওয়াবে বলেছে।

আমাদের বলতে আমি যে পিন্‌ডিদা আর হেবোকে বাদ দিয়েছি সেটা বলল না। কিন্তু পিন্‌ডিদা সেটা না বুঝতে পারার মতো বোকা নয়। কারণ পিন্‌ডিদা আর হাবুল যে শত্রুপক্ষ এখন সেটা আমি হাবভাবে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছি।

চিকেন রোস্টের নাম শুনেই পিন্‌ডিদা অন্যমনস্ক হয়ে গেল কেমন। বিড়বিড় করে বলল, তাই নাকি—চিকেন রোস্ট্ যে বড় ভালো জিনিস রে চটপটি—কিন্তু কীভাবে যে মাথা-মোটা সোনাটাকে সাহায্য করি ভেবে পাচ্ছি না।

আমি তিরিক্ষি হয়ে বলে উঠলাম, আ-হা আমাকে সাহায্য করার কথা ভেবে নিজের ঘুম নষ্ট কোরো না যেন পিন্‌ডিদা!

পিন্‌ডিদা গায়ে না মেখে বলল, না রে—চিকেন রোস্টের কথা শুনে কান দুটো কেমন করে উঠল।

সেই দিন। রীতিমতো একটা উত্তেজনার দিন বলতে হবে। এই স্পোর্টস-এর আবহাওয়ায় শহরের মারামারি গরম ভাবটা আপাতত যেন শিকেয় উঠেছে।

চটপটিটা এবারেও দৌড়ে সেকেন্ডই হয়ে গেল।

এক সময় 'গো অ্যাজ ইউ লাইক' অর্থাৎ 'যেমন খুশি তেমন'-এর খেলা শুরু হল। আমি লক্ষ করছি, পিন্‌ডিদা সভার আসরের মধ্যেই বসে আছে, অর্থাৎ তার মুখেই যত হাতি-গণ্ডার মারা।

ক্রিং ক্রিং করে সাইকেলের অবিরাম ঘন্টি বেজে উঠল। পোস্ট অফিসের স্পেশ্যাল মেসেঞ্জার পিওন তার লাল সাইকেলের ঘন্টি বাজিয়ে পিছনের ভিড় ঠেলে ম্যাজিসট্রেটের দিকে এগোলো। সামনের খেলা বন্ধ থাকল একটু, কারণ ম্যাজিসট্রেটের কাছে অমন জরুরি বার্তা প্রায়ই আসে—সেটা না দেখা পর্যন্ত ম্যাজিসট্রেট এদিকে মুখ ফেরাবেন না।

সই করে ছাপ মারা টেলিগ্রাম নিয়ে সেটা খুলেই ম্যাজিসট্রেটের মুখ কালো। সাইকেল পিওন সেলাম বাজিয়ে চলে গেছে।

টেলিগ্রামের খবর পড়ে ম্যাজিসট্রেটের সত্যি চক্ষু স্থির। পত্রপাঠ তাকে বর্ধমান থেকে হুগলিতে বদলি করা হয়েছে এবং এখানকার চার্জ বুঝিয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে।

তার মুখের দিকে তাকিয়েই সকলে বুঝেছে টেলিগ্রামে একটা কিছু অপ্রত্যাশিত খবর আছে।

একটু বাদেই আবার লাল সাইকেলের ক্রিং ক্রিং শব্দ। ম্যাজিসট্রেট তখন সামনের খেলায় মন দিতে চেষ্টা করেও পেরে উঠছিলেন না। আবার সেই পিওন, তার হাতে আর একখানা টেলিগ্রাম। এটাও তাড়াতাড়ি সই করে নিয়ে খুলে পড়লেন তিনি। তার পরই হতভম্ব। এটাতে লেখা, ভালো কাজের জন্য জনমতের চাপে তাঁর বদলির আদেশ বাতিল করা হল।

বিমূঢ় মুখে ম্যাজিসট্রেট এবারে সাইকেল পিওনের দিকে তাকালেন।

সাইকেল পিওন এবারে বড় করে একটা সেলাম ঠুকল।

হাসিতে আর খুশিতে ম্যাজিসট্রেটের মুখ ভরাট। সাইকেল পিওনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন তিনি। শেক্-হ্যান্ড করলেন।

বলা বাহুল্য, সেই সাইকেল পিওন আমি। মেরে দিয়েছি সন্দেহ নেই। বাতাস সাঁতরে আমি সাইকেল নিয়েই সভার মধ্যে ঢুকে গেলাম।

কিন্তু এবারে ভগবানই বিরূপ বোধহয় আমার ওপর। চোখের পলকে অপ্রত্যাশিত একটা রোমহর্ষক কাণ্ড ঘটে গেল প্যান্ডেলের মধ্যে। আজকের দিনেও যে কেউ প্রতিশোধের ছুরি শানিয়ে বসে ছিল কে জানতো।

হঠাৎ ঝকঝকে ছোরা হাতে একটা লোক তীরের মতো ছুটে এল আর সেই ছোরা একজনের বুকে বসিয়ে দিয়েই আবার তীরের মতো ছুটে পালিয়ে গেল। আহত ছেলেটা একটা আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। গলগল করে রক্ত বার হচ্ছে।

এমনি অতর্কিতে ঘটে গেল ব্যাপারটা যে সকলের হাত-পা ঠান্ডা কয়েক মুহূর্তের জন্য। আর সেই বিমূঢ় মুহূর্তের ফাঁকেই আক্রমণকারী ছেলেটা উধাও।

তারপরেই চেঁচামেচি শোরগোল ছোটাছুটি। ম্যাজিসট্রেটের দেহরক্ষীরা তাঁর দু পাশে ছুটে এসেছে। পুলিশ রিভলবার বার করে ভিড়ের দিকে ছুটে গেছে।

রক্তে-ভাসা আহত ছেলেটাকে জনাকতক ধরাধরি করে কার গাড়িতে তুলছে। এক্ষুণি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার। আমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছি। স্পোর্টস অসমাপ্তই থেকে গেল। সক্কলের বুক কাঁপছে।

হঠাৎ আবার দুই চক্ষু গোল আমার। হাত জোড় করে পিন্‌ডিদা ম্যাজিসট্রেটের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে এবং কী বলছে। পরক্ষণে সেখানে হাসাহাসি পড়ে গেল। তারপরেই মাইকে ঘোষণা করা হল সত্যি, কেউ কাউকে আক্রমণ করেনি, মারেনি এটা 'গো অ্যাজ ইউ লাইক'-এর একটি খেলা মাত্র। খেলাটার পরিচালক 'ফাইভ স্টার' ক্লাবের পি. এন. ডি (অর্থাৎ পিন্‌ডিদা)।

আমি, চটপটি, কেবলু, কার্তিক হতভম্ব, নির্বাক।

হতচকিত আসরের মানুষদের তারিফ-এ আসর মুখর এবার।

আবার দেখলাম পিন্‌ডিদা হাত জোড় করে ম্যাজিসট্রেটকে কী বলল। ম্যাজিসট্রেট হাসি মুখে ঘন ঘন মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

হ্যাঁ, এবারও 'গো অ্যাজ ইউ লাইক'-এর প্রথম প্রাইজ আমিই পেলাম। কাপ জিতলাম। কিন্তু তার আগে ম্যাজিসট্রেট তাঁর ভাষণে পিন্‌ডিদাকে ধন্যবাদ জানালেন। তিনি বললেন, পি. এন্. ডি. তাঁর কাছে আবেদন জানিয়েছে, তার খেলা যদি সব থেকে স্বাভাবিক এবং চমকপ্রদ হয়েও থাকে তাহলেও প্রাইজটা তার পাওয়া উচিত নয়, কারণ খেলা হিসেবে এটা একটা মন্দ উদাহরণ। অতএব প্রাইজ তার পরের যোগ্য ব্যক্তিকে দেওয়া উচিত। ম্যাজিসট্রেট সাহেব জানালেন, তিনি তার সঙ্গে একমত।

কাপ আর মেডেল বাড়িতে রেখে সন্ধ্যার মুখে চটপটি, কেবলু আর কার্তিক আমাকে বাইরে টেনে এনেছে। হ্যাঁ, উদার হয়ে আমিও ওদের সঙ্গে পিন্‌ডিদা আর হেবোর সন্ধানে এসেছি। কিন্তু ওরা নিপাত্তা।

বিনোদের দোকানের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে দেখি ওরা দুজন আগের ভাগেই টেবিল জাঁকিয়ে বসে আছে। আমাদের দেখেই পিন্‌ডিদা তিরিক্ষি মেজাজে বলে উঠল, এত দেরি কেন, কাপ ধুয়ে জল খাচ্ছিস নাকি।

চিকেন রোস্ট্ টেবিলে এসেছে এক সময়। সকলেই হইহই করে খাচ্ছে। পিন্‌ডিদা শুধু একাগ্র মনে রোস্টে ছুরি চালাচ্ছে। আর আড়ে আড়ে আমার দিকে তাকাচ্ছে।

আমার মনে হচ্ছে তার ছুরির ফলা যেন আমাকে বিঁধছে। আমার ধারণা, পিন্‌ডিদা কিছু না বললেও নীতিপরায়ণ ম্যাজিসট্রেট সাহেব ওই একই কারণে প্রাইজ তাকে না দিয়ে আমাকেই দিতেন। সেয়ানা পিন্‌ডিদা আগে থাকতেই সেটা বুঝে নিয়ে সব থেকে বড় বাহাদুরিটা নিজেই নিয়ে নিল।

পিন্‌ডিদা যেভাবে খাচ্ছে আর থেকে থেকে আমার দিকে তাকাচ্ছে—আমার মনে হচ্ছে যেন আমিই আস্ত চিকেন রোস্ট্ একখানা।

## পিন্‌ডিদার সিংহ

ব্রেজিলের স্মরণীয় ফুটবল প্লেয়ার প্রদীপ নারায়ণ দত্ত অর্থাৎ পি. এন. ডি. অন্যথায় সেখানকার জনতার উল্লাসে 'পিন্‌ডি' নামে এখন আমাদের এই বর্ধমানে বাবুগঞ্জের পিন্‌ডিদা যে শিকার আর প্রাণী-জগৎ সম্পর্কেও এমন বিশারদ সেটা এই প্রথম জানলাম আমরা, আর জেনে হাঁ হয়ে গেলাম। অঘটনের ফলে হাঁটুর চাকতি খুলে ফুটবলের দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে না হলে সেও যে পৃথিবীর বাছাই একাদশের একজন হতে যাচ্ছিল এখন সেটা আমরা প্রায় বিশ্বাসই করি। সেই বাছাইয়ের নম্বর একবার পিঠে লাগিয়ে মাঠে নামার সুযোগ পেলে হাঁটুর চাকতি খোলা কেন—ঠ্যাং কেটে বাদ দিলেও পিন্‌ডিদার রাজার হালে কাল কেটে যেত। কিন্তু পিন্‌ডিদার সে-জন্যে খুব একটা আক্ষেপ নেই। সে স্পোর্টসম্যান, তার মতে জীবনটাই একটা স্পোর্টস। এতে ওঠা-নামা না থাকলেই জীবন বিস্বাদ।

আর, এখন আমাদেরও এমন অবস্থা যে সামনের ওই আধ-হাত প্রমাণ উঁচু জায়গাটাতে একটা দিন পিন্‌ডিদা এসে না-বসলে সকলের জীবন বিস্বাদ। অথচ ওই হোঁতকা হেবো ছাড়া আমরা বাকি চারজন অর্থাৎ আমি, চটপটি, কেবলু আর কার্তিক সর্বদাই যে পিন্‌ডিদার ওপর তুষ্ট এমন নয়। বোকা-বোকা মুখ করে, আর ঠোঁটের ফাঁকে আকাশের প্রায় মুছে যাওয়া বাঁকা চাঁদের মতো একটু হাসি বুলিয়ে পিন্‌ডিদা যার দিকে তাকায় তারই বুকের ভেতরটা গুড়ুগুড়ু। বরফে পালিশ-করা ছুরির মতো কখন যে এক-একটা প্রাণান্তকর বিদ্রূপ কার মাথা থেকে পা পর্যন্ত কেটে দিয়ে যাবে ঠিক নেই। আমাদের মধ্যে হোঁতকা মার্কা হাবুলটাকেই পিন্‌ডিদা যা একটু স্নেহের চোখে দেখে। মেজাজ বিগড়োলে পিন্‌ডিদা তাকেও যে এক হাত নেয় না এমন নয়। কিন্তু ওটার গণ্ডারের চামড়া। তাছাড়া পিন্‌ডিদাকে তোয়াজ তোষামোদে খুশি রাখার জন্য ও যা করে সেও আমাদের দ্বারা হয় না। কথায় কথায় পিন্‌ডিদার পায়ের ধুলো নেয়, পিন্‌ডিদা ওকে কখনও কোণঠাসা করলে ও রাগত চোখে আমাদের বলে, মুখ টিপে হাসছিস কী, গুরুর চাবুকও যে আশীর্বাদের মতোই সেটা যেদিন বুঝবি সেদিন হাসির বদলে হিংসে করবি আমাকে। তারপর ভাবের বন্যা চোখে এনে বলে, পিন্‌ডিদা, তুমি আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিলে। আর কখনও এ-রকম বোকামি করব না, দেখে নিও।

পিন্‌ডিদা যত উঁচু দরের মানুষই হোক—মানুষ তো বটে। এরকম চাটু বাক্যে কোন দুর্বাসা না সদয় হয়; আমাদের আবার এই কারণেই হাবুলের ওপর রাগ। কিন্তু সেই রাগও অনেক সময় চেপে যেতে হয়, কারণ কিছু বললেই ও দ্বিগুণ রেগে গিয়ে এমন করে পিন্‌ডিদার দিকে তাকায় যেন

অপমানটা তারই। ফলে পিন্‌ডিদা ওরই ওপর সদয় হয়ে মিছরির ছুরি দিয়ে আমাদেরই গায়ের ছালচামড়া ছাড়ানোর ফাঁক খোঁজে।

যাক, দলের মধ্যে পিন্‌ডিদার সম্পর্কে সব থেকে সজাগ আর সতর্ক থাকতে হয় আমাকেই। প্রথম কারণ, পিন্‌ডিদার সর্বদাই আমার পকেটের ওপর সব থেকে বেশি চোখ। ওই হেবো হতভাগাটাই নিশ্চয় আমার পকেটের খবর তাকে দিয়ে থাকবে। ঠাকুরমার একটি মাত্র আদরের নাতি আমি! একটু প্যাঁচ কষলেই তার কাছ থেকে টাকা বার করতে পারি। আর আমার পকেট থেকে সেই টাকা প্যাঁচ কষে বার করে নেবার ব্যাপারে পিন্‌ডিদা আবার সিদ্ধহস্ত। অনেক ঠকে আমাকে তাই মুখ শুকিয়ে শূন্য পকেট দেখাতে হয়। কিন্তু হাবুলের বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই পিন্‌ডিদা সর্বদা সেটা বিশ্বাস করে না। আর দ্বিতীয় কারণ, পিন্‌ডিদার হুল ফোটানোর সব থেকে সেরা শিকারও আমিই। বুদ্ধির খেলায় এতদিন আমিই ছিলাম দলের প্রধান, সেখানে পিন্‌ডিদার পঞ্চাশগুণ প্রাধান্যের অধিকার আমি মেনে নিলেও অন্ধের মতো সর্বদা তার সকল কথায় সায় দিয়ে উঠতে পারি না। কেবলু কার্তিক বা চটপটিরও অনেক সময় সংশয় উপস্থিত হয়। কিন্তু সাহস করে আর হাবুলের বোকামার্কা রাগ গাঁট্টার ভয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক সময় তারা মুখ বুজে থাকে! কিন্তু আমি অতটা পেরে উঠি না। পিন্‌ডিদার কোনও কথার জবাবে সন্দেহ প্রকাশ না করলে বা একটু-আধটু তর্ক না তুললে আসর জমে কী করে?

যাক, এবার আসল কথায় আসি। সেদিন বিকেলের আসরে আলোচনার বিষয় ছিল বাঘ এবং সিংহ। পিন্‌ডিদা তার আধ-হাত উঁচু জায়গায় বসে ছিল, সামনে আমরা। জাতীয় পশু হিসেবে সিংহকে বাতিল করে সে-জায়গায় বাঘকে এনে বসানো হয়েছে—সেটাই যে একমাত্র বিবেচনার কাজ হয়েছে আমার কলকাতার পদস্থ অফিসার কাকার মুখে শোনা বুলি আউড়ে যাচ্ছিলাম। বলছিলাম, বাঘ আমাদের একেবারে নিজস্ব পশু, সে-জায়গায় প্রায় পরদেশি সিংহকে ও-রকম সম্মান দেওয়ার কোনও অর্থই হয় না, এতদিনে একটা ভুল শুধরানো হয়েছে মাত্র, ইত্যাদি।

আড়চোখে শুধু আমি কেন, সকলেই এক-একবার পিন্‌ডিদার দিকে তাকাচ্ছিল। কিন্তু পিন্‌ডিদার কানে কিছু যাচ্ছে কি না সন্দেহ। মাঝে মাঝে হাই তুলছিল, নিরাসক্ত মুখে দূরের আকাশ দেখছিল, ঘাড় বাঁকিয়ে উড়ন্ত পাখি দেখছিল, আর মাঝে মাঝে দাঁতে দাঁত ঘষে কল্পিত চানাচুর, ডালমুট চিবুচ্ছিল বোধহয়। কিছু একটু চিবুতে না পারলে পিন্‌ডিদার মুড আসে না—কিন্তু অনেক গচ্চা দিয়ে আমিও সেয়ানা হয়ে গেছি। বিকেলের আসরে এসে বসার সময় পকেট ঝেড়েঝুড়ে আসি। কখনও দু-এক আনা সংগ্রহ করতে পারলে হেবো চানাচুর কিনে পুজোর নৈবিদ্যের মতো ঠোঙাসুদ্ধ পিন্‌ডিদার দিকে এগিয়ে দেয়। আমার ধারণা, আমাদের ভাগ দেবার ভয়েই পিন্‌ডিদা তখনও নিরাসক্ত অন্যমনস্কভাবে প্রাকৃতিক শোভা দেখতে দেখতে চানাচুরের ঠোঙা শেষ করে। কিন্তু আজ হাবুলের পকেটও শূন্য।

আমার কথা শেষ হতেই আবার একটা হাই তুলে ক্লান্তিকর বিরক্তির সুরে পিন্‌ডিদা বলে উঠল, কী যে বাজে কপচাচ্ছিস সেই থেকে ঠিক নেই। বাঘও চিনিস না সিংহও চিনিস না, মাঝখান থেকে বকিয়ে মাথা ধরিয়ে দিচ্ছিস।

মজার গন্ধ পেয়ে মোটা হাবুল নড়েচড়ে বসে কুতকুত করে তার গুরুর দিকে তাকাল। চটপটি কার্তিক কেবলুও উৎসুক চোখে আমার দিকে ফিরল, অর্থাৎ এই নস্যাৎ করে দেওয়াটা বরদাস্ত করি কি না, সেই কৌতূহল।

আমার আত্মাভিমানে লাগল ঠিকই। বাঘ সিংহ চিড়িয়াখানায় কত দেখেছি ঠিক নেই। বাইরের বইয়ের মধ্যে শিকারের গল্পই আমি গোগ্রাসে গিলি। বিলিতি শিকারের ছবি দেখানো হচ্ছে খবর

পেলে পাগলের মতো দেখতে ছুটি। হিংস্র জানোয়ার সম্পর্কে আমার যা জ্ঞান তার ধারে কাছেও কেউ যেতে পারে কি না আমার সন্দেহ।

আমি জবাব দিলাম, বাঘও চিনি সিংহও চিনি—অনেকের থেকে ভালোই চিনি।

মুখের দিকে এমন করে খানিক চেয়ে রইল পিন্‌ডিদা যেন আমিই অদ্ভুত জীব একটা।

—কি করে চিনিস, বই পড়ে?

—তুমি কি করে চেনো, ওদের সঙ্গে মেলামেশা করে?

মুখের ওপর এমন বেয়াদপি প্রশ্ন শুনে হাবুল চোখ পাকাল। কিন্তু পিন্‌ডিদাকে রাগতে না দেখে পাকানো চোখ আবার ঠান্ডা করল। পিন্‌ডিদা ঠোঁটের ফাঁকে খুব ঠান্ডা এক টুকরো হাসির রেখা ফুটিয়ে জবাব দিল, তাও বলতে পারিস।

কার্তিক সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করল, সামনা-সামনি বাঘ সিংহ দেখেছ নাকি তুমি পিন্‌ডিদা?

—বাঘ না, সোনা সিংহের সঙ্গে তুলনা করছিল, সিংহ দেখেছি—বন্দুক ছেড়ে একেবারে খালি হাতেও সামনা-সামনি বিশ গজের মধ্যে দেখেছি।

বরাবর সংস্কৃতয় ফেল মারা কেবলু বলে উঠল, চিড়িয়াখানায় নাকি?

পিন্‌ডিদা ভুরু কুঁচকে তাকাল তার দিকে। তারপর সংস্কৃততে ব্যঙ্গ করে উঠল, মস্তকে গোবরং—হেবোকে বলল গাঁট্টার চোটে গোবর ফাঁক করে দিতে?

হাবুল মহাখুশি। কিন্তু পিন্‌ডিদার আসল লক্ষ্য আমি। ঠান্ডা চোখ দুটো আমার মুখের ওপর বুলিয়ে বলল, সিংহের মেজাজ সম্পর্কে কতটুকু জানিস যে মাতব্বরের মতো মাস্টারি করছিস?

আমারও রোখ চাপল, জবাব দিলাম, মেজাজের কোন দিকটা জানি না সেটা বলো। যত বড় প্লেয়ারই হোক, পিন্‌ডিদা বাঘ সিংহ সম্বন্ধে আমার থেকে বেশি খবর রাখে এ আমি বিশ্বাস করতে রাজি নই।

চটপটির এর মধ্যে আমার দিকে একটু বেশি টান! পিন্‌ডিদাকে আর একটু তাতিয়ে তোলার জন্য সায় দিয়ে মন্তব্য করল, যাই বলো পিন্‌ডিদা, জন্তু-জানোয়ারের আচার-আচরণ সম্পর্কে সোনাকে মোটামুটি এক্সপার্ট বলতে পার—ঢের পড়াশোনা করেছে।

জবাবে পিন্‌ডিদা আমাকে ছেড়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে এমন একটা হাসি হাসলে যা দেখলে সত্যিই পিত্তি জ্বলে যায়। সেই হাসির সঙ্গে বিস্ময়ে হাবুডুবু খাওয়া মুখ—তাই নাকি! সোনার এত গুণ! এরপর ডাক্তারির বই পড়ে কোনওদিন বলবে বড় বড় অপারেশনের ব্যাপারেও সোনা একজন মস্ত এক্সপার্ট। বলি, সিংহকে যে খাটো করে মাতব্বরি করছিস, সত্যিকারের সিংহের পাল্লায় কোনওদিন পড়েছিস? হ্যাঁ রে সোনা?

রাগে আমার মুখ কালো। কিন্তু আমি কিছু বলার আগেই কেবলু একটু সংস্কৃত ঝাড়ার মওকা পেল। বলল, তার মানে পিন্‌ডিদা তুমি বলতে চাও সোনা বালভাষিতং অমৃতং!

—ঠিক ধরিছং। —পিন্‌ডিদা একটা প্রায় ভেঙচি কেটে আবার আমার দিকেই ফিরল, বলি জীবনে কটা ছাড়া-সিংহর সঙ্গে মোকাবিলা করেছিস যে তাদের আচার-আচরণ সম্পর্কে একেবারে বেদব্যাস হয়ে বসে আছিস?

এবার ভয়ে ভয়ে কার্তিক জিজ্ঞাসা করল, তুমি নিজের হাতে মোকাবিলা করেছ নাকি?

পিন্‌ডিদার ঠান্ডা দুই চক্ষু এবারে ওকে নস্যাৎ করে নিল একদফা। তারপর মোলায়েম করে পাল্টা প্রশ্ন করল, বলি ব্রেজিল জায়গাটার কতটুকুতে মানুষ বাস করে, আর কতটা জায়গা জুড়ে জন্তুজানোয়ার বাস করে—মানে কতটা সূর্যের আলো ঢোকে না এমন জঙ্গল—সে ছিটেফোঁটা জ্ঞান আছে না তাও নেই?

হাবুল হতভাগা হাসি-হাসি মুখে সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যে ফলিয়ে বলল, প্রায় সবটাই তো জঙ্গল—আর সিংহের সংখ্যাও নিশ্চয় মানুষের থেকে বেশি সেখানে—তাই না পিন্‌ডিদা?

পিন্‌ডিদা সস্নেহে একবার তাকাল তার দিকে। ওর কথার জবাব না দিয়ে অন্য সকলের উদ্দেশে গলা দিয়ে এমন একটা শব্দ বার করল যেন একসঙ্গে এতগুলো অর্বাচীন আর দেখেনি। বলল, ও-দেশ থেকে আসার সময় সঙ্গে সাত-সাতটা নানা রকমের বন্দুক আর রাইফেল ছিল। বম্বেতে পা দিয়েই সে-সব জমা করে দিতে হয়েছে—নইলে পুলিসের টানা হেঁচড়ায় প্রাণান্ত। আর হাঁটুর চাকতিই যখন গেছে ও-সব বয়ে বেড়িয়ে আর কী লাভ। ...আট-দশটা শিকারের অ্যালবাম ছিল, সে-সব দেখলে তোদের মতো বীর পুরুষেরা মূর্ছা যেত কি না কে জানে—লন্ডনের হানটিংকালচার অ্যাসোসিয়েশন সেগুলো একরকম ছিনিয়েই নিল—যদি একটাও আনতাম সোনার জন্য আপসোস থাকত না।

শুনে হাবুল বিস্ময়ে টইটম্বুর, নতুন করে আবার যেন পিন্‌ডিদাকে দেখছে। ওদিকে চটপটি, কার্তিকও কেবলুও মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। আমিও হঠাৎ কেমন হকচকিয়ে গেলাম, কী বলব ভেবে পেলাম না। বিশ্বাস হচ্ছে না—সেটাও আর তেমন জোর দিয়ে বলতে পারছি না।

এবারে আনন্দে গদগদ হেবো হোঁতকাটাই মওকা পেয়ে বলে উঠল, তাহলে পিন্‌ডিদা নিজের দুই-একটা অভিজ্ঞতার ঘটনা বলে আমাদের জানোয়ার এক্সপার্ট সোনাকে সিংহর আচরণ সম্পর্কে একটু সমঝে দাও না?

পিন্‌ডিদা অল্প অল্প হাসতে লাগল। টেনে টেনে বলল, এতবড় এক্সপার্টকে সমঝে দেব না, একটা ঘটনা বলে সামান্য একটু যাচাই করব। ঘটনাটা সম্পর্কে সিংহের রাজসিক মেজাজ আর আচরণ নিয়ে একটা মাত্র প্রশ্ন করব—শুধু সোনা কেন, পুরো একটা দিন চটপটি, কেবলু, কার্তিকের সঙ্গে মাথা খাটিয়ে জবাব দিক। সেই একটা সামান্য প্রশ্নের দশটা জবাব দিক ওরা—দশটার মধ্যে একটা জবাবও ঠিক হলে আমি দশ টাকা বাজি হারব—আর দশটার একটাও ঠিক না হলে সোনার দল দশ টাকা হারবে—কী হে সোনামণিরা, রাজি?

বাজির কথা উঠতে সকলেই সচকিত, কেবল হেবো হোঁতকার আনন্দ ধরে না। যে-ই জিতুক তার ষোলো আনা লাভ। বাজির ব্যাপারে বাদ পড়লেও খাওয়ার ব্যাপারে তো পিন্‌ডিদা ওকে ডাকবেই।

পিন্‌ডিদাকে দশ টাকা বাজিতে নামতে দেখে আমি অবাক—সেও আবার দশটা জবাবের মধ্যে একটা জবাব ঠিক হলেই সে হারবে। সিংহর মেজাজ বা আচরণ সম্পর্কে এমন কী প্রশ্ন হতে পারে যে পুরো চব্বিশ ঘণ্টা ভেবেও দশটা জবাবের মধ্যে একবারও ঠিক বলতে পারব না? তাছাড়া চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দরকার হলে এনসাইক্লোপিডিয়া পর্যন্ত ঘাঁটাঘাঁটি করতে পারব। এছাড়া অন্য বইও আছে।

সবার ওপরে মানের প্রশ্ন। ওয়ান ইজ টু টেন বাজি ধরার হিম্মতও যদি না থাকে—প্রেস্টিজ থাকে কী করে? ওদিকে চটপটি, কেবলু, কার্তিক অসহায় মুখে আমার দিকে চেয়ে আছে। হারলে ওরা সমান ভাগ নিতে কখনওই রাজি হবে না জানা কথা—আবার জেতার লোভও পুরো মাত্রায় আছে।

আমি জবাব দিলাম, ঠিক আছে—তুমি হারলে হেবো শেয়ার নেবে, না দশ টাকা তুমি একলাই দেবে?

পিন্‌ডিদা মুখ শুকিয়ে জবাব দিল, আমি একলাই দেব—ও বেচারাকে আর মিথ্যে লোকসানের মধ্যে টানি কেন?

ফলে আমার গোঁ আরও বেড়ে গেল। বললাম, বেশ চটপটি, কেবলু আর কার্তিককে আমি দলে নিলেও হারলে দশ টাকা আমি একলাই দেব। কিন্তু আমরা জবাব দিলে তুমি যদি ইচ্ছে করে বলো জবাব ঠিক হয়নি?

পিন্‌ডিদা ভুরু কুঁচকে তাকাল আমার দিকে—এতখানি অধঃপতন হয়েছে তোর! পিন্‌ডিদা দশটা টাকার জন্য মিছে কথা বলবে?" ঠিক আছে, প্রশ্নের উত্তর আমি কাল কাগজে লিখে আনব। আর ওই একটা প্রশ্নের দশ-দশটা উত্তর তোরাও আর একটা কাগজে লিখে নিয়ে আসবি। তারপর আমার উত্তর লেখা কাগজ তোদের হাতে দেব—তোদেরটা আমার হাতে দিবি। তোদের সবকটা উত্তর পড়া হলে তারপর আমার উত্তরটা দেখবি। দশটা জবাবের একটা জবাবও ঠিক হলে তক্ষুনি দশ টাকা দিয়ে দেব।—এবার বিশ্বাস হচ্ছে ?

এরপর আর অবিশ্বাসের কোনও প্রশ্নই থাকতে পারে না। আমি তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে পিন্‌ডিদার হাত ধরলাম। অর্থাৎ, এর এপর আর কোনও কথা নেই।

পিন্‌ডিদা চিবিয়ে চিবিয়ে শুরু করল, আগে ঘটনাটা বলি শোন। ব্যাপারটা ঘটেছিল ব্রেজিলের ম্যানটশ থেকে মাইল তিরিশ দূরের একটা জঙ্গলে। সেই জঙ্গলের একজন কেয়ারটেকারের অতিথি হয়ে দিনকতক ছিলাম আমি। তার কোয়াটারস-এর পর থেকেই জঙ্গল শুরু।

সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনছি। বাজির ব্যাপার আছে পরে, তাই প্রতিটি কথা মনে গেঁথে নেওয়ার তাগিদ আমাদের।

পিন্‌ডিদা বলতে লাগল, এক দুপুরে অন্যমনস্কের মতো বেড়াতে বেড়াতে কতদূরে যে চলে গেছি খেয়াল নেই। আসলে মাথায় তখন ফুটবল ঘুরছিল আমার।

...হঠাৎ চমকে উঠে দেখি সামনে তিরিশ গজের মধ্যে পেল্লায় এক সিংহ—কালচে মেটে রং, ঘাড়ে-গর্দানে দেড় হাত ফাঁপানো কেশর। আমার খালি হাত, সঙ্গে একটা বন্দুক পর্যন্ত নেই। আমার হাত-পা অসাড়।

কয়েক পলকের মধ্যেই সেই বিরাট সিংহ বিকট এক গর্জন করে তীরের মতো ছুটে এসে চোদ্দো হাত দূর থেকে আমার মাথা লক্ষ করে মারল প্রচণ্ড এক লাফ। আর ঠিক সেই মুহূর্তে দিশেহারার মতো চোখ-কান বুজে আমি মাটিতে বসে পড়লাম। সিংহ আমার মাথার ওপর দিয়ে টপকে আরও চোদ্দো হাত দূরে গিয়ে পড়ল।

...কিন্তু পশুরাজ একেই বলে, বুঝলি সোনা? একবার শিকার ফসকে ফিরে আর আক্রমণ করল না। ঘুরে গম্ভীর বিরক্তিতে আমাকে একবার দেখে নিল, তারপর নিজের ওপরেই রাগে গজগজ করতে করতে চলে গেল।

ঘটনা শুনে সকলেই হতভম্ব আমরা। বিশ্বাস করব কী করব না ভেবে পেলাম না।

পিন্‌ডিদা আবার শুরু করল, প্রাণে বেঁচে আমার মাথায় একটা প্ল্যান এল! সিংহটা আশপাশেই থাকে ধরে নিয়ে পরদিন খুব ভোরে সেখানে একটা ছাগল বেঁধে রেখে দুপুরে ঠিক আগের দিনের সময় ধরে বন্দুক নিয়ে চুপিচুপি সেদিকে এগোলাম।

কিন্তু কিছুদূর থেকে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে যা দেখলাম, আমার চক্ষুস্থির। আর তক্ষুনি বুঝলাম আগের দিনের শিকার অর্থাৎ আমাকে ফসকে পশুরাজের মেজাজ কী হতে পারে। আর বুঝলাম, এই মেজাজ আর এই আচরণ বলেই সিংহ পশুরাজ।

পিন্‌ডিদার হাসিমাখা চোখ দুটো সকলের মুখের ওপর এক চক্কর ঘুরে আমার মুখের ওপর এঁটে বসল। খুব আলতো করে বলল, তুই তো জানোয়ার এক্সপার্ট—এখন ভেবেচিন্তে বল, ওই সিংহের কোন মেজাজ আর কী আচরণ দেখে অত অবাক হলাম আমি—কী অবস্থায় দেখা সম্ভব, আর কেনই বা সিংহকে যোগ্য পশুরাজ বলছি আমি। এক কথায় আমি গাছের আড়াল থেকে ওই সিংহকে কী অবস্থায় দেখেছিলাম দশবারের চেষ্টায় আঁচ করতে পারলেই আমি দশ টাকা হারব।

আমি, চটপটি, কেবলু আর কার্তিক দস্তুরমতো একটা উত্তেজনা নিয়েই বাড়ি এসে আলোচনায়

বসে গেলাম। একটা সিংহ কী এমন করতে পারে যা দশ রকমের উত্তর লিখেও ঠিক মেলাতে পারব না?

সেদিন রাত এগারোটা পর্যন্ত আর পরদিন সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটে পর্যন্ত মাথা ঘামিয়ে আমরা সম্ভাব্য দশটা উত্তর লিখলাম, যথা :

এক। সিংহ ছাগলটাকে না খেয়ে আগের দিনের প্রতিশোধ নেবার জন্য শিকারির আশায় ওত পেতে ছাগলটার পাশে বসে আছে।

দুই। সিংহ ছাগলটাকে খেয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে, কিন্তু বুদ্ধি করে তার সিংহীকে পাহারায় মোতায়েন রেখেছে।

তিন। সিংহ শিকারির মতলব বুঝে ওটাকে না খেয়ে ওটার সঙ্গে খেলা করছে।

চার। আগের দিনের শিকার ফসকে সিংহের এমন ঘেন্না ধরে গেছে যে, ছাগলের খুঁটি উপড়ে দড়ি টেনে সে ছাগলটাকে জঙ্গলের বাইরে ছেড়ে দিতে যাচ্ছে।

পাঁচ। শিকার ফসকাবার লজ্জায় সিংহ ছাগলটাকে ছোঁবে না, কিন্তু সিংহী তাকে খেতে চায়; ফলে সিংহের সঙ্গে সিংহীর লড়াই বেধেছে।

ছয়। রাগের চোটে সিংহ নিজে ছাগল না খেয়ে সেখানকার বিষাক্ত পিঁপড়ে দিয়ে ছাগলটাকে খাওয়াচ্ছে, আর সে গম্ভীর চোখে তাই দেখছে!

সাত। সিংহ চালাকি করে পিন্‌ডিদা আসার ঢের আগেই ছাগল নিয়ে চম্পট দিয়েছে।

আট। ছাগলটাকে ভয় পেয়ে ব্যা ব্যা করতে দেখে সিংহ ওটার গা চেটে অভয় দিচ্ছে।

নয়। সিংহ ওই ছাগলের সামনে আরও অনেক জন্তু-জানোয়ার মেরে এনে সেখানে ফেলে রেখে শিকারিকে তার তেজ দেখিয়ে গেছে।

দশ। ছাগলটাকে রক্ষা করার জন্য সিংহ অন্য জানোয়ারের সঙ্গে তুমুল লড়াই করছে।

মোট কথা এর বাইরে আর কিছু হতে পারে বলে আমাদের মনে হল না। একমত হয়েই আমরা পাঁচটার পর মাঠে এলাম। শেষেরগুলো খুব সম্ভব নয়, প্রথম দিকের একটা না একটা মিলবেই।

যথাসময়ে হাবুলের সঙ্গে পিন্‌ডিদাও এসে হাজির। উঁচু জায়গায় বসতে বসতে পিন্‌ডিদা বলল, কী রে, মনে হচ্ছে দশটা টাকা খসলই আমার। দেখি কী উত্তর এনেছিস। আর এই নে আমার উত্তর।

হাত বাড়িয়ে একটা খাম আমার হাতে দিয়ে আমাদের উত্তর লেখা কাগজটা টেনে নিল।

তারপর পিন্‌ডিদা যত পড়ে তত হাসে।

পড়া শেষ করেও পিন্‌ডিদা হেসে অস্থির। শেষে বলে, গাধা বটে তোরা এক-একটা। পরে বিশেষ করে আমাকে বলল, এই জ্ঞানগম্যি নিয়ে পশুরাজের মেজাজ আচরণ জানার বড়াই করিস! নে টাকা দশটা বার কর।

টাকা বার করার আগে খাম থেকে পিন্‌ডিদার উত্তর লেখা কাগজ বার করলাম। ওতে লেখা :

গাছের আড়াল থেকে আমি দেখলাম, আগের দিন বুক-মুখ-মাথা টপকে শিকার ফসকাবার ফলে সেই সিংহ বাঁধা ছাগলের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে একমনে লো-জাম্প (নিচুপাল্লার লাফ) প্র্যাকটিস করে চলেছে।

# পিন্‌ডিদার চণ্ডীপাঠ

কথায় বলে দাঁত থাকতে দাঁতের মর্ম বোঝে না। আমাদেরও সেই দশা এখন। যে দাঁতের জোরে আমাদের এত কড়কড়ানি সেটা যে নিজেদের দোষে এভাবে উপড়ে যাবে কেউ ভাবিনি। টুপ করে খসেই পড়ল যেন একেবারে।

আজ চোদ্দো পনেরো দিন হয়ে গেল আমাদের সামনের ওই উঁচু ঢিপির আসন খালি। ওখানে একজনেরই বসার অধিকার সেটা নিজেদের অগোচরেই মেনে নিয়েছি আমরা। বলা বাহুল্য, সে-অধিকার পিন্‌ডিদার। পিন্‌ডিদা অনায়াসে একদিন যেমন ওই উঁচু আসনটি দখল করেছিল তেমনি অনায়াসেই অর্থাৎ কোনওরকম পিছুটান না-রেখেই যেন ওটা ছেড়ে চলে গেল। পূর্ণিমার আকাশে চাঁদ নেই আর বর্ধমানের বাবুগঞ্জের মাঠের ওই ঢিপির আসনে পিন্‌ডিদা নেই—তফাত নেই খুব। এ-যেন আমরা হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছি এখন।

ব্রেজিল-ফুটবলে একদা বিশ্ব-একাদশের সব থেকে সেরা বাছাই ফরোয়ার্ড প্রদীপনারায়ণ দত্ত, অন্যথায় পি-এন্‌-ডি—এককথায় শত সহস্র উল্লসিত শ্বেতাঙ্গ-কণ্ঠের 'পিন্‌ডি', হাঁটুর মালাই-চাকি ভেঙে সমস্ত ব্রেজিলকে কানা করে দিয়ে এমনি নিঃশব্দেই উধাও হয়ে ভারতের মাটিতে এসে পড়েছিল। আর তারপর আমাদেরই বরাত জোরে পশ্চিমবাংলার এই বর্ধমানের বাবুগঞ্জের পাকা বাসিন্দা হয়েছিল। কিন্তু অতবড় ভাগ্যের কতটুকু দাম আমরা দিলাম? পিন্‌ডিবিহীন সেই ব্রেজিল শহরের হাহাকারের গল্প শুনে মুচকি হেসেছিলাম আমরা। তার আসার নামেই গোটা ব্রেজিল নাকি শোকের মেঘে ঢেকে গেছল। আর তারপর দিকে দিকে হাজার হাজার মেয়ে পুরুষের স্লোগান উঠেছিল, নো পিন্‌ডি, নো ফুটবল, নো ব্রেজিল! পিন্‌ডি ছাড়া চলবে না—চলবে না! ফুটবল জাদুকরকে জাতীয় সম্মান দিয়ে ধরে রাখতে হবে, রাখতেই হবে! আকাশ-ফাটা সেই স্লোগানে কানের পর্দা ঝাঁঝরা হবার ভয়ে সেখানকার সর্বস্তরের হোমরা-চোমরারা এসে পিন্‌ডিদার হাতে পায়ে ধরাধরি। —পিন্‌ডি, তুমি ব্রেজিলের গৌরব, ব্রেজিলের গর্ব—তোমার হাঁটুর মালাই-চাকি ভেঙেছে, কিন্তু তুমি তো আস্ত আছ—আর যতদিন আস্ত আছ ততদিন তুমি আমাদের—তোমার সমস্ত দায়-দায়িত্ব ব্রেজিলের!

শেষ পর্যন্ত আস্ত ফেরা আর সম্ভব নয় বুঝে সকলের চোখে ধুলো দিয়েই নিঃশব্দে ব্রেজিল থেকে খসে পড়তে হয়েছিল পিন্‌ডিদাকে। তারপর সেখানকার সেই উত্তাল হাহাকারের খবর কাগজে পড়েছে। শোকে ব্রেজিলের আকাশ ছেয়ে গেছল। হাজার হাজার ছেলেমেয়ে এসে বেসরকারি তল্লাশি দলে নাম লিখিয়েছে। সরকারি মিসিং স্কোয়াড আকাশ ঢুঁড়েছে, সমুদ্র ফুঁড়েছে, পাহাড় উড়িয়েছে, জঙ্গল পুড়িয়েছে। ব্রেজিলের সেই হাহাকারের খবর পড়ে ক-রাত যে পিন্‌ডিদার ঘুম হয়নি সে কেবল সে-ই জানে।

এটুকু শুনে তার তোয়াজের দোসর হোঁতকা হাবুল মোটা শরীর দুলিয়ে চুকচুক করে বলেছিল, আ-হা, পিন্‌ডিদা, পরে একবার অন্তত তোমার সেখানে যাওয়া উচিত।

ওই ঢিপির আসনে বসে পিন্‌ডিদা উদাস চোখে দূরের আকাশের উড়ো-চিলটাকে দেখছিল আর মুখরোচক বেলেহাঁস কল্পনা করছিল ওটাকে। বিমনাভাবে বলেছিল, যেতে তো পারি, কিন্তু গেলে আবার কী হবে জানিস তো...।

এটুকুতেই সম্মানিত বোধ করে বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়েছিল হেবো তাও তো বটে, কী করেই বা আবার সেখানে যাও তুমি!

কিন্তু কেবলুর কৌতূহল একবার চাগিয়ে উঠলে সে সেটা সহজে হজম করতে পারে না। উশখুশ করে প্রশ্নের সঙ্গে একটু সংস্কৃতের জ্ঞানও ঝাড়তে গেছল। –গেলে কী হবে পিন্‌ডিদা আকাশের চাঁদ পেয়ে একেবারে 'ভোগস্য দাসঃ' বানিয়ে ফেলবে তোমাকে?

আকাশ থেকে পিন্‌ডিদার দু-চোখ সামনের রাস্তার দিকে নেমে এসেছিল। বিড়বিড় করে বলেছিল, কুড়মুড়ে ভাজা–

তখন নতুন আলাপই বলা চলে, পিন্‌ডিদার কথাবার্তার সাদা-সাপটা অর্থ ভালো বুঝতাম না। হঠাৎ কুড়মুড় ভাজা শুনে আমরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করছিলাম। অন্যমনস্কের মতো আঙুল তুলে পিন্‌ডিদা সামনে রাস্তাটা দেখিয়ে দিয়েছিল।

হ্যাঁ, কুড়মুড় ভাজা মানে কুড়মুড় ভাজাই, সংস্কৃতয় তেরো পাওয়া কেবলুর ভাষায় পিন্‌ডি-প্রত্যয় কিছু নেই ওতে। চেনা-মুখ কুড়মুড়-ভাজা-অলা হন্তদন্ত হয়ে খেলার মাঠের দিকে যাচ্ছিল। একটু বাদে খেলা শুরু হয়ে যাবে। পিন্‌ডিদা তাকেই দেখিয়েছিল আর তার কথাই বলছিল।

আমার ইশারা পেয়ে কেবলুই ছুটে গিয়ে ও-ব্যাটাকে ধরে আনল। কিন্তু পিন্‌ডিদার মন তখনও ব্রেজিলেই উধাও বোধহয়। কুড়মুড় ভাজা-অলার কাছ থেকে পর-পর তিনবার হাত বাড়িয়ে তিন ঠোঙা নিয়ে পাশে রেখে চিবুতে শুরু করেছে খেয়ালও নেই।

কুড়মুড় ভাজা-অলা চলে যেতে হোঁতকা হেবো আড়চোখে একবার আমাকে দেখে নিয়ে হেসে হেসে চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছিল, ব্রেজিলে ফিরে গেলে কী হবে সেটা কিন্তু কেউ এরা বুঝতেও পারছে না পিন্‌ডিদা–

পিন্‌ডিদা এখানে এসে ওই টিপির আসনে কায়েম হয়ে বসার আগে আমি ছিলাম এই দলের পান্ডাগোছের একজন–যাকে বলে ব্রেন। ওই হোঁতকার সঙ্গে আমার প্রায়ই লেগে যেত তখন। হাতির মাথা আর বাঘের মাথা যে এক নয় সেটা ও বুঝতেই চাইত না। পিন্‌ডিদাকে তার উঁচু আসন আমি সসম্মানেই ছেড়ে দিয়েছিলাম। তবু হোঁতকার ধারণা, ভিতরে ভিতরে আমার সেই কারণে একটু জ্বলুনি আছে। নইলে পিন্‌ডিদার সব কথা সর্বদা আমি বেদবাক্য বলে মেনে নিই না কেন? তাই আমার পয়সায় কুড়মুড় ভাজা চিবুলেও ফাঁক পেলে ঠাসতে ছাড়ে না।

কিন্তু আমার সহ্যগুণ থাকলেও ও মুখ খুললে চটপটি একটুতেই চিড়বিড় করে ওঠে। ও বলেছিল, তুই তো বুঝে মাত করে দিয়েছিস একেবারে। কী আবার হবে, ব্রেজিলে ফিরে গেলে পিন্‌ডিদাকে সেখানকার সকলে মিলে দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা নজরবন্দি করে রাখবে–এটুকু বুঝতে আর কষ্ট কী! এভাবে স্বাধীনতা খোয়ানোর জন্যে পিন্‌ডিদা আর সেখানে ফিরে যেতে পারে!

–হুঃ! গলা দিয়ে বিরক্তিকর একটা শব্দ করে পিন্‌ডিদা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। যেন কুড়মুড় ভাজার সঙ্গে দাঁতে লোহার দানা পড়েছে একটা। আর ওইটুকু শুনেই বেচারা চটপটি একেবারে চুপসে গেছল। ওই গাধার মাথা হেবো হোঁতকার কাছেও আর মান-ইজ্জত থাকল না।

যা-ই হোক, ফের ব্রেজিলে ফিরে গেলে পিন্‌ডিদার কী হবে, এই কৌতূহলটাই বেশ দানা বেঁধে উঠেছিল এরপর। কিন্তু পিন্‌ডিদার ভিতরটা যেন সাত-সমুদ্দুরের ওপারেই বসে আছে তখনও। কুড়মুড় ভাজা চিবুচ্ছে আর শব্দ না করে বড় নিশ্বাস ছাড়ছে।

এমনিতেই একসঙ্গে পাঁচটা কথা বলতে বাধো-বাধো ঠেকে কার্তিকের। তা বলে ভিতরটা কি ওতেই চুপ করে থাকে নাকি? বিশেষ করে একটা সম্ভাবনা মাথায় যখন এসেই গেছে। পরীক্ষার পর ও আবার কবিতা লেখা শুরু করেছে। যাকে বলে সরব চিন্তা–সেই-রকম করে বলেছিল,

বোধহয় সেখানকার মস্ত কারও মেয়ে-টেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে পিন্‌ডিদাকে একেবারে আটকে ফেলা হবে--সংসারের খাঁচা পিন্‌ডিদার কিছু কক্ষনো ভালো লাগতে পারে?

বিমনার মতোই পিন্‌ডিদা আস্তে আস্তে ঘুরে তাকিয়েছিল ওর দিকে। তারপর সব ছেড়ে শুধু ওর মাথাটার দিকেই হাঁ করে চেয়েছিল খানিক। এর বেশি আর কিছু দরকার হয়নি, ওটুকুতেই কার্তিক কুপোকাত।

বাতাস জমে উঠতে হোঁতকা হাবুল চাপা আনন্দে চাপা আনন্দে জুলজুল করে আমার দিকে তাকাতে লাগল। ভাবখানা, কী গো সোনামণি, সবাই তো তল, এখনও মুখে সেলাই কেন--বুদ্ধির দৌড় দেখাও?

না, পিন্‌ডিদার ওপর রাগ হয় না, তার হাব-ভাবই ওইরকম উঁচু দরের, হাবুলটার এরকম মোসাহেবিপনা দেখলে পিত্তি জ্বলে যায়। কিন্তু আমার টিপ্পনীটা যে পিন্‌ডিদা এ-ভাবে মাথা পেতে নেবে কল্পনাও করিনি। হাবুলকে আর সেই সঙ্গে পিন্‌ডিদাকেও হয়তো একটু তাতিয়ে তোলার জন্য বলে ফেলেছিলাম, কী আবার হবে, ব্রেজিলের লোকেরা পিন্‌ডিদার হাঁটুর ভাঙা মালাই চাকতিতে পেরেক ঠুকে আবার তাকে ফুটবলের মাঠে নামিয়ে দেবে--

জবাব শুনে দশাসই হাবুল রেগে উঠবে কী হেসে গড়াবে ভেবে না পেয়ে কুতকুত করে পিন্‌ডিদার দিকে চেয়ে রইল।

কিন্তু সকলকে, এমনকি আমাকেও অবাক করে পিন্‌ডিদা সাদামাঠা মন্তব্য করেছিল, সোনা তবু কাছাকাছি--

এবার আমার তাকানোর পালা হাবুলের দিকে। চটপটি, কার্তিক আর কেবলুও খুশি খানিকটা। কিন্তু তার আগেই ফের পিন্‌ডিদার গলা শুনে সকলে সচকিত। কুড়মুড় ভাজার শেষটুকু ভিতরে চালান দিয়ে পিন্‌ডিদার কথার সুতো ধরে থেকে সে বলল, কেবল--

আশান্বিত হয়ে হাবুলই তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করল, কেবল কী পিন্‌ডিদা?

--বলছিলাম, সোনা কেবল বোর্নিও যেতে গিয়ে বর্ধমানে নেমে পড়েছে।

হাবুল হোঁতকার সেই হি-হি হাসি হাড়পিত্তি জ্বালিয়ে দিচ্ছিল। ওর ওই পেল্লায় ভুঁড়ি কেঁপে-কেঁপে-ফেঁপে-ফেঁপে উঠেছিল।

ব্রেজিলে ফিরে গেলে কী হবে তিক্তবিরক্ত হয়ে পিন্‌ডিদা অবশ্য এর পর বলেই দিয়েছিল। --এত কী-যে মাথা ঘামাস তোরা বুঝি না। ওদের প্রেম বা ভালোবাসায় ভেজাল নেই আমাদের মতো এতো। ব্রেজিলে ফিরে গেলে ওরা স্রেফ আমাকে মেরে মমি বানিয়ে সব থেকে বড় আর চার রাস্তার মাঝখানে উঁচু বেদির ওপরে দাঁড় করিয়ে রাখবে। ব্যস, ফুরিয়ে গেল।

শোনার পর সকলেই আমরা একদিক থেকে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম, পিন্‌ডিদা আমাদের ছেড়ে কখনও কোথাও যাচ্ছে না। সেই পিন্‌ডিদা কোথাও না গিয়েও আমাদের বর্জন করেছে। চোদ্দো পনেরো দিন হয়ে গেল তার টিপির আসন খালি। এমন যদি হত, কোনও বড় রকমের ঝগড়া-ঝাঁটি করে সরে গেছে তাহলেও বোঝা যেত। কিন্তু পিন্‌ডিদা স্রেফ নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে মনের জগতে বিবাগী হয়ে গেছে। বর্ধমানের এই বাবুগঞ্জের মামাবাড়িতে থেকেও সে যেন ব্রেজিল ছাড়িয়ে আরও ঢের দূরে চলে গেছে।

রোজই বিকেলের রোদ না পড়তে মাঠের এই জায়গাটাতে এসে বসেছি আমরা। ঠাকুমার হাতবাক্স হাতড়ে কিছু টাকাও পকেটে মজুত রেখেছি। রোজই ভাবি, কত কী তো আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে দুনিয়ায়। মনে যা আছে সব ঝেড়ে ফেলে পিন্‌ডিদা আজ হয়তো আসবে। আমি আর চটপটি এক সঙ্গেই আসি। ওদিক থেকে কেবলুকে নিয়ে কার্তিকও হাজিরা দেয়। মাঠে আসা ব্যাপারে কেমন করে আমরা যেন একটু বেশি পাংচুয়াল হয়ে গেছি। একটু-আধটু দেরি হলেও হাবুলেরও

আসার কামাই নেই। ও ভেবেছিল পিন্‌ডিদার অনুপস্থিতির সুযোগে আমরা বোধহয় কথায় কথায় ঠাসব ওকে। কিন্তু সে-রকম লক্ষণ না দেখে সে-ও এসে বেজার মুখ করে বসে থাকে। পিন্‌ডিদার সব থেকে অনুগত ভক্ত যে ও, তাতে তো কারও সন্দেহ নেই। ওর দুঃখ আমাদের থেকে বেশি ছাড়া কম নয়। তাছাড়া পিন্‌ডিদার সম্পর্কে টুক-টাক দুই একটা খবর ও-ই এনে দেয়।

ভিতরে ভিতরে এরা এরপর আমাকেই দুষবে জানি। ভিতরে ভিতরে কেন, এখনই শুরু হয়ে গেছে। হাবুল আসার আগে চটপটি তো সেদিন বলেই ফেলল, পিন্‌ডিদা তো আর হেঁজিপেজি কেউ নয়, মানীর মানে একটা ঘা না দিলেই পারতিস।

কেবলু আর কার্তিকও চুপ করে থাকল। অর্থাৎ চটপটির কথাতেই ঘুরিয়ে সায় দিল। আমি রেগে গিয়ে বললাম, তোরা আমার সঙ্গে ছিলি কি ছিলি না? তখন তো দিব্বি সায় দিয়ে মজা লুটেছিস! তাছাড়া পিন্‌ডিদা কি আমাদের কারও ওপর রাগ করেছে এক-ফোঁটা? তার ভিতরে-ভিতরে এরকম একটা পরিবর্তন এসেছে বলেই না আমরা তাকে হারাতে বসেছি!

যুক্তির দিক থেকে সবই ঠিক। চটপটি আর পালটা জবাব কিছু দিয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু নিজেকে যে আমি দোষী ভাবছি একটু তাও ঠিক। পিন্‌ডিদার দোষের মধ্যে একটু খেতে ভালোবাসে। তা দুনিয়ায় কত বড় বড় লোকই তো খেতে ভালোবাসে। আমরাও কম ভালোবাসি না। কিন্তু পিন্‌ডিদার এই খাওয়ার ব্যাপারটাকে নিয়ে আমি কি একটু বেশি কচলে ফেলিনি?

খুলেই বলি।

দু-মাস হল একটা ভোজনপর্বের ব্যাপার চলছিল নিজেদের মধ্যে ব্যাপারটা শুরু করেছিল হাবুল। পিন্‌ডিদা বাদে সকলকে অবাক করে দিয়ে হাবুল একদিন ওর বাড়িতে চায়ের নেমন্তন্ন করে বসল আমাদের। ব্যাপার বোঝার জন্য আমরা হাঁ করে ওর মুখের দিকে চেয়েছিলাম। লজ্জা-লজ্জা মুখ করে গৌরবটা হাবুল পিন্‌ডিদার দিকেই চালান করে দিল। বলল, এটা পিন্‌ডিদার সাজেশান।

হাবুলের নেমন্তন্ন পেয়ে শুধু পিন্‌ডিদার অবাক না হওয়ার কারণ বোঝা গেল। কিন্তু এ-কথা শোনার পর আমরা আরও বেশি অবাক। পিন্‌ডিদাকে তো হাবুলের ওপরেই সব থেকে বেশি সদয় জানতাম! তার ওপরেই পিন্‌ডিদার এমন অকরুণ হামলা কেন?

তাও বোঝা গেল। হাবুল অনেক দিন ধরেই তার বাবার বন্ধুর ফোটোগ্রাফির দোকানে কাজ শিখছিল। বাবার বন্ধু গেল মাস থেকে হাবুলের মাসে একশো টাকা অ্যালাওয়েন্স বরাদ্দ করেছে। বর্ধমান শহরে ওটাই সব থেকে জমজমাট ফোটোগ্রাফির দোকান। হাবুল নাকি স্টিল ক্যামেরায় হাত পাকিয়ে এখন মুভি ক্যামেরায় (বিজ্ঞাপনের জন্য) কাজ শিখছে।

হাবুলটা রাতারাতি অন্য মানুষ হয়ে গেল আমাদের চোখে। বরাত বটে! এই বরাতের খবর নিয়ে হাবুল পিন্‌ডিদাকে প্রণাম করতে গেছল। শোনার পর আশীর্বাদস্বরূপ পিন্‌ডিদা ওকে এই ফতোয়া দিয়েছে। মেনুও সে-ই করে দিয়েছিল। বিকেলের জলখাবার হলেও ভর-পেট ব্যবস্থাই হয়েছিল। বেগুন ভাজা, লুচি, মাংস, চাটনি আর শেষে দুটো করে বড় সাইজের মিষ্টি।

মনের আনন্দে খেতে খেতে কেবলুটা একটু বেশি উল্লাস করে ফেলেছিল। বলেছিল, ফি বছর এই দিনটায় আমাদের নিয়ে হাবুলের সেলিব্রেট করা উচিত—অস্মাকম্ তুষ্টে হাবুলঃ পরিতুষ্টম্!

পিন্‌ডিদা পিটপিট করে কেবলুর দিকে তাকাতে লাগল। কেবলুর সেদিকে খেয়াল নেই, মাংসের কচি হাড়ের সঙ্গে সংস্কৃত চিবুতে পেরে দু-চোখ আধ-বোজা।

পিন্‌ডিদা আলতো করে জিজ্ঞাসা করল, টানা একটা বছর অপেক্ষা করতে তোর ভালো লাগবে?

পিন্‌ডিদার কাছ থেকে এ-রকম সমর্থন পেয়ে আনন্দে মুখের হাড় চিবুতে ভুলে গেল কেবলু। —তবে কি মাসে একদিন বলছ?

পিন্‌ডিদা বলল, সে-ও তো তিরিশটা দিন, আমার অত ধৈর্য নেই, সামনের রবিবারেই ভালো।

হাবুলের থলথলে মুখে যেন কালি লেপা হল এক প্রস্থ। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই পিন্‌ডিদা কেবলুর দিকে চেয়ে কোর্টের বিচারকের মতো রায় দিল, সামনের রবিবারে তুই খাওয়াচ্ছিস।

হাত কামড়াতে গিয়ে কেবলু নিজের আঙুলে কামড়ে বসল। তারপর আঁতকে উঠে বলল, আমি! বা রে, আমি খাওয়াতে যাব কেন, আমি কি চাকরি পেয়েছি!

পিন্‌ডিদা ভুরু কুঁচকে তাকাল ওর দিকে। একবার যখন রায় দিয়ে ফেলেছে আর রক্ষা নেই। বলল, কেন, তুই এবারে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দিসনি?

কেবলু ফাঁড়া কাটাবার আশায় তড়বড় করে জবাব দিল, দিচ্ছিলাম, কিন্তু সংস্কৃত পরীক্ষা তো না দিয়েই কোশ্চেন পেপার হাতে নিয়ে উঠে এসেছি—আমার ফেল করা ঠেকাবে কে? সোনার বরং ভালো রেজাল্টের আশা, ও খাওয়াতে পারে।

বিপাকে পড়লে এইভাবেই পার পেতে চায় কেবলুটা। কিন্তু আজ পিন্‌ডিদা শনি হয়ে ওর কাঁধেই ভর করেছে। খেঁকিয়ে উঠল, সোনা সোনাই—তাই বলে তুই চিরটা কাল কয়লা হয়ে থাকবি? সংস্কৃত পরীক্ষা না দিয়ে উঠে এসেছিলি কেন—বেশি ফুর্তি হয়েছিল বলে?

বিপদনাশের আশায় কাঁদ কাঁদ মুখ করে কেবলু বলল, না, ভয়ানক দুঃখু হয়েছিল বলে, চোখ বুজে নম্বর দিলেও ষোলো-সতেরোর বেশি পেতাম না।

—তবে? পিন্‌ডিদা আর নির্মম কঠিন। —সামনের বার সেটা একষট্টি বা একাত্তর করতে হবে না? আমাদের খাইয়ে তুষ্ট করলে তোর সংস্কৃত সরস্বতীও তুষ্ট হবে বলে দিলাম, যা—

কেবলুর সর্বনাশ, কিন্তু হাবুলের এখন পৌষ মাস। মাংসের ঝোলে ডোবানো হাত চাটতে চাটতে সে এবার উঠেই দাঁড়াল। কেবলুর ওপর ছোট ছোট চোখের সমস্ত স্নেহ উজাড় করে বলল, পিন্‌ডিদার আশীর্বাদের জোর জানিস না, আমাকে মনে মনে কত আশীর্বাদ করেছে বলেই না এমনটা হল—নইলে একশো টাকা ছেড়ে দশ টাকা রোজগারের মুরোদ ছিল আমার? পিন্‌ডিদা যা বলল, চোখ কান বুজে করে ফেল, সামনের বার সংস্কৃতের জ্বালা-পোড়ার হাত থেকে তুই বেঁচে যাবি দেখে নিস—

কেবলু আমার ঘাড়ে চাপতে চেয়েছিল এবারে আমি আর একটু উসকে দিলাম। —তাহলে এই মেনুই তো ঠিক থাকল! পিন্‌ডিদা?

পিন্‌ডিদার ডিশের বড় রসগোল্লা দুটোও উদরস্থ হয়ে গেছে ততক্ষণে। হাবুল তাড়াতাড়ি নিজের ডিশের রসগোল্লা দুটোও তার সামনে এগিয়ে দিল। পিন্‌ডিদা সস্নেহে তাকাল একবার ওর দিকে, বলল, তুই দিনকে-দিন যা মোটা হচ্ছিস, তোর বেশি মিষ্টি খাওয়া ভালো নয় আমিও ভাবছিলাম। তারপর আমার দিকে ফিরে জবাবটা দিল। —হ্যাঁ, এই মেনুও থাকতে পারে, আর কেবলু চাইলে বেগুন ভাজা আর চাটনির বদলে আলুর চপ আর টোমাটো সস্‌ও দিতে পারে। ওর যেমন সুবিধে, কারও ওপর জোর করা ঠিক নয়।

বাইরে এসে কেবলু আমার ওপরেই অভিমানে ফেটে পড়ল একেবারে। —শেষ পর্যন্ত তুইও তাল ঠুকে এ-ভাবে ডোবালি আমাকে।

আমি মুখ মুচকে জবাব দিলাম, কেন, তুমি আমার ঘাড়ে চাপতে চাওনি? সোনা ভালো পাস করবে, ও খাওয়াক—বলিসনি?

কাঁদো কাঁদো মুখ করে কেবলু বলল, তোর তো ঠাকুমা আছে, ঠাকুমার হাতবাক্স আছে—আমার কী আছে বল। সংস্কৃত কোশ্চেন পেপার হাতে করে পরীক্ষার হল থেকে উঠে এসেছিলাম বলে বাবা গায়ের ছাল ছাড়াতে বাকি রেখেছে—এখন এ-জন্যে টাকা চাইলে আর আস্ত রাখবে? আমি ভাই সামনের রোববারের আগেই বাড়ি ছেড়ে পালাব।

এবারে এই কেবলুটার জন্যেই মায়া হতে লাগল আমাদের। আমাদের বলতে আমার, চটপটির আর কার্তিকের। কিছু চাঁদা তুলে কেবলুকে দেবার নামে চটপটির গোল মাথা বনবন করে চক্কর খেল, ক্ষেপেছিস, কলেজে ঢোকার আগে পাঁচসিকে হাপিস করার উপায় নেই। জবাব না দিয়ে কার্তিকও কার্তিকমুখো হয়ে বসে থাকল।

কিন্তু একে কথা যখন হয়ে গেছে, উপায় তো একটা বার করতেই হবে। এই সামান্য ব্যাপারে পিছু হটলে পিন্‌ডিদার কাছে আমদের মান ইজ্জত থাকবে? চিরটা কাল খোঁটা দেবে না? খোঁটা দেবার সময় পিন্‌ডিদার আবার সকলকে জড়িয়ে নেওয়া স্বভাব। ঠিক বলবে, তোদের মুরোদ জানা আছে। খাতির-কদর এরপর যা একটু ওই হেবোটাই পাবে। কেবলুটার জন্য আমাদের সকলেরই নস্যি হয়ে যেতে হবে পিন্‌ডিদার কাছে—মাঠের আসরও আর হয়তো তেমন জমবে না।

সমস্যাই বটে একখানা।

কিন্তু এসব ব্যাপারে আমার মাথা এত চটপট খোলে যে, নিজেই মাঝে-মাঝে অবাক হয়ে যাই। ভাবতে গিয়ে এমন একখানা বুদ্ধি মাথায় এল যে আনন্দে আত্মহারা আমি। বলে উঠলাম, হয়েছে—কাউকে খরচা করতে হবে না, সব খরচ কেবলুই করবে! কেবলু ঝাঁঝিয়ে উঠল, তার মানে?

—তার মানে সব খরচ তোর বাবা করবে, মা করবে আর তোর হাত দিয়ে করাবে।

কেবলু বললে, তুই খেপেছিস?

—সবুর বৎস, সবুর। তোর বাবা তো আচার-অনুষ্ঠান মানা পণ্ডিত মানুষ—তোর মা কেমন, ধম্মে-কম্মে মতি আছে?

—বাবার থেকে বেশি ছাড়া কম নয়।

—ওয়ান্ডারফুল।

জবর কিছু প্ল্যান মাথায় এসেছে সেটা ওরা বুঝে নিয়েছে। অধীর হয়ে চটপটি তাড়া দিল, ব্যাপারখানা কী ভেবেছিস তাই বল্ না?

বললাম, আমাদের ক্লাসের হেপো ভোলাকে মনে আছে তোদের নাকি, না এর মধ্যেই ভুলে মেরে দিয়েছিস?

সন্ধে পেরোবার সঙ্গে সঙ্গে এই নাম শুনে খুব স্বস্তি বোধ করল না ওরা কেউ। কার্তিক বলল, সে তো গেল বছরেই মরে ভূত হয়ে গেছে, তাকে আবার টানছিস কেন?

বললাম, সে এখন কাঁধে না চাপলে কেবলুর পরিত্রাণের উপায় নেই। ভোলা আমাদের সকলেরই বাড়ি আসত, তার মধ্যে সংস্কৃত পড়ার ঝোঁকে কেবলুর বাবার কাছে বেশি যেত। হাইক্লাস!

রোগে ভুগে-ভুগে বেচারা ভোলা গত বছর মরেই গেল। সেই ভোলা এতদিন বাদে মুশকিল আসান কী করে করতে পারে কেউ এখনও ভেবে পাচ্ছে না দেখে আমার মজাই লাগছিল।

প্ল্যানটা এবার খোলসা করে বললাম ওদের। মন দিয়ে শোনার পর কেবলুর হতাশ মুখে পর্যন্ত আশার আলো জাগল। বাবা-মায়ের কাছে একটু বিপাকে পড়লে কেউ যে আমরা ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির নই কে না জানে। আনন্দের চোটে চটপটি বলে উঠল, তোর কী মাথা রে সোনা—অ্যাঁ?

কার্তিকও উদার খুশিতে ঘোষণা করল, প্ল্যান সাকসেসফুল হলে তোকে নিয়েই একটা কবিতা লিখব আমি!

পরদিন ঘুম থেকে উঠে নিখুঁতভাবেই কাজটুকু সেরে ফেলল কেবলু। অবাক-অবাক মুখ করে মায়ের কাছে গিয়ে বলল, কাল রাতে কী একটা স্বপ্ন দেখলাম গো মা, একেবারে জলজ্যান্ত যেন—

শুনেই ওর মা বলে উঠল, থাক থাক, স্বপ্নের কথা বলে কাজ নেই।

শোনোই না মা, একই জনকে দু-বার দেখলাম, একবার রাতে আর একবার ভোর রাতে।

ভালো স্বপ্ন না মন্দ, ভেবে না পেয়ে মা উতলা একটু। –কাকে দেখলি আবার?

–আমাদের ক্লাসের সেই ভোলাকে মনে আছে তোমার? বাড়িতে বাবার কাছে পড়তে আসত, তুমি মাঝে-মাঝে খেতে টেতে দিতে মনে নেই?

মায়ের খুব মনে আছে, কারণ এটুকু শুনেই ঘাবড়েছে।

–প্রায় এক বছর আগে মারা গেছে তো, এতদিন বাদে একেবারে সামনে বসে থাকতে দেখলাম তাকে–মুখখানা কী যে শুকনো কী বলব মা, একেবারে যেন কত দিনের উপোসি মূর্তিখানা। আবার ভোর রাতের দিকে ফের স্বপ্ন দেখলাম, ছুটির দিনের বিকেলে আমরা জনাকতক বন্ধু মিলে ওকে নিয়ে বসে লুচি মাংস আলুর চপ টোমাটো সস্ এসব খাচ্ছি, আর ভোলাটার তখন কী যে হাসি-খুশি মুখ মা–কী বলব!

স্বপ্নের কথা শুনে মা বিরস মুখে সোজা বাবার ঘরের দিকে চলে গেল। আর কেবলু তক্ষুনি তার পড়ার ঘরে বসে চেঁচিয়ে শব্দরূপ আর ধাতুরূপ পড়া শুরু করে দিল। এক ফাঁকে উঠে দেখে এল বাবা গম্ভীর মুখে পঞ্জিকা দেখছে আর মা তার সামনে দাঁড়িয়ে।

সেদিন আর কোনও কথা হল না। পরদিন মা নিজে থেকে এসে জিজ্ঞাসা করল, স্বপ্নে ভোলার সঙ্গে বসে যে বন্ধুদের নিয়ে খাচ্ছিলি তাদের মুখ মনে আছে?

–সে তো আছেই, আমরা ছ জন আর ভোলা–কেন মা?

–তাদের সব রোববার বিকেলে এখানে এসে খেতে বলে দে। আমি টাকা দিয়ে দেব, যা-যা খেতে দেখেছিস সে সবই ব্যবস্থা করবি–ভুলিস না যেন, একটা কাগজে লিখে রাখ।

কেবলুর আকাশ থেকে পড়ার মুখ একেবারে।

মা বলল, হাঁ করে চেয়ে আছিস কী? স্বপ্নে মৃতজনকে দেখলে লোক খাওয়াতে হয়–এ তো নিজেই খেতে চেয়েছে।

রোববারের খাওয়াটা হাবুলের বাড়ির খাওয়া থেকেও বেশি জমজমাট হয়েছে। কেবলুর মা নিজে জুলুম করেই খাইয়েছে সক্কলকে। কেবলু মাকে আগেই বলে রেখেছিল, তুমি স্বপ্নের কথাটা ওদের কাউকে বোলো না যেন মা, ওরা পরে হাসি-ঠাট্টা করবে–মরা মানুষকে নিয়ে ইয়ারকি আমার ভালো লাগবে না।

ভয় পিন্‌ডিদা আর হাবুলের জন্যে। মা কিছুই বলেনি।

কিন্তু খাওয়া শেষ হতে পরিতৃপ্ত একটা ঢেকুর তুলে পিন্‌ডিদা আবার আচমকা একটা বোমা ফেলল যেন। বলল, কার্তিক, সামনের রোববার তাহলে তোর ওখানে ব্যবস্থা।

কার্তিক বিষম একটা আছাড় খেয়ে উঠল যেন। –আ-আ আমার ওখানে কী ব্যবস্থা?

পিন্‌ডিদা বিরক্ত। –এক কথা কেন যে একবারে বুঝতে পারিস না, বুঝি না। কী ব্যবস্থা আবার—এখানে যা হল সেই ব্যবস্থা। একবার যখন শুরু হয়েছে, মাঝখানে থেমে আর লাভ কী, কলেজে ঢুকতে যাচ্ছিস সব, তার আগে একটা রিইউনিয়ন গোছের হয়ে যাওয়া ভালো না?

শুনে শুধু কার্তিক নয়, আমার আর চটপটির চোখও ছানাবড়া। সাদা কথায় এরপর চটপটি আর আমার পালা। কী কুক্ষণে যে হাবুল হতভাগাটা ওর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে প্রথম খাইয়েছিল আমাদের!

পিন্‌ডিদা আবার বলল, ছোট-ছোট এই ব্যাপারগুলোর মধ্যে আনন্দ পেতে শেখ, সেই আনন্দ আখেরে কত কাজ দেয় দেখিস। ব্রেজিলে তিন বেলা খাওয়া নিয়ে সব এমন কাণ্ড করত যে এক-একসময় মনে হত বনে-জঙ্গলে চলে যাই। কিন্তু ওদের ওই আনন্দটুকুর কথা ভেবে এড়ানোও যেত না। একটা জাত কি এমনিতে বড় হয় রে।

হাবুলের থলথলে মুখে হাসি চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছে। সে জিজ্ঞাসা করল, কার্তিকের বাড়ির মেনু কি এক রকমই হবে পিন্‌ডিদা?

পিন্‌ডিদা জবাব দিল, লুচি মাংস আর রাজভোগের আইটেম তো থাকবেই, তারপর কার্তিকের যেমন সুবিধে। কারও ওপর জোর করতে নেই বলেছি না!

রাগে সর্বাঙ্গ রি-রি করছে আমাদের। কেবলুর অতটা নয় বোধহয়, কারণ তার ফাঁড়া কেটে গেছে।

এর পর একে একে আরও তিনবার ভোলাকে স্বর্গ থেকে স্বপ্নে টেনে দিয়ে আসতে হল। একবার তার শুকনো মুখ দেখা যায়, আর একবার খাওয়ার আনন্দে হাসিখুশি মুখ। ছেলের কল্যাণ ভেবে কোন্ মা আর ব্যবস্থা না করে স্বপ্নের ইঙ্গিত উড়িয়ে দিতে পারে।

কিন্তু আমরা ঠিক করেছি, পিন্‌ডিদাকে এবারে আর কিছুতেই ছাড়া হবে না। সব শেষ তার কাছ থেকেও একটা খাওয়া আদায় করতে হবে। আর তা যদি না পারা যায়, আমাদের মনের ভাবটা তাকে ভালো করে বুঝিয়ে দিতে হবে। চটপটি কার্তিক আর কেবলু আমার সঙ্গে এক মত। ঘা খেয়ে সকলেই এবারে চনমনে হয়ে উঠেছে।

কার্তিক আর চটপটির পালা শেষ হতে পিন্‌ডিদা যখন আমার দিকে তাকাল, আমি নিজেই বললাম ঠিক আছে, পরের রোববারে আমার বাড়িতে। কিন্তু তার পরের রোববারে তোমার ওখানে—তুমি আমাদের লিডার, এই আনন্দটুকু থেকে নিশ্চয় আমাদের বঞ্চিত করবে না।

পিন্‌ডিদা পিটপিট করে খানিক চেয়ে রইল আমার দিকে।—

—মহাভারত পড়েছিস?

আমি বেপরোয়া। —হ্যাঁ পড়েছি।

—পড়েইছিস শুধু, শিখিসনি কিছু। এক সঙ্গে দুই চিন্তা করলে লক্ষ্যভেদ হয় না। এখন নিজের চরকায় তেল দিয়ে নিজের কর্তব্য ভাবো।

পরের রোববার নিজের চরকায় তেল দেওয়া বা নিজের কর্তব্য সারা হতে পিন্‌ডিদাকে চেপে ধরলাম—এবারে আর দুই চিন্তা করছি না, এখন একটা চিন্তা সামনের রোববারে তোমার ওখানে!

আমার সঙ্গে সঙ্গে শুধু হাবুল ছাড়া আর সকলেই সায় দিল।

পিন্‌ডিদা বলল, ক'সপ্তাহ ধরে খেয়ে খেয়ে কেমন অরুচি ধরে গেছে।

আমি বললাম, ব্রেজিলে দিনে রাতে তিন বেলা নেমন্তন্ন খেতে তুমি, এ তো মাঝখানে ছদিনের ফারাক—ফাঁসির খাওয়া খেলেও তার মধ্যে রুচি ফিরে আসবে। অন্য সকলকে বললাম, তাহলে সামনের রোববারের জন্য রেডি হ তোরা!

হাবুলের মুখখানা এমন যেন সে-ই বিপাকে পড়েছে। পিন্‌ডিদা অন্যমনস্কের মতো বলল, সামনের রোববারে হবে না. মামীর অশ্লেষা না মঘা কী একটা পড়েছে। দেখি—হাবলুকে নিয়ে উঠে চলে গেল।

আমি মরিয়া এবার। পিন্‌ডিদার থেকে খাওয়া আদায় করতেই হবে। আর তা না পারলে পিন্ডি চটকেই ছাড়ব তার। কী আর হবে। ব্রেজিলে তো আর ফিরে যেতে পারবে না—সেখানে গেলেই তো মেরে মমি বানিয়ে রাখবে।

একে একে তিন রোববার চলে গেল। কিন্তু আমার তাগিদের কামাই নেই. পিন্‌ডিদা কিছু একটা অজুহাত দেখিয়ে ঠিক এড়িয়ে যায়। একদিন তার মামার সঙ্গে রাস্তায় দেখা হতে পায়ের ধুলো নিয়ে বললাম, সামনের রোববার বিকেলে পিন্‌ডিদা আমাদের তার ওখানে খাবার কথা বলেছিল কিন্তু আমাদের সকলেরই আবার সেদিন আর এক বন্ধুর বাড়িতে নেমন্তন্ন—পিন্‌ডিদাকে বলে দেবেন, পরের রোববারে হলে আমাদের আপত্তি নেই।

ভদ্রলোক খানিক হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে রইল। তারপর খেঁকিয়ে উঠল, কে পিন্‌ডিদা?

আমি মুখ কাঁচুমাচু করে বললাম, আজ্ঞে আপনার ভাগ্নে প্র-প্রদীপদা।

—সে তোমাদের খাবার নেমন্তন্ন করেছিল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আমার বাড়িতে?

—ইয়ে কথায়-কথায় বলছিল।

হঠাৎ চোখ পাকিয়ে যেন মারতেই এল ভদ্রলোক। রেগে গিয়ে দু হাতের দুই বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলল, যাও, বন্ধুদের বলে দাও বাড়িতে এসে কাঁচকলা খেতে পাবে তোমরা—কাঁচকলা বুঝলে?

এই অপমানও সহ্য করতে হবে আমাদের? চটপটি ওরা সকলে এক বাক্যে বলল, কক্ষনো না!

এরপর আমাদের আচরণও দ্রুত বদলাতে লাগল। পিন্‌ডিদা এলেই রোববারের তাগিদ দিতে ছাড়ি না। এদিকে সে আসার আগে ডালমুট কুড়মুড় ভাজার ঠোঙা আর ঘুগনির পাতা আমাদের পাশে ছড়িয়ে থাকে। পিন্‌ডিদা সেগুলোর দিকে জুলজুল করে তাকায়, আবার আমাদের দিকেও। শেষে দূরের আকাশ দেখতে থাকে। আমরা তাগিদ দিই, ব্রেজিলের কিছু গল্প বলো না পিন্‌ডিদা, অনেক দিন কিচ্ছু বলছ না।

পিন্‌ডিদা ফোঁস করে বলে, ব্রেজিল দূরে সরে যাচ্ছে, কিছু ভালো লাগে না।

মওকা পেয়ে আমরা ভাবছি, আরও একটু আক্কেল তাকে দিতে হবে। মামার বাড়িতে সুবিধে না হোক, বিনোদের দোকান আছে। সেখানে তো অনায়াসে খাওয়াতে পারে আমাদের। ব্রেজিলের রোজগারের সব টাকা তো এরই মধ্যে শেষ হয়ে যায়নি। শেষ হবে কী করে, কোনওদিন হাতের আঙুল ফাঁক হতে দেখা যায়নি তার।

একটাকা দু' টাকার অনেক খুচরো নোট জমিয়েছি। পিন্‌ডিদার সামনেই সেগুলো বার করে মন দিয়ে গুনি, তারপর মনে মনে কিছু হিসেব করে সেগুলো আবার পকেটে রেখে দিই। চটপটি কেবলু কার্তিকও দু চার টাকা দেখায় আবার পকেটে রাখে।

পিন্‌ডিদা চোখ বেঁকিয়ে দেখে। উদাস চোখে দূরের দিকে চেয়ে খানিক বসে থাকে। তারপর উঠে চলে যায়। তখন অবশ্য ঠিক ভালো লাগে না আমাদের। তবু ভাবি, মজুত হোক আর একটু। এর পর পিন্‌ডিদার মাঠে আসায় কামাই হতে লাগল একদিন দু দিন করে। দু দিন আসে তো একদিন আসে না। হাবুলের ফোটোগ্রাফের দোকানের কাজের চাপ বেড়েছে। তার আসতে বিকেল গড়ায়। আড্ডা নীরস হয়ে উঠতে একদিন সে বলল, পকেটে একটা টাকা আছে পিন্‌ডিদা, কী খাবে বলো?

রাগ করে আমাদের জব্দ করার জন্য সে পিন্‌ডিদাকে একলাই খাইয়ে আমাদের আক্কেল দিতে চায়।

পিন্‌ডিদা যেন কত দূরে কোথায় চলে গেছল। জিজ্ঞাসা করল, কী বললি?

হাবুল জবাব দিল, পকেটে একটা মাত্র টাকা আছে, সকলের কুলোবে না, তোমার জন্য কী আনব?

পিন্‌ডিদা আবারও তেমনি বিমনার মতো চেয়ে থেকে হঠাৎ সাগ্রহে বলল, একটু গঙ্গা জল এনে দিতে পারিস?

আমরা হাঁ সকলে।

কী ভাবতে ভাবতে পিন্‌ডিদা উঠে চলে গেল। আমরা যে যার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। হাবুল রাগের চোটে আমাদের মুখগুলো ঝলসে দিয়ে উঠে চলে গেল। হাবুল টাকা বার করল, খাওয়াতে চাইল—আর তা কানে না শুনে পিন্‌ডিদা উঠে চলে গেল—এ চোখে দেখেও বিশ্বাস করি কী করে?

দু' দিন এর পর পিন্‌ডিদা আর এলোই না। আমরা মুষড়ে পড়তে লাগলাম। হাবুলও এসেই তাকে না দেখে রাগ করে চলে গেল। তৃতীয় দিন পিন্‌ডিদা আসতে এবারে রাগ ভুলে আমিই পকেট থেকে তিনটে টাকা বার করে হাবুলের দিকে বাড়িয়ে দিলাম। অনেক কচলানো হয়েছে, আর না। হাবুলকে বললাম, বিনোদের দোকান থেকে তিন টাকার মাংসের ঘুগনি নিয়ে আয়।

পিন্‌ডিদা উদাস মুখ করে উঠে দাঁড়াল। –তোরা খা, আমি একটু কাজ সারি গে।

এবার একসঙ্গে আমরা হাঁ হাঁ করে উঠলাম। –সে কি পিন্‌ডিদা, মাংসের ঘুগনিটা খেয়ে যাও!

জবাবে পিন্‌ডিদা হাসল আমাদের দিকে চেয়ে। এমন স্নেহমাখা হাসি পিন্‌ডিদার মুখ সত্যিই আর দেখিনি। বললে, তোরা খেলেই আমার খাওয়া হবে রে।

সত্যি চলে গেল। আমাদের মুখ আর রা নেই কারো। টাকা তিনটে ছুড়ে ফেলে দিয়ে হাবুলও চলে গেল।

তারপর একদিন দু' দিন করে সাত দিন যায় পিন্‌ডিদার আর দেখা নেই। কী যে কাণ্ড হয়ে গেল মাঝখান থেকে কিছুই বুঝছি না। অথচ পিন্‌ডিদা যে রাগ করে এ-রকম তা তো মোটেই নয়! তার তো দরদ-ভরা মুখ উলটে! এ কী পরিবর্তন রে বাবা!

ঘাবড়ে গেছে হাবুলও। সেদিন সে এসে বলল, পিন্‌ডিদার বাড়ি গেছলাম, নিজের তিন তলায় চিলে-কোঠায় বসে সে দিন-রাত চণ্ডীপাঠ করছে।

আমরা আঁতকে উঠলাম, চণ্ডীপাঠ! চণ্ডীপাঠ কি রে!

–হ্যাঁ, চণ্ডীপাঠ। আমাকে দেখে খুব খুশি হয়ে তোদের সক্কলের খবর নিল। বিশেষ করে সোনা তোর। বলল, তোরা জানিস না–ওটা সোনার ছেলে।

আমার পিঠে যেন চাবুক পড়ল একটা। জিজ্ঞাসা করলাম, মাঠে আসবে না আর?

হাবুল জবাব দিল, কিছু বুঝছি না, বললে শুধু হাসে। বলে, সময় বড় তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাচ্ছে রে, কিছু ভালো লাগে না।

আরও সাতদিন কেটে যেতে আমরা হেরেই গেলাম একেবারে। চটপটি ওরা স্বার্থপরের মতো আমার দোষ দিতে লাগল। পারলে হাতে পায়ে ধরেও তাকে আবার ফেরানো যায় কি না ভাবছি। শেষে সকলে মিলে এক বিকেলে তার বাড়ির তিনতলা চিলে-কোঠায় গিয়ে হাজির হলাম আমরা। দোতলায় উঠতে পিন্‌ডিদার মামী বলল, ওটার কী হয়েছে হঠাৎ বলো তো, দিনরাত তিন তলার ওই ঘরে চণ্ডী নিয়ে পড়ে আছে!

শুনে বুকের তলায় মোচড় পড়তে লাগল আমাদের।

পিন্‌ডিদা কিন্তু আমাদের দেখে মহা খুশি। রুক্ষ মেজাজের সেই পিন্‌ডিদাই নয় যেন আর। হাতের চণ্ডী কোলের ওপর রেখে সানন্দে বলল, এসেছিস তোরা–আয় আয়–সব ছাড়লুম কিন্তু তোদের আর ছাড়তে পারছি না।

আমি কাঁদো কাঁদো সুরে বললাম, আমাদের ছাড়বে কেন পিন্‌ডিদা?

–সব মায়া রে, সব মায়া। যাক তোরা আসবি আমি জানতাম। এই দেখ, তোর জন্যে খামে করে কিছু কথা লিখে রেখেছি, সামনের শুক্লপক্ষের প্রথম রবিবারের সন্ধ্যায় এটা খুলে মন দিয়ে পড়িস। তোর ভালো হবে–এদেরও ভালো হবে।

খামটা হাতে নিয়ে আমি অবাক। মুখবন্ধ খাম। ওপরে আমারই নাম লেখা। বললাম, এখনই পড়ে ফেলি না?

–না না না! কী পাগল ছেলেরে তুই–যা লিখেছি আমার গুরুর আদেশে লিখেছি–আমার গুরু হল গিয়ে আমার আত্মা–নির্দেশ অমান্য করলে ক্ষতি হবে, সামনের শুক্লপক্ষের রোববারে হল গিয়ে আমার নিয়মভঙ্গের দিন–সেই দিন খুলে পড়বি, এদেরও পড়াবি।

খাম পকেটে রেখে অভিমানের সুরে বললাম, তুমি আর তাহলে মাঠে আসবে না?

চুপচাপ খানিক মুখের দিকে চেয়ে থেকে পিন্‌ডিদা জিজ্ঞাসা করল, আমাকে খুব চাস তোরা?

আমরা এক বাক্যে বললাম, খুব চাই, তোমাকে ছেড়ে আমরা থাকতে পারছি না।

—ঠিক আছে, রোববারের ওই নিয়মভঙ্গের দিনই যাব—সেদিন তো আর কিছু বাদ-বিচার নেই।

আমরা তাইতেই খুশি আপাতত। কেবলু জিজ্ঞাসা করল, নিয়মভঙ্গ কী পিন্‌ডিদা?

—নিয়মভঙ্গ মানে আগের জীবনে ফিরে আসা। সেখানে গিয়েও আবার মা চণ্ডীর আশ্রয়ে ফিরে আসা চাই। ওই রকম করে বাসনার শেষ করতে হয়।

কার্তিক জিজ্ঞাসা করল, মাত্র একদিনের জন্য নিয়মভঙ্গ?

হেসে পিন্‌ডিদা বলল, নিয়ম তো একদিনেই ভঙ্গ হয় রে। তারপর কবে আবার এই জীবনে ফিরে আসব সেটা আমার বিবেচনা আর সাধনার ব্যাপার।

আমি বললাম, নিয়মভঙ্গের দিন তাহলে আমাদের সঙ্গে বসে খেতেও হবে তোমাকে—তাতে তো আর বাধা নেই?

—না, নিয়মভঙ্গ যখন তাতে আর বাধা কী।

চটপটি বলল, তাহলে সেদিন তো আমিষ মানে মাংসটাংসও চলতে পারে তোমার?

পিন্‌ডিদা বলল, তোদের যা খুশি করগে বাপু, আমার কাছে আমিষ নিরামিষ সব এক—মুরগি পাঁঠা বাঘ ভালুক সব সমান।

এক ধরনের উত্তেজনা নিয়েই উঠে এলাম আমরা। তারপর ঠিক করলাম, পিন্‌ডিদা নিয়মভঙ্গের দিন দস্তুরমতো ঘটাই করব আমরা। যদি এর ফলে পিন্‌ডিদা তার সাধক জীবনে ফিরে যেতে কিছুদিন দেরি করে। এবারে সকলেই, এমনকী হাবুলও ভালো চাঁদা দিতে রাজি হয়ে গেল। অবশ্য মোট খরচ যা হবে তার অর্ধেকই আমি দেব বলে কবল করলাম।

সামনের শুক্লপক্ষের রোববারে তিনদিন আগেই বিনোদের দোকানে অর্ডার চলে গেল। পোলাও, মাংসের চপ, মাছের ফ্রাই আর মুরগির কালিয়া। শেষে আইসক্রিম। পিন্‌ডিদাকে আমাদের দিকে ফেরানোর চেষ্টা তো করতে হবে।

সেই দিন এলো।

বিনোদ তার রেস্তোরাঁর একটা দিকই খালি করে দিয়েছে আমাদের ছজনের জন্যে। রাত সাড়ে আটটায় পিন্‌ডিদাকে নিয়ে আমরা এসে জড়ো হয়েছি। বিনোদের দোকান ফাঁকা তখন, খদ্দের নেই।

পিন্‌ডিদাকে অবাক করে দেবার মতোই ব্যবস্থা। খাবার আসতে লাগল। পিন্‌ডিদা দেখছে আর অল্প অল্প হাসছে, কিন্তু অবাক আদৌ হচ্ছে না। প্রথম কোর্স অর্থাৎ পোলাওয়ের সঙ্গে ফ্রাই এবং মাংসের চপ আসতে হাবুল বলে উঠল, হাত লাগাও পিন্‌ডিদা!

টেনে টেনে পিন্‌ডিদা বলল, যা দেবী সর্বভূতেষু ক্ষুধা রূপেন সংস্থিতা, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ। বুঝলি কিছু? যে দেবী সকলের মধ্যে ক্ষুধারূপে বসে আছেন, তাঁকে প্রণাম। যাক, এবার নিয়মভঙ্গ শুরু হোক।

খাওয়া শুরু হল। আমরা দেখলাম পিন্‌ডিদা দেখতে দেখতে আগের মতো হয়ে যাচ্ছে। মুখের হাসি কমছে, তেরছা চাউনি ফিরে আসছে। সেই সঙ্গে একাগ্র মনেই খাচ্ছে। আমাদের আনন্দ বাড়ছে—নিয়মভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে পিন্‌ডিদা যেন আগের মানুষ। খুশি হয়ে আমরা পিন্‌ডিদার ডিশে এটা-সেটা চালান দিচ্ছি। পিন্‌ডিদা নির্লিপ্ত মুখে খেয়ে চলেছে।

প্রায় ঘণ্টা দুই ধরে চলল এই খাওয়ার পর্ব। পিন্‌ডিদাকে খাইয়ে অত আনন্দ আর বোধহয় কখন পাইনি আমরা।

খাওয়া শেষ হতে পিন্‌ডিদা সেই আগের মতোই বাঁকা চোখে তাকাল আমার দিকে। মোলায়েম স্বরে জিজ্ঞাসা করল, তোর নামের সেই খামটা এনেছিস? আজই তো পড়ার কথা ছিল—

খাম আমার পকেটে, খাওয়ার আনন্দে এতক্ষণ ভুলেই গেছলাম। আমার নাম লেখা খামে পিন্‌ডিদা কী লিখেছে জানার জন্য আমাদের কৌতূহলের অন্ত ছিল না।

তাড়াতাড়ি খামটা ছিঁড়ে ভিতর থেকে একটা কাগজ বার করলাম। আমার এ-পাশে ও-পাশে পিছনে চটপটি, হাবুল, কার্তিক, কেবলুও ঝুঁকে পড়ল। আমার নাম লেখা চিঠি একখানা। সকলে একসঙ্গে রুদ্ধশ্বাসে পড়তে লাগলাম। কিন্তু পড়তে পড়তে আমার চোখ-মুখ অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে টের পাচ্ছি। চিঠিতে বড় হরফে লেখা :

—বৎস সোনা, তুমি সত্যিকারের সোনার ছেলে একটা! খাঁটি শিষ্য তার গুরুকে ভালো করে যাচাই করে নিয়ে তবে ক্ষান্ত হয়। তুইও তাই করেছিস। সেজন্য আমি পরম তুষ্ট তোর ওপর। শিষ্যরাই চিরকাল তাদের গুরু সেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে থাকে, চর্ব্যচোষ্য ভোজন করিয়ে নিজেরা সার্থক হয়। গুরু সে-সব খেলেও উদাসীনই থাকে। কিন্তু তুই খাঁটি শিষ্য বলেই আমাকে উলটো পরীক্ষার মধ্যে ফেলতে চেয়েছিলি। আমার কাঁধে খেতে চেয়ে দেখতে চেয়েছিলি আমিও তোদের মতো সাধারণ একজন কি না।

কিন্তু এবারে বোধহয় চোখ খুলেছে তোর। তাই খুশি হয়ে আমি তোকে একটু বেশি গুরুসেবার সুযোগ দিচ্ছি। নিয়মভঙ্গের দিনে যা খরচ হবে (আমার ধারণা বিনোদের দোকানেই হবে) তার সব টাকা তুইই দিয়ে দিবি। চটপটি হাবুল কার্তিক আর কেবলুর কাছে কিছু-কিছু যা আছে, সেই টাকা এখনকার মতো মাঠের খরচের জন্য ওদের পকেটেই জমা থাক্। —তোদের পিন্‌ডিদা।

এক হাবুল ছাড়া আমাদের বাকি সকলের মুখে যেন কালি লেপে দেওয়া হল এবং এক প্রস্থ। সব থেকে বেশি বোধহয় আমার মুখে।

বড় ঢেঁকুর তোলার সঙ্গে আমার দিকে কঠিন একটা তির্যক দৃষ্টি হেনে পিন্‌ডিদা তার চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল। তারপর বিনোদের দেওয়া এক মুঠ মৌরিভাজা মুখে ফেলে দোকান থেকে নেমে চলে গেল।

## পিন্‌ডিদার তেলতত্ত্ব

আমার বাবা-মা দু'তিন দিনের জন্য কোথাও গেলে আমি একেবারে খুশি যে হই না এমন নয়। আমার জন্য মায়ের উতলা ভাবটুকু দেখে খুশি হই। বাবার গুরুগম্ভীর উপদেশের পিছনে আমার জন্য একটু চাপা দুশ্চিন্তা আছে জেনেও খুশি হই। এটুকু বুঝতে পারি একমাত্র ছেলেকে রেখে বাবা-মায়ের কোথাও যেতে মন সরে না। কিন্তু সামাজিকতার দায়ে মাঝে-সাজে তাদের যেতেই হয়। আর বলতে লজ্জা করে, কোথাও যাবার আগে মা আমাকে বেশ কয়েকটা টাকা বাড়তি দিয়ে আমার মন ভালো করে দিয়ে যায়। সে-টাকা বাবার খরচের টাকা দিয়ে যাওয়ার হিসেবের মধ্যে পড়ে না। আর বাবাও খরচের টাকা দরাজ হাতে দিয়ে যায়।

আমাকে তো গুরুদায়িত্ব নিয়ে বাড়িতে থাকতেই হয়। আমি সুদ্ধ চলে গেলে বুড়ি ঠাকুমাকে দেখে কে? তার তো আর হুট-হাট কোথাও যাবার উপায় নেই। আমিও ভাব দেখাই যেন কর্তব্যের দায়ে থেকে যেতে হচ্ছে। একদিকে যেমন খুশি হই, অন্যদিকে একটু মন খারাপও কি হয় না? তখনই তো বুঝতে পারি, উঠতে-বসতে আমার যত খুঁতই ধরা হোক, তলায় তলায় আমাকে তারা ভালই বাসে।

কিন্তু আমার মনের ভাবই যাই-ই হোক, বাবা-মা, দু'পাঁচ দিনের জন্যে কোথাও যাচ্ছে শুনলে কেবলু কার্তিক হাবুল এমন কি চটপটিও অমন নেচে ওঠে কেন? যেন ওদেরই কোনো দুর্গ্রহ সরে যাচ্ছে। আর পিন্‌ডিদা? তার মুখ দেখে কি মন বোঝার উপায় আছে? তবু খুব বুঝতে পারি, ভিতরে ভিতরে সে-ই সব থেকে খুশি হয়। আর কাউকে বুঝতে না দিয়ে কল-কাঠি সেই নাড়ে।

এবারে বাবা-মাকে দু'দিনের জন্য কলকাতা চলে যেতে হচ্ছে বাবার এক খুড়তুতো ভাইয়ের মেয়ের বিয়েতে। না গিয়ে উপায় নেই। একে আমরা বর্ধমানে থাকি, খুব একটা যোগাযোগ নেই। এর ওপর না গেলে একটাই কথা সকলে বলবে, মস্ত বড় লোক এখন, আসবে কেন!

মা আর বাবার এই গোছের আলোচনা তাদের অলক্ষ্যে আমি নিজেই শুনেছি।

তারা দু'দিনের জন্য কলকাতায় যাচ্ছে, বোকার মতো এ-খবরটা মাঠে বসে আমি নিজেই দিয়েছিলাম। আমারও যদি পেটে কোনো কথা থাকত। শুনেই চটপটি তিড়িং করে নেচে উঠল, বলল, তাহলে আদায়-টাদায় যা করার ঠিকমতো করে রাখিস।

কেবলু সংস্কৃত ঝাড়ল, একঘেয়ে মরুভূমিতে ওয়েসিস্ দর্শনম্! একটা স্পেশাল প্রোগ্রাম অবশ্য করণীয়ম্!

আমার রাগ হয়ে যাচ্ছিল। মনের দিক থেকে চটপটি কেবলু আর কার্তিক অনেকটা আমার দিকে। পিন্‌ডিদার নাগাল পাবার আগে আমিই তো দলের লিডার ছিলাম। কার্তিক অবশ্য চুপচাপ, তবু আমার মনে হল ওর মুখেও খুশির জেল্লা দেখছি! আমার রাগ হবে না তো কী? কিছু বাড়তি লাভ হয় বলে কি বাবা-মাকে আমি ভালোবাসি না?

কিন্তু গা জ্বলে গেল হাবুলের কথা শুনে। ও কেবলুকে সাপোর্ট করে বলল, স্পেশাল প্রোগ্রাম তো একটা করাই উচিত—কিন্তু সোনার তো আবার সর্ব ব্যাপারে মুখ শুকানোর স্বভাব—হয়তো বলবে বাবা-মা বাড়তি তেমন কিছুই দিয়ে যায়নি।

আমরা আর সহ্য হল না। বলে উঠলাম, তোর বপুখানা যেমন হাতির মতো, বুদ্ধিও তেমনি.....

শুনেই হেবো হোঁতকা খাপ্পা হয়ে উঠল। চোখ পাকিয়ে দু-ই হাঁটুর ওপর উঠে বসল।—পিন্‌ডিদা, ওকে তুমি সাবধান করো, আমি কিন্তু ওর মাথাটা ছাতু করে দিয়ে জেলে যাব!

চটপটি মন্তব্য করল, ফাঁসি যাবি।

পিন্‌ডিদা অলস চোখে হেবোর দিকে তাকালো। বলল, সোনা ঠিকই বলেছে, বাবা-মা যাচ্ছে ওর দুঃখু হচ্ছে কি না খোঁজ নিয়েছিস? বাবা-মা কি কম জিনিস?

হাবুল চুপসে গেল।

কেবলু উপযুক্ত শ্লোক আওড়াতে গিয়ে খিচুড়ি পাকিয়ে ফেলল, পিতা-মাতাহি ধর্মঃ, পিতা-মাতাহি কর্মঃ, স্বর্গাদপি গরীয়সী।

বিরক্তিতে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, তোর গালে এক চড় কশায়সি—মা সঙ্গে আছে বলে বাবাসুদ্ধ স্ত্রীবাচক গরীয়সী হয়ে গেল!

কেবলু সংশোধন করল, গরীয়ান্ হবে।

—মাতা গরীয়ান্ হবে কী করে?

—তাহলে পিতা-মাতাহি গরীয়ান-গরীয়সী হবে।

পিন্‌ডিদা বলল, তুই মুখ সেলাই করে বসে থাকলে তোর পক্ষে সব থেকে নিরাপদ হবে।

পিন্‌ডিদা আজ খুব মুডে নেই। তাকে মুডে আনার মতো আমি কোনো ব্যবস্থাও করিনি। খানিক মুখ গোঁজ করে থেকে পিন্‌ডিদা মুখ তুলল। —ভালো লাগছে না, আমাকে খানিকটা এগিয়ে দিবি চল্‌তো হেবো—

ঢিবির আসন ছেড়ে উঠে পড়ল। ঢোসকা হাবুলও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো। পিন্‌ডিদার কাছ থেকে যেন একটু বাড়তি কদর লাভ হল তার। আমার দিকে একবার চোখের ঝাপটা মেরে বলল, এমন শুকনো মুখে আর কাঁহাতক ভালো লাগে—চলো পিন্‌ডিদা।

তারা খানিক এগোতে চটপটি আর কার্তিকের ওপর ঝাঁঝিয়ে উঠলাম।— আমার বাবা-মা থাকবে না এটা তোদের কাছে খুব একটা উৎসব—কেমন?

গলা শুকিয়ে চটপটি বলল, তা কেন, ওঁরা না থাকলে একটু বাড়তি আনন্দের ব্যবস্থা হয় তো, তাই মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে।

—আমার মন খারাপ থাকে বলে বাড়তি আনন্দের ব্যবস্থা করি—তা বলে তোরা এত হ্যাংলার মতো করিস কেন?

বেজায় চটেছি এটা কেবলুও বুঝতে পারছে। তা না হলে পিন্‌ডিদাকে ফেরাতাম, একটু আনন্দ দেবার ব্যবস্থাও করতাম। ও হাত জোড় করে বলল, সত্যি অন্যায় হয়েছে, তুই আমাদের ক্ষমা করে দে সোনা—ক্ষমাহি পরমং তপঃ।

পিন্‌ডিদা কেন এগিয়ে দেবার জন্য হাবুলকে ডেকে নিয়ে গেল এটা পরদিন বিকেলে বোঝা গেল! দারুণ কিছু কাজের ভার পেলে যেমন খুশি উপচে ওঠে তেমনি থলথলে মুখ ওর। উঁচু ঢিপির আসনে বসে পিন্‌ডিদা নির্লিপ্ত মুখে এ-দিক ও-দিক তাকাচ্ছে। হাবুলের যেন হঠাৎই কিছু মনে পড়ল।—হ্যাঁরে চটপটি, সোনার বাবা-মা মানে আমাদের মাননীয় মেসোমশাই মাসিমা দু'দিনের জন্য কলকাতা যাচ্ছেন.....তুই কী যেন স্পেশাল প্রোগ্রাম করার কথা বলছিলি?

চটপটি গতকালের দাবড়ানি ভোলেনি। দায়টা কেবলুর ঘাড়ে চাপালো।—আমি টাকা-কড়ি আদায় করে রাখার কথা বলেছিলাম.....বাবা-মা দু'দিন থাকবে না, সোনার তো একটু মন খারাপ হবেই—তাই একটু ফুর্তি-টুর্তির মধ্যে থাকার জন্যে—স্পেশাল প্রোগ্রামের কথা কেবলু বলেছিল—ওর যদি কোনো কাণ্ডজ্ঞান থাকত।

বেগতিক দেখে কেবলু কবুল করল, আমি তো মূর্খ, নইলে বার বার ফেল করি—মূর্খস্য বনচম্ বালভাষিতং—সোনা কালই আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছে।

শেখানো-পড়ানো হোঁতকা হাবুল কথার মাঝে এ-রকম বিঘ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না, খেই হারিয়ে অসহায় চোখে পিন্‌ডিদার দিকে তাকালো। পিন্‌ডিদা ধমকে উঠল, কী বলতে যাচ্ছিলি—তোর মাথায় কী আছে যে আমি বলব? ইডিয়েট কোথাকারের—

হাবুল হাঁসফাঁস করে উঠল, হ্যাঁ-হ্যাঁ মনে পড়েছে—

ও পিন্‌ডিদার শেখানো বুলি কিছু আওড়াবে ধরতে পেরে আমি ওর টুঁটি টিপে ধরার মতো করে বলে উঠলাম, মনে পড়েছে মানে কি, তুই তোর নিজের কথা বলছিস না?

—চটপটি আর কেবলুটার জন্য নিজের কথাই তো তালগোল পাকিয়ে গেছল—খাঁটি নিজের কথা বলতে যাচ্ছিলাম, যাকে বলে ওরিজিন্যাল—

—আচ্ছা বল।

—শোন্ সোনা, তুই তো খাঁটি সোনাই বটে একখানা, বাবা-মায়ের একমাত্র ছেলে—তাঁরা দু'দিন থাকছেন না শুনে আমাদেরই কেমন লাগছে—তোর তো ভিতরটা একেবারে খাঁ-খাঁ করছে—করছে কিনা বল্—

শুরুতেই বুঝতে পারছি শেখানো বুলি। এ-রকম বেঁধে কথা বলার সাধ্যি হেবো হোঁতকার নেই। আমি গম্ভীর। —বলে যা।

—তাই বলছিলাম তোর মন খারাপ হতে বাধ্য।.....তা তোর প্রতি তো আমাদের একটা কর্তব্য আছে, তাই বলছিলাম, মাসিমা মেসোমশাই চলে গেলে আমরা যদি একটা রাত সকলে মিলে তোদের ওখানে কাটিয়ে দিই—তাহলে দারুণ হয় না? তোর আর অত খারাপ লাগবে না—আমরাও একটা রাত নতুনভাবে কাটিয়ে দেব।

প্রস্তাব লোভনীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু এ-প্রস্তাব হেবো হোঁতকার মগজের নয়। হতেই পারে না। একটা রাত সকলে মিলে আমাদের বাড়িতে কাটানো মানে খরচের ব্যাপার। হাবুলের প্রস্তাব শুনে সকলেই রোমান্টিক হয়ে উঠেছে। মুহূর্তের মধ্যে প্ল্যান ঠিক করে নিলাম। বললাম, দারুণ বলেছিস রে হেবো—তোর সম্পর্কে আমার ধারণাই বদলে গেল—কিরে এ-ভাবে একটা রাত কাটাতে তোদের কী রকম লাগবে?

প্রশ্নটা চটপটি কেবলু কার্তিকের দিকে। ওরা একসঙ্গে বলে উঠল, ওয়ানডারফুল, সুপার ফাইন, হাবুলের সত্যিই মগজের ধার বাড়ছে।

আমি বললাম, কিন্তু সব নির্ভর করছে পিন্‌ডিদার ওপর—পিন্‌ডিদা তো কিছুই বলছে না।

গম্ভীর মুখে পিন্‌ডিদা রায় দিল, আমার আবার জায়গা বদলালে রাতে ভালো ঘুম হয় না—তবু সকলের আনন্দের জন্য একটা রাতের ঘুম জলাঞ্জলি দিতে এমন আর কি অসুবিধে।

আমি উৎসাহিত হয়ে বললাম, জানি আমাদের তুমি কত ভালোবাসো—তাহলে কাল সকালেই তোমার ওখানে এসে দু'জনে চেক সই করে ফেলি—একশ-সোয়াশো টাকা তুললেই নিশ্চয় হয়ে যাবে—তারপর বিনোদের ওখানে একেবারে অর্ডার প্লেস করে ফেরা যাবে।

এবারে পিন্‌ডিদা সচকিত, চেক সই মানে—কিসের চেক সই?

অন্য সবাইও একটু থতমত খেয়ে গেছে।

আমি বললাম, বা রে একটা ফিস্টের ব্যবস্থা করতে হবে না! আমাদের ফান্ডের টাকা খরচ করার মতো এমন মওকা আর কবে পাব। আমাদের ফান্ডে তো প্রায় সুদে-আসলে চার হাজার টাকা হয়ে গেছে (পিন্‌ডিদার সব গল্প পড়লে তোমরা ফান্ডের হদিস পাবে), তার থেকে এ ক'টি টাকা খরচ করতে তুমি আপত্তি কোরো না পিন্‌ডিদা।—প্লীজ! কি বলিস রে তোরা?

ক্লাবের ফান্ড ব্যাঙ্কে জমা আছে। এ-পর্যন্ত সুদে-আসলে বাড়ছেই। এক পয়সাও খরচ হয়নি অর্থাৎ তোলা হয়নি। সকলের স্ফূর্তি করার জন্য টাকা তোলার প্রস্তাব অনেক বার করা হয়েছে। কিন্তু কোনো না কোনো উপায়ে পিন্‌ডিদা পাশ কাটিয়ে গেছে। ক্লাব ফান্ড থেকে টাকা তোলা যাবে পিন্‌ডিদা আর আমার জোড়া সইয়ে। তাই আমার এ-প্রস্তাব।

আমার প্রশ্নের জবাবে কেউ আর কিছু মন্তব্য করতে সাহস করল না। ওরা পিন্‌ডিদার মুখখানাই দেখছে, আর প্রতি মুহূর্তে ওদের বুকে হাতুড়ির ঘা পড়ছে। কারণ পিন্‌ডিদার মুখ দেখে মন বোঝা ভার।

মাথা নিচু করে পিন্‌ডিদা একটু চিন্তা করল। তারপর বলল, ও টাকাটা তো আমার নয় সকলের। সকলেই যদি তাই চাস আমি আপত্তি করব কেন.....তবে আমার ইচ্ছে ছিল, টাকা আরো বাড়ুক.....ওই টাকা নিয়ে খুব বড় স্টাইলে আমরা একবার আউটিং-এ বেরুবো। ঠিক আছে, কাল সকাল আটটা নাগাদ আমার বাড়ি এসে চেক সই করে নিয়ে যাস। আচ্ছা, তোরা গল্প কর, আমার মাথাটা কেমন ভার ভার লাগছে—উঠি।

মোসায়েব হেবো হোঁতকা ড্যাবডেবে চোখ দিয়ে আমাকে গিলল কয়েক পলক। তারপর গলা দিয়ে 'হুঁ' করে একটা ঘেন্নার শব্দ বার করে তাড়াতাড়ি উঠে পিন্‌ডিদার সঙ্গ নিতে চলল।

অন্য সকলেরও মুখ একটু ভার ভার। দু'দিন ধরে আসর জমছে না, আজও পিন্‌ডিদা এ-ভাবে চলে গেল এ জন্য যেন আমিই দায়ী।

বড় নিঃশ্বাস ফেলে কেবলু বলেই উঠল, মা কুরু ধনজন যৌবন গর্বং—

আমি খেঁকিয়ে উঠলাম, কী বললি? অজ্‌ মুখ্‌খু কোথাকারের, যখন তখন গাধার মতো সংস্কৃত ঝাড়িস, কিছু বলি না বলে—কেমন? তোরাও আমার টাকার গাছ দেখেছিস—তাই না? অথচ অত টাকা ব্যাঙ্কে পচছে—তার মধ্যে প্রায় অর্ধেক আমার বাবার দেওয়া টাকা—তাছাড়া আমাকেই টোপের মতো ব্যবহার করে পিন্‌ডিদা রাম বাদশাকে ধরে দু'হাজার টাকার সরকারি পুরস্কার ক্লাব-ফান্ডে জমা করল—আয়ুর জোর না থাকলে আমি যে রাম বাদশার হাতে ('লিডার বটে পিন্‌ডিদা' পড়ো) খুনও হয়ে যেতে পারতাম—আর এত কষ্টের সেই টাকা ব্যাঙ্কে পচে মরছে, একটা পয়সা খরচ করার নাম নেই—আর তোরা কেবল আমার দোষ দেখছিস—কেন আমি হেঁ-হেঁ করে গাঁটের টাকা খসাচ্ছি না বলে?

আমার মেজাজ দেখে সকলেই বোবা মেরে গেল। খানিক বাদে কার্তিক মুখ খুলল। দলের মধ্যে সে-ই একটু ধীর স্থির ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। খুব মোলায়েম করে বলল, দ্যাখ্‌ সোনা, তোর রাগ হকের রাগ—এ হতেই পারে। পিন্‌ডিদা যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তোর ওপরেই সব থেকে জুলুম করে, এ কি আমরা কেউ বুঝি না বলতে চাস? কিন্তু আমাদের সকলকে ছেড়ে কেন কেবল তোর ঘাড়েই পিন্‌ডিদা চেপে বসে এ কি তুই বুঝিস না? কারণ পিন্‌ডিদা খুব ভালো করে জানে, চেপে বসা দূরে থাক, আমাদের ঘাড় মটকালেও তুই যা করতে পারিস আমরা তা পারি না। ভগবান আমাদের কারোই সে অবস্থা দেননি।....এখন পিন্‌ডিদা আর আমাদের সব দোষ স্বীকার করেও বলছি, পিন্‌ডিদা যদি কোনো কারণে আমাদের ত্যাগ করে—সে অবস্থাটা কি তুইও কল্পনা করতে পারিস? পিন্‌ডিদা যখন ছিল না—ছিল না, কিন্তু যে-কোনো কারণে পিন্‌ডিদা যখন আমাদের মধ্যে নেই, তোর ভাবতে কেমন লাগে?

কার্তিকের কথাগুলো সত্যিই আমার মনে দাগ কেটে বসল। না, বসন্তের কোকিল ডাকে না, আর পিন্‌ডিদা আমাদের মধ্যে নেই—এ যেন একই ব্যাপার।

কার্তিকের কথা শুনে একেবারে হামলে পড়লাম না বটে। মনে মনে ঠিক করলাম, আগামীকাল ক্লাব ফান্ড থেকে টাকা তোলা হোক—বাবা-মা দু'দিন দু'রাত থাকবে না, দ্বিতীয় দিন না হয় আমিই খরচা-পাতি করে বাড়িতে আসর জমাব। একদিন অন্তত ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে বোঝা যাক, সেখানকার গচ্ছিত টাকা আমাদেরই টাকা।

পরদিন সকাল সাতটার গাড়িতে বাবা-মা কলকাতা চলে গেল। আমার মেজাজ-পত্র ভালো। বাড়তি যা হাতে পাব ভেবেছিলাম তার থেকে বেশিই পেয়েছি। মা অবশ্য সর্বদাই বলে, হিসেব করে খরচ করবি, আর যা বাঁচবে সেটা আমরা এলে ফেরত দিবি। কিন্তু এটা যে কথার কথা তা আমি যেমন জানি মা-ও তেমনই জানে। এ-ও খুব ভালো করেই জানে, রেজাল্ট বেরুলে, ছেলে কলেজে পড়বে—তার খরচের হাত একটু বাড়াই স্বাভাবিক। তাছাড়া দিনে দিনে সব কিছুর বাজারও চড়ছে। ফলে আগে খরচের বাবদ যেখানে দু'দিনের জন্য সত্তর আশি টাকা রেখে গেলে চলত, এখন সেখানে কম করে দু'শ টাকা রেখে যাওয়াই উচিত। এর ওপর একজনের বুড়ি মা আর একজনের বুড়ি শাশুড়ী থাকল, তার জন্য হঠাৎ কখন কী দরকার হয় ঠিক আছে? এ-জন্যেও না একশ দেড়শ টাকা বাড়তি রেখে যাওয়া দরকার। বাবা প্রত্যেকবারেই বলে যায়, এ-টাকা খরচ করার দরকার হবে না—ফিরে এলে তোর মা-কে দিয়ে দিবি। কিন্তু আমি জানি, বাবা সে-টাকার কথা মাকে বলেই না, আর বললেও মা আমার কাছে টাকা ফেরত নেবার জন্য হাত পাতে না। এ-ছাড়া বাবা-মা এ-ভাবে চলে গেলে বরাবরই মায়ের কাছ থেকে আমার কিছু ঘুষ বরাদ্দ। আমাকে

চাইতে হয় না। যাবার আগে চুপচাপ মা নিজেই দিয়ে যায়। মোট কথা আমার বাণিজ্যটুকু ভালোই হল এটা স্বীকার করতেই হবে।

চেক সই করার জন্য পিন্‌ডিদা সকাল আটটায় আসতে বলেছিল। আমি মিনিট কতক আগেই এলাম। পিন্‌ডিদা চেকবই বার করবে কি করবে না সেই সন্দেহ আমার এখনো আছে। আর একবার চেক সই করতে এসে দেখি সে নেই—আমাকে বলে সেই ফাঁকে ঠাকুমার কাছে গিয়ে সেবারের খাওয়ার খরচ তার ওপর দিয়ে চালিয়ে দিয়েছিল। ঠাকুমা বুড়ির গোপাল বলতে তো ওই পিন্‌ডিদা।

কিন্তু না। পিন্‌ডিদা বাড়িতেই আছে। আমার ডাক শুনে চেক-বই হাতে করেই নেমে এলো। ফলে আমার একটু তোয়াজের মুখ। বললাম, একেবারে রেডিই ছিলে দেখছি।

—না থেকে আর উপায় কি—পিন্‌ডিদা গম্ভীর, সকলের ভাগের টাকা খরচ করা হবে বলে যখন ঠিক করেছিস, তখন আমার আর বলার কী আছে—নে কত টাকা তুলবি লিখে সই কর। চেকবই এগিয়ে দিল।

কথাটা খট্ করে কেমন কানে লাগল। পরে ভাবলাম, এই টাকার ওপর সকলের সমান অধিকার আছে বলেই আমাকে একটু ঠেস দিয়ে সকলের ভাগের টাকা কথাটা শোনালো। আমার মনে হল, চেক সই-টই করা হলেই বলবে, বিনোদের দোকান থেকে খাবার-দাবার আর তোর বাড়িতে টেনে নিয়ে গিয়ে ফিস্টি করে লাভ কি, ভাগের টাকায় খাওয়া হচ্ছে যখন, বিনোদের দোকানে বসেই হোক। অর্থাৎ টাকা তোলার রাগে সকলে মিলে আমার বাড়িতে রাত কাটানোর ফুর্তিটাই পিন্‌ডিদা বরবাদ করে দিতে চায়।

আমিও এক-রোখা কম নই। আমার মনে যা আছে, অর্থাৎ আমার নিজস্ব খরচে পরদিনের প্রোগ্রামে ওটাই শর্ত থাকবে, সকলকে আমার বাড়িতে রাতে থাকতে হবে। একবার তবু ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলা হোক। তাছাড়া পিন্‌ডিদা যদি ওই কথা বলে তখন আমিও শোনাবো, বাবা-মা থাকবে না, তাই আমার মন ভালো করার জন্যই সকলে মিলে একসঙ্গে বাড়িতে রাত কাটানোর প্রস্তাবটা হয়েছিল। হাবুলের কথায় আমি অন্তত তাই ভেবেছিলাম।

চেক-বইটা টেনে নিয়ে কলম বাগিয়ে ধরে জিগ্যেস করলাম, কত টাকা তোলা হবে?

নিরীহ মুখে পিন্‌ডিদা ফিরে জিগ্যেস করল, তুই কী বলিস?

—আমি আর কী বলব.....সকলের ভাগের টাকা বলছ, আমার তো মাত্র এক-ভাগ.....সকলের হয়ে তুমিই বলো, সবাই মেনে নেবে।

একটু ভেবে পিন্‌ডিদা বলল, যে দিন-কাল পড়েছে, তার ওপরে বিনোদের আবার যে লাভের খাঁই.....পার হেড পঁচিশ টাকার নিচে কি হবে?

এবারে সত্যিই আমার অবাক হবার পালা। টাকা তুলতে হচ্ছেই বলে পিন্‌ডিদা এত উদার হবে ভাবব কি করে? বকা-ঝকি করে পিন্‌ডিদাকে পার হেড পনেরো টাকায় রাজি করানোর কথাই ভাবছিলাম। সেখানে কিনা নিজেই পার হেড পঁচিশ টাকা প্রস্তাব করে বসল! খুশি হয়ে জবাব দিলাম, পঁচিশ টাকা পার হেড বেশ ভালোই হবে পিন্‌ডিদা—বিনোদকেও আচ্ছা করে সমঝে দিতে হবে বেশি লাভ-টাভ রাখা চলবে না! তাহলে ছ পঁচিশং একশ পঞ্চাশ টাকা লিখি?

—লেখ....।

চেক লিখে প্রথমে পিন্‌ডিদাকে সই করে দিলাম। তার সই হতে নিচে আমি সই করলাম।

.....না পিন্‌ডিদার মুখে এখনো কোনো রাগের চিহ্ন দেখছি না। বলল, এক কাজ কর, বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ চটপটি আর কার্তিককে ডেকে নিয়ে তুই আর একবার আমার এখানে চলে আয়, তার মধ্যে আমি ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নিয়ে আসছি। কি মেনু হবে তখনই ঠিক করে

বিনোদের কাছে অর্ডার প্লেস করে বলে দিতে হবে, রাত ঠিক আটটার মধ্যে সব কিছু রেডি করে তাকে লোক দিয়ে তোদের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে হবে।

শুনে ভিতরে ভিতরে এবারে আমিই অনুতপ্ত। টাকা তোলার রাগে পিন্‌ডিদা আমার ওখানে সকলে মিলে ফূর্তি করে রাত কাটানোর প্রোগ্রাম বাতিল করে দিল না। আর আমি কিনা পিন্‌ডিদা কি বলবে ধরে নিয়ে বাতাসে ঝগড়া করছিলাম!

তাড়াতাড়ি বললাম, ঠিক আছে পিন্‌ডিদা, চটপটি কার্তিককে নিয়ে....আর বলো তো হাবুলকেও ডেকে নিয়ে ঠিক সাড়ে দশটায় তোমার কাছে ফের আসছি।

—আর শোন, এই দিনেই আমার আবার এমন কাজ পড়ে গেল, সন্ধের পরেও ফুসরত পেলে বাঁচি। যদি দেখিস বেলা এগারোটার মধ্যেও আমি এলাম না, তোরা তোদের বাড়িতেই অপেক্ষা করিস, আমি ফাঁক-মতো একবার হয়ে আসব'খন—তোরা মোটামুটি একটা মেনু ঠিক করেই ফেলিস, আমার অপেক্ষায় থাকিস না—আর যেন কি বলছিলি? না, হেবোকে আর ডেকে আনতে হবে না, যা মাথা মোটা ওটার।

পিন্‌ডিদাকে খুশি করার জন্যেই হাবুলকেও ডাকার কথাটা বলেছিলাম। পিন্‌ডিদা আবার আমার খুশি হবার মতো কথাই বলল। ফলে গলায় এবারে আব্দারে সুর চড়ালাম, সন্ধের পরেও ফুরসত পেলে বাঁচি মানে! না পিন্‌ডিদা, আজকের দিনে তোমার ব্যস্ত-ট্যস্ত থাকা চলবে না—

স্নেহের সুরে পিন্‌ডিদা বলল, তোদের ছেড়ে এমনিতে কি আর ব্যস্ত থাকছে ইচ্ছে করে রে, পরের ঝামেলা সামাল দিতে দিতেই আমার এ জীবনটা কেটে গেল—এসে ধরা-করা করলে আর কথা না দিয়ে পারি না—যাক্‌গে সন্ধ্যার মধ্যে ফ্রি হয়ে যেতে চেষ্টা করব—তোরা সাড়ে দশটায় আসিস, আর না পেলে ফিরে গিয়ে তোদের বাড়িতেই অপেক্ষা করিস।

চলে এলাম। মনে মনে ঠিক করলাম, পিন্‌ডিদাকে আজ খুশি রাখতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব। মেজাজ বিগড়লে সত্যি আমি বড় কচ-কচ করে কথা শুনিয়ে বসি। অথচ আসরের মধ্যমণি এই পিন্‌ডিদা না থাকলে আমাদের পৃথিবীটা যে ধূসর নীরস হয়ে যাবে তাতে কোনো ভুল নেই। সমস্ত রাত সকলে একসঙ্গে থাকব, পিন্‌ডিদার মেজাজ শরিফ করে দিতে পারলে রাতটা স্মরণীয় হয়েও থাকতে পারে। মুডে থাকলে পিন্‌ডিদা যে অভিজ্ঞতার বাস্তব গল্প ফেঁদে বসবে—রাত কোথা দিয়ে কেটে যাবে আমরা হয়তো টেরও পাব না।

চটপটি আর কার্তিককে ডেকে নিয়ে বেশ খোশমেজাজে ঠিক সাড়ে দশটায় আবার পিন্‌ডিদার বাড়ি এলাম। কিন্তু ডাকাডাকি করে সাড়া পেলাম না। কে একজন মুখ বাড়িয়ে বলে দিল, বাড়ি নেই—

আমরা তবু আরও মিনিট দশেক তার জন্য অপেক্ষা করে সকলে মিলে আমাদের বাড়ির দিকে পা বাড়ালাম। না পেলে পিন্‌ডিদাই ওখানে হয়ে আসবে বলে দিয়েছে।

কিন্তু বাড়িতে পা দিতে না দিতে ঠাকুমার যাকে বলে একেবারে উগ্রমূর্তি। চটপটি আর কার্তিকের সামনেই এক থোকা দশটাকার নোট আমার মুখের সামনে নাড়িয়ে দিয়ে খনখন করে উঠল, হ্যাঁরে দাদা, এ কি কাণ্ড! কলারশিপ পেয়ে আজ বাদে কাল তুই কলেজে পড়বি—আর এই বুদ্ধি এই বিবেচনা তোর! একটা বাচ্চাছেলের বুদ্ধি বিবেচনাও কি তোর নেই?

আমি (সঙ্গে কার্তিক আর চটপটিও) হতভম্ব। বললাম, কি হয়েছে? তোমার এই মেজাজ কেন? এই টাকাই বা কিসের?

—এই মেজাজ কেন? টাকা কিসের? এই মেজাজ নিয়েই তোর কাঁধে চেপে আমি যেন ড্যাং ড্যাং করে চলে যাই! আর এই টাকা হল তোর বুদ্ধি বিবেচনার টাকা—আমার মুখে তুই কত চুনকালি দিতে পারিস এটা দেখানোর জন্যেই আমার গোপাল এ-টাকা রেখে গেছে—তোকে দিতে বলে গেছে—নে এবারে বেঁচে থাকতেই তুই আমার শ্রাদ্ধ কর।

ঠাকুমার রাগ আর দুঃখ দেখে আমি হতচকিত।

.....এরপর ব্যাপারখানা বোঝা গেল। খানিক আগে পিন্‌ডিদা এসেছিল। আর এই দেড়শ টাকা আমাকে দেবার জন্য ঠাকুমার হাতে গুঁজে দিয়ে গেছে। কিসের টাকা কেন টাকা জিগ্যেস করতে পিন্‌ডিদা নাকি ঠাকুমাকে বলতেই চায়নি কিছু। কিন্তু মুখ দেখেই ঠাকুমার মনে হয়েছে সে কিছু চেপে যাচ্ছে। ঠাকুমা চেপে ধরতে বাধ্য হয়ে মুখ খুলেছে। বলেছে, সোনার বাবা-মা অর্থাৎ তাদের এত ভক্তি-শ্রদ্ধার মেসোমশাই কলকাতা চলে গেলেন বলে সোনার বেজায় মন খারাপ দেখেছে সকলে। তাই ঠিক হয়েছে, ঠাকুমাকে দেখার জন্য আর সোনার মন ভালো করার জন্য সকলে মিলে এই রাতটা এখানে সোনার সঙ্গে কাটাবে। তখন সোনা প্রস্তাব করেছে, রাতে সকলের খাওয়া-দাওয়ার খরচ আছে—তাই সকলের ভাগের টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে খাওয়ার খরচ চালাতে হবে—তাহলে কারোই আর কিছু গায়ে লাগবে না। সেই প্রস্তাব অনুযায়ী সকলের ভাগের টাকা সমানভাগে ব্যাঙ্ক থেকে তুলে এনে ঠাকুমার হাতে দিয়ে যাচ্ছে—সোনা ওরা এলে এটা দিয়ে দিতে হবে—সে ভয়ঙ্কর ব্যস্ত, পাঁচটা মিনিট অপেক্ষা করার উপায় নেই। টাকা ফেরত দেবার জন্য ঠাকুমা তার পিছনে ধাওয়া করেছে। কিন্তু পিন্‌ডিদার দাঁড়ানোর ফুরসতই নেই—কেবল বলে গেল, যা বলার আপনার নাতিকেই বলবেন—তার কথামতোই এ-টাকা সে রেখে গেল। তার সময় নেই, কি খাওয়া হবে না হবে তারাই যেন ঠিক করে বিনোদের দোকানে অর্ডার দিয়ে দেয়। বলেই ঝড়ের মতো চলে গেছে।

ব্যাপারটা বলার পর ঠাকুমার আবার উগ্র মূর্তি। আমার ওপর ঝাঁঝিয়ে উঠল, লেখা-পড়া শিখে এই মন আর এই জ্ঞান বুদ্ধি হয়েছে তোর হারামজাদা! তোর মন খারাপ বলে সকলে মিলে এখানে থাকবে খাবে আর যে যার ভাগের টাকা খরচ করবে! তোর বাবার এত দরাজ মন আর তোর এই মন! এখনো যোগ শিখিসনি, একেবারে ভাগ শিখে বসে আছিস? রাগে নিজের ট্যাঁক মুচড়ে কি বার করল।—নে হারামজাদা নে, দেড়শ টাকার জায়গায় এই দু'শ টাকা নে—গোপালেরা সব পেট ভরে আনন্দ করে খাবে সেই ব্যবস্থা কর—এই দেড়শ টাকা আমি তার হাতে ফেরত দিয়ে বলব, তোমার মতো দাদাটার যাতে একটু বুদ্ধি-সুদ্ধি হয়, তুমি আমার মুখ চেয়ে কেবল এইটুকু দেখো গোপাল।

রাগের চোটে দুটো একশ টাকার ভাঁজ করা নোট আমার গায়ে ছুড়ে মেরে ঠাকুমা তার পুজোর ঘরে ঢুকে গেল।

যা বোঝবার বুঝলাম। বুঝল চটপটি আর কার্তিকও।

রাগে আমার সর্বাঙ্গ রি-রি করছে। চটপটি বলল, এর জবাব কি হতে পারে রে সোনা?

বলে উঠলাম, এর একটাই জবাব হতে পারে—পিন্‌ডিদাকে গিয়ে বলা, আমাদের ঘাট হয়েছে—তোমার জুড়ি কেবল তুমিই! চল্ বিনোদের দোকানে।

সন্ধ্যার পরে পিন্‌ডিদা আসতেই কাতর মুখে ঠাকুমা তার ওপর চড়াও হল। হাতের নোটের গোছা তার পকেটে গুঁজে দিয়ে বলল বাবা গোপাল, আমার দাদা পড়াশুনায় ভালো হলে কি হবে, তোমার বুদ্ধির কানা-কড়িও নেই—তা'বলে কি ওকে এভাবে আক্কেল দিতে হবে—ও তুলতে বলল আর তুমিও সকলের ভাগের টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে ফেললে? এটা কি হোটেল বাড়ি—যে যার চাঁদা দিয়ে তবে খাবে! ছি ছি ছি, লজ্জায় আমার মাথা কাটা যায়।

নোট ক'টা ভালো করে ভাঁজ করে পিন্‌ডিদা প্যান্টের পকেটে গুঁজল। তারপর এগিয়ে এসে ঠাকুমার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল। ঠাকুমা আরো বিগলিত, পিঠে হাত বুলিয়ে বলতে লাগল, বাবা আমার, গোপাল আমার সকলের তোমার মতো মতি বুদ্ধি হোক—

প্রণাম সেরে পিন্‌ডিদা আমার চোখ এড়িয়ে অন্য সকলের উদ্দেশে খেঁকিয়ে উঠল, হাঁ করে

বসে আছিস যে সব! ঠাকুমার পায়ের ধুলো নে হাঁদাগুলো—এমন ঠাকুমা ছেড়ে আর কোনো দেশের মাটি চষলে পাবি?

সবার আগে হোঁতকা হাবুল ঠাকুমার পায়ে পড়ল। তারপর শুধু আমি ছাড়া একে একে আর সকলে প্রণামের জন্য লাইন দিল। আমি পিন্‌ডিদার মুখখানাই দেখছি। কিন্তু উদ্ভাসিত দু'চোখে পিন্‌ডিদা ঠাকুমাকেই পুজো করছে।

এই রাগের মুখে সব থেকে যা যোগ্য জবাব আমি সেই জবাবই দিলাম। সকলের প্রণাম সারা হতে আমি উঠে ঠাকুমার দিকে এগোলাম না। পিন্‌ডিদার দিকে এগোলাম। হঠাৎ ঝুঁকে তার পা ছুঁয়েই একটা প্রণাম করে উঠলাম।

পিন্‌ডিদা সত্যিই হকচকিয়ে গেল। ঠাকুমা আহ্লাদে বলে উঠল, আ-হা, তুমি ওকে আশীর্বাদ করো গোপাল—তোমার মতো মতি বুদ্ধি হোক দাদার।

অগত্যা পিন্‌ডিদা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। সক্কলে হৈ হৈ করে উঠল। ঠাকুমা হাসি মুখে চলে যেতে হাবুল পিন্‌ডিদার দিকে এগোল। তার কাজটা আমি আগে ভাগে করে ফেলেছি ভেবে ভুল শোধরানোর জন্য ও পিন্‌ডিদার পায়ের ওপর চড়াও হতে গেল। পিন্‌ডিদা আঁতকে উঠে তিন হাত সরে গেল। থতমত খেয়ে হাবুল বলল, বা রে, আমরা তোমায় প্রণাম করব না?

পিন্‌ডিদা প্রায় ভেঙচি কেটে উঠল, কেন করবি—সোনা করল বলে? প্রণাম করে সোনা আমার গালে একখানা চড় বসালো কিনা সেটা বোঝার বুদ্ধি তোর আছে?

হাবুল ফ্যালফ্যাল করে খানিক পিন্‌ডিদার দিকে চেয়ে রইলো, তারপর আমার দিকে ফিরে চোখ পাকিয়ে কৈফিয়ত তলব করল, পিন্‌ডিদার সঙ্গে ইয়ারকি হচ্ছে বুঝি?

পিন্‌ডিদা ওই কথা বলাতে আমার রাগ অনেকটা জল। বললাম, আ-হা ভক্তকে হতাশ করতে নেই পিন্‌ডিদা, প্রণাম করতে দিয়ে আশীর্বাদ করো ও-যেন জন্মজন্ম তোমার হনুমান হয়ে থাকে।

কেবলু সংস্কৃতের খিচুড়ি পাকিয়ে মন্তব্য করল, রামভক্ত হনুমান লম্ফদানে সাগরং লঙ্ঘয়তি।

কেবলুর দিকে পিন্‌ডিদা কটমট করে তাকালো। ওর সংস্কৃত বুলি পিন্‌ডিদার সব থেকে অসহ্য। একটা চেয়ার টেনে গ্যাঁট হয়ে বসে হুকুম জারি করল, আর নো বাজে কথা, সারাদিন ব্যস্ত ছিলাম। তোরা কি দিয়ে কি করলি কে জানে—ঠাকুমা তোদের দেড়শ টাকাই দিয়েছে না আরো বেশি?

কেবলু আবার বলে উঠল, দ্বি শতং—দ্বি শতং পিন্‌ডিদা! ঠাকুমা কড়কড়ে দু'শ টাকা দিয়েছে—চটপটি আর কার্তিকের মুখে মেনু শুনে ভোজনং শরণং গচ্ছামি করো!

এক চোখ ছোট করে পিন্‌ডিদা চটপটিকে জিগ্যেস করল, দু'শ টাকারই মেনু করে বসে আছিস নাকি—কালকের জন্য পঞ্চাশটা টাকাও হাতে রাখিস নি?

জবাব আমি দিলাম, দু'শ টাকার বেশি না হলে বাঁচি—কালকের জন্য ভাবনা কি—কড়কড়ে দেড়শ টাকা তোমার পকেটেই আছে—ও টাকা তো আর ব্যাঙ্কে ফেরত যাচ্ছে না—

শুনে পিন্‌ডিদা হাঁ হয়ে চেয়ে রইলো খানিক—হল কি তোর সোনা—অ্যাঁ? এত করে ফান্ডের টাকাটা বাঁচিয়ে দিলাম আর তোর কিনা সেই ভাগাড়ের শকুনের মতো চোখ! এমন বাবা এমন ঠাকুমা তোর—তাদের ঘরে এ তুই কোন্ শাইলক এসে জন্মালি! ব্যাঙ্ক খোলা থাকলে আমি এক্ষুণি গিয়ে এ-টাকা আবার জমা করে দিয়ে আসতাম—কাল সকালে এই কাজ করে পাশ বই তোদের নাকের ডগায় ফেলে দেব—বুঝলি?

বুঝে এক হাবুল ছাড়া আর কেউ খুশি হল না। হাবুল ফোড়ন কাটল, তুমি না থাকলে আমাদের এত সাধের ফান্ড ঝাঁঝরা হতে এক মাসও সময় লাগবে না পিন্‌ডিদা—

রাগের চোটে আমি হাবুলকে নিয়ে পড়লাম। এই আনন্দের দিনে তোর এমন অলুক্ষণে কথা মুখে এলো কি করে?—পিন্‌ডিদা না থাকলে মানে কি? মনে তোর কি আছে আমরা জানতে চাই!

হাবুলের হোঁতকা মুখ চুপসে গেল। চটপটি মওকা পেয়ে চিড়বিড় করে উঠল, এই ভর সন্ধ্যায় তুই এই কথা বললি হতভাগা—পিন্‌ডিদার আঙুল কামড়ে বালাই-ষাট করে দে শীগগীর!

কেবলু আশ্বাস দিল, ওর কথা বাল-ভাষিতং—কিছু ভাবিস না—ন ফলিতং।

পিন্‌ডিদার স্নেহের টানটা আজ আমার দিকেই বেশি। হেসে বলল, হাবুলের মুখখানা দ্যাখ্ একবার—ওর সঙ্গে লাগিস কেন, তোর নখের ডগার বুদ্ধি কি ওর মগজে আছে!

মন্তব্য পিন্‌ডিদার, অতএব ভেবাচাকা খেয়ে হাবুল চুপ মেরেই রইলো। পিন্‌ডিদার সঙ্গে আজ যে আমার অদৃশ্য একটা টাগ-অব-ওয়ার চলছে সেটা বোঝার মতো ক্ষমতা হেবোর নেই।

ভোজন-পর্ব শেষ হতে এক পিন্‌ডিদা ছাড়া আর সকলেরই হাঁসফাঁস দশা। যাকে বলে ফাঁসির খাওয়া। কেবল পিন্‌ডিদারই বোধহয় পায়ের আঙুল থেকে নাকের নিচে পর্যন্ত পেট—খাবার সর্ব অঙ্গে ছড়িয়ে থাকে বলেই হয়তো তার অস্বস্তি চোখেও পড়ে না। সব থেকে বড় ঘরের খাট-পালঙ সরিয়ে মেঝেতে ঢালা বিছানা পাতা হয়েছে। এই রাতে কেউ আলাদা শুতে রাজি হবে না জানা কথাই, আর ভাগ হয়ে শুলে আসরও জমবে না।

পিন্‌ডিদার বরাবরই সকলের থেকে একটু উঁচু আসনে বসা অভ্যাস। একটা মোটা তাকিয়ার ওপর বসে দেয়ালে ঠেস দিয়ে পান চিবুতে লাগল। আমরাও যে যার শুয়ে বসে বা গড়িয়ে পান চিবুচ্ছি। আমাদের মধ্যে সব থেকে কম কথা বলে কার্তিক। সে প্রস্তাব করল, রাতে ঘুমনো চলবে না—সকলের জেগে থাকার মতো তুমি একটা মজাদার প্রোগ্রাম করো পিন্‌ডিদা।

পিন্‌ডিদা দু'চোখ বুজে মৌজ করে পান চিবুচ্ছে। আমি আড় চোখে দেখলাম, হাবুল চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছে—বেশি খাওয়ার দরুন ওর ভুঁড়িটা হাপরের মতো ওঠানামা করছে। বললাম, তার আগে একটা শর্ত হোক, যে ঘুমিয়ে পড়বে—আমরা সকলে মিলে তাকে ঘুমের মধ্যে চ্যাংদোলা করে তুলে বাইরের উঠোনে রেখে আসব।

এমন শর্ত কার জন্য করা সেটা হাবুলও বুঝেছে। গোঁ-গোঁ করে বলল, সকলকে জাগিয়ে রাখার ক্ষমতা এক পিন্‌ডিদা ছাড়া এখানে আর কার আছে শুনি? প্রোগ্রাম করে পিন্‌ডিদা ছাড়া আর কেউ জিভ নাড়লে বাকি সকলেই ঘুমিয়ে কাদা হয়ে যাবে—কে কাকে চ্যাংদোলা করে উঠোনে নিয়ে যাবে?

এই আই-ঢাই অবস্থাতেও হেবো হোঁতকার গলার স্বর তোষামোদে টইটম্বুর।

কার্তিক সায় দেবার মতো করেই বলল, তাহলে পিন্‌ডিদারই সোলো প্রোগ্রাম হোক্।

চটপটি তাড়াতাড়ি হাত তুলে প্রোগ্রামের ভাগীদার হওয়ার থেকে নিজেকে বাঁচালো। আমি হাবুল আর কার্তিকের সঙ্গে এক মত সোলো প্রোগ্রাম করে পিন্‌ডিদা এই রাতের মতো আমাদের চোখের ঘুমকে নির্বাসন দণ্ড দিক।

কেবলুরও নিজেকে বাঁচানোর দায়। —সর্বসম্মতঃ নিষ্পত্তিং—গুরুভোজনান্তং পিন্‌ডিদা মধুরভাষিতং মধুরেণ সমাপয়েৎ কুরু।

চোখ বুজে পান চিবুতে চিবুতে পিন্‌ডিদা রায় দিল, ত্বং একটা আস্ত গোরু। সোনার শর্তের সঙ্গে আর একটা শর্ত থাকবে—সমস্ত রাতের মধ্যে কেবলু একটাও সংস্কৃত বুলি কচকচ করবে না!

একটু নড়ে চড়ে বসে আমিও ঠেসের সুরে বললাম, ঠিক আছে—কিন্তু সেই সঙ্গে আরো একটা শর্ত থাকবে—হাবুল একবারও কাউকে তেল দেবে না—বা তেল দিতে সাহায্য করবে না।

হাবলু তেল একমাত্র কাকে দেয় সে বোধহয় পিন্‌ডিদাই সব থেকে ভালো জানে। হেবো আমার দিকে কটমট করে চেয়ে আছে। কার্তিক কেবলু আর চটপটি পিন্‌ডিদার রি-অ্যাকশন দেখছে।

.....পিনডিদা এবারে চোখ খুলে আমার দিকে তাকালো যেন আমার মুখখানা পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্যের মতো দেখার জিনিস। দেখছে তো দেখছেই। এই দেখার ভিতর দিয়েই মানুষটা যেন

কোন্ দূরে উধাও হয়ে যাচ্ছে। কথাগুলোও যেন কেঁপে কেঁপে দূরে সরছে। —কি বললি....কি বললি রে সোনা তুই! .....হাবুল তেল দেবে না.....তেল দিতে চেষ্টা করবে না।.....তেল দেওয়া-নেওয়ার এই কারবার তুই বুঝিস.....তোর কোনো ধারণা আছে?

শুধু আমি কেন, আমরা বাকি পাঁচ মূর্তিই হকচকিয়ে গেলাম। না জেনে না বুঝে পিন্‌ডিদার কোন্ স্মৃতির উৎসে নাড়া-চাড়া দিয়ে বসলাম! এই উৎস ব্যথার না দুশ্চিন্তার তা-ও ছাই বুঝছি না।

পিন্‌ডিদার দু'চোখ দূরের কোথাও পাড়ি দিয়ে আবার আমার মুখের ওপরেই চড়াও হল। তার কথাগুলোও কেটে কেটে মুখের ওপর বসতে লাগল। —তেল কাকে দেওয়া হয়—পৃথিবীতে তেল দেবে এমন পোড়া ভাগ্য ক'জনার হয়—কার হয়?

আমি বিস্ময়ে হাবুডুবু খেতে লাগলাম। চটপটি কেবলু কার্তিকের জোড়া-জোড়া চোখ একবার আমার দিকে আর একবার পিন্‌ডিদার দিকে ঘুরপাক খাচ্ছে। হেবো তাড়া দিয়ে উঠল, হাঁ করে আছিস কেন—পিন্‌ডিদা কি জিগ্যেস করছে জবাব দে না!

পিন্‌ডিদার গলার স্বর নির্মম গোছের মোলায়েম।—হ্যাঁ রে সোনা, এ-তো খুব সহজ প্রশ্নের সহজ জবাব—আমাকে এমন ত্রাসের মধ্যে ফেলে দিয়ে এই সামান্য কথাটার জবাব দিতে পারছিস না!.....তেল পাওয়ার, তেল খাবার ভাগ্য কার হয়—যার অঢেল তেল তার না যার ভাঁড়ার তেল শূন্য তার?

বললাম, যার অঢেল তেল তাকেই লোক তেল দেয়.....কিন্তু তোমাকে আমি ত্রাসের মধ্যে ফেললাম কী করে পিন্‌ডিদা?

—ত্রাস বসে ত্রাস! এখনো ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে সেই ত্রাসের গ্রাসে পড়ে আমি হাবুডুবু খাই। আগে আমার কথার জবাব দে—আর, কে তেল দেয় যার অঢেল তেল সে, না যার ভাঁড়ে তেল ঠন ঠন সে? চট্‌পট্ বল্, আমার গলা কাঁপছে দেখছিস না?

উত্তেজনায় সত্যিই গলা কাঁপছে পিন্‌ডিদার। তাড়াতাড়ি জবাব দিলাম, তেল, থাকলে আর তেল দিতে যাবে কেন—তেল যার নেই সে-ই তেল-অলাকে তেল দেয়।

—ঠিক বলেছিস সোনা, খুব ঠিক বলেছিস। তেল যার নেই সে-ই তেল দেয়, হাঁটুর মালাইচাকি ভেঙে আমারও এই কপাল হয়েছিল—এক তেল-অলাকে তেল দিতে গেছলাম। কিন্তু তখন যদি জানতাম, তেল-অলার আমার তেল পছন্দ হলে আর মুক্তি নেই, তাহলে কি তার ধারে কাছে ঘেঁষতাম! কোনো তেল-অলার তোর বুদ্ধির তেল পছন্দ হলে আদর করে সে তোকে তার তেলের পিপেয় এমন ডুবিয়ে রাখবে যে দম-বন্ধ হয়ে মরার আগে আর তোর মুক্তি নেই। উঃ, জিন জেকব আজও আমার কাছে একটা দুঃস্বপ্ন—তেল দিতে গিয়ে তার স্নেহের তেলে পা হড়কে হড়কে আমি যাকে বলে একেবারে আম-তেল হয়ে মরতে বসেছিলাম—সোনা রে অত তুচ্ছ করে কাউকে তেল দেওয়ার কথা বলিস না—তেল যে সত্যি দিতে জানে—তেলই তাকে মেরে মমি বানিয়ে ঘরে রেখে দেবে, তবু হতছাড়া করবে না—জিন জেকবের পাল্লায় পড়ে তেল দেওয়ার কথা শুনলেই আমার প্রাণ-পাখি বুকের খাঁচা ভেঙে পালিয়ে বাঁচতে চায়।

পিন্‌ডিদার রীতি জানি। এবারে শোনার মতো কিছু রসদ আসছে বুঝেই সময়োচিত ইন্ধন জোগালাম।—বলো কি পিন্‌ডিদা, হাবুলকে তো তাহলে বড় বে-ফাঁস কথা বলে ফেলেছি—তা জিন জেকব কে? কোন দেশের মানুষ?

বড় করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল পিন্‌ডিদা, বলল, তেল যার জগৎ তার, তেল যার আছে তার অন্য কোনো দেশ নেই, সে কেবল তেল-জগতের মানুষ—মরে গেলেও সে এই জগৎ ছাড়া হতে চায় না। জিন জেকবের কথা পরে হবে, আগে এই মানুষদের একটা গল্প শোন—তাহলে এদের মন-মেজাজ বুঝতে পারবি!—এক মস্ত তেলের খনির মালিক মারা যেতে তার আত্মা সাঁই-সাঁই

করে স্বর্গের দিকে চলল, পৃথিবীর অনেকটা তার তেলের বশ ছিল, তার ঠাঁই স্বর্গে ছাড়া আর কোথায় হবে? কিন্তু গিয়ে দেখে স্বর্গের দরজার চাবি এঁটে সেখানকার দারোয়ান ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছে।

তেল-অলা রেগে গেল, এ কেমন ডিউটি দেওয়া, পৃথিবীর লোকের মরা থেমে নেই, কিন্তু এ-দিকে স্বর্গ দরজার চাবি বন্ধ করে পাহারাদার ঘুমোচ্ছে! তাকে ঠেলেঠুলে তুলে তেল-অলা হুকুম করল, দরজা খোলো বাপু আমাকে ভিতরে যেতে দাও, নইলে তোমার পাহারাদারের চাকরিখানা আমি খেয়ে ছাড়ব।

আধঘুম অবস্থায় পাহারাওলা বলল, বিরক্ত কোরো না, স্বর্গের হাউস ফুল দেখেই দরজা বন্ধ করে আমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোচ্ছি—আর একটি আত্মারও আপাতত স্বর্গে জায়গা হবে না—তুমি নরকে যাও।

তেলের খনির মালিক খাপ্পা হয়ে উঠল, কি আমি পৃথিবীকে তেলে ভাসিয়ে এসেছি, রাজা বাদশারা পর্যন্ত আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত খোশামোদের তেল মাখিয়ে খাতির করেছে—আর আমি কিনা নরকে যাব!

আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে স্বর্গের দরোয়ান তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, বড় বিরক্ত করো তো তুমি—তোমার মতো অমন অনেক তেল-অলা স্বর্গে গড়াগড়ি খাচ্ছে—বলছি হাউস ফুল—আর একটি আত্মারও এখন সেখানে জায়গা হবে না—সোজা নরকের পথ দেখো বাপু—জায়গা পাবে।

তেল-অলা গুম হয়ে রইল। শেষে কিনা নরকে যেতে হবে তাকে! স্বর্গে জায়গা হবে না! বেগতিক দেখে নিজের তেলতেলে হাতখানা আধ-ঘুমন্ত প্রহরীর গায়ে বুলিয়ে আর গলার স্বরেও তেল ঢেলে তেল-মালিক বলল, ওহে হেভেনলি দরোয়ান, দয়া করে একটু চোখ খুলে তাকাও না, তুমি তো আর নরকের দরোয়ান নও যে এই মেজাজ করছ?

তেল পেলে কে আর না তেল-তেলে হয়? দরোয়ান একটু সদয় হল, কি বলবে বলো?

—স্বর্গে আর একটা সিটও খালি নেই বলছ?

—বলছি তো। আমার কাছে চার্ট আছে—হাউস ফুল।

—কত দিনে খালি হবে?

—তা কি বলা যায়, কারো নরক মতি হলে তবে হবে—পাঁচ দশ হাজার বছর লেগে যেতে পারে।

—কি সর্বনাশ!.....তা স্বর্গে অনেক তেল-মালিকের আত্মা আছে বলছ?

—অনেক, কম করে দু'চার হাজার।

—সদ্য পৃথিবী থেকে এসেছে, তেল-অলার মাথা সাফ। নরম গলায় বলল, দরোয়ান ভাই, একটু উপকার যদি করো, তেল মালিকের আত্মারা যেখানে আছে সেই এলাকায় যদি একটু রটিয়ে দাও, নরকে তেলের খনি বেরিয়েছে—সেখানকার আত্মারা দেদার তেল তুলছে—তাহলে আমি তোমার কেনা হয়ে থাকব প্রহরী ভাই।

দরোয়ান মজা পেয়ে হাসল, বলল, তোমার মতলব বুঝেছি..... ঠিক আছে রটিয়ে দিচ্ছি।

পাঁচ হাজার দশ হাজার বছর ছেড়ে পাঁচ দশ ঘন্টার মধ্যেই প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। দুড়দাড় করে কয়েক হাজার তেল মালিকের আত্মা নরকের পথে নেমে চলেছে। প্রহরী বাধা দিতে চেষ্টা করল, বোঝাতে চাইলো, কিন্তু তাদের দাঁড়ানোর বা শোনার সময় নেই।

সদ্য পৃথিবী-ছাড়া এই তেল মালিক হেসে জিগ্যেস করল, এখন আর হাউস ফুল নয়তো—এবার জায়গা হবে তো?

প্রহরী বলল, যাও, এন্তার জায়গা খালি—হাত পা ছড়িয়ে সুখে থাক গে।

তেল-অলা আনন্দে স্বর্গে চলে গেল। কিন্তু একটা বছর না ঘুরতে সে আবার বেরিয়ে এলো। মুখ চোখের মিনমিনে ভাব। প্রহরী বলল, কি হল, এরই মধ্যে চললে কোথায়?

আমতা আমতা করে তেল-অলা জবাব দিল, নরকেই যাই.....সেখানেই কিছুকাল থেকে আসি।

প্রহরী অবাক।—সে কি হে, চালাকি করে এতগুলো লোককে তুমি নরকে পাঠালে এখন নিজে যাচ্ছ—কি ব্যাপার?

তেল-অলা বলল, চালাকির ফাঁদে নিজেই পড়লাম কিনা কে জানে—এতগুলো লোক নরকে নেমে গেল—এক বছরের মধ্যে কারো ফেরার নাম নেই কেন? ....সত্যিই সেখানে তেলের খনি বেরিয়েছে কি না ওরা তেল তুলছে কি না কে জানে। না ভাই, এখানে আর আমার মন টিকছে না, নরকেই যাই।

গল্পটা শেষ করে পিন্‌ডিদা আমার দিকে তাকালো। তেলের স্বাদ একবার যে পেয়েছে তার মরজি আর বিবেচনা বোঝ—জিন জেকব হল এমনি তেল জগতের ভুঁই-ফোঁড় চাঁই একজন—তোয়াজের তেলে তাকে যে বশ করবে তার আর জীবনে নিষ্কৃতি আছে না মুক্তি আছে?

ভনিতার গল্পই যা জমে উঠেছে, আমাদের আশা এখন তুঙ্গে। হোঁতকা হাবুল পর্যন্ত গড়াগড়ির লোভ ছেড়ে উঠে বসেছে। হাবুলের মুখেও এখন আর চট করে সংস্কৃত বুলি বেরুবে না। চটপটি তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে ভিতরে ছুটল। আধ-মিনিটের মধ্যে এক হাতে কুঁজো আর অন্য হাতে গেলাস নিয়ে ফিরল। এক গেলাস জল ভরে পিন্‌ডিদার সামনে রাখলো। তারপর নিজে ঢকঢক করে এক গেলাস জল গিলে বলল, আর যার দরকার গড়িয়ে খাও—পিন্‌ডিদা শুরু করো, আমরা রেডি—

ফোঁস করে একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে পিন্‌ডিদা বলল, বলতে পারি, কিন্তু তেলের কথা তোরা আর আমার সামনে উচ্চারণ করবি না—তেল মানেই পা পিছলে আলুর দম—তা সে যে তেলই হোক।

আমি কবুল করলাম, রান্না বান্না, মাথায় মাখা আর শীতকালে গায়ে মালিশ করা ছাড়া আমরা আর তেলের মুখ দেখব না পিন্‌ডিদা—তেলের কথাও কইব না।

পিন্‌ডিদা জিন জেকবের কাহিনী শুরু করল। জেকবের কাহিনী মানে নিজের কাহিনীও। শুনতে শুনতে গোড়ার দিকে আমি অন্তত বারকয়েক উসখুস করে উঠেছি। কার্তিক আর চটপটিও আমার দিকে তাকিয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেছে। আগে কেউ গুল-গল্প ছাড়লে আমরা বলে উঠতাম, মিটার চাপা—কত পারসেন্ট দ্যাখ। কেবলু আর কার্তিকও আমার দিকে চেয়ে মুখে বলতে চাইছে, মিটার চড়িয়েছিস না কি রে সোনা—কত পারসেন্ট ধরে নেব?

কিন্তু শুনতে শুনতে একসময় আমরা এমনই তন্ময় হয়ে গেলাম যে সত্য-মিথ্যার ফারাক কখন ঘুচে গেছে কারো হুঁশ নেই।

জিন জেকব তখনো তেল-জগতের কেষ্ট-বিষ্টু হয়ে ওঠেনি। হবে এমন স্বপ্নও মনের কোণে নেই। অতি সাধারণ মানুষ। সাধারণ অবস্থা। লেখা-পড়া তেমন কিছু করেনি। তাই অভিজাতদের সংশ্রব এড়িয়ে চলে। তার স্ত্রীও মুখ্যু সুখ্যু ভালো মানুষ। টেক্সাসের মানুষ দুজনেই। রোজগারের জন্য ব্রেজিলে পড়ে থাকে। জেকবের একমাত্র আনন্দ আর অবসর বিনোদনের বিষয় হল ফুটবল। এমন অন্ধ ফুটবলপ্রেমিক আর কোথাও আছে কি না পিন্‌ডিদার জানা নেই। অন্ধ বলাটা তাৎক্ষণিক অর্থে একেবারে ভুল নয়। চোখের অসুখে জেকবের দুটো চোখই যেতে বসেছিল। অনেক ভাগ্যের জোরে একেবারে দৃষ্টিহীন হয়ে যায়নি। এখন পঁচিশ পাওয়ারের চশমা লাগিয়ে তবে দেখতে পায়, চশমা খুললে যাকে বলে অন্ধ। দু'হাত দূরের-মানুষের মুখও দেখতে পায় না। আর ভালো মানুষ বউটা কখনো খুব রেগে গেলে নাকি টুক করে তা চশমাটা খুলে নিত। ব্যস, তখন হাঁসফাঁস দশা

জেকবের। হাতড়ে হাতড়ে স্ত্রীর নাগাল পেলে তার পা জড়িয়ে ধরে চশমা ফেরত দেবার জন্য মিনতি করত। একবার স্ত্রীর বদলে জেকব ঝাড়ুদারনির পা জড়িয়ে ধরেছিল। সেই থেকে রেগে গেলেও তাঁর স্ত্রী আর চশমা খুলে নেয় না।

যাক, ফুটবলের যে এত ভক্ত সে ফুটবলে জাদুকর 'পিন্‌ডি'কে কোন চোখে দেখবে? বয়স পিন্‌ডিদার থেকে সতেরো কি বিশ বছরেরও বড় হতে পারে। কিন্তু জেকবের কাছে পিন্‌ডিদা আকাশসমান উঁচু মাথার মানুষ। তার জীবনের একমাত্র স্বপ্ন আর আকাঙ্ক্ষা ফুটবল আকাশের জাদু-নক্ষত্র 'পিন্‌ডি'র সঙ্গে পরিচিত হবে—'পিন্‌ডি'র বন্ধু হবে। পয়সা খরচ করে একবার সে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল, 'ফুটবলের রাজা পিন্‌ডি—তোমার সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের সাধ কি আমার এই জীবনে পূর্ণ হবে না?'

পিন্‌ডিদার এক অন্তরঙ্গ ভক্ত কাগজের সেই ছাপা আবেদন দেখালো। আর দেখার পরে পিন্‌ডিদাও কি জবাব না দিয়ে পারে? তখন কি জানত এই জবাবই তার কাল হবে। জিন জেকব হাতে স্বর্গ পেল। তারপর থেকে পিন্‌ডিদাই তার ধ্যান-জ্ঞান। উদার হয়ে পিন্‌ডিদা হৃদ্যতার হাত বাড়িয়েছে, প্রাণ গেলেও সেই হাত কি আর ছাড়তে পারে জিন জেকব?

.....এক খেলায় দেশময় দারুণ হৈ-চৈ পড়ে গেল। বেশ শক্ত টিমের সঙ্গে ফাইন্যাল খেলা। কিন্তু পিন্‌ডিদা যে টিমের আছে সেই টিমে তো আর হারার প্রশ্ন নেই। ক' গোলে জিতবে তাই নিয়ে গবেষণা, তাই নিয়ে বাজি ধরা-ধরি। আগের রাতে জিন জেকব একান্তে পিন্‌ডিদাকে ধরল। মুখ কালো করে বলল, বউ শাসিয়েছে আমাকে।

লোকটাকে এখন পিন্‌ডিদা সত্যিই খুব পছন্দ করে। তাই উতলা হয়ে জিগ্যেস করল, কেন—কি হয়েছে?

—আমার রোজগারে মন নেই, দিনের বেশির ভাগ সময় তোমার কাছে পড়ে থাকি—তোমার কথা ভেবে ভেবে রাত কাটে—সংসারের অচল অবস্থা—সেই রাগে আল্‌টিমেটাম দিয়েছে।

....এখন তুমিই কেবল আমাকে রক্ষা করতে পারো পিন্‌ডি।

পিন্‌ডিদার সহানুভূতির কমতি নেই। জিগ্যেস করল, কিভাবে আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি?

—আমি ধার করে কিছু টাকা যোগাড় করছি, তোমাদের খেলার ওপর বাজি ধরতে চাই—এটাই আমার শেষ আশা—এখন তুমিই বলে দাও কি বাজি ধরব?

পিন্‌ডিদা একটু ভেবে জিগ্যেস করল, বাজারে হাইয়েস্ট দর কি যাচ্ছে?

—হাইয়েস্ট দর তোমাকে নিয়েই—তুমি চার গোল দেবে—ওয়ান ইজ টু এইট দর যাচ্ছে—জিতলে এক ডলারে আট ডলার পাব।

পিন্‌ডিদা বলল, আচ্ছা কাল আমি মাঠে তোমার জন্য প্রাণ ঢেলে দেব। তুমি কত টাকার খেলতে চাও?

—একশ ডলার পর্যন্ত খেলতে পারি, কিন্তু পিন্‌ডি হারলে একেবারে পথে বসব—বরং তিনের দরে তোমার ওপর দু'গোলের বাজি ধরি।

—না, বললাম তো তোমার জন্য কাল আমি মাঠে সংহার মূর্তি ধরব—আমি কম করে ছ'গোল দেব, বাজি ধরলে কি দর পাও দেখো।

উত্তেজনায় জিন জেকবের দু'চোখ গোল একেবারে।—বলো কি পিন্‌ডি! অপনেন্ট তো কাঁচা দল নয়—তুমি ছ'গোল না দিতে পারলে আমি তো এই বাজি ধরে মাঠেই হার্টফেল করব!

পিন্‌ডিদা বলল, বাজি ধরে যদি ভাগ্য একটু ফেরাতেই চাও—যা বললাম তাই করো।

উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে জেকব চলে গেল, তারপর আরো দু'গোল দেবে বাজি ধরে ষোলর

দর পেয়েছে! অর্থাৎ পেলে এক ডলারে ষোল ডলারে পাবে—একশ ডলারই খেলে এসেছে—জিতলে ষোল শ ডলার পাবে। তারপর কাতর মুখে বলল, কিন্তু পিন্‌ডি আমার আশা দেখে ওরা যে হাসছে!

—হাসুক। খেলার পরে তুমি হাসবে। এখন যাও, আমাকে কনসেনট্রেট করতে দাও।

....হ্যাঁ জিন জেকব খেলার পরে হেসেছে তো বটেই—কিন্তু কেঁদেছেও তার ডবল। শুধু জিন জেকব কেন, মাঠ ভরতি সাপোর্টাররা সবাই প্রথমে হেসেছে পরে কেঁদেছে।

আগে হেসেছে কারণ, খেলা শেষ হবার দশ মিনিট আগে পর্যন্ত পিন্‌ডিদা গুনে গুনে ছয় গোলই দিয়েছে।—পিন্‌ডিকে রুখতে পারে মাঠে সেদিন এমন শর্মা কেউ ছিল না। আকাশ-ছোঁয়া পিন্‌ডি-পিন্‌ডি রবে মাঠসুদ্ধু মানুষ পাগল। পিন্‌ডিদার এমন পাগলের মতো খেলা ফুটবলের ইতিহাসে কেউ দেখেনি।

.....তারপর? তারপরেই বজ্রপাত। মাঠের আকাশ বিষাদের কালো মেঘে ছেয়ে গেল।.....পিন্‌ডিদা মাঠে কাটা-ছাগলের মতো গড়াচ্ছে। তার হাঁটুর মালাইচাকি সরে যায়নি শুধু, ভেঙেই গেছে।

স্ট্রেচারে করে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। দেশের সেরা সার্জনরা হাসপাতালে এসে কনফারেন্স বসিয়ে দিল। বড় বড় কাগজের প্রতিনিধিরাও হাসপাতালে হত্যে দিয়ে পড়ল। ও দিকে জনতার ভিড়ের চাপে কত ছেলে-মেয়ে পিষে মরল, কত জখম হল তার হিসেব কে রাখে?

পরদিন সমস্ত কাগজের প্রথম পাতায় পিন্‌ডিদার ছবি—পাশাপাশি তাজ্জব খবর আর শোকের খবর।.....বন্ধু জিন জেকবকে বাজি জেতাবার জন্য জীবনের সেরা খেলা মরিয়া হয়ে খেলেছে, পিন্‌ডি—প্রতিজ্ঞা করেছিল ছ'গোল দিয়ে জিন জেকবকে ষোলর দরে বাজি জেতাবে। তাই জিতিয়েছে। গুনে গুনে ছ'গোলই দিয়েছে।.....তারপর সকলের বুক দুমড়ে ভাঙার মতোই শোকের খবর।.....পিন্‌ডির হাঁটুর মালাইচাকি অপারেশন হয়েছে—ভাঙা অংশ বাদ দিতে হয়েছে। অতএব পিন্‌ডির খেলার জীবন শেষ।

সমস্ত দেশের সেটা শোকের দিনই বটে। জাতীয় শোকের দিন। পিন্‌ডিদার মন কারো থেকে কম খারাপ হয়নি। দেশসুদ্ধু লোকের এত শোকই তার যা সহ্যে না। ক্লাবের কর্তাব্যক্তিরাও এসে কান্নাকাটি করেছে। বলেছে, তোমার হাঁটুর মালাইচাকি গেছে—কিন্তু তুমি তো আছ পিন্‌ডি—তোমাকে আমরা মাথায় করে রাখব—তুমি আমাদের ক্লাবের মহা-মর্যাদায় কোচ হয়ে থাকবে।

কিন্তু পিন্‌ডিদা মুশকিলে পড়ল জিন জেকবকে নিয়ে। ষোল শ' ডলার জিতেও তার মতো শোকাচ্ছন্ন আর কেউ না। পাগলই হয়ে গেছে। বলছে, আত্মহত্যা করবে—করবেই। পিন্‌ডির খেলা গেল তার আর এই জীবন রাখার কোনো মানে হয় না। আত্মহত্যাই তার জ্বালা জুড়োনোর একমাত্র পথ।

পিন্‌ডিদা তাকে যত বোঝায় তার গোঁ ততো বাড়ে। কারো কথা শুনবে না, কোনো কথা শুনবে না—আত্মহত্যাই তার একমাত্র শান্তির পথ।

অগত্যা পিন্‌ডিদাকে একটু মিথ্যের আশ্রয় নিতে হল। বলল, ডাক্তাররা আশা করছে, নতুন মালাইচাকি আবার একটা গজাতেও পারে। যদি গজায় তাহলে তো আর ভাবনা নেই। তাই পিন্‌ডিদার প্রস্তাব এক বছরের জন্য অন্তত জেকব আত্মহত্যা স্থগিত রাখুক—ততদিনে যদি পিন্‌ডিদার হাঁটুতে নতুন মালাইচাকি না গজায় তখন না হয় আত্মহত্যা করবে।

জিন জেকব রাজি হল। কিন্তু একটা বছর পিন্‌ডি যখন আর ফুটবল মাঠে নামবেই না, তার আর ব্রেজিলে বসে থেকে লাভ কি—সে বরং এই একটা বছর নিজের দেশ টেক্সাসেই কাটাবে—আত্মহত্যার জন্য তৈরি হবে। মরতে তো এমনিতেই হবে বাজির ষোল শ' ডলারে ক'দিন আর

চলতে পারে—তারপর তো আবার রোজগারের ধাক্কায় আধ-মরা হতেই হবে। বছরটা ঘুরলে তার থেকে পুরো মরাই ভালো।

জেকব সস্ত্রীক টেক্সাসে চলে গেল।

তারপর ন'মাস না যেতে এক তাজ্জব খবর। জিন জেকব টেক্সাসের পাঁচ জন ধনীর মধ্যে একজন হয়ে বসেছে। সে বিরাট এক তেলের খনি পেয়ে গেছে। এত বড় খনি আবিষ্কার গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কেউ করতে পারেনি। সেদিনের সেই অর্ধশিক্ষিত জিন জেকব রাতারাতি কোটি-কোটি কোটি-কোটি ডলারের মালিক।

কিন্তু যত বড় লোকই হোক, জিন জেকব কি পিনডিকে ভুলতে পারে! হাঁটুর মালাইচাকি গেছে? তাতে কি? পিন্‌ডির হাঁটুতে সোনার মালাইচাকি বসিয়ে দিতে কতক্ষণ লাগবে। হাঁটুর মালাইচাকি কেন—পিন্‌ডির পা দুটোই তো সে সোনায় বাঁধিয়ে দিয়ে তাকে তার কাছে রেখে দিতে পারে!

একদিন এরোপ্লেনে উড়ে ব্রাজিলে এসে হাজির। পিন্‌ডিদা তার ভাগ্যের সিকে ছেঁড়ার খবর আগেই পেয়েছিল। টেলিগ্রাম করে জেকবই তাকে জানিয়েছিল। এবারে সশরীরে এসে সোজা তাকে টেক্সাসে তুলে নিয়ে গেল। পৃথিবীর কোনো চিকিৎসায় যদি মালাইচাকি সারে, তো পিন্‌ডিকে সে সারিয়ে তুলবেই। আর যদি না সারে, সমস্ত জীবন পিন্‌ডিকে সে রাজার হালে রাখবে। মোট কথা, পিন্‌ডিকে না নিয়ে সে এখান থেকে নড়বে না।

.....পিন্‌ডিদাও লোভেই পড়ল। জিন জেকব তো এখন আর সেই লোক নয় যে একটুও হেলাফেলা করা যাবে। উল্টে এখন তাকে একটু তোয়াজ তোষামোদে খুশি রাখতে পারলে আখেরে অনেক লাভ। তাছাড়া খেলার মাঠ তো এখন তার কাছে অনুপস্থিত, বড় লোকের বাড়িতে কিছুদিন ফুর্তিতে কাটিয়ে এলে মন্দ কি?

সেই আশাই কাল হল। ফুর্তি বলে ফুর্তি—এমন আনন্দেও মানুষ থাকতে পারে! মানুষ কত ভালো খেতে পারে? কত ভালো ভালো জিনিস দেখতে পারে? রাজা বাদশারা কি এর থেকেও বেশি সুখে বেশি আনন্দে থাকে?

একটা বছর ঘুরে গেল। খেতে খেতে পিন্‌ডিদার খাওয়ায় অরুচি এসে গেল।

ও-দিকে ব্রেজিলের মানুষেরা পিন্‌ডিদাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে। ক্লাবের খেলোয়াড় পিন্‌ডি নেই, কিন্তু কোচ পিনডির দ'মও কি কম নাকি! কিন্তু একবছর ধরে কোথায় সে হাওয়ায় মিলিয়ে আছে? কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুতে লাগল—পিন্‌ডি তুমি কোথায় আছ? যেখানেই থাকো দয়া করে চলে এসো—সমস্ত ব্রেজিলের মানুষ তোমার ফেরার অপেক্ষায় দিন গুনছে—এবারে এসে তুমি তোমার ক্লাবের কোচ হয়ে আমাদের কর্ণধার হয়ে বোসো।

সেই সব কাগজ পড়ে জিন জেকব হাসে। বলে, খবরদার যাবার নাম করেছ কি তোমাকে মেরে মমি বানিয়ে নিজের কাছে রেখে দেব। তুমি শুধু আমার—আর কারো নয়।

....এদের মন এমনি সাংঘাতিকই বটে। এর অনেক পরে পিন্‌ডিদা যখন ব্রেজিল থেকে পালাতে চেষ্টা করেছিল তখন ওই রকম লোকদের হাতে পড়ে পিন্‌ডিদার প্রাণান্ত দশা হয়েছিল—সে গল্প তো আমরা বর্ধমানের এই বাবুগঞ্জের পাঁচ-পিন্‌ডিদা-ভক্তরা কত আগেই শুনেছি।

যাক, এত বড় লোক জিন জেকব আর তার রোগে-ভোগা বউয়ের কিন্তু মনের তলায় একটা বড় খেদ হয়ে গেছে। টেক্সাসের সাধারণ মানুষ তো গরিব আর খেটে খাওয়া মানুষ। তাদের কাছে যতই হোমরাচোমরা হয়ে উঠুক জিন জেকব—তাতে কি মন ভরে! ও-দিকে অভিজাত আর শিক্ষিত যারা আছে তাদের কাছে খুব একটা পাত্তা পায় না। কারণ তারা তাকে গরিব দশা থেকে জানে—আর পেটে বিদ্যে-বুদ্ধি কত, তা-ও জানে। টাকা থাকলে লোকের অনেক রকমের খাতির কদর পেতে সাধ যায়। জেকব আর তার বউয়ের অদৃষ্টে তা আর জোটে না।

খেদের কথা একদিন বন্ধু পিন্‌ডিকে বলেই ফেলল জেকব।

ভেবেচিন্তে পিন্‌ডিদা বলল, এখানে তোমার এত চেনা লোক, অভিজাত লোকেরা তোমাকে পাত্তা দেবে না, কতবার তো কতজনকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করলে, তারা কেবল পেট-ভাসিয়ে খেয়েই গেল—ফিরে তোমাদের কেউ ডাকে না।

জেকব মাথা নেড়ে সায় দিল।—সেই কথাই তো বলছি—আগে ওরা আমাকে বলত ব্যাটা চোখে দেখতে পায় না, অন্ধ—এখন আবার বলে, টাকায় অন্ধ হয়ে সকলকে টেক্কা দেবার মতলব।....পিন্‌ডি ভাই, আমি চোখে দেখি না, আধা অন্ধ—ওপরওয়ালার এই মার সহ্য হয়—কিন্তু টাকার মারেও লোকে আমাকে অন্ধ বলবে, এ বরদাস্ত হয় না—এ-দিকে আমার রোগা-পটকা বউটা কোনদিন পটাশ করে মরে যাবে—তার অভিজাত হবার সাধও মিটবে না—তুমি একটা রাস্তা দেখাও।

পিনডিদা মোক্ষম রাস্তাই দেখালো। বলল, টেক্সাস ছেড়ে তুমি ডালাসে ঘর বাড়ি কিনে সেখানে বসবাস শুরু করো। ডালাসের মতো বিলাসের জায়গা পৃথিবীতে আর ক'টা আছে। ডালাস হল গিয়ে অভিজাত বিলাসী মানুষদের স্বর্গভূমি—সেখানে তো আর তোমার পুরনো পরিচয় কারো জানা নেই—বিরাট অয়েল মার্চেন্ট হিসেবেই সেখানে সবাই তোমাকে খাতির করবে।

যেমন প্রস্তাব তেমনি কাজ। পিন্‌ডিদা আর বউ জোসেফিনকে নিয়ে জিন জেকব ডালাসে এসে বিরাট বাড়ি-ঘর কিনে জাঁকিয়ে বসল। টাকার জোরে কি না হয়। সব কিছু ছবির মতো সাজানো।

পিন্‌ডিদা পরামর্শ দিল, এবারে বেশ কিছু বাছাই করা অভিজাত প্রতিবেশীকে ডেকে তুমি একটা জোরদার পার্টি দাও—আর এই সঙ্গে তুমি দুটি জিনিসের অর্ডার দাও—একটা রেমব্র্যান্ড্‌ট্‌ আর একটা জাগুয়ার—পার্টি চলাকালে এই দুটো জিনিস এসে পৌঁছান চাই—অভিজাত আমন্ত্রিতরা তাহলে তোমার টাকার জোর আর টেস্ট দুইই বুঝতে পারবে।

বন্ধু পিন্‌ডির ওপর জেকবের অন্ধ বিশ্বাস। বলল, অর্ডার ফর্ডার তুমিই দাও বাপু, ও-সব আমি বুঝি-টুঝি না—জিনিস এলে আমি চেক্‌ কেটে দিয়ে খালাস।

পার্টির ঢালাও আয়োজন হল। এলাকার অভিজাত ভদ্রলোক ভদ্রমহিলারা সব আসতে লাগল। জেকব আর জোসেফিনের সঙ্গে পরিচিত হতে লাগল। আমন্ত্রিতরা সোসাইটির নামকরা ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা। তারাও নতুন অয়েল মারচেন্ট দম্পতিকে যাচাইয়ের চোখ নিয়েই এসেছে। এ-দিকে পিন্‌ডিদা একটা জাগুয়ার আর এক-প্রস্থ রেমব্র্যান্ড্‌ট্‌ অর্ডার দিয়ে রেখেছে—পার্টি চলাকালীন এতটার থেকে এতটার মধ্যে এসে পৌঁছনো চাই। দুই কোম্পানিই রাজি হয়েছে, যথাসময়ে পাঠাবে।

পার্টি সবে জমে ওঠার মুখে। একজন কর্মচারী বাড়ির মালিক জেকবের হাতে একটা চিরকুট ধরিয়ে দিল। জেকব বাইরে চলে এলো। একটু বাদে ফিরে এসে সকলকে শুনিয়ে পিন্‌ডিদাকে বলল, আমাদের অর্ডারের একটা জিনিস এসে গেছে।

সকলকে শুনিয়ে পিন্‌ডিদাও তাকে জিগ্যেস করল, কোনটা এসেছে—রেমব্র্যান্ড্‌ট্‌ না জাগুয়ার।

জেকব কাগজটা তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে চট্‌পট্‌ জবাব দিল, তা ঠিক বলতে পারছি না—দুটোর মধ্যে একটা এসেছে দেখলাম—তুমি দেখে এসে ও কে করলে আমি চেক কেটে দিচ্ছি।

জেকবের এই জবাব শুনে পিন্‌ডিদার মাথাতেই বুঝি বাজ পড়ল একটা। কারণ আমন্ত্রিত ভদ্রলোক ভদ্রমহিলারা ততক্ষণে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাসা-হাসি শুরু করেছে। করবে না?

গপ্‌প থামিয়ে পিন্‌ডিদা আমাদের পাঁচ মূর্তির দিকে তাকালো। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলাদের মধ্যে কেন মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাসাহাসি শুরু হয়ে গেল বল দেখি?.....রেমব্র্যান্ড্‌ট্‌ বা জাগুয়ার দুটোর একটা এসেছে বলতে লোকে হাসবে কেন?

এবারে কেবল আমিই হেসে উঠে বললাম, রেমব্র্যান্ড্‌ট্‌ হল পৃথিবীবিখ্যাত ডাচ্‌ চিত্রকর—

রেমব্র্যান্ডট্ আসা মানে তার এক প্রস্থ ছবি আসা। আর জাগুয়ার হল গিয়ে—হেবো-হোঁৎকা ফস করে বলে উঠল, জঙ্গলের চারপেয়ে হিংস্র জানোয়ার—

মওকা পেয়ে বলে উঠলাম, গাধার মতো গোরু কোথাকারের, পার্টির সময়ে ডেলিভারি দেবার জন্য জঙ্গলের হিংস্র জানোয়ার অর্ডার দিতে গেছে পিন্‌ডিদা? এই জাগুয়ার হল গিয়ে পৃথিবীর মধ্যে নাম-করা ফ্যাশানেবল ঢাউস মোটরগাড়ি!.....এখন একটা এসেছে, চোখে দেখেও জিন জেকব বুঝতে পারছে না জাগুয়ার এলো না রেমব্র্যান্ডট্ এলো—তার বিদ্যেবুদ্ধির দৌড় অভিজাত নিমন্ত্রিতদের কাছে ফাঁস হয়ে গেল না? তারা মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাসবে না?

পিন্‌ডিদা মন্তব্য করল, সোনা—সোনার ছেলেই বটে—এগুলো সব দু'পেয়ে গাধা।

মন্তব্য গায়ে না মেখে আবার আমরা গল্পের জগতে ফিরে ডালাসের আসরে পৌঁছে গেলাম।

.....পিন্‌ডিদা কি করল? হঠাৎ হা-হা শব্দে হেসে উঠে জিন জেকবকে জড়িয়ে ধরে পার্টির ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। আড়ালে এসে জেকবকে এই মারে তো সেই মারে। অভিজাত আমন্ত্রিতদের সে কি হাসির খোরাক জুগিয়েছে বুঝতে পেরে জেকবের মুখ চুন। আবার সঙ্গে সঙ্গে কোটি কোটি পতির মেজাজ চড়ল। পিন্‌ডিদাকেই দোষ দিল, অর্ডার যা দিয়েছিল তা কোনটা কি আমাকে আগে থাকতে বলে রাখবে তো? তুমিই আমার সর্বনাশ করলে—

পিন্‌ডিদা বলল, শোনো, আমার সময় নষ্ট করার সময় নেই—এক্ষুণি তিন চারটে বড় কাগজের রিপোর্টারকে ফোনে নেমন্তন্ন করে চলে আসতে বলো—ঘরোয়া পার্টিতে তারা আসতে চাইবে না—তাদের বলো ফুটবলের মালটি সুপারস্টার পিন্‌ডি এই পার্টিতে উপস্থিত আছে—তাহলেই ছুটে আসবে তারা—এই বিপাকে নিজের পরিচয় ফাঁস না করে আর উপায় কি—তোমার মুখ রক্ষা তো করতে হবে!

দশ মিনিটের মধ্যে চার-চারটে বড় খবরের কাগজের রিপোর্টার হন্তদন্ত হয়ে উপস্থিত। পিন্‌ডি পার্টিতে উপস্থিত জানার পরেও তারা না এসে পারে? আর এ-দিকে জাগুয়ার ডেলিভারি দেবার জন্যও লোক এসে গেছে। জাগুয়ার আর রেমব্র্যান্ডট্ দেখে রিপোর্টাররা খুব খুশি।.....হ্যাঁ, জেকব লোকটার টাকা যেমন আছে রুচিও তেমনি বটে।

তাদের সামনেই পিন্‌ডিদার হঠাৎ কি মনে পড়তে জেকবের গলা জড়িয়ে ধরে বেদম হাসতে লাগল। বলল, মাই ডিয়ার জেকব, তোমার রসিকতার ধার আর সাহস দেখে হাসতে হাসতে আমার পেটে খিল ধরে গেছে—অভিজাত সোসাইটির ওপর তুমি যে ব্যঙ্গের চাবুক হানলে তার তুলনা নেই—ফুটবল সুপার স্টার পিন্‌ডি তোমার কাছে মাথা নত করছে।

ব্যাপার সঠিক না বুঝেও কাগজের রিপোর্টার সেই জড়াজড়ির ছবি আর ফুটবল সুপারস্টারের মাথা নত করার ছবি তুলে ফেলল। তারপর জানতে চাইলো, অভিজাত সোসাইটির ওপর অয়েল মার্চেন্ট কি ব্যঙ্গের চাবুক হানলো যে ফুটবল সুপারস্টার এত মুগ্ধ?

পিন্‌ডিদা হাসতে হাসতে ব্যাপারখানা খুলে বলল তাদের। টাকার জোরে আধুনিক অভিজাত সম্প্রদায় কি বিদ্যেবুদ্ধি নিয়ে সমাজের মাথায় চড়ে আছে—তারই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখালো অয়েল মারচেন্ট ধনপতি জিন জেকব। নিজেকে সেই নির্বোধের দলে ফেলে অভিজাত সমাজের ওপর এমন ব্যঙ্গ পৃথিবীর ক'জন ছুড়ে দিতে পেরেছে! এই একটি রসিকতার জন্য ফুটবল সুপারস্টার পিন্‌ডি'র তাকে অভিজাত সমাজের রসিক চূড়ামণি বলে স্বীকার করে নিতে আপত্তি নেই।

রিপোর্টারেরাও মহাখুশি হয়ে ছবির আর নোট নিয়ে তাড়াতাড়ি যে-যার কাগজের অফিসে ছুটল। খাওয়া মাথায় থাক—আজকের নাইট এডিশনেই এমন মজাদার খবরটা ছাপতে না পারলে অন্য প্রতিযোগী কাগজের কাছে মার খাবে। দেড় ঘন্টার মধ্যে এই দারুণ খবরটা চার-চারটে কাগজের মারফত ডালাসে ছড়িয়ে পড়ল।

এদিকে পার্টি তখনো চলছে। কারণ প্রোগ্রাম তো ইলাহী। সে-ব্যাপারে তো আর কার্পণ্য করা হয়নি! অভিজাত ভদ্রলোক ভদ্রমহিলারা তখনো হোস্ট জিন জেকবের বিদ্যেবুদ্ধি নিয়ে জটলা করছে আর রুমালে মুখ চেপে দম-ফাটা হাসি হাসছে। এরই মধ্যে আসরে কতকগুলো নাইট্ এডিশনের কাগজ এসে গেল। সেই কাগজ দেখে পার্টির সমস্ত অভিজাত আমন্ত্রিতের চক্ষুস্থির। তারপর পার্টিতে আরো কাগজ আসছে—আসছে তো আসছেই। সমস্ত কাগজে ফুটবল সুপারস্টার পিন্‌ডি আর অয়েল মারচেন্ট জিন জেকবের জড়াজড়ির ছবি—আর অভিজাত সমাজের প্রতি জিন জেকবের রেমব্র্যান্ড্ট্ আর জাগুয়ার নিয়ে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের প্রহসন। সেই সঙ্গে তার সম্পর্কে ফুটবল সুপারস্টার পিন্‌ডির মন্তব্য।

পার্টির চেহারাই বদলে গেল। কি আশ্চর্য, এটা যে হোস্টের এত বড় একটা রসিকতা তারা কিনা বুঝতেই পারেনি! কেবল, তাদের অগোচরে কাগজের রিপোর্টার যারা উপস্থিত ছিল তারা বুঝেছে। বুঝে বাইরে এসে জিন জেকব আর ফুটবল মাল্‌টি সুপারস্টার পিন্‌ডিকে ছেঁকে ধরে রিপোর্ট আর ছবি নিয়ে ফলাও করে ছেপেছে! হ্যাঁ, জিন জেকবের মতো এমন নির্ভীক বাস্তব রসিক অভিজাত সমাজে কতজন আছে! কাড়াকড়ি করে তারা এসে এসে জিন জেকবের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করতে লাগল আর জেকব দম্পতির সঙ্গে ফুটবল সুপারস্টার পিন্‌ডিকেও নিজেদের পার্টিতে নেমন্তন্ন করে যেতে লাগল। একজন তো ঘোষণাই করে বসল, তার পরবর্তী পার্টিটাই মিস্টার অ্যান্ড মিসেস জিন জেকব আর ফুটবল সুপারস্টার পিন্‌ডর সম্মানার্থে।

দিন-কতকের মধ্যে পিন্‌ডিদা জিন জেকবের নতুন কেনা জাগুয়ার গাড়ি নিয়ে আরো চমকের ব্যবস্থা করল। কাগজে অয়েল মারচেন্ট জিন জেকব আর তার জাগুয়ার গাড়ি সম্পর্কে অভিনব খবর বেরুলো। যেমন, জিন জেকব চশমা ছাড়া অন্ধ, মাইনাস পঁচিশ তার চশমার পাওয়ার, চশমা ছাড়া এক হাত দূরের মানুষও দেখতে পায় না। সেই মানুষ কিনা তার জাগুয়ার চালাবার সময় চশমা পাশে খুলে রাখে—সে সময় তার চশমার দরকারই হয় না—এর রহস্য কি? এ-ভাবে গাড়ি চালালে তার গাড়ির নিচে চাপা পড়ে ভালাসের লোক তো রোজ একশ দেড়শ করে খতম হবার কথা। অথচ একটিও অ্যাকসিডেন্ট হয় না—জাগুয়ার গাড়ি চালাবার সময় চশমা খুলে রেখেই মনের আনন্দে গাড়ি চালায় জিন জেকব। পাশে স্ত্রী আর ফুটবল সুপারস্টার পিন্‌ডিকে নিয়ে জেকবের গাড়ি চালানোর ছবিও কাগজে ছাপা হয়েছে! পরে অয়েল মারচেন্ট জিন জেকবের বাদশাই মেজাজ বোঝা গেছে। গাড়ির সামনের দিকের কাচের খানিকটা অংশে নিজের চশমার পাওয়ার বসিয়ে নিয়েছে জেকব। তাই চালাবার সময় আর চশমার দরকার হয় না। সুইচ টিপলেই তার দিকের সামনে পাওয়ার বসানো উইন্ডশেল বেরিয়ে আসে। অন্য ড্রাইভার চালানোর সময় আবার সুইচ টিপলে সেটা সরে যায়।

এই অভিনব বুদ্ধি পিন্‌ডিদার। তার দৌলতেই অভিজাত মহলে জিন জেকব আর তার রোগাপটকা স্ত্রীর খাতির কদর তুঙ্গে।

.....পিন্‌ডিদা এবার ছুটি চায়। তাকে ব্রাজিলে ফিরত হবে। কোচের দায়িত্ব নিতে হবে। কিন্তু যাবার কথা বললেই জেকবের মেজাজ খাপ্পা। পিন্‌ডিদা বুঝতে পারে জেকব তার পিছনে অন্তত পনেরো জন স্পাই লাগিয়ে রেখেছে। হঠাৎ গা-ঢাকা দেবার রাস্তা নেই। জেকবের স্পষ্ট কথা, এ-জীবনে সে আর পিন্‌ডি বিচ্ছিন্ন হবে না। ছাড়াছাড়ি মতলব করলে জেকব আগে বন্ধু পিন্‌ডিকে গুলি করে মারবে তারপর নিজেকে। না পিন্‌ডিদার এ-জীবনে আর বোধহয় নিষ্কৃতি নেই। সে হাত বাড়ালে জেকব তাকে লক্ষ লক্ষ টাকা দেবে, কিন্তু মুক্তি দেবে না।

এমন দিনে একটা অঘটন ঘটে গেল। বলা নেই কওয়া নেই জেকবের রোগা-পটকা বউ জোসেফিন চোখ বুজে বসল। জেকব শোকে কাতর। পিন্‌ডিদা তাকে অষ্টপ্রহর সান্ত্বনা দিচ্ছে। জেকবের নাজেহাল দশা।

একদিন পিন্‌ডিদাকে বলল, আর তো পারি না, চলো কিছুকালের জন্য আমরা কোথাও বেরিয়ে পড়ি পিন্‌ডি—ডালাসে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

পিন্‌ডিদা এক পায়ে প্রস্তুত। এক জায়গায় বসে খেয়ে খেয়ে মুটিয়ে গিয়ে (পিন্‌ডিদা পর্যন্ত নাকি মুটিয়ে গেছল) কোটি কোটিপতির ধামা ধরে থাকতে আর কাঁহাতক ভালো লাগে। দু'জনে পরামর্শ করে ঠিক করল, স্থল-পথে নয় জল-পথে পাড়ি জমাবে তারা। কোথায় যাবে? ভেবে কাজ নেই, যেদিকে দু'চোখ যায়। কোন জল-পথ ধরবে—রেড্ রিভার না গালফ্ অফ্ মেক্সিকো? না রিভার টিভারের ছোট-খাটো জল-যাত্রা ভালো লাগবে না। তার থেকে গালফ্ অফ মেক্সিকোয় ভেসে পড়া যাক। পরে ওটাই তো বিশাল ক্যারেবিয়ান সী হয়েছে—সেখানে কত জানা-অজানা দ্বীপ, কত জানা-অজানা পাহাড়।

অজানার হাত-ছানির এই রোমাঞ্চের কি তুলনা আছে। দারুণ একটা মডার্ন লঞ্চ কিনে ফেলা হল। জেকব তার পুরনো লঞ্চ বাতিল করল কেবল পুরনো সারেঙ আর তার জুনিয়ার মেট্ আর খালাসি দু'জন থাকল। তারা অভিজ্ঞ লোক, প্রস্তুত হয়ে সবরকম সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে তবে রওনা হতে চায়।

কিন্তু জেকবের আর দেরি সয় না। বউ মরে যেতে মেজাজ খিটখিটে। যাবার দিন দু'দুবার বাতিল করা হয়েছে। সারেঙকে ডেকে জেকব শাসিয়ে দিল, ফের যাত্রা পিছোলে দলবলসুদ্ধ তোমাকে বরখাস্ত করা হবে—এটা লাস্ট ওয়ার্নিং মনে রেখো!

মুখ কালো করে সারেঙ চলে যেতে পিন্‌ডিদা বলল, ওর ওপর নির্ভর করেই আমরা ভেসে পড়তে চলেছি, আর যাত্রার আগেই ঘা বসিয়ে ওর মনটা খারাপ করে দিলে!

জেকব তক্ষুণি ফোঁস করে উঠল, কি বললে—ওর ওপর নির্ভর করে আমরা ভেসে পড়তে চলেছি! তুমি কি সেই পিন্‌ডি আছ না তোমার মাথার স্ক্রু ঢিলে হয়ে গেছে? আমি অয়েল মারচেন্ট জিন জেকব—মালটি মালটি মালটি মিলিয়নেয়ার—আমি সমুদ্রে ভেসে পড়তে চলেছি লঞ্চের একটা সারেঙের ওপর নির্ভর করে! এই কথা কিনা তোমার মুখ দিয়ে বেরুলো?

পিন্‌ডিদা সামাল দিতে চেষ্টা করল, আমি ঠিক সেই কথা বলছি না—লঞ্চ চালিয়ে নিয়ে যাবার আর ফিরিয়ে আনার দায়িত্বটা তো ওর—কখন কি দরকার হয় ভেবেচিন্তে গোছগাছ করে নিয়ে তবে তো বেরুবে—একটু কিছু গণ্ডগোল হলে তুমি তো তখন ওর টুঁটি চেপে ধরবে।

—আলবত্ ধরব, গণ্ডগোল হলে লোকের টুঁটি চেপে ধরার আমার রাইট আছে! আসলে ওই সারেঙ হোম-সিক্ হয়ে পড়েছে বলে নানা অছিলায় দেরি করছে—বউ তো আর ওর মরেনি, আমার মরেছে। এত গোছগাছ করার কি আছে? মালটি মালটি মালটি মিলিয়নেয়ার কাকে বলে তুমি জানো না বলেই এ-কথা বলছ পিন্‌ডি—যার তেল আছে দুনিয়ায় তার সব আছে—বুঝলে? তেল থাকা মানেই সঙ্গে ডলারের বস্তা থাকা, আর পকেটে ইন্টারন্যাশনাল ব্যাঙ্কের চেক বই থাকা—এই দুটো জিনিস সঙ্গে থাকলে সমুদ্রের মাছ আর হাঙর কুমিরও নিজের গায়ে ছাল খুলে তোমার দরকারি জিনিসের যোগান দেবে-গোছগাছের নামে অত সময় নষ্ট করার দরকার কি?

কি মানুষের সঙ্গে ভেসে পড়তে চলেছে ভেবে পিন্‌ডিদার মন খারাপ হয়ে গেল। তেল যখন ছিল না তখন এই মানুষই কি ছিল। আর তেল হবার পর দুনিয়ার মানুষও বোধহয় তাকে তেল দিয়ে খুশি করতে পারবে না। কিন্তু সাহস করে যাবে না বলারও কি উপায় আছে পিন্‌ডিদার? ওর পকেটে সর্বদা রিভলভার মজুত থাকে। মেজাজ তিরিক্ষি হলে হয়তো গুলি করে মাথার খুলি উড়িয়ে দেবে—তারপর টাকার জোরে সকলের মুখ বন্ধ করে শেষে কাঁদতে কাঁদতে মিশরে টিশরে গিয়ে দেহটাকে মমি বানিয়ে এনে নিজের শোবার ঘরে সাজিয়ে রাখবে।

দুর্গা দুর্গা করে এক সকালে যাত্রা করা গেল। সর্বাধুনিক লঞ্চ গাল্‌ফ অফ মেক্সিকোর জলে ভেসে চলল। প্রথম তিন চারটে দিন বেশ আনন্দেই কাটল। জিন জেকব বউয়ের শোক ঝেড়ে ফেলেছে। নাচ গান খাওয়া-দাওয়া আনন্দ ফুর্তির মধ্যেই এক সময় পিন্‌ডিদাকে বলল, নতুন কোনো জায়গায় গিয়ে মনের মতো নতুন ধরনের কোনো ব্যবসা ফেঁদে ফেলতেও আপত্তি নেই। পুরনো কোনো কিছুই জিন জেকবের আর পছন্দ নয়।

এরপর সারেঙকে ডেকে হুকুম করল, নতুন পথে চলো, নতুন দিকে—আমি পুরনো দ্বীপ পুরনো পাহাড় পুরনো জল-জঙ্গল কিছুই দেখতে চাই না—তোমার কম্‌পাস বন্ধ করে দাও—যে-দিক চোখ টানে সেই দিকে চলো!

....দিন দশ বারোর মধ্যে লঞ্চ সত্যিই এমন অজানা পথে পাড়ি জমালো যার হদিস কেউ জানে না। দূরে দূরে জলের ওপর মাথা উঁচিয়ে আছে ছোট বড় পাহাড়। দূরে দূরে কখনো একটা দ্বীপ চোখে পড়ছে। সেই সব দ্বীপে জন-মানুষ জীব-জন্তুর চিহ্নও নেই। কিন্তু জিন জেকবের তবু ভেসে চলার তাড়া!

বে-গতিক দেখে সারেঙ চুপিচুপি পিন্‌ডিদার সঙ্গেই পরামর্শ করে। খাবারের স্টক কমে আসছে, এ ভাবে চললে বিপাকে পড়তে হবে। পিন্‌ডিদা বলল, তোমাদের সাহেবকে বুঝতে না দিয়ে ফেরার রাস্তা ধরো। কিন্তু সারেঙ ফেরার রাস্তারও ঠিক হদিস পাচ্ছে না—দু'দিন আগের ঝড়ে লঞ্চের কম্‌পাসটা বিগড়েছে বলে সন্দেহ হচ্ছে।

তবু মাথা খাটিয়ে এবার ফেরার চিন্তাই করা উচিত। পিন্‌ডিদাই জেকবকে বিপদের আভাস দিল। খাবার ফুরিয়ে গেলে সর্বনাশ—তেল ফুরিয়ে গেলেও সর্বনাশ। এমন একটি দ্বীপ দেখা যাচ্ছে না যেখানে খাবার বা তেল পাওয়া যেতে পারে।

জেকব খাপ্পা।—কি! আমি মালটি মালটি মালটি মিলিয়েনেয়ার অয়েল-মারচেন্ট—আমার খাবার ফুরোবে তেল ফুরোবে? ঠিক আছে, ফিরতে না কোনো লোকালয় পেতে কতদিন লাগবে?

সারেঙ মাথা চুলকে জবাব দিল, তিন দিন লাগতে পারে আবার তিন সপ্তাহও লাগতে পারে—লঞ্চ সমুদ্রের কোথায় ভাসছে এখন তারই তো হদিস মিলছে না— তাছাড়া অজানা জায়গায় লোকালয় কোথায় বা কতদূরে সে কী করে জানবে?

জেকবের থমথমে মুখ।—তিন সপ্তাহ সময় লাগলে খাবার বা তেল ফুরিয়ে যাবে না?

—ফুরোনোই সম্ভব সার.....

—তবে আর কি, আনন্দ করে হাত তুলে নাচো সকলে! ইডিয়েট কোথাকারের।....শোনো, তেল ফুরোলে চলবে না, মাঝে মাঝে লঞ্চ চালাবে আর মাঝে মাঝে মেশিন বন্ধ করে সকলে মিলে কাঠের পাটাতন টাটাতন দিয়ে নৌকোর মতো করে লঞ্চ চালাবে—সক্কলে হাত চালাবে, তুমি সুদ্ধু— কেবল আমি তখন স্টিয়ারিং ধরব, আর পিন্‌ডি আমার পাশে থাকবে। বুঝলে?

পুরনো লঞ্চ একটু আধটু চালাতে শিখেছিল জিন জেকব। তাইতেই তার ধারণা সে এই বিদ্যেয় বিশারদ একজন। হুকুম শুনে সারেঙ চোখে সর্ষেফুল দেখছে। মাথা নাড়ল, বুঝেছে।

কিন্তু মালিকের এটাই শেষ হুকুম নয়। পরের হুকুম আরো মারাত্মক।—শোনো, যতদিন না কোনো লোকালয়ে গিয়ে খাবার যোগাড় করা হচ্ছে, ততোদিন লঞ্চের খাবারের স্টক তোমরা ছোঁবেও না—এই খাবার শুধু আমার আর পিন্‌ডির জন্য রিজারভ থাকবে। শুধু লঞ্চের জল ছাড়া তোমরা আর কিছু পাবে না—সমুদ্রের লবণজল খাবার জল করে নেবার অটোমেটিক যন্ত্র আছে যখন লঞ্চে—জলের ভাবনা নেই—কিন্তু খাবারের স্টকে হাত দিলে আমি গুলি করে মারব। তোমরা জাল ফেলে সমুদ্রে মাছ ধরে খাবে।

সারেঙ আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা কাঁপতে শুরু করেছে। হাত জোড় করে তার জুনিয়র মেট্ জানালো, জাল তো সঙ্গে আনা হয়নি সার.....মাছ কি করে ধরা যাবে....?

—ওয়ার্থলেস ওয়ার্থলেস ওয়ার্থলেস! রাগে তিনখানা হয়ে ফেটে পড়ল জিন জেকব—একটা জাল পর্যন্ত সঙ্গে না নিয়ে আমাকে নিয়ে তোমরা সমুদ্রে ভেসেছ—সমুদ্রে আমার ফিশিংয়ের শখ হতে পারে এটা পর্যন্ত মাথায় আসেনি!

সারেঙ মাথা চুলকে বলল, আজ্ঞে হুইল বঁড়শি টড়শি আছে—জাল নেই।

—তবে তাই দিয়ে মাছ পেলে ধরে খাবে নইলে খাবে না—পিন্‌ডি! এখন থেকে তুমি খাবারের স্টকের চার্জে থাকবে—ও দিকে কেউ এগোলে তার মাথার খুলি উড়িয়ে দেবে।

ফেরার চেষ্টায় আরো দুটো দিন কাটলো। ফেরা হচ্ছে না, সকলে মিলে আরো অথৈ জলে পড়ছে কেউ জানে না। জেকবকে বুঝ দেবার জন্য মাঝে মাঝে লঞ্চ থামিয়ে সকলে মিলে হাত লাগিয়ে জল কেটে এগোতে চেষ্টা করে। আসলে একটু এগোয় না, স্রোতের টানে যেটুকু ভেসে চলে। বঁড়শি ফেলে মাছ ধরতে চেষ্টাও হয়। একটি মাছও ওঠেনি।

সকলের মনের যা অবস্থা, কে ঠাণ্ডা মাথায় বসে মাছ ধরতে পারে? জেকবের অগোচরে তাদের একে একে ডেকে পিন্‌ডিদা লঞ্চের স্টক থেকেই খাবার দেয়।

সেদিন বিকেলের পরে সারেঙ আর লঞ্চ নিয়ে এগোলো না। একটা ছোট পাহাড়ের ধারে মাটির নাগাল পেয়ে নোঙর ফেলল। জানালো, বাতাস দেখে মনে হচ্ছে সমুদ্রের অবস্থা ভালো নয়। অন্ধকার হয়ে গেলে চোরা পাহাড়ের লেগে লঞ্চের ক্ষতি হতে পারে।

ওদের মনে কি ছিল তা কেবল ওরাই জানে।

রাত্রি। জেকব দেদার মদ গিলে ঘুমোচ্ছে। আর মাথাটা নানা চিন্তায় ধরেছিল বলে পিন্‌ডিদাও কড়া ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোচ্ছিল। লঞ্চ হঠাৎ বিষম দুলতে লাগল আর ঠোক্কর খেতে লাগল। ঘুম ভেঙে পিন্‌ডিদা আর জেকব দু'জনেই উঠে বসল। কিন্তু বসেও থাকতে পারছে না, লঞ্চ এলোপাথাড়িভাবে দুলছে আর কিছুর সঙ্গে ধাক্কা খাচ্ছে। ভীষণ ঝড় উঠেছে। সমুদ্র অশান্ত উত্তাল। আসলে ধাক্কা নয়, বিরাট বিরাট ঢেউয়ের আঘাতে লঞ্চ ভেঙে পড়ার দাখিল। তখন প্রায় ভোরই হয়ে গেছে কিন্তু এই বিপর্যয়ে চারদিক অন্ধকার—মনে হয় গভীর রাত।

জেকব চিৎকার করে উঠল, সারেঙ উল্লুকের দল কি করছে—নোঙর তুলে নিচ্ছে না কেন—লঞ্চ যে এক্ষুণি চুরমার হয়ে যাবে।

পিন্‌ডিদা তাকে ছেড়ে কোনরকমে কেবিন থেকে বেরিয়ে এলো। কোথায় সারেঙ আর কোথায় তার সব লোক! লঞ্চ ফাঁকা, কেউ নেই। পিন্‌ডিদার তক্ষুনি সন্দেহ হল, লঞ্চ আঁকড়ে হুমড়ি খেয়ে দেখল পিছনে লাইফ বোটটা বাঁধা নেই আর লাইফ-বেল্ট বাঁধা রবারের বয়াগুলোও উধাও। অর্থাৎ ওগুলো নিয়ে লাইফ বোটে উঠে সারেঙ সদলে পালিয়েছে। হামাগুড়ি দিয়ে পিন্‌ডিদা খাবারের স্টকের খুপরিতে এলো। প্রায় সব খাবারই তুলে নিয়ে গেছে তারা—জলের ড্রাম দুটো পর্যন্ত।

আবার হামাগুড়ি দিয়ে এসে পিন্‌ডিদা জেকবকে খবরটা দিল। তাদের পাগলের মতো গালাগাল দিতে দিতে জেকব এন্‌জিনের দিকে এগলো। পিন্‌ডিদাকে বলে গেল আমি সিটি বাজালেই তুমি নোঙর তুলে নেবে—নইলে এক্ষুণি লঞ্চ আছড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে—নোঙর ছিঁড়ে পাহাড়ে গিয়ে লাগলে আর রক্ষা নেই।

তিন মিনিটের মধ্যে উত্তাল ঝড়ের সমুদ্রে নোঙর তোলা লঞ্চ খেলনার মতো ঢেউয়ের বাড়ি খেতে খেতে তীরের মতো কোন্ দিকে চলল কে জানে।

কিন্তু এ-ভাবে তিন চার ঘন্টা কাটল না। পিন্‌ডিদা পাশের কিছু আঁকড়ে ধরে বসে আছে। আর ডলারের থলে পিঠে শক্ত করে বেঁধে আর ইন্টারন্যাশনাল ব্যাঙ্কের চেক বইও তার মধ্যে ফেলে জেকব প্রাণপণে স্টিয়ারিং ধরে আছে। ঝড় আর ঢেউয়ের আছাড়ি-বিছাড়িতে দু'জনে ঠোক্কর

খাচ্ছে, ওলট-পালট খাচ্ছে। তারপরেই একটা বিরাট শব্দ, লঞ্চ কোনো পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে খান খান। একটা বড় পাথর দু'দিক থেকে আঁকড়ে ধরে জেকব আর পিন্‌ডিদার প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা।

একটু দম নেবার পর দু'জনে শরীরের শেষ শক্তি দিয়ে নিজেদের সেই পাহাড়ের ওপর টেনে তুলে পাথর আঁকড়ে পড়ে রইলো। তারপর দু'জনেই জ্ঞান হারালো।

জ্ঞান হতে পিন্‌ডিদা চোখ মেলে দেখল ঝড় আর ঢেউয়ের চিহ্নও নেই, সমুদ্র শান্ত। মাথার ওপর সূর্যের কড়া তাপ। অদূরে জেকব মাথা গোঁজ করে বসে আছে আর আপন মনে বিড়বিড় করে কি বকছে।

হামাগুড়ি দিয়ে পিন্‌ডিদা তার পাশে আসতে সে মাথা নেড়ে বলল, ভাগ্যিস বুদ্ধি করে ডলারের ওয়ালেট আর তার মধ্যে চেক বইটা ফেলে পিঠে শক্ত করে বেঁধে নিয়েছিলাম—এগুলো খোয়াতে হয়নি—নগদ কম করে এক লক্ষ ডলার সঙ্গে আছে....ঘাবড়ে যেও না।

শুনে পিন্‌ডিদার কি ইচ্ছে করল? ইচ্ছে করল একটা ধাক্কা মেরে জেকবকে পাহাড় থেকে জলে ফেলে দিতে। তেলের মানুষ এখনো ডলার দেখাচ্ছে—এ জীবনে তাকে তেল দেওয়ার আর কি দরকার হবে?

হাত নিশপিশ করলেও মেজাজ সামলালো। অদূরে কিছু দেখা যাচ্ছে।....শ পাঁচেক গজ দূরে বেশ বড়সড় একটা দ্বীপের মতো। সেই দ্বীপে গাছপালা আছে। .....অ্যাঁ! আর কি আছে? ওটা কি? ও-গুলো কি?

দুটো গোরু! চার পাঁচটা ছাগল! ওই তো কুকুরও কয়েকটা! পিন্‌ডিদা উঠে দাঁড়িয়ে পাগলের মতো চিৎকার করে উঠল, ইউরেকা! ওই দ্বীপে নিশ্চয় মানুষ থাকে নইলে ওগুলো ওখানে কেন!

জেকবও উঠে দাঁড়িয়ে দেখল। কিন্তু মানুষ বা ঘরবাড়ি তো দেখছি না।

—মানুষ নিশ্চয় আছে—ঘরবাড়িও আছে—ওই গাছপালার সারির ওধারে আছে বোধহয়!

তাই হবে। আরো কিছুক্ষণ বাদে দেখা গেল দশ বারোজন মানুষও এসে দ্বীপের ধারে দাঁড়ালো। পিন্‌ডিদা গায়ের জামাটা খুলে মাথার ওপর তুলে নাড়তে আর নাচতে লাগল আর চিৎকার করতে লাগল।

হ্যাঁ লোকগুলো দেখতে পেয়েছে তাদের। অবাক হয়ে দেখছে। পিন্‌ডিদা নেচেই চলেছে আর মাথার ওপর হাত তুলে জামা নেড়ে ইশারা করেই চলেছে।

লোকগুলো হাত তুলে তাদের কিছু আশ্বাসই দিল বোধহয়। কয়েকজন ছুটে চলে গেল। আধঘন্টার মধ্যে ধরাধরি করে তারা একটা ভেলা এনে জলে রাখল। চারজন লোক তাতে উঠে বসে ভেলা নিয়ে এদিকে আসতে লাগল।

.....হ্যাঁ পিন্‌ডিদার আবার মনে হল জীবন প্রিয়। এত সংকট এত বিপর্যয়ের পরেও এই প্রিয় জীবন হয়তো খাঁচাছাড়া হবে না।

পাহাড় থেকে নেমে এসে পিন্‌ডিদা আর জেকব ভেলায় উঠে বসল।

লোকগুলোকে দেখে খুব সাদাসিধে গোছের মনে হল। খুব সাধারণ বেশবাস। আর পাঁচটা সভ্যদেশের মানুষের মতোই কথাবার্তা। তারা জিগ্যেস করল, তোমরা কে? কোথা থেকে এলে? ওই পাহাড়ের ডগায় গিয়ে উঠলে কি করে?

জেকব নিজের পরিচয় দিল, আমার নাম জিন জেকব। আমি একজন বিখ্যাত তেলের কারবারী, আমার নিজের তেলের খনি আছে—আর ইনি আমার বন্ধু পিন্‌ডি, ফুটবল সুপারস্টার। আমরা মেক্সিকোর মানুষ, সমুদ্রে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, লঞ্চ-ডুবি হতে আমাদের এই হাল—তোমরা পৃথিবীর নামজাদা দু'জন মানুষকে উদ্ধার করেছ, এরপর নির্বিঘ্নে আমাদের দেশে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করে দিলে আমি তোমাদের বিশ হাজার ডলার পুরস্কার দেব।

ভেলা দ্বীপের দিকে চলেছে। লোকগুলো ফ্যালফ্যাল করে জেকবের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। তাদের মধ্যে বয়স্ক লোকটি জিগ্যেস করল, ডলার কি?....পুরস্কার তো কেবল ঈশ্বর দিতে পারে, তোমরা তো দেখছি আমাদের মতো মানুষ, তোমরা পুরস্কার দেবে কি করে?

এ-কথা শুনে জিন জেকব হাঁ। ডলার কি জানে না, পুরস্কার কি করে দেবে জানে না, তেল কি জিনিস তা-ও জানে কিনা সন্দেহ—এরা আবার কি রকম মানুষ!

পিন্‌ডিদা লোকগুলোকে খুব ভালো করে নিরীক্ষণ করছিল। সেই বয়স্ক লোকটিকে জিগ্যেস করল, এটা কোন দ্বীপ?

সে জবাব দিল, এটা জ্ঞানী পুরুষের দ্বীপ।

—জ্ঞানী পুরুষ! তিনি কে?

—আমাদের দ্বীপের রাজা।....জ্ঞানী পুরুষ জানো না, তোমরা কেমন লোক.....তোমাদের দেশে জ্ঞানী পুরুষই নেই?

জেকব ফড়ফড় করে বলে উঠল, এন্তার আছে—আমরা সকলেই জ্ঞানী পুরুষ।

শুনে লোক ক'জন যেন ধড়ফড় করে উঠল। বড় বড় চোখ করে দু'জনকে দেখতে লাগল।

জেকব বলল, তোমরা ডলার চেনো না, খাও কি করে?

সেই লোক জবাব দিল, আমরা তো খাবার জিনিস তৈরি করে বা রান্না করে হাত দিয়ে খাই—তোমরা ডলার দিয়ে খাও....সে কেমন দেখতে?

জেকবের মেজাজ চড়ল, ডলারের দেমাকে যে ফুলে ফেঁপে বেলুন হয়ে আছে—কেউ সেই ডলার চেনে না শুনলে কেমন লাগে? পিঠে বাঁধা ওয়ালেট থেকে ডলার বার করে দেখাতে পারে, কিন্তু দেখিয়ে লাভ কি! খিটখিটে সুরে জিগ্যেস করল, তেল চেনো, না তা-ও চেনো না?

জেকবের মেজাজ দেখে লোকগুলো ভড়কে যাচ্ছে। সেই বয়স্ক লোকই বলল, আমরা বীজ পিষে রান্নার তেল প্রদীপের তেল বার করি—সেই তেলের কথা বলছ?

রাগে আর হতাশায় জিন জেকব সমুদ্রের দিকে ঘুরে বসল। যে মানুষেরা ডলার চেনে না তাদের কাছে কি কদর হবে?

পিন্‌ডিদা জিগ্যেস করল, তোমাদের দ্বীপে কেনা-বেচা নেই?

—কেনা-বেচা! সে কি মরা-বাঁচার মতো কিছু? মরা-বাঁচা আছে....কিন্তু সে তো ঈশ্বরের হাতে, আর কিছুটা আমাদের রাজা জ্ঞানী পুরুষের হাতে। ঘোর পাপীকে তিনি মৃত্যুদণ্ড দিতে পারেন, আবার অল্প অল্প দোষ করলে বাঁচিয়ে রেখে দোষ মুক্ত হবার সুযোগও দিতে পারেন।.....কিন্তু মৃত্যুদণ্ড আমাদের জ্ঞানী পুরুষ বলতে গেলে দেনই না—কারণ তাঁর দ্বীপে সে রকম পাপী কেউ নেই, বেশি দোষ করলে দুই একজনকে নির্বাসন দিয়ে আমরা অন্য জগতে পাঠিয়ে দিতে দেখেছি—জ্ঞানী পুরুষ মন্দ লোক বা লোভী লোককে পছন্দ করেন না—তারা থাকলে দ্বীপের মানুষ খারাপ হয়ে যায়—তাই তিনি ভিন্ন জগৎ থেকে জাহাজ-পুরী ডাকিয়ে এনে তাতে উঠিয়ে দিয়ে তাকে দ্বীপ-ছাড়া করান। কারো চরিত্র-দোষ দেখলে জ্ঞানী পুরুষ সব থেকে রোগে যান।

পিন্‌ডিদা এবারে খুব উৎসুক।—ভিন্ন জগৎ থেকে তোমাদের জ্ঞানী পুরুষ জাহাজ-পুরী ডাকিয়ে আনান.....সেই জাহাজ-পুরী সমুদ্রের জলে ভেসে আসে?

—তাই তো আসে। আমাদের দ্বীপে হয় না বা পাওয়া যায় না এমন কত কি তো অনেক সময়েই দরকার হয়, বেশি অসুখ-বিসুখ লেগে গেলে এখানে তৈরি হয় না এমন ওষুধও দরকার হয়—সাধারণত সে-রকম দরকারের সময়েই জ্ঞানী পুরুষ জাহাজ-পুরী তলব করেন, তার তখনই অপছন্দের লোককে তিনি সেই জাহাজ-পুরীতে তুলে অন্য জগতে পাঠিয়ে দেন।

পিন্‌ডিদা সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের জ্ঞানী পুরুষ জাহাজ-পুরী কি করে তলব করেন?

—জ্ঞানী পুরুষের যন্ত্রপাতি আছে, সেটা নাড়া-চাড়া করেই তিনি খবর পাঠাতে পারেন—তার কয়েকদিনের মধ্যেই জাহাজপুরী জলে ভেসে চলে আসে।

জিন জেকবও ভুরু কুঁচকে বেশ মন দিয়ে শুনছে।

—তা মেয়ে পুরুষ বুড়ো বুড়ী বাচ্চা কাচ্চা মিলিয়ে হাজার দশেক হবে।

—এই জ্ঞানী পুরুষ কত কাল ধরে তোমাদের রাজা হয়ে আছেন।

—ইনি চল্লিশ বছর ধরে আমাদের রাজা হয়ে আছেন। এঁর আগে এঁর বাবা জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন। এঁকেও ঈশ্বর ডেকে নিলে এঁর বড় ছেলে জ্ঞানী পুরুষ হবেন।

একটু ভেবে পিন্‌ডিদা জিগ্যেস করল,—তা আমরা তো এখন তোমাদের আশ্রিত—আমাদের দ্বীপে নিয়ে গিয়ে তোমরা কি করবে?

—তোমরা আমাদের আশ্রিত হতে যাবে কি জন্যে, আমরাই তো জ্ঞানী পুরুষের আশ্রিত....আমরা তোমাদের তো জ্ঞানী পুরুষের কাছে নিয়ে যাব, তোমরা কেমন লোক তোমাদের মুখ দেখলেই তিনি বুঝতে পারবেন। তাঁর বিচার আর তাঁর বিবেচনা, আমরা আশ্রয় দেবার কেউ না।

পিন্‌ডিদা আর জিন জেকব ভেলা থেকে নেমে দ্বীপে উঠতে অনেক লোক তাদের ঘিরে ধরল। এই মানুষগুলোও বেশ সোজা-সরল মনে হল পিন্‌ডিদার। অথচ বন্দীর মতোই তারা তাদের চারদিক থেকে ঘিরে সঙ্গে সঙ্গে আসতে ইশারা করল।

চলতে চলতে খাটো গলায় জিন জেকব বলল, ওদের এই জ্ঞানী পুরুষ মহা ঝানু লোক বুঝতে পারছ?.....দশ হাজার লোককে বোকা বানিয়ে তাদের রাজা হয়ে বসে আছে, অয়্যারলেসে তার সঙ্গে নিশ্চয় কোনো মেন-ল্যান্ডের যোগাযোগ আছে, খবর দিয়ে সেখান থেকে দরকার মতো জাহাজ আনায়— বুঝলে?

পিন্‌ডিদা জবাব দিল, আমি সবই বুঝেছি, তুমি কেবল তার কাছে গিয়ে তোমার তেলের মেজাজ দেখিও না—আর ডলার দেখিও না—আশ্রয় পেতে চাও তো তাকে বরং বুদ্ধি বুদ্ধিমানের মতো একটু তেল দিতে চেষ্টা কোরো।

খুব চিন্তিত মুখে জেকব বলল, তেলে ভেসে ডলারের পাহাড়ে উঠে বসে তেল দেওয়া যে প্রায় ভুলেই গেছি পিন্‌ডি ভাই—বেমক্কা যদি মুখ দিয়ে কিছু বেরিয়ে যায়?

—তাহলে মরবে। তার থেকে মুখ সেলাই করে থাকো—আমি কি করি দেখো।

তারা যত এগোচ্ছে, সামনে পিছনে লোক ততো ভেঙে পড়ছে। সকলেরই দেখার আর জানার কৌতূহল কোন জগৎ থেকে কারা এখানে এলো। দ্বীপে একটিও পাকা ঘর-বাড়ি চোখে পড়ল না পিন্‌ডিদার। সবই বাঁশ হোগলা আর খড়ের ঘর। একটিও যানবাহন চোখে পড়ল না। দূরে দূরে লাঙল গোরু দিয়ে জমি চষছে কেউ কেউ। দু'দিকে গাছপালা ফুলে ফলে ভরে আছে।

জ্ঞানী পুরুষ রাজার বাড়িও অন্য রকম কিছু নয়। একই ধরনের একটু বড়সড় ছাপরা ঘর। লোকটা বাইরেই একটা উঁচু ঢিবিতে বসে আছে। পিন্‌ডিদার মনে হল বছর পঁয়ষট্টি বয়েস হবে। বেশ সৌম্য প্রসন্ন মূর্তি। বুক পর্যন্ত পাকা দাড়ির বোঝা। চোখের চাউনি উজ্জ্বল। তারও অতি সাধারণ বেশবাস। পরদেশী দু'জনকে নিয়ে এসে দ্বীপবাসীরা মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে তাকে অভিবাদন জানালো। দেখা-দেখি পিন্‌ডিদা ও জেকবও তাই করল। উঠে জেকব আশ্বস্ত সুরে কানে কানে বলল, লোকটা দেখতে তো দুশমনের মতো নয় পিন্‌ডি—ভিতরে কেমন কে জানে।

জবাবে সকলের অলক্ষ্যে পিন্‌ডিদা তাকে একটা কনুইয়ের গুঁতো মারল। রাগে চাপা গলায় জেকব গজগজ করে উঠল, এখানে তেলের দাম নেই বলেই তোমার এত সাহস।

তেমনি চাপা-গলায় পিন্‌ডিদা বলল, এখানে কেবল তেল দেওয়ার দাম আছে—সেটা তোমার আমার জীবনের দাম মনে রেখো।

এদিকে ভেলার সেই ক'জন লোক আগে রাজার কাছে গিয়ে পরদেশীদের সম্পর্কে বিবরণ পেশ করছে বোধহয়। জ্ঞানী পুরুষ রাজা মন দিয়ে শুনছে। না রাজার কোন বডিগার্ড বা প্রহরী-টহরী নেই তবু লোকজন কাছে গিয়ে ভিড় করছে না, শ্রদ্ধা সহকারে দূরে দাঁড়িয়ে রাজার বিচার-বিবেচনা বোঝার অপেক্ষায় আছে।

প্রাথমিক খবর শোনার পর রাজার সামনে পিন্‌ডিদা আর জেকবের ডাক পড়ল।

তারা রাজার সামনে এসে সবিনয়ে দাঁড়ালো। রাজা হাতের ইশারায় সকলকে আরো দূরে সরে যেতে বলল। সঙ্গে সঙ্গে সকলে হুকুম পালন করে পঁচিশ-তিরিশ গজ দূরে সরে গেল। তারা বুঝে নিল পরদেশীদের সঙ্গে রাজার কথাবার্তা তাদের শোনার জন্য নয়।

দু'জনকে ভালো করে একটু দেখে নিয়ে জ্ঞানী পুরুষ রাজা হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালো—ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম, দ্বীপবাসীদের হয়ে আমি রাজা জ্ঞানী পুরুষ তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি—বোস।

পিন্‌ডিদা আনত হয়ে ধন্যবাদ জানালো। দেখাদেখি জেকবও কোথায় বসবে সে ভেবে না পেয়ে এদিক-ওদিক তাকালো। পিন্‌ডিদা ধুপ করে মাটিতে বসে পড়তে সে-ও তাড়াতাড়ি বসে বাঁচল।

হাসি হাসি মুখে রাজা জেকবের দিকে তাকালো। তোমাদের মধ্যে ভেলায় আমার লোকদের তেল আর ডলার দেখাচ্ছিল কে—তুমি বোধহয়?

চুপসে গিয়ে জেকব মিনমিন করে বলল, বেগ্ টু বি এক্সকিউজড্ মি লর্ড—এখানকার রীতি তো আমার জানা ছিল না.....

—এখানে মি লর্ড কেউ নয়, উই আর অল্ ফ্রেন্ডস হিয়ার। হাসি মুখে পিন্‌ডিদার দিকে তাকালো।—তুমি খেলোয়াড় হয়ে এই তেলঅলার সঙ্গে ভিড়লে কি করে—তেলের কারবারীকে তেল দেওয়ার জন্য?.....তা শোনো বন্ধুরা, এখানকার সহজ-সরল মানুষেরা তেল বা ডলার চেনে না। তেল দেওয়া-নেওয়ার কারবারও বোঝে না। আমার এখানে নিজের কাজ-নিজে-করো সিস্টেম, প্রত্যেকের কাজের ফল আর প্রোডাকশন আমার আড়তে মজুত হয়—তারপর সব জিনিসই যার যেমন দরকার তেমনি বিলি করা হয়। ছেলে-মেয়েদের যারা লেখাপড়া শেখায় গাছ-গাছড়া শেকড়-বাকড় নিয়ে গবেষণা করে আর চিকিৎসা করে—তাদের কেবল অন্য কোনো প্রোডাকশনের কাজ করতে হয় না। এছাড়া মেয়ে-পুরুষ সকলকে যার যার যোগ্যতা আর সাধ্য অনুযায়ী কাজ করতে হয়।.....তোমরা আপাতত এই দ্বীপের অতিথি, পরে যদি এখানে থাকার ছাড়পত্র পাও তখন কাজ নিয়ে ভাবা যাবে—এখন তোমরা খাবে দাবে আর অতিথির মতো সব দেখেশুনে বেড়াবে।.....কিন্তু একটা কথা, তোমাদের মেনল্যান্ডের জ্ঞান-বুদ্ধি এই এক্সপেরিমেন্টাল আইল্যান্ডের সরল মেয়ে-পুরুষদের মগজে ঢোকাতে চেষ্টা করবে না—সেটা করলে অপরাধ হবে জেনে রেখো।.....আরো একটা কথা খুব ভালো করে মনে রেখো, অতিথি হিসেবে এই দ্বীপের তোমরা সর্বত্র বেড়াতে পারো, কেবল ওই পুব-দক্ষিণ কোণে প্রথম যে পাহাড় আছে—সেটা ছাড়িয়ে তার ও-দিকে কখনো যাবে না—এই হুকুম অমান্য করলে আরো বেশি অপরাধ হবে। এই দুটি নির্দেশ সর্বদা মনে রেখো। এই দ্বীপের মানুষেরা সকলে ঈশ্বরবিশ্বাসে এই বিশ্বাসে আঁচড় পাড়ার মতো কোনো কাজ তোমরা করবে না।

জোড়-হাত করে পিন্‌ডিদা বলল, জো হুকুম ধর্মাবতার.....কিন্তু আমাদের দেশে ফেরার ব্যবস্থা কি হবে, কবে পর্যন্ত হবে মহামান্য জ্ঞানী পুরুষ?

হাসতে লাগল। জবাব দিল, ঈশ্বর জানেন, তাঁর দয়া হলে ব্যবস্থা হবে, না হলে এই দ্বীপেই থেকে যেতে হবে।....এখান থেকে ওখানে যাবার কথা ভেবে কি লাভ, একদিন না একদিন অনেক

দূরেই তো সক্কলকে যেতে হবে—তার থেকে উচিত মতো বিবেক মতো সেই ভীষণতম দিনের জন্য এখান থেকেই মনে মনে প্রস্তুত হও—প্রস্তুত হতে পারলে দেখবে সেই ভীষণতম দিনেও তোমার মনে মহা-শান্তি! এখানকার মানুষেরা সব করে আর সেই ভীষণতম দিনের জন্যও প্রস্তুত থাকে বলে যাবার সময় মহাশান্তিতেও চলে যায়।

জিন জেকব বলল, ভীষণতম দিন ভালো মানুষের জীবনে আসতে যাবে কেন....আর সেটা কি-রকম দিন না জানলে প্রস্তুত হবই বা কি করে?

মুচকি হেসে জ্ঞানী পুরুষ জবাব দিল, প্রস্তুতির প্রথম পাঠ হিসাবে তোমাকে তেলের ভাবনা আর ডলারের ভাবনা ছাড়তে হবে। তারপর পিন্‌ডিদাকে বলল, তোমাকেও তেল দেওয়ার বিদ্যে ভুলতে হবে।

পিন্‌ডিদা ভাবতে চেষ্টা করে নতুন দ্বীপের নয়া মানুষদের আদরে যত্নে সে বহাল তবিয়তেই আছে। আরো শান্তি, তেলে হাবুডুবু জিন জেকবের মুখ চেয়ে বা মন বুঝে চলার দিন গেছে। হ্যাঁ, জেকব মনে মনে এখানে তার তেলের খনিতেই সাঁতার কেটে চলেছে। তার এক চিন্তা করে দেশে ফিরে তেলের স্রোতে সাঁতার কেটে আবার ডলারের কাঞ্চনজঙ্ঘায় উঠে বসবে। তার সবেতে খুঁতখুঁতুনি। এই খেয়ে কেউ বাঁচতে পারে? মাটিতে শুয়ে কেউ ঘুমুতে পারে? এমন ধাপসা মোটা বেশ-বাসে গায়ের ছাল উঠে যায় না? আর এমন নির্বোধ মানুষদের সঙ্গেই বা কতদিন কাটানো যায়? সে দিন-রাত পিন্‌ডিদাকে উত্তেজিত করতে চেষ্টা করে, পালাবার ফিকির বার করো—তেলের মর্ম জানে না বোঝে না—এটা কি একটা ভদ্রলোকের বাসের জায়গা?

বেড়াতে বেড়াতে জেকব আর পিন্‌ডিদা একদিন দ্বীপের পুব-দক্ষিণ কোণের দিকে চলেছে। যত এগোচ্ছে ততো নির্জন। শেষে একসময় জন-মানব ছেড়ে পশু-পাখিও নেই। তারপর সামনে একটা পাহাড়! পিন্‌ডিদা থমকে দাঁড়িয়ে গেল। বলল, আর এক পা-ও এগিও না—জ্ঞানী পুরুষ নিষেধ করে দিয়েছিল মনে নেই, এই পুব-দক্ষিণের পাহাড় ছাড়িয়ে এক পা-ও ও-দিকে যাওয়া চলবে না!

জেকব থমকে দাঁড়ালো। নিষেধ মনে পড়েছে। কিন্তু এ ক'দিন দ্বীপের রাজাকে দেখে তার ভয়-ডর কমে গেছে। যা পোশাক-আশাক আর যে-ভাবে থাকে, সকলের সঙ্গে মেলা-মেশা করে রাজা—শুনলে হাসি পায়। এখন আবার জেকবের তেলের মেজাজ। বলল, নিষেধ করল তো বয়েই গেল, চলো গিয়ে দেখা যাক ও-ওদিকটায় কি আছে।

ভিতরে ভিতরে কৌতূহল একটু পিন্‌ডিদারও আছে। কিন্তু নিষেধ অমান্য করতেও মন সরে না। এই রাজাটিকে তার অত্যন্ত ভালো লেগেছে। বলল, থাক বারণ যখন করেছে গিয়ে কাজ নেই—আপদে বিপদে পড়ব কি-না কে জানে।

কিন্তু তক্ষুণি একটা অদ্ভুত চিন্তা মাথায় এলো জেকবের। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ উত্তেজিত। বলে উঠল, এই পিন্‌ডি—এমনও তো হতে পারে ও দিকটায় তেলের খনি-টনি কিছু আছে, তাই ও-দিকটায় সক্কলের যাওয়া নিষেধ!....লোকটা এখান থেকে অয়্যারলেসে খবর পাঠালে মেন-ল্যান্ড থেকে এখানে জাহাজ আসে টাকার জোর ছাড়া এটা আর কোন জোর হতে পারে? নিশ্চয় জাহাজে এখান থেকে ক্রুড অয়েল পাঠিয়ে কাঁড়ি কাঁড়ি ডলার রোজগার করে এখানে ভালো মানুষ দ্বীপের রাজা হয়ে বসে আছে—উঃ! ব্যাটা কি ধাপ্পাবাজ, আমি যাবই ও-দিকে—কি আছে দেখবই।

উত্তেজনায় বড় বড় পা ফেলে জিন জেকব এগিয়ে চলল। অগত্যা পিন্‌ডিদাও তাকে অনুসরণ করল।

খানিক এসে দু'জনেরই পা থেমে গেল। সামনে একটা গির্জা। আগাগোড়া সুন্দর পাথরের তৈরি। কি অপূর্ব তার ভাস্কর্য! মার্বেলের মেঝে। অদূরে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্তি। কিন্তু সব কিছুর

ওপর পুরু ধুলোর আস্তরণ। কোথাও একটা বাইবেল পর্যন্ত নেই। ঘন্টাগুলো বিবর্ণ। এক সুন্দর গির্জা কিন্তু দেখলেই বোঝা যায় বহুকাল এখানে মানুষের পা পড়েনি বা কোনরকম উপাসনা হয়নি।

ব্যাপারখানা কি না বুঝে দু'জনে আবার এগলো। সামনেই একটা ছোট পাহাড়, কিন্তু পাহাড়ে এ আবার কি ভৌতিক কাণ্ড হয়ে চলেছে! অদূরে দাঁড়িয়ে দুজনে হাঁ করে দেখতে লাগল। পাহাড়ের নিচে থেকে প্রায় এক মণ ওজনের একটা গোল পাথর আপনিই গড়গড় করে প্রায় চূড়ায় উঠে যাচ্ছে, কিন্তু সেখান থেকে আপনিই আবার গড়গড় করে গড়িয়ে নিচে নেমে আসছে। নামছে উঠছে, উঠছে নামছে—কেবল এই করে যাচ্ছে।

পিন্‌ডিদা বলল, দেখো জেকব, ভালো মনে হচ্ছে না, চলো কেটে পড়ি। এ এক ভুতুড়ে জায়গা কিনা বুঝতে পারছি না।

জেকব বলল, এসেছি যখন দেখেই যাই—আরো এগিয়ে হয়তো দেখব খনি থেকে তেল বেরিয়ে আপনিই পিপেতে ভরাট হয়ে চালান হয়ে যাচ্ছে।

আরো কিছুটা এগোতে চোখ জুড়ানো দৃশ্য। অপূর্ব সুন্দর একটা মস্ত পাখি। যেন আলগা সোনা গুলে গুলে তার দেহ আর বিশাল পাখা তৈরি হয়েছে। দুটো চোখ যেন দুটো হীরে বসানো। মুগ্ধ হবার মতোই পাখির রূপ। সেটার শরীরে সর্বত্র আর দুই ডানায় বাইবেলের গীতার কোরাণের আর বুদ্ধের চমৎকার চমৎকার বাণী বড় বড় হরফে লেখা। স্পষ্ট পড়া যায়। পড়লে মন ভরেও যায়। কিন্তু এমন সুন্দর পবিত্র পাখিটা এ কি কাণ্ড করছে! যত সব নোঙরা ময়লা ক্লেদাক্ত আবর্জনা তুলে তুলে খাচ্ছে। দেখলে গা ঘিন-ঘিন করে, বমি পায় এমন সব জিনিস খাচ্ছে!

দু'জনে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলল। বাঃ এবারেও ভারি মনোরম দৃশ্য। চমৎকার সুন্দর একটা বাগান। তাতে হাজার রকমের ফুল ফুটে আছে। কিন্তু সব ফুলই উঁচু ডালে। একটা ছোট্ট ফুটফুটে ছেলে সেখানে ঘুরছে আর ফুল পাড়তে চেষ্টা করছে। কিন্তু একটা ফুলও সে পাচ্ছে না। সব গাছের সমস্ত ফুলই তার নাগালের বাইরে। অনেকক্ষণ ধরে ফুল পেতে চেষ্টা করছে বোঝা যায়, ক্লান্ত ঘর্মাক্ত মুখ। পিন্‌ডিদা আর জেকবকে মায়া দেখে করুণ নেত্রে তাদের দিকে তাকালো। পিন্‌ডিদার ভারি মায়া হল। এগিয়ে এসে বলল, আমার কাঁধে উঠে কিছু ফুল পেড়ে নাও।

ছেলেটা পিন্‌ডিদার কাঁধে উঠে ফুল পাড়তে লাগল। কিন্তু পাড়ছে তো পাড়ছেই, কাঁধ থেকে আর নামার নাম নেই। পিন্‌ডিদা নামাতে চেষ্টা করলে সে দু'পায়ে কাঁধ-গলা এমন আঁকড়ে ধরছে যে দম বন্ধ। পিন্‌ডিদার জিভ বেরিয়ে পড়ার দাখিল, চোখে অন্ধকার দেখছে। কিন্তু মাটিতে বসে পড়তে গেলেও ছেলেটা দু'পায়ে সাঁড়াশির মতো এমন গলা চেপে ধরছে যে আবার তাকে নিয়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে। জেকব তাকে কাঁধ থেকে নামাতে চেষ্টা করতে সেই ছোট্ট ছেলে এমন পা ছুঁড়ল যে সে মাটিতে গড়াগড়ি। পিন্‌ডিদার প্রাণ যায় যায়।

....তারপরেই দেখা গেল সব ভ্যানিশ। বাচ্চা ছেলে-টেলে কেউ নেই। পিন্‌ডিদা মাটিতে বসে জিভ বার করে ধুঁকছে।

এবারে জেকবও ঘাবড়েছে। বলল, চলো চলো, আর এক মুহূর্তও এখানে নয়—এ নিশ্চয় কোনো মায়াবীর এলাকা।

দু'জনে পা চালিয়ে ফিরে চলল।

যেখান থেকে আর এগোনো নিষেধ ছিল ঠিক সেখানে একদল জোয়ান লোক দাঁড়িয়ে। এই দ্বীপেরই লোক সব, কিন্তু তাদের মুখভাব কঠিন মনে হল। পিন্‌ডিদা আর জেকব আসতেই তিনজন করে জোয়ান লোক তাদের জাপটে ধরল, একজন লোক চোখের পলকে দু'জনকেই শক্তপোক্ত দড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল।

জেকব বলে উঠল, এ কি রকম ভদ্রতা তোমাদের—আমরা দ্বীপের অতিথি, আমাদের এ-ভাবে বেঁধে নিয়ে যাবার মানে কি?

একজন ব্যঙ্গ করে বলল, অতিথির মর্যাদা খুব রেখেছ তোমরা—নিষেধ সত্ত্বেও তোমরা নিষিদ্ধ এলাকায় গেছ—রাজার কাছে চলো, মানেটা এরপর খুব ভালো করে বুঝবে।

তারা তাদের সোজা জ্ঞানী পুরুষ রাজার কাছে নিয়ে এলো। বিচার দেখার জন্য সেখানে এরই মধ্যে অনেক মেয়ে-পুরুষ এসে জমেছে। জ্ঞানী পুরুষ রাজার তেমনি সৌম্য মূর্তি মুখ দেখলে বিশ্বাসই করতে ইচ্ছে করে না, এই মূর্তির রাজা তাদের কোনো কঠিন শাস্তি দিতে পারে।

রাজা হুকুম করল, হাতের বাঁধন খুলে দাও, শাস্তি যখন পাবেই কষ্ট বাড়িয়ে লাভ কি.....।

বাঁধন খুলে দেওয়া হল। ফলে পিন্‌ডিদা আর জেকবের ধারণা, শাস্তি হলেও লঘু শাস্তি হবে।

রাজা জিগ্যেস করল, নিষেধ সত্ত্বেও তোমরা অমান্য করলে কেন? ও-দিকে গেলে কেন?

জেকব মিনমিন করে বলল, খুব অন্যায় হয়েছে, রাজা, আমি ভেবে ছিলাম, ও-দিকে তেলের খনি আছে, তাই তুমি যেতে নিষেধ করেছ।

—ওঃ.....। জ্ঞানী পুরুষ পিন্‌ডিদার দিকে তাকালো।—আর তুমি গেছলে কেন, তেলের কারবারীকে তেল দেবার জন্য?

পিন্‌ডিদার মাথা নিচু। প্রায় স্বীকার করেই নিল।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রাজা বলল, এই নিষেধ অমান্য করলে তার শাস্তি মৃত্যু। আজ পর্যন্ত দ্বীপের কেউ এই নিষেধ অমান্য করেনি—তোমরাই প্রথম করলে। তোমাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। আজ থেকে তিন দিন বাদে তোমাদের মরতে হবে। আমার তিন জন করে জোয়ান লোক পাথর দিয়ে মেরে তোমাদের হত্যা করবে—তোমাদের বেশি কষ্ট দেব না—কয়েক ঘায়ে শেষ করে দিতে পারে এমন লোকই দেব।

দু'জনেরই অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। কোমল মুখ থেকে এমন নির্মম দণ্ড ঘোষণা কানে শুনলেও যে বিশ্বাস হয় না।

কাঁপতে কাঁপতে জেকব বলে উঠল, রাজা জ্ঞানী পুরুষ, আমরা তোমাদের নির্বোধ অতিথি, একটি বার আমাদের মার্জনা করে দাও!

জ্ঞানী পুরুষ উঠে দাঁড়ালো। সদয় গলায় জবাব দিল, মার্জনা করার মালিক আমি নয়, আমি ঈশ্বরের নির্দেশ পালন করছি—তিনি যদি তোমাদের মার্জনা করেন তাহলে আমার মারফত সেই নির্দেশও পাবে—কিন্তু দুঃখের বিষয় সে-আশা কম বন্ধুগণ....দেখো মাঝে তিন দিন সময় আছে—তোমাদের ভাগ্য।

বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে রাজা উঠে চলে গেল।

মৃত্যুদণ্ডের আসামী হলেও পিন্‌ডিদা আর জেকব তাদের ঘরেই বাস করছে। ইচ্ছেমতো ঘোরা-ফেরার স্বাধীনতাও আছে। প্রহরী মোতায়েন এমনও নয়। কারণ দ্বীপ থেকে তারা পালাবে কোথায়? তবু পিন্‌ডিদার ধারণা, দ্বীপের মানুষ কেউ না কেউ দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা তাদের দিকে চোখ রেখেছে।

না, ঘর থেকে বেরুবার মতো মানসিক শক্তিও আর পিন্‌ডিদা আর জেকবের নেই। দু'দিনের মধ্যে জেকবের মাথার সমস্ত চুলই তো সাদা হয়ে গেল পাগলের মতো অবস্থা তার।

তৃতীয় রাত। এই রাত পোহালেই দু'জনের মৃত্যুদণ্ড। জোয়ানেরা পাথর দিয়ে তাদের মাথা ছাতু করবে। জেকব চিৎকার করে বলছে, এমন বর্বর দেশ আর আছে! অন্যভাবে মানুষ মারতে পর্যন্ত জানে না এরা! যে-দেশে তেল নেই, ডলার নেই, সে কি মানুষের দেশ!

দরজা খুলে গেল। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে দ্বীপের রাজা জ্ঞানী পুরুষ।

জেকব আর্তনাদ করে উঠল, রাজা তুমি এসেছ—আমরা কি তাহলে ক্ষমা পেলাম? বলো—বলো?

রাজা জবাব দিল, কি করে বলব, এ-দেশে যে তেল দিয়ে বা ডলার দিয়ে মার্জনা মেলে না ভাই। মার্জনা যিনি করেন, তোমরা তো তাঁরও শরণ নিয়েছ বলে মনে হয় না.....সেই কবে শেষের ভীষণতম দিনের জন্য তোমাদের আমি প্রস্তুত হতে পরামর্শ দিয়েছিলাম?

জেকব উন্মাদের মতো বলে উঠল, এই ভীষণতম দিনের জন্য কে প্রস্তুত হতে পারে?

রাজা ঠাণ্ডা গম্ভীর গলায় জবাব দিল, এই ভীষণতম দিন একভাবে না একভাবে সকলেরই আসে—এখানকার সকলেই ঈশ্বরকে ডেকে ডেকে এই দিনের জন্য প্রস্তুত হয়—এই দিন যখন আসে তখন আর কারো একে ভীষণতম দিন বলে মনে হয় না—আশীর্বাদ মনে হয়। কিন্তু তোমরা অপরাধ করেও তিন দিনের মধ্যে তাঁকে শরণ করতে পারলে না? কি আর বলব.....

.....কিন্তু পিন্‌ডিদার তবু কেন মনে হচ্ছে, চরম দণ্ড বহাল আছে শোনবার জন্যেই এখানে আসেনি। এর মুখের দিকে চেয়ে গোড়া থেকেই পিন্‌ডিদা কেন এই চরম দণ্ডে বিশ্বাস করতে পারছে না? অথচ ভয়ে শিরদাঁড়া বেঁকে আছে এ-ও ঠিক।

হঠাৎ কি মনে হতে জিগ্যেস করল, নিষিদ্ধ এলাকায় যাবার ফলে আমাদের এই শাস্তি তা তো বুঝলাম—কিন্তু যা দেখলাম সে সবের মানে কি?

—কি দেখলে বলো?

—প্রথমেই ওই চমৎকার গির্জা.....

জ্ঞানী পুরুষ বলল, ওই গির্জা হল ভবিষ্যতের ধর্মস্থানের চেহারা— জাঁকজমকের গির্জা আছে কিন্তু কোনো রকমের উপাসনা নেই।

—দ্বিতীয়, পাহাড়ে মস্ত পাথর, আপনা থেকে গড়িয়ে প্রায় শেষ পর্যন্ত উঠেছে, তারপর পড়ে যাচ্ছে—উঠছে আর পড়ছে....

—ওটা ভবিষ্যতের ভালো মানুষদের ভাগ্য। চেষ্টা-চরিত্র করে তারা উঠবেই আবার ধাক্কা খেয়ে পড়তেও হবে—তাদের ওপরে উঠে স্থির হয়ে থাকাটা কেউ বরদাস্ত করবে না—ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দেবেই।

—তৃতীয়, অমন সুন্দর পাখি, সমস্ত গায়ে ধর্মের কি সুন্দর বাণী লেখা—কিন্তু কি ঘেন্নার নোঙরা জিনিস সব খাচ্ছে।

—ওই পাখি ভবিষ্যতের ধর্মগুরুদের চেহারা। বাইরে সর্বদা পবিত্র নামাবলীতে সর্বাঙ্গ মুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—ধর্মের বাণী শোনাচ্ছে—কিন্তু ভিতরে নিজেরা অমনি নোঙরা।

—আর শেষের ওই সুন্দর বাচ্চা ছেলেটা? যে ফুল পাড়ার জন্য আমার কাঁধে উঠে আর নামে না—আমাকে আধমরা করে তারপর ভ্যানিশ হয়ে গেল?

—সে ভবিষ্যতের দুর্বলের অত্যাচারের প্রতীক। অযোগ্য দুর্বল যোগ্য লোকের কাঁধে চড়ে তাকে মেরে মেরে নিজের জীবনের সঞ্চয়ের ফুল কুড়োবে—তারপর হাওয়া হয়ে যাবে—তুমি মরলে কি বাঁচলে ফিরেও দেখবে না।

পিন্‌ডিদা আর জিন জেকব স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলো।

খানিক চুপ করে থেকে রাজা জ্ঞানী পুরুষ বলল, তোমরা ক্ষমা পেতে পারো যদি তোমাদের ভুল বুঝে থাকো.....

জেকব পাগলের মতো বলে উঠল, আমরা আমাদের ভুল বুঝতে পেরেছি রাজা—আমরা নির্বোধের মতো ভীষণ—ভীষণ ভুল করেছি—ভবিষ্যতে আর এ-রকম ভুল কক্ষণো করব না—এই কান মলছি, এই নাকে খত্ দিচ্ছি!

রাজা চুপচাপ তার মুখের দিকে চেয়ে রইলো একটু।—কি ভুল করছে? নিষিদ্ধ এলাকায় গিয়ে তোমরা এই সব দেখে এমন কি অন্যায় করেছ যার জন্য তোমাদের মৃত্যুদণ্ড দিতে বাধ্য হলাম? বলো—নিষেধ অমান্য করার জন্য অর্থাৎ এ-সব দেখার জন্য কেন তোমাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে—এটুকু বলতে পারলেই তোমরা মুক্ত—মাত্র তিন মিনিট সময় পাবে এর জন্য।

জেকব প্রাণপণে নিজের মাথার চুল টেনে ছিঁড়ে জবাব হাতড়ে বেড়াতে লাগল।

দেড় মিনিট হয়ে গেল, তোমরা দ্বারা হবে না—রাজা পিন্‌ডিদার দিকে ফিরল, এই সহজ প্রশ্নের জবাব তুমি দিতে পারবে—দেখো আর দেড় মিনিটও নেই!

আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনছিলাম। এই পর্যন্ত বলে পিন্‌ডিদা ড্যাব-ড্যাব করে আমাদের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। চটপটি চড়বড় করে উঠল, কি হল পিন্‌ডিদা, ক্লাইম্যাক্সের মুখে থেমে গেলে কেন—তুমি বলতে পারলে?

না পারলে আজ আর আমি তোমাদের সঙ্গে শুয়ে বসে আছি কি করে—বা-বা, সকাল যে প্রায় পাঁচটা বাজে রে!

আমি বলে উঠলাম, প্লীজ পিন্‌ডিদা, আর এ-টুকুর জন্য ঝুলিয়ে রেখো না— তোমার মতলব বুঝতে পেরেছি, আজ রাতেও আমার খরচেই এত বড় না হোক ছোট গোছের প্রোগ্রাম কিছু হবে—এইবার বলে ফেল, নিষিদ্ধ এলাকার ব্যাপার জেনে ফেলেছ বলে জ্ঞানী পুরুষ তোমাদের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছিল কেন?

—তোদের মাথায় তো আর মৃত্যুদণ্ড ঝুলছিল না, দেড় মিনিট ছেড়ে এই প্রায় চার মিনিটের মধ্যেও ওই সহজ প্রশ্নটার জবাব খুঁজে পেলি না?....নিষিদ্ধ এলাকায় গিয়ে ভবিষ্যতের যে চেহারাটা আমরা দেখে ফেলেছি, জ্ঞানী পুরুষের দ্বীপের ঈশ্বর ভক্ত সরল মানুষেরা তা জেনে ফেললে আর ভবিতব্য বুঝলে, আর ঈশ্বর ভক্ত থাকবে, না সরল থাকবে? তাদের সব বিশ্বাস ভেঙে গুঁড়িয়ে নৈতিক সর্বনাশ হয়ে যাবে না? তাই ওই এলাকায় যাওয়া নিষেধ—গেলে শাস্তি।....আমি যখন জ্ঞানী পুরুষকে জবাবটা দিলাম তখন সে হাসতে হাসতে বলল, তোমাদের আমি কোনদিই মারতাম না, কেবল দ্বীপের মানুষকে শিক্ষা দেবার জন্যই ও-রকম ঘোষণা করেছিলাম—কাল তারা দেখবে ঈশ্বরের নির্দেশে তোমাদের আমি নির্বাসিত করেছি—কাল জাহাজ এসে তোমাদের মেন-ল্যান্ডে নিয়ে যাবে। তারপর তির্যক চোখে আমার দিকে চেয়ে রাজা বলল, তোমার মগজে বুদ্ধিসুদ্ধি তো বেশ আছে দেখছি, তবু তেল-অলাকে তেল দিতে গেছলে কেন?

জিন জেকব ফসফস করে বলে উঠল, এরপর পিন্‌ডি আর তেল না দিলেও তেল-অলাকে তেল দেবার লোক পৃথিবীতে চিরকাল থাকবে জেনে রেখো—এ-ও প্রায় ঈশ্বরের নির্দেশ।

আড়মোড়া ছেড়ে পিন্‌ডিদা বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। বলল, না ঘুমিয়ে রাতের খাওয়াটাই ভালো করে তল হয়নি, আজ রাতে আবার সোনার প্রোগ্রাম— যাই, কম করে এখন এক ঘন্টা মর্নিং ওয়াক করব আমি।

চলে গেল।

আমরা এ-ওর মুখ তাকাচ্ছি।

# মোগলাই পরোটা, সঙ্গে কোর্মা

প্রদীপ নারায়ণ দত্ত'র প্রথম অক্ষরগুলো নিলে দাঁড়ায় পি, এন্, ডি—এই নাম ব্রেজিলের ফুটবল মাতোয়ারা দর্শকদের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে পিন্‌ডি—আর আমাদের সেই পিন্‌ডিদা হাঁটুর মালাইচাকি খুলে ব্রেজিলের লক্ষ লক্ষ অনুরাগীকে শোক সাগরে ভাসিয়ে বর্ধমানের বাবুগঞ্জে এসে আমাদের দাপটের লীডার হয়ে বসেছে—এসব পুরনো খবর এখন আর কে না জানে? তাই পরিচয় পর্ব সিকেয় তুলে ব্যাপারখানা বলি।

দুগ্‌গো পুজোর ছুটি কালীপুজোর পরে শেষ হয়। এখানও টানা বারো-চৌদ্দ দিন ছুটি আছে। নভেম্বরের শুরু এটা। কিন্তু এবারে এরই মধ্যে বেশ ঠাণ্ডা ভাব এসে গেছে। আজ আবার তার ওপর মেঘলা আকাশ! বিকেল চারটের মধ্যেই আমি, চটপটি আর কার্তিক মাঠের দিকে পা বাড়ালাম! পিন্‌ডিদা কেবলু আর হাতিমার্কা হাবুলও এমন দিনে ঘরে বসে থাকবে না জানা কথাই। এমন আড্ডার মওকা কে ছাড়ে!

দূর থেকে চোখে পড়ল সংস্কৃত বিশারদ কেবলু আর হোঁতকা হেবো আগে ভাগে এসে বসেই আছে। পাশের একটু উঁচু টিপিটা অর্থাৎ পিন্‌ডিদার আসন খালি। আমরা কাছে আসতে খুশিমুখে হাবুল কেবলুর ঢং-এ অভ্যর্থনা জানালো, শুভাগমনং কুরু—

কেবলুর তাইতেই রাগ হয়ে গেল। ফস করে বলে বসল, তুমি একখানা গণ্ডারাং পুরু। তার পরেই প্রমাদ গুনে লাফিয়ে উঠে হাবুলের নাগালের সাত হাত দূরে গিয়ে দাঁড়াল। তাতেও রেহাই পেত কিনা সন্দেহ, হাবুল উঠে দাঁড়াতে গেছল। পিন্‌ডিদা ভিন্ন আর সকলের কাছে তার ভীমসেনের প্রতাপ। ও ওঠার আগেই কেবলু চেঁচিয়ে উঠল, ওই যে, পিন্‌ডিদা এসে গেছে।

হাবুল আর আমরা সামনে তাকিয়ে দেখলাম, সত্যি। ঢ্যাঙা রোগা লোকটা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে আসছে। দাঁত কড়মড় করে হাবুল কেবুলকে শাসালো, খুব বাঁচিতং গেলি।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কেবলু আবার বসে পড়ল। সদা গম্ভীর পিন্‌ডিদা তার উঁচু আসনে বসেই গোরুর মতো আকাশের দিকে নাক তুলে লম্বা লম্বা তিনটে নিঃশ্বাস টেনে বাতাসে কিছু শুঁকতে চেষ্টা করল। তারপর আমার দিকে ফিরে আলতো করে জিগ্যেস করল, আজ তোর পকেটের খবর কি রে সোনা?

সোনা আমার ডাক নাম। শোনামাত্র আমি দারুণ অস্বস্তি বোধ করলাম। আমার পকেটের ওপর পিন্‌ডিদার শকুনির দৃষ্টি লেগেই আছে। তার মেজাজ ঠাণ্ডা রাখতে আজ পর্যন্ত কত বার যে ঠাকুমার বাক্স হাতাতে হয়েছে ঠিক নেই। কিন্তু সদ্য সদ্য পকেটের অবস্থা আমার সত্যি ভালো। পুজোয় কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছিল ছোট মাসি আর ছোট কাকা। যাবার আগে কাকা আমাকে তিরিশ টাকা দিয়ে গেছল, আর ছোট মাসি দিয়েছিল কুড়ি টাকা। তারা এলে বাবাকে গোপন করে ও-রকম দিয়ে যায়। আর আদর করে দিলে আমিই বা আপত্তি করি কি করে।

সেই টাকার প্রায় সবটাই আমার প্যান্টের ভিতরের পকেটে গোঁজা। বাইরে জামার পকেটে মাত্র দুটো টাকা আছে। কিন্তু আকাশের দিকে চেয়ে পিন্‌ডিদা বাতাসে শুঁকল কি? খাবার জিনিসের মতো সে-কি বাতাসে টাকার গন্ধও পায় নাকি! আমার মনে হল, প্যান্টের ভিতরের পকেটের টাকাও টান পড়েছে। তাড়াতাড়ি জবাব দিলাম, খবর আর ভালো কোত্থেকে হবে—ঘুগনি বা ডালমুট টালমুট কিছু হতে পারে!

পিন্‌ডিদা এমন চেয়ে রইল আমার দিকে যেন হিপনোটাইজ করে টাকার আসল খবরটা বার করে নেবে। চেয়েই আছে। আমি তাড়াতাড়ি আবার বললাম, সে ঘুগনি-অলা বা চানাচুর-অলা এলে তখন দেখা যাবে। অনেকদিন তোমার ব্রেজিলের গল্প শুনি না পিন্‌ডিদা, আজ কিছু বলো না—

আরো খানিক তেমনি চেয়ে থেকে পিন্‌ডিদা বেশি অমায়িক হাসি হাসল একটু। বাতাসে তেমনি নাক উঁচিয়ে বার দুই ফোঁস-ফোঁস নিঃশ্বাস টেনে আবার কি শুঁকল। তারপর অন্তরঙ্গ সুরে বলল, এই গল্প নিয়েই ব্রেজিলের ছেলেদের মধ্যে কত মজার রেষারেষি হয়ে যায় তোরা তো জানিসও না—

—কি-রকম—কি-রকম পিন্‌ডিদা? পিন্‌ডিদার সব কথাতেই রসের গন্ধ পায় হেবো-হোঁতকা। পিন্‌ডিদা আমাদেরও চোখে মণি, কিন্তু ওর মতো অত মোসায়েবি করতে পারি না। যাক, তা বলে আমারও ঔৎসুক্য কম নয়।

পিন্‌ডিদা বলল, আচ্ছা, এখানেও সেই মজার আসরই হয়ে যাক। তোরা পাঁচজনে পাঁচটা গল্প বলবি—বানিয়ে হোক সত্যি হোক বা নিজের অভিজ্ঞতা থেকে হোক। এক-একজনের আট মিনিট করে সময়। যার গল্প সবার থেকে কম সরস বা মজাদার হবে—সে বাকি সকলকে খাওয়াবে। আমি জাজ্। নে হাবুল, তুই প্রথম শুরু কর্—

আমরা বাকি চারজন আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলাম। কারণ, আমাদের চার জনের গল্প হেবোর থেকে অন্তত খারাপ হতে পারে না। ওটা কেবল হাতির মতো রাগতে জানে আর খেতে জানে—মগজে একফোঁটা বুদ্ধি নেই। হাবুল নিজেও তার কেরামতি জানে, তাই চোখে সর্ষেফুল দেখল। আঁতকে উঠে বলল, আমি গল্পের কি জানি—

পিন্‌ডিদার সঙ্গে সঙ্গে ধমক।—স্টুপিড কোথাকার—আমি তোকে গল্প লেখক হতে বলছি? মজার খেলা বুঝছিস না?

আমি তক্ষুনি সায় দিয়ে বললাম, বি স্পোরটিং হাবুল—কত কি মজার ব্যাপার সকলের জীবনে ঘটে—তোরটা খারাপ হবে ধরে নিচ্ছি কেন?

মনে মনে ঠিক জানি, হেবো হোঁতকা এবারে মোক্ষম ফাঁদে পড়েছে। ওদিকে চটপটিরও হয়তো মজার গল্প কিছু মাথায় এসে গেছে। সে অভয় দিয়ে বলল, ঘাবড়াচ্ছিস কেন—শুরু করে ফেল্, ঠিক হয়ে যাবে—

পিন্‌ডিদা বিচারকের সুরে বলল, তুই প্রথম বলছিস বলে তোকে পাঁচ মিনিট ভাবার সময় দেওয়া যেতে পারে।

অনেক পাঁয়তাড়া কষে আর অনেক মাথা ঘামিয়ে হাবুল যে গল্পটা বলল, তা এমনি সাদামাঠা আর বাজে, যে শুনলে হাসিই পায়। যা বলল, তার সার কথা হল, অনেকের চোখের সামনে দিন-দুপুরে একবার সে রাস্তার কলার খোসায় পা-পিছলে চিৎ-পটাং হয়েছিল! অতবড় শরীরটা নিয়ে ও-ভাবে চিৎপাত হয়ে পড়তে কাছে যারা ছিল তারা হেসে সারা। কিন্তু হাবুল এমন পড়া পড়েছে যে সহজে আর উঠতেই পারে না। তাই দেখে সব থেকে বেশি হাসছিল যে ছোকরা সে-ই তাকে হাত ধরে হেঁইও করে টেনে তুলল। হাবুল যখন উঠল, সেই কলার খোসাটা তার অন্য হাতে। ওঠার পর হাবুল একহাতে ছোকরার গলা চেপে ধরে অন্য হাতে কলার খোসার ভিতরের দিকটা বেশ করে তার মুখে ঘষে দিল।

আমরা হাসি চেপে পিন্‌ডিদার দিকে তাকালাম। পিন্‌ডিদা গম্ভীর। হাবুল সশঙ্কে তার দিকে চেয়ে আছে। পিন্‌ডিদা তেমনি বাতাসে নাক উঁচিয়ে বার দুই শব্দ করে শুঁকল কি। তারপর কার্তিককে হুকুম করল, তোর গল্প বল্—

কার্তিকের গল্প মাঝারি গোছের হলেও হাবুলের থেকে ঢের ভালো। গল্পটা এই রকম ওদের বাড়িতে ঘটা করে কার্তিক পুজো হয়। সেই পুজোর সময় ওর মা হঠাৎ কার্তিক—কার্তিক বলে তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল। সেই চিৎকার শুনে সকলে হকচকিয়ে গেল, বাবা ভাবল কার্তিকের ভর-টর কিছু হয়েছে। সে-ও চেঁচিয়ে বলল, মাথায় জল দে শিগগির। মা শুনে আগুন, পুজোর কার্তিকের হাতে তীর-ধনুক দেওয়া হয়নি, অঙ্গহানির ভয়ে সে অমন চেঁচিয়ে ছেলে কার্তিককে ডাকছিল। ধনুক-বাণ সাজিয়ে দেবার ভার ছেলের ওপর ছিল।

চতুর্থ বার শব্দ করে বাতাস শুঁকে পিন্‌ডিদা মুখ বেঁকিয়ে বলল, তোর গল্পটা বড্ড বেশি সাজানো রে কার্তিক, তুই হাবুলের কাছে হেরে গেলি। আছাড় খেয়ে যে হাসা উচিত নয় হেবো সেটা বুঝিয়ে দিয়েছে।

কার্তিকের মুখ পাংশু। হোঁতকা হাবুলের গাবদা মুখ দিয়ে হাসি চুঁয়ে চুঁয়ে পড়তে লাগল। আমি শুধু হতাশ না, পিন্‌ডিদার বিচার দেখে কেমন খটকাও লাগল।

এবারে চটপটির গপ্‌প। যে-রকম গল্প আমার পছন্দ সে-রকম একটাই বলল। রাতে ঘুমের মধ্যে ফ্যাইন্যাল ম্যাচের স্বপ্ন দেখে এমন শট্‌ হাঁকিয়েছে যে ওর দাদার দাঁত কপাটি লেগে যাবার দাখিল। মাথায় অনেক জল বাতাস করতে তবে সে সুস্থ হয়। তারপর মায়ের সেই পাখার ডাঁট দিয়ে পিট্টুনির চোটে চটপটির পিঠের ছাল উঠে যাওয়ার দাখিল।

রায় শোনার আশায় উদ্‌গ্রীব চোখে আমরা পিন্‌ডিদার দিকে তাকালাম। পঞ্চম দফা বাতাস শুঁকে পিন্‌ডিদা বলল, চটপটি বাস্তব ছেড়ে গল্পে স্বপ্নের ডানা লাগিয়েছে ও কার্তিকের কাছেও হেরে গেল।

ফলে চটপটি বিমর্ষ, কার্তিক নিশ্চিন্ত। কিন্তু আমার অস্বস্তি আর সংশয় বাড়ছেই।

এরপর কেবলুর গল্প। এবং সত্যি কথা বলতে কি অন্য তিন জনের থেকেই ভালো। শুনলে হাসিও পায়, দুঃখও হয়। গল্পটি এই রকম সংস্কৃত পরীক্ষায় বার বার ফেল করে বাবার হাতের থাপ্পড় আর পণ্ডিতমশায়ের চিমসে হাতের কড়া গাঁট্টা খেয়ে কেবলু মরিয়া হয়ে উঠেছিল। তাই অনেক দিন ধরে অনেক পরিশ্রম করেও পাস করার এক মোক্ষম উপায় বার করেছিল। উপায় আর কিছু নয়, চার সেন্টিমিটার লম্বা খুব পাতলা কাগজের একটা টেপ ফিতে, খুব সরু কলম আর ড্রইং করার কালি। আঁকা আর লেখার ব্যাপারে কেবলুর হাত ভালো। সেই কাগজের ফিতেয় অনেক শব্দরূপ ধাতুরূপ যা পরীক্ষায় আসতে পারে বা এসে থাকে, ব্যাকরণের বাছাই কিছু খটমট সন্ধিবিচ্ছেদ যেগুলো পণ্ডিতমশায়ের খুব প্রিয়, আর গোটা তিনেক গল্পের পীস-এর সংক্ষিপ্ত সার, যার একটা না একটা পণ্ডিতমশাই সংস্কৃততে দেবেই। মোট কথা যেখান থেকে যে রকম প্রশ্নই আসুক, ওই ফিতে থেকে কেবলু পঞ্চাশ নম্বরের উত্তর পেয়ে যাবেই।

পরীক্ষার দিন খেয়ে-দেয়ে দুর্গা দুর্গা করে তৈরি হল। শার্ট পরতে গিয়ে হঠাৎ মনে পড়ল ওর একটা পয়মন্ত হলদে শার্ট আছে। অতএব মায়ের বার করা শার্ট বাতিল করে সেটাই পরল। তারপর সন্তর্পণে আগে সেই কাগজের ভাঁজ করা টেপ পকেটে পুরল। সবটা খুললে দশ মিটার লম্বা হবে, গোটালে চার সেন্টিমিটার। সংস্কৃত পরীক্ষার ফল দেখিয়ে এবারে ও সক্কলকে তাক লাগিয়ে দেবেই। সেই ফিতের ওপর রুমাল রাখল। তার ওপর মায়ের দেওয়া পুজোর ফুল বেলপাতা।

প্রশ্নপত্র দেখে খুশি ধরে না। কম করে ষাট নম্বরের উত্তর ফিতেয় আছে। তা ছাড়াও কিছু লিখতে পারবে এমন প্রশ্নও আছে। মাস্টারমশায়রা সকলে ওকে শান্ত, নিরীহ ছেলে বলে জানে। তাই যে দু'জন গার্ড দিচ্ছে তাদের চোখ ওর দিকে তেমন নেই—টোকাটুকির মার্কামারা ছাত্রদের দিকে তারা বেশি টহল দিচ্ছে। বুকের ধুকপুকুনি থামতে কেবলু সন্তর্পণে পকেটে হাত ঢোকালো, আর তার তিন সেকেন্ড পরেই গলা দিয়ে একটা আর্তনাদ বেরিয়ে আসার দাখিল। ফুল বেলপাতা

আর রুমালের তলায় সেই কাগজের ভাঁজ করা ফিতেটা নেই—সেটা খুঁজতে গিয়ে পকেটের ফুটো দিয়ে তিনটে আঙুল বেরিয়ে এলো। অর্থাৎ ওই ফুটো গলে মোক্ষম সম্পদটি খোয়া গেছে। কেবলুর কেবল কান্নাই পেল না, এত মন ভেঙে গেল যে যা ও জানত তা-ও আর লেখা হল না। লিখতে হল না। লিখতে গিয়ে সব তালগোল পাকিয়ে গেল। আর সেবারেই ও সংস্কৃততে রেকর্ড নম্বর পেয়ে ফেল করল—একশ'র মধ্যে তিন!

গল্প শেষ হতেই ইচ্ছে করে আমি এমন হাত-তালি দিয়ে উঠলাম যে এবার আর পিন্‌ডিদার ঘটা করে নাকে বাতাস টানা হল না। তার বদলে আমার দিকে চেয়ে রইল একটু।

আমি বললাম, সুন্দর হয়েছে।

মুচকি হেসে পিন্‌ডিদা কেবলুর দিকে ফিরল। টিপ্পনীর সুরে বলল, দ্যাখ্, সোনা যে তোকে এত ভালবাসে—গল্প শুনে সে পর্যন্ত তোকে ঠাট্টা করছে। আরে গাধা, চুরির গল্প ফেঁদে তুই আসর মাত্ করতে গেলি। নীতি আর আদর্শের কথা ভাবলে সকলেই তো তোকে গোল্লা দেবে! যাক্, কেবলু চটপটির কাছেও হারল—নে সোনা, এবারে তুই শুরু কর।

কেবলুর গল্প শুনে বাহবা দেবার ফল দেখে যা বোঝার আমি বুঝে নিয়েছি। পিন্‌ডিদার মতলব আমার কাছে জলের মতো পরিষ্কার। পিন্‌ডিদার আসল শিকার আমি—আর গল্পের রায় কি হবে জানা হয়ে গেছে। হাবুলের থেকে ভালো কার্তিক বলেছে, কিন্তু কার্তিক হারল—কার্তিকের থেকে ভালো চটপটি চটপটি বলেছে—পিন্‌ডিদার বিচারে হারল চটপটির থেকে ভালো কেবলু বলেছে—অথচ বিচারে কেবলুর কপালে হার—আমার গল্পের কি দশা হবে এ আর কোন্ বোকায় না বোঝে।

রাগে আমার পিত্তি জ্বলতে লাগল। কিন্তু সেটা প্রকাশ করা তো যায় না। গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে বললাম, আমার কোনও গল্প মাথায় আসছে না।

পিন্‌ডিদা অবাক।—সে কি রে, তুই সব থেকে জমিয়ে বলবি বলেই তো তোকে সকলের শেষে ডেকে এত সময় দিলাম। ঘাবড়াস না, শুরু কর, তোরটা ভালো হবেই।

প্যাঁচা মুখ করে আমি জবাব দিলাম, না, আমার মাথায় কোনও গল্প নেই।

রেগে গিয়ে হাবুল বলে উঠল, ওই মাথায় একটা গাট্টা বসালে গল্প বেরুবে?

আমি কটমট করে ওর দিকে তাকালাম। ইচ্ছে করছিল পিন্‌ডিদার কারসাজিটা মুখের ওপর বলে দিই। কিন্তু অত সাহসও নেই, পিন্‌ডিদা বিগড়ালে আমাদের দল কানা।

পিন্‌ডিদার রাগত দুই চোখ এবারে হাবুলের দিকে। ধমকে উঠল, দ্যাখ্ হেবো, সোনা তোদের মতো অত গাধা নয়, ওর হার স্বীকার করার হিম্মত আছে— বুঝলি।....যাক, সোনার কাছেই তাহলে তোদের সকলের খাওয়া পাওনা হল—

রাগে আরো গা জ্বলছে আমার। আকাশের দিকে চোখ রেখে জবাব দিলাম, একসময় ওদের খাইয়ে দেওয়া যাবে'খন—

পিন্‌ডিদা পিটপিট করে খানিক চেয়ে থেকে হাসল একটু। বলল, বেশ কথা, তুই ব্রেজিলের গল্প শুনতে চেয়েছিলি, এবারে তাই একটা বলি—তোরাও শোন।

বিচারের ফয়েসলা হয়ে যেতে এক আমি ছাড়া আর সকলে খুশি তো বটেই। এবারে উৎসুকও। শুধু আমারই গল্প শোনার মেজাজ নেই। উঠে চলে চলে যেতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু গেলে ওরা ভাববে শোকে আর ট্যাঁকের পয়সা খসার শোকে চলে যাচ্ছি। তাছাড়া যত রাগই হোক, পিন্‌ডিদার সামনে সেটা ফলানো শক্ত।

পিন্‌ডিদার দু'চোখ যেন ব্রেজিলেই চলে গেছে। নিজের মনেই বলল, ফাদার থর্নম্যান.....থর্ন মানে কাঁটা.....বাপ-কন্টক বলে আমি বাংলায় গাল পাড়তাম তাকে—কি লোকের খপ্পরেই পড়েছিলাম রে বাবা....এ গল্পের বোলো আনাই সত্যি, বুঝলি? মনে পড়লে এখনো গায়ে কাঁটা দেয়!

পিন্‌ডিদার বলার ঢং এমন যে ইচ্ছে না থাকলেও কান খাড়া হয়। শুরুতেই মাত্ হবার মুখ করে ওরা সব কাছে এগিয়ে এসেছে। পিন্‌ডিদার গল্প পিন্‌ডিদার বয়ানেই বলা যাক :

'নানা দেশ ঘুরে কাটা ঘুড়ির মতো ব্রেজিলে সবে গোঁত্তা খেয়ে পড়েছি। কিছুই জানি না, কিছুই চিনি না। কালে দিনে যে আমি ভেল্কি দেখানো অমন একখানা ফুটবল স্টার হয়ে বসব কেউ ভাবতেও পারে না। আমার সঙ্গে আছে জোসেফ আর জন। তাদের সঙ্গে জাহাজে আলাপ। আলসেমির জন্য প্রাইজ থাকলে ওরা ঠিক ওয়ারল্ড-চ্যাম্পিয়ন হত। যাক তিন জনে কোথায় থাকি, কোথায় খাই, এ এক সমস্যা। এ-দিকে চুঁই-চুঁই, অথচ পকেট প্রায় গড়ের মাঠ।

'একজন লোক আমাদের দুরবস্থার কথা শুনে বলে দিল ওই গীর্জের বাড়িতে ফাদার থর্নম্যানের কাছে যাও—সে তোমাদের একটা গতি করে দেবে। গেলাম, দেখতে ভালো। কথা-বার্তায় অমায়িক। কিন্তু তেমন ধুতোম প্যাঁচার মতো গোমড়া মুখ আমি আর জীবনে দেখিনি। যতদিন তার ওখানে ছিলাম, তাকে কখনো হাসতে দেখিনি। তাকে হাসাতে পারা নিয়ে আমি জোসেফ আর জন নিজেদেরে মধ্যে বাজি পর্যন্ত ধরেছি। কিন্তু যার হাসতে মানা, তাকে হাসাই কি করে?

'যাক, শুরু থেকেই বলি। আমাদের দুরবস্থার কথা শুনে ফাদার থর্নম্যান পুলিশের বড়কর্তার মতো জেরা শুরু করল। কোথায় দেশ, কেন দেশ ছেড়ে বেরিয়েছে, কোথায় কোথায় গেছি, কোথায় কার আশ্রয়ে দিন কাটিয়েছি ইত্যাদি ইত্যাদি। সবিনয়ে আমরা সত্যি জবাবই দিলাম। শুনে টুনে ফাদার থর্নম্যান বলল, ঠিক আছে, যে-ক'দিন না সুবিধে মতো ব্যবস্থা হয় এখেনেই থাকা-খাওয়া চলতে পারে, কিন্তু একটা শর্তে। রোজ তোমাদের তিন জনের কিছু না কিছু পরোপকার করতে হবে। যেদিন পরের উপকার করবে না সেদিন ঈশ্বরের শাস্তিতে খাওয়া বন্ধ।

আমরা ভাবলাম, পরের উপকার করা এ আর এমন কি কঠিন কাজ। পরের জন্য রোজ যা-হোক কিছু করলেই হল। সানন্দে রাজি হয়ে গেলাম। দেখলাম, গীর্জের বাড়িতে খ্যাঁটের ব্যবস্থাও দিব্বি ভালো। আমরা বহাল তবিয়তে দিন কাটাতে লাগলাম। কাজের মধ্যে রোজ তিন জনকে বেরিয়ে সেধে অজানা অচেনা লোকের কিছু না কিছু উপকার করে আসতে হয়। বেগার খাটার লোক পেলে কে না খুশি হয়—আমরা তিন জনে রোজ বেরিয়ে বিনে পয়সায় লোকের উপকার করি এ-ও আশপাশের লোকে জেনে গেছে। তাই দেখা পেলেই অনেক আমাদের খাটিয়ে মারতে চায়। এক একদিন তো উপকার করার ঠেলায় দারুণ বিরক্তি ধরে যায়। কিন্তু না করেও উপায় নেই। সকালে অথবা রাতে যাবার আগে গোমড়া মুখো ফাদার থর্নম্যান ঠিক জানতে চাইবে সেদিন আমরা কে কি উপকার করলাম। কুঁড়ের বাদশা জোসেফ আর জন তো তিরিক্ষি হয়ে উঠল, আর পারি না, চলো কেটে পড়ি।

একদিন সকাল থেকে বেজায় ঠাণ্ডা। বরফ পড়ছে : হাড় কাঁপানো শীত। [illegible] বেরুনোর নামে গায়ে জ্বর আসে। কিন্তু ভগবান সদয় সেদিন। কি দরকারে ফাদার থর্নম্যান দূরে কোথায় চলে গেল। সেদিন আর না ফেরারই সম্ভাবনা বলে গেল। আমাদের খুশি ধরে না। সমস্ত দিন আর বাড়ি থেকে বেরুলামই না। কম্বল মুড়ি দিয়ে আড্ডা দিলাম আর গলা ছেড়ে গান করলাম! দুপুরে তোফা খেয়ে লম্বা ঘুম লাগালাম. বিকেলের দিকে আর বরফ পড়ছে না—কিন্তু কে আর এই হাড়গুঁড়নো শীতের মধ্যে বাইরে বোরোয়। জন বাটলারের কাছ থেকে রাতের ডিনারের মেনু জেনে এলো। ফ্রায়েড রাইস, হরিণের মাংস আর সালাড। বাটলারটা রাঁধে ভালো, মেনু শুনেই জিভে জল আসার দাখিল। সন্ধ্যা হতেই এক-একবার আমরা কম্বল মুড়ি দিয়ে কিচেনের পাশ দিয়ে ঘুরে যাচ্ছি, খাসা খুসবো ছেড়েছে। ভাবছি রান্না সারা হলেই বাটলারকে তাড়া দিয়ে আগে খেয়ে নেব। খিদেটাও বেশ চনমনে হয়ে উঠেছে।

'এমন সময় বজ্রাঘাত। আমরা খেতে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছি, ফাদার থর্নম্যান এসে হাজির। গম্ভীর মুখে আমাদের সান্ধ্য শুভেচ্ছা জানালো। আমাদের গলা দিয়ে আর পাল্টা স্বর বেরোয় না। জোসেফ তো চিঁ-চিঁ করে বলেই ফেলল, আজ আর আপনি ফিরতে পারবেন ভাবিনি ফাদার।

'হাসতে-মানা ফাদার তেমনি গম্ভীর গলায় জবাব দিল, কাজ হয়ে গেল, ফেরার গাড়িও পেলাম—চলে এলাম।

'আমরা বোবার মতো ঘরে বসে আছি। একটু বাদে পোশাক-আশাক বদলে থর্নম্যান আবার আমাদের ঘরে এসে বসল। হাতে কাজ না থাকলে ফাঁক পেলেই এসে আমাদের ভালো ভালো উপদেশ দিয়ে থাকে। একটা চেয়ার টেনে বসে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করল, আজ তোমরা লোকের কি কি উপকার করলে শুনি—

আমি প্রাণের দায়ে মিথ্যে করে কিছু বলতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু বরাত মন্দ। প্রভুভক্ত ওই বাটলার ব্যাটা ঘরে এসে হাজির। ও তো জানে সমস্ত দিনের মধ্যে আমরা গীর্জের চাতাল ছেড়ে বেরুইনি। আমাদের মুখের অবস্থা দেখে বাটলারও মজা পেয়ে গম্ভীর। ফাদার যা বোঝার বুঝে নিল। তার সমস্ত চোখমুখ কঠিন হয়ে উঠতে লাগল গলার স্বরও অকরুণ।—একদিন আমি ছিলাম না, তার মধ্যে ফাঁকি। কেউ কিছু করোনি—এই চরিত্র তোমাদের?

'অদৃষ্টে কি আছে কে জানে, গলার স্বরে কান্না ঢেলে আমি বলে ফেললাম, আপনি ছিলেন না বলে আমাদের মন এত খারাপ ছিল যে নড়তে চড়তেও ইচ্ছে করছিল না ফাদার—কেবল ভাবছিলাম পিতা কি জিনিস।

'ফাদার থর্নম্যান আমার দিকে চেয়ে রইল খানিক। গম্ভীর বটে, কিন্তু মুখের কঠিন ভাব কোমল হতে লাগল। বুঝলাম আমাদের ফাঁড়া কেটেছে। বলল' ছেলেদের এত দুর্বল হওয়া ভালো না—যত মন খারাপই হোক, কর্তব্যে অবহেলা করতে নেই। যাক, আমি তো এসে গেছি, এবার তোমরা বেরিয়ে পড়ো—যেটুকু পারো লোকের উপকার করে এসো—নইলে তো খেতেও ভালো লাগবে না তোমাদের।

'মুখ আমসি করে আমি জন আর জোসেফ সেই হাড়-জমানো শীতে বেরিয়ে এলাম। প্রায় ঘন্টাখানেক বাদে তিন জনে আবার খুশি মনেই ফিরে এলাম। আমাদের মুখে ফাদার থর্নম্যান বলল, কাজ শেষ তো? চলো তাহলে খাবার টেবিলে গিয়ে বসি।

'টেবিলে বসে ফাদার প্রথমে জোসেফকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি উপকার করে এলে বলো।

'জোসেফ সবিনয়ে জবাব দিল, আমি এক বুড়িকে গাড়ি ঘোড়া বাঁচিয়ে বড় রাস্তা পার করে দিয়ে এলাম।

'ফাদার থর্নম্যান মাথা নেড়ে বলল, এটা মন্দ কাজ নয়, বুড়ি-টুড়িদের পক্ষে রাস্তা পার হওয়া ঝামেলার ব্যাপার.....এটা ভালোই করেছ। এরপর জনকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি উপকার করে এলে?

'জন বলল, বুড়িকে রাস্তা পার করানোর ব্যাপারে আমি জোসেফকে সাহায্য করলাম।

'শুনে ফাদার ভুরু কোঁচকালো একটু। খুব যেন মনঃপুত হল না। যাই হোক, এবারে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি উপকার করে এলে?

'সবিনয়ে জবাব দিলাম, বুড়িকে রাস্তা পার করানোর ব্যাপারে আমি জোসেফ আর জন দু'জনকে সাহায্য করলাম।

'শুনে ফাদার থর্নম্যান আকাশ থেকে পড়ল। বলে উঠল, কি আশ্চর্য, একটা বুড়িকে রাস্তা পার করানোর জন্য তিন জনের দরকার হল—আর এতক্ষণ সময় লাগল।

'থতমত খেয়ে আমি বললাম, কি করব, বুড়ি হলেও তার গায়ের জোর কি কম—কিছুতেই রাস্তা পার হইতে চায় না—বকাঝকি ধস্তাধস্তি ব্যাপার—শেষে তিনজনে মিলে চ্যাংদোলা করে তাকে রাস্তা পার করে দিয়ে আসতে হল।

'ফাদার থর্নম্যান হাঁ করে আমাদের মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারপর হঠাৎ সে কি হাসি। এই প্রথম তাকে হাসতে দেখলাম আমরা।'

পিন্‌ডিদার গল্প শেষ হতে অন্য সকলে সঙ্গে আমিও হেসেই ফেলেছিলাম। তাই দেখে পিন্‌ডিদার এক মুখ হাসি। বলল, সোনা পর্যন্ত হাসছে যখন আমার গল্প যে সব থেকে ভালো হয়েছে বোঝাই গেল। নাক উঁচিয়ে শব্দ করে তিন বার বাতাস টেনে কিছু গন্ধ শুঁকতে চেষ্টা করল! তারপর উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, আসার সময় বিনোদের দোকান থেকে মাংসের পুর দেওয়া ডিমে ভাজা মোগলাই পরোটার ভুরভুর গন্ধ নাকে এলো। খবর নিতে ঢুকে দেখি মাংসের কোর্মাও চাপানো হয়েছে আর তার ম, ম গন্ধও আমার নাকে। সেই থেকে ওই দুটো গন্ধ নাকে লেগেই আছে। চটপট চল—যে আ-দেখলে খদ্দের আজকাল সব—দেরি হলে হয়তো গিয়ে দেখব সব সাবড়ে দিয়েছে।

সকলে হৈ-হৈ করে চলল। পিছনে আমি। আমি কেবল ভাবছিলাম, মোগলাই পরোটা আর মাংসের কোর্মা না হয় পিন্‌ডিদার নাকে গেছে—কিন্তু আমার ট্রাউজারের ভিতরের পকেটের টাকার গন্ধ পিন্‌ডিদা পেলে কি করে?

# পিন্‌ডিদার মানবিক ভূত

শুরু থেকেই বোঝা গেছল পিন্‌ডিদার মেজাজপত্র সেদিন একটুও ভালো ছিল না। যদিও আমাদের পাঁচজনের হাতে কুড়ি পয়সার ঝাল মুড়ির ঠোঙা আর পিন্‌ডিদার একলার হাতে আট আনার অর্থাৎ পঞ্চাশ পয়সার ঠোঙা। চট্ করে ফুরিয়ে যাবে বলে আমরা তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছি আর যত না ঝাল তার থেকে বেশি হুসহাস শব্দ করছি। আর রাগের চোটে পিন্‌ডিদা খাচ্ছে বলার থেকে মুড়ি-কুল ধ্বংস করেছে বলা যেতে পারে।

পিন্‌ডিদার বিবেচনায়, আর বলা বাহুল্য তার পয়লা নম্বরের চামচে হোঁতকা হাবুলের বিবেচনায় দোষটা আমারই। কারণ আমি নাকি লোভ দেখিয়ে অসুস্থ শরীরে পিন্‌ডিদাকে এখানে টেনে এনে তারপর বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। চটপটির হাত থেকে মুড়ির ঠোঙাটা নিয়ে একবার ভিতরে চোখ চালিয়েই ফ্যালফ্যাল করে এমন চেয়ে রইল যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না। তারপর আমার দিকে চেয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে কানে গরম সীসে ঢালতে চাইল।—দ্যাখ সোনা, কাট ছাঁটের ব্যাপারে তুই তো দেখি আমার ব্রেজিলের ফ্যানদেরও হার মানালি! প্রদীপনারায়ণ দত্তকে তারা পি. এন. ডি. করেছে তারপর পিন্‌ডি করেছে—এই ছাঁট-কাটে তাদের ভক্তিশ্রদ্ধা বেড়েছে বই কমেনি—আর তুই কিনা মোগলাই পরোটা আর কষা-মাংস ছেঁটে দিয়ে শেষে ঝাল মুড়িতে দাঁড় করালি? বলিহারি তোর ভক্তিশ্রদ্ধা।

জবাবে হাবুল-হাতিটা ঘন-ঘন মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিল, কারণ দ্বিতীয় দফায় পিন্‌ডিদাকে ওই ডেকে এসেছিল বলে পিন্‌ডিদা ওর ওপরেও তেরিয়া হয়ে উঠতে পারে ভাবছিল হয়তো।

ব্যাপারখানা খুলেই বলি। আমি কার্তিক আর চটপটি আসতে আসতে দেখি আমাদের চিরাচরিত বসার জায়গায় হাবুল একলা বসে আছে। সাধারণত ওই পিন্‌ডিদাকে নিয়ে আসে। পারলে কাঁধে করে নিয়ে আসে—পিন্‌ডিদার এমনিই ভক্ত হনুমান সে। পিন্‌ডিদা ছাড়া আড্ডা জমানোর চেষ্টা মানে বরফ ছাড়া কুলপী জমানোর চেষ্টার মতো। এই এক ব্যাপারে আমরা বর্ধমান বাবুগঞ্জের মার্কামারা আড্ডাবাজ পার্টি পিন্‌ডিদার কাছে হার মেনেছি সেটা স্বীকার করতে আপত্তি নেই।

কাছাকাছি হতে হাবুল দুশ্চিন্তায় তার থলথলে মুখ হাঁড়ি করে জানান দিল, আজ আর পিন্‌ডিদার আশা নেই বোধহয়—কম করে দশবার ডাকলাম—বাড়ির সামনে বিশ মিনিট পায়চারি করলাম—পিন্‌ডিদার নো পাত্তা। অথচ কাল ফেরার সময়ে আমাকে আজ একটু সকাল সকাল ডাকতে বলেছিল—এক জায়গায় হয়ে তারপর মাঠে আসার কথা। এরকম তো হয় না.....

আমি আমার জায়গা নিয়ে বসতে বসতে বললাম, তাহলে তুই ডাকতে আসার আগেই বেরিয়ে গেছে।

হাবুল তাইতেই তেতে উঠে বলল, কখনো তা হতে পারে না। পিন্‌ডিদা কথার খেলাপ করে না!

এই রকম মোটা বুদ্ধি ওর। হোঁতকাটার হাতের নাগালের মধ্যে বসে তর্ক করাও নিরাপদ নয়। দূরের দিকে চোখ যেতেই দেখি আমাদের সংস্কৃত বিশারদ কেবলু হনহন করে আসছে। সংস্কৃত পরীক্ষায় হালে পানি পায় না বলে চুটিয়ে সংস্কৃত কপচে গায়ের ঝাল ঝাড়ে। কেবলুর হাঁটা দেখেই মনে হল খবর আছে।

একটু দূর থেকেই গলা চড়িয়ে জানান দিল, নো পিন্‌ডিদা—পিন্‌ডিদা শ্মশান যাত্রাস্য ফলং ভোগস্তি!

শুনে আমাদের পেটের ভেতরসুদ্ধু কচলে উঠল। এ বলে কি! কাল বিকেলেও জলজ্যান্ত মানুষকে দেখলাম, আড্ডা দিলাম—এর মধ্যে সে বিনা নোটিসে শ্মশানযাত্রা করে বসল—এ হয় কি করে? তাছাড়া সবার আগে তো তাহলে আমরা জানব!

আমি আর্তনাদ করে উঠলাম, বলিস কিরে তুই?

আমাদের মুখ দেখেই কেবলু বুঝেছে ওর সংস্কৃত বলার মধ্যে বড় রকমের কিছু গড়বড় হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি বসে পড়ে সামাল দিতে চেষ্টা করল, সাদা কথাটাও বুঝলি না, কি-যে পাকা মাথা তোদের জানি না। পাশের বাড়ির এক বুড়ো টেঁসে যেতে কাল রাতের ঠাণ্ডায় শ্মশানযাত্রা করে পিন্‌ডিদার শরীর খারাপ হয়েছে—আজ সকাল থেকে গুনে গুনে আড়াইশ হাঁচি হয়েছে বলল! আমি আসতে আসতে দেখি গায়ে চাদর জড়িয়ে পিন্‌ডিদা দোতলার রেলিং-এ ঝুঁকে রাস্তা দেখছে। ডাকতেই খেঁকিয়ে উঠলো।—বুড়ো মরার ধকলে হেঁচে হেঁচে মরে যাচ্ছি—সর্দিতে ভেতরটা ঢপঢপ করছে—এর মধ্যে মাঠে গিয়ে কিছু লাভ হবে, শরীর টানার মতো মোগলাই পরোটা আর কষা মাংসের ব্যবস্থা করবি যে এত আদর করে ডাকছিস?

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল আমাদের। পিন্‌ডিদা শ্মশানযাত্রা করেনি, শ্মশান-যাত্রার ফল ভোগ করছে। অমন চমকে দিয়েছিল বলে কেবলুর মাথায় আমারই একটা রাম গাঁট্টা বসাতে ইচ্ছে করছে। অনাত্মীয় কেউ মারা গেলে শ্মশানবন্ধু হয় পিন্‌ডিদার এই গুণ আমাদের জানা ছিল না। শ্মশান-টশানে অমার যেতে বিচ্ছিরি লাগে, ও-দিকে গেলে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চলি। কিন্তু পিন্‌ডিদা আজ এলে ওই শ্মশান-টশান নিয়েই হয়তো ছমছমে আড্ডা জমত একটা। পিন্‌ডিদার অভিজ্ঞতার তো আর শেষ নেই। তাছাড়া পিন্‌ডিদার জন্য হঠাৎ বেশ টানও অনুভব করলাম। কেবলু হতভাগার কথা শুনে যা ভেবে আঁতকে উঠেছিলাম তাই যদি হত! আমার মনে হতে লাগল,

পিন্‌ডিদার সঙ্গে আমাদের সকলের একটা ফাঁড়া কাটল। শুধু এই কারণেই কিছু খরচা করা উচিত। কিন্তু পকেটে মাত্র দেড়টি টাকা সম্বল তা-ও জানি।

ভেবে চিন্তে আমি হাবুলের দিকে তাকালাম। বললাম, মোগলাই পরোটা আর কষা মাংসের মতো অতটা হবে না—তবে সর্দি লাগা শরীর খানিকটা টানার মতো একটু কিছু হবে—হেবো যা তুই পিন্‌ডিদাকে ডেকে নিয়ে আয়।

হাবলু তখুনি উঠে রওনা দিল। আমার ইচ্ছে ছিল চটপটিকে পাঠিয়ে স্পেশাল ঝাল দিয়ে পিঁয়াজি আনা হোক। কিন্তু তার আগেই ঝালমুড়িঅলা এসে হাজির। ও আমাদের চেনে, আমরাও ওকে চিনি। তাই এদিকে এলে না ডাকতেই হানা দেয়। হুকুম করলেই কটকটে ঝালের স্পেশাল ঝালমুড়ির ঠোঙা সাজায়। আমরা সকলেই একমত। দেড় টাকায় ক'টা আর পিঁয়াজি হবে, তার থেকে স্পেশাল ঝালমুড়ি ভালো। এতেও পিন্‌ডিদা'র ঠাণ্ডা লাগা শরীর চাঙ্গা হবে। আমাদের পাঁচ জনের অর্থাৎ আমার চটপটির কেবলুর কার্তিকের আর হাবুলের কুড়ি পয়সার ঠোঙার অর্ডার দিলাম আর পিন্‌ডিদার পঞ্চাশ পয়সার। পিন্‌ডিদার বেলায় ভাগের ব্যাপারটা এই রকমই হয়।

আমাদের হাতে হাতে কুড়ি পয়সার ঠোঙা আর চটপটির হাতে কুড়ি পয়সার ঠোঙা দিয়ে আর হাবুলের কুড়ি আর পিন্‌ডিদার পঞ্চাশ পয়সার ঠোঙা দুটো সামনে রেখে মুড়িওয়ালা বিদায় হতে না হতে অদূরের রাস্তায় পিন্‌ডিদা আর হাবুলের মূর্তি দেখা গেল। সঙ্গে সঙ্গে পিন্‌ডিদার ঠোঙা চটপটির হাতে আর হাবুলের ঠোঙা কেবলুর হাতে। নইলে পিন্‌ডিদার যে খুঁতখুঁতুনি, হয়তো বলে বসবে ঘাসের ঠাণ্ডায় মুড়ি মিইয়ে গেছে—আর হেবো মোটকাও সঙ্গে সঙ্গে সায় দেবে।

কিন্তু চটপটির হাত থেকে ঠোঙা নিয়ে আর তাতে মুড়ি দেখে পিন্‌ডিদা যে অমন খিঁচড়ে যাবে আর কট-কট করে ওই রকম কথা শোনাবে তা কি ভেবেছি? তার উঁচু টিবির আসনে বসে খাচ্ছে তো দিব্বি, অথচ ভাবখানা এমনি যেন মুড়ি খাইয়ে তা'র ইজ্জত মেরে দিয়েছি।

তার কথার পেঁ ধরে হাবুল আয়েস করে মুড়ি চিবুতে চিবুতে বলল, সত্যি সোনা, তুই দেখালি বটে। মোগলাই পরোটা আর কষা মাংসের বদলে একটু কিছু হবে বলতে আমি ভাবলাম বিনোদের দোকানের মেটের চচ্চড়ি টচ্চড়ি অন্তত হবে—আর তুই কিনা একেবারে মুড়িতে নেমে এলি! কাল রাতের ওই ঠাণ্ডায় শ্মশানযাত্রা করে পিন্‌ডিদার শরীরের কি হাল জানিস?

আমাকে জবাব দিতে হল না, আর আগে পিন্‌ডিদা হাবুলের ওপরেই রাম খাপ্পা হয়ে উঠল।—কি বললি স্টুপিড কোথাকারের আমি শ্মশানযাত্রা করে মানে?

হাঁসফাঁস করে হাবুল শুধরে বলল, মানে, কনকনে শীতের রাতে ওই বুড়ো মড়া শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার ধকলে বলছিলাম—

পিন্‌ডিদা আরো খাপ্পা।—ইডিয়েট! আমি বুড়ো মড়া শ্মশানে নিয়ে গেছলাম তোকে কে বললে? আমার কি দায় পড়েছে?

আমরা সকলেই হতভম্ব। পিন্‌ডিদা এখন আর হাঁচছে কাশছে না অবশ্য, কিন্তু গায়ে তার এখনো বেশ করে গরম চাদর জড়ানো। এবারে কেবলুই ভয়ে ভয়ে বলল, তুমি যে বললে রাতের অত ঠাণ্ডায় পাশের বাড়ির বুড়ো মড়ার ধকলে হেঁচে হেঁচে মরে যাচ্ছ—গুনে গুনে আড়াইশ হাচ্ছো মাচ্ছো করেছ!

মুখ বিকৃত পিন্‌ডিদা বলল, বলিহারি বুদ্ধি তোদের! বুড়ো মড়ার ধকলে বললাম বলেই আমি শ্মশানে চলে গেলাম!

আমতা আমতা করে চটপটি জিজ্ঞাসা করল, তাহলে ধকলটা কি পিন্‌ডিদা?

পিন্‌ডিদা বীতশ্রদ্ধ।.....উঃ! কি আর বলব তোদের—আরে বাবা শীতে রাতে গেঞ্জি গায়ে লেপের তলায় ছিলাম—হঠাৎ পাশের বাড়িতে মড়াকান্না শুনে বেরিয়ে এলে ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে না? তার জন্যে আমাকে তোরা একেবারে শ্মশানে পাঠিয়ে ছাড়বি!

মনে মনে বললাম, ননীর শরীরে লেপের তলা থেকে বেরুনোর ঠাণ্ডাটুকুও সয় না ভাবব কি করে। কিন্তু মুখে তো আর সে কথা বলতে পারি না। যাক, হেবো হোঁতকাকে পিন্‌ডিদা একটু আগে স্টুপিড বলল, ইডিয়েট বলল, তাইতেই আমার কান জুড়িয়েছে। এবারে পিন্‌ডিদাকে নরম করার দায় আমিই নিলাম।—যাক্ পিন্‌ডিদা এবারের মতো মাপ করে দাও—এই পকেট উল্টে দেখাচ্ছি তোমাকে, আমার কাছে আজ ঝালমুড়ির দেড়টি টাকাই ছিল। কেবলুর সংস্কৃত যন্ত্রণা থেকে তোমাকে জ্যান্ত উদ্ধার করতে পেরে একবারটি দেখার জন্য ভিতরটা আঁকুপাকু করছিল।

পিন্‌ডিদার দুই পাতলা ভুরুর মধ্যে বড়সড় ভাঁজ পড়ল একটা।—কেন, কেবলু কি সংস্কৃত চোটে আমাকেই মেরে ভূত বানিয়ে দিয়েছিল নাকি?

এবারে কেবলুর মুখ আমসি। কিন্তু বোকার মতো ওর ফাঁড়া কাটিয়ে দিল ওই হাবুলই। পিন্‌ডিদার মন পাওয়ার আশায় ফস করে বলে বসল কেবলু সংস্কৃতই কপচায়, তুমি দেহ ছাড়লে ভূত না হয়ে ভগবান হতে পারো সেই কাণ্ডজ্ঞান ওর কাছে!

আজ হাবুলের কপালই মন্দ। দেহ ছাড়ার কথা শুনেই পিন্‌ডিদার পিত্তি জ্বলে গেল। হুমকি দিয়ে উঠল, দ্যাখ রাসকেল, ফের তুই টকাশ-টকাশ কথা বলবি তো আমি তোর মাথায় ঠকাশ-ঠকাশ গাঁট্টা বসিয়ে দেব। ভর সন্ধ্যায়-উনি আমাকে দেহ ছাড়াতে এসেছেন!

আনন্দে আমাদের পেটের ভিতরটা দুলে উঠছিল। সাহস পেয়ে কেবলু পর্যন্ত গম্ভীর চালে বলে উঠল, হাবুল, পিন্‌ডিদাকে আর ক্রুদ্ধং মা কুরু।

হাবুল কটমট করে কেবলুর দিকে তাকালো। তিন তিনবার দাবড়ানি না খেলে ও হাবুলের মাথাটা চিবিয়ে খাবার জন্য তেড়ে যেত।

প্রসঙ্গ বদল্যাবার তাগিদে আদুরে সুরে কার্তিক জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা পিন্‌ডিদা তুমি ভূত বিশ্বাস করো?

মনে মনে আমি কার্তিককে তারিফ করলাম। আমার ভিতরটাও এই গোছের জমাটি আলোচনার মধ্যে ঢুকতে চাইছিল। উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করলাম, কিন্তু পিন্‌ডিদা চুপচাপ মুড়ি চিবুতে লাগল। তাকে আর একটু উসকে দেবাব জন্য একটু দাবড়ানির সুরে কার্তিককে বললাম, কেন আবার পিন্‌ডিদার মেজাজ খারাপ করে দিচ্ছিস—এই ভ'র সন্ধ্যায় ও-সবের নাম টাম করাও হয়তো পছন্দ করে না।

একটু আঁতে লাগার মতো করেই বলেছিলাম। পিন্‌ডিদা ঘাড় বাঁকা করে আমাকে দেখল একটু। তারপর বলল, ভ'র সন্ধ্যা ছেড়ে পিন্‌ডিদা পর পর চার রাত ভূতের সঙ্গে ঘর পর্যন্ত করেছে—বুঝলি? তাও তোদের এখানকার মতো খোলা গলার দিশি ভূত নয়, জলজ্যান্ত বিলিতি ভূত।

ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে সক্কলে উৎসুক, এমন কি হাঁড়িমুখ হাবুলও নড়েচড়ে বসল। আব্দারে গলায় চটপটি আর কার্তিক বলে উঠল, শুনব পিন্‌ডিদা—শুনব।

আবার আমার দিকে তেরছা একটা চাউনি ছুড়ে পিন্‌ডিদার গলা দিয়ে ব্যঙ্গ ঝরালো, আট আনার ঝালমুড়িতে সাহেবভূতের সঙ্গে ঘর করার গপ্‌প হয় না।

রাগতে গিয়েও আমার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল একটা। ভালো মুখ করে জিগ্যেস করলাম, আট আনার ঝালমুড়িতে হয় না....খুব জমাটি ব্যাপার বুঝি?

তেমনি ব্যঙ্গের সুরে পিন্‌ডিদা জবাব দিল, খুব কি না জানি না, পৌষের শীতের মতো।

সকলেই উৎসুক। আমি বললাম, শুনে যদি সে-রকম জমাটি মনে হয়,—কাল না হয় মোগলাই পরোটা আর কষা মাংসই হবে!

এবার গলার সুর পালটে পিন্‌ডিদা বলল, বলছিস?

আমি আর একবার ঘুরিয়ে শর্তটাকেই বড় করে নিলাম। জবাব দিলাম, বলছিলাম, সত্যিই জমাটি হলে, তবে.....।

পিন্‌ডিদা আবারও গলায় স্নেহ ঢেলে একই কথা বলল।—বলছিস তো?

আমি মাথা নাড়লাম। আমার মতলবটা অন্যরকম। একবার যে-যার গল্প বলার ব্যাপারে পিন্‌ডিদা আমাকেই নস্যাৎ করার মতলব এঁটেছিল। যার গল্প পিন্‌ডিদার বিচারে সকলের থেকে সাদা-মাঠা হবে সে বাকি ক'জনকে খাওয়াবে এই শর্ত ছিল। কোপটা সেবারে হাবুলের ঘাড়ে পড়বে ধরে নিয়েই সানন্দে আমরা রাজি হয়েছিলাম। কিন্তু পিন্‌ডিদা যে-চাল চালে হাবুলকে ছেড়ে কেবল আর কার্তিককে পর্যন্ত উতরে দিয়ে কমপিটিশানটা শেষ পর্যন্ত আমার আর চটপটির মধ্যে টেনে এনেছিল—তখনই পিন্‌ডিদার মতলব বুঝেছিলাম। পিন্‌ডিদা চটপটিকেও উতরে দিয়ে শেষ পর্যন্ত শিকার বানাবে ধরে নিয়ে গল্প না বলেই আমি রাগ করে হার স্বীকার করেছিলাম, আর গ্যাঁটের কড়ি গুনে দিয়েছিলাম। সেই রাগ আমার মনে জমা ছিলই। এবারে তার উপযুক্ত শোধ নেবার মওকা। পিন্‌ডিদার ভূতের সঙ্গে ঘর করার গল্প শেষ হলেই মুখ কাঁচুমাঁচু করে সবার আগে আমি বলে উঠব, এ আর কি জমাটি গপ্‌প হল পিন্‌ডিদা। চটপটি ওরাও তখন ব্যাপার বুঝবে, একমাত্র হাবুল ছাড়া আর কেউ প্রতিবাদ অন্তত করবে না। তাছাড়া গল্প জমাটি হল কি না হল এবারে সে বিচারের ভার তো শুধু আমার।

সকলে এত উৎসুক যে আবছা অন্ধকারে পিন্‌ডিদাকে ঘিরে আর একটু ঘন হয়ে বসেছে। ধীরেসুস্থে মুড়ির ঠোঙা শেষ করে পিন্‌ডিদা সেটা মুড়িয়ে একদিকে ফেলে দিয়ে ফোঁস করে বড় নিশ্বাস ফেলল একটা। বলল, মাইকেলটাকে আর রাখা গেল না, আত্মহত্যাই করল শেষ পর্যন্ত!....এতদিনে বোধহয় কোথাও মানুষ-টানুস হয়ে জন্মেই গেছে—কিন্তু মাইকেলের মানুষ হওয়ার একটুও ইচ্ছে ছিল না।

হেঁয়ালির মতো লাগল সকলেরই। আত্মহত্যা করে মানুষ হয়ে জন্মালে আর কি ভূতের গল্প হল! চটপটি জিজ্ঞেস করল, কে মাইকেল, তোমার কোনো সাহেব বন্ধু।

—না। ইংল্যান্ডের রেডফোর্ট কাস্‌ল-এতে এক সাহেব ভূত.....আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে দেড়শ বছর ওখানে আস্তানা গেড়েছিল।

আমি সুদ্ধু একটু হতভম্ব। গুরুটা চড়া সুরেরই বটে। কার্তিক বলে উঠল ভূত আত্মহত্যা করল! আর আত্মহত্যা করে মানুষ হয়ে গেল?

নিস্পৃহ গলায় পিন্‌ডিদা জবাব দিল, না হবার কি আছে, মানুষ আত্মহত্যা করলে ভূত হয়, আর ভূত আত্মহত্যা করলে মানুষ ছাড়া আর কি হবে—মারবেল?

মওকা পেয়ে এতক্ষণে হাবুল কার্তিককে খেঁকিয়ে উঠল, কেন মাঝখানে কথা বলে পিন্‌ডিদাকে থামাচ্ছিস? আমার বলে এটুকু শুনেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে!

এরপর পিন্‌ডিদা যা বলে গেলে হুবহু তাই তুলে দিলাম—

—"শোন্ তাহলে, শুরু থেকেই বলি। ব্রেজিলের ফুল ফুটবল টিম ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এগ্‌জিবিশন ম্যাচ খেলতে আসছে। আমার তখন হাঁটুর মালাইচাকতি খোলা, সঙ্গে আসার কোনো প্রশ্ন নেই। কিন্তু টিমের ম্যানেজার আমার ডেরায় এসে হত্যা দিয়ে পড়ল। বলল, পিন্‌ডি, তুমি খেলো না খেলো, তুমি না গেলে টিম নিয়ে যাওয়াই কোনো মানে হয় না—তুমি সঙ্গে থাকলেই এমন মরাল বুসটিং হবে যে আমাদের টিম তেজী ষাঁড়ের মতো লড়বে। তোমাকে সঙ্গে যেতেই হবে, তোমার থাকা-খাওয়া সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সব ভার ব্রেজিল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের।

"কি আর করা যাবে, রাজি হয়ে গেলাম। এমন প্রাণ-ঢালা ভালবাসার ডাক এড়াই কি করে। কিন্তু রাজি হলাম একটা শর্তে। ইংল্যান্ডে গিয়ে হোটেলে বা কোনরকম ভিড় ভাড়াক্কার মধ্যে আমার

থাকা পোষাবে না—লন্ডনের রেডফোর্ট কাস্‌ল-এ আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। বারো মাস ওটা খালিই পড়ে থাকে, তোমরা লিখলেই অনায়াসে ব্যবস্থা হয়ে যাবে—তবে খাবার-দাবার সব কোনো সেরা হোটেল থেকে পাঠাতে হবে।

"ম্যানেজার তক্ষুনি রাজি হয়ে নাচতে নাচতে চলে গেল। যেন আমি সঙ্গে যাচ্ছে মানেই তার টিম জিতে বসে আছে। এখন আমার ওই কাস্‌লটা বেছে নেবার বিশেষ কারণ আছে। আমি যে অ্যাপার্টমেন্টে থাকি তার ল্যান্ডলেডি মিসেস জোনস আমাকে ছেলের মতো ভালবাসে। তবে নিজের ছেলেপুলে নেই, গোটাকতক মেয়ে। তারা যে-যার স্বামীর ঘর করছে। আধবুড়ি মিসেস জোনস বিধবা। তারা কাছে থাকে তার খুব আদরের এক ছোট ভাইয়ের পনেরো বছরের মেয়ে লুসি। এই ভাই অর্থাৎ লুসির বাপের জন্য মিসেস জোনস-এর দুঃখের শেষ নেই।.....বছর পাঁচেক আগে লুসির বাপ জনাকয়েক বন্ধুর সঙ্গে ইংল্যান্ডে বেড়াতে গেছল। তারা সকলে মিলে লন্ডনের ওই রেড্‌ফোর্ট কাস্‌ল-এ উঠেছিল। সেখানে নাকি এমন অলৌকিক সব কাণ্ড ঘটতে লাগল যে বন্ধুরা সব পর দিনই পালিয়ে বাঁচল। গোঁ ধরে কেবল থেকে গেল লুসির বাবা। কিছুদিন বাদে যে যখন ব্রেজিলে ফিরে এলো, তার মাথার সব চুল পেকে গেছে, অস্বাভাবিক চাউনি, সর্বদা আতঙ্কগ্রস্ত। সর্বদা মুখে কেবল এক বুলি, কি ভীষণ! কি ভয়ঙ্কর! কি সাংঘাতিক! লোকটা শেষ পর্যন্ত বদ্ধপাগল হয়ে গেল, তারপর গাড়ি চাপা পড়ে মারাই গেল। পরের মাসেই লুসির মা আর একজনকে বিয়ে করে সরে গেল। লুসি চলে এলো পিসির কাছে। সেই থেকে ভাইয়ের জন্য শোকের পাথর বুকে করে বসে আছে মিসেস জোনস। তার দুঃখ দেখে আমারও বুকের ভেতরটা টনটন করত। তাই ইংল্যান্ডে যাবার নেমন্তন্ন পেলেই ঠিক করে ফেললাম লন্ডনের ওই রেডফোর্ট কাস্‌ল-এই আমাকে থাকতে হবে, ব্যাপারখানা ভালো করে বুঝতে হবে। যদি রহস্য ভেদ করতে পারি তাতেও মিসেস জোনস-এর বুক একটু হালকা হবে।

"কিন্তু মিসেস জোনস শোনামাত্র বিপত্তি বেধে পড়ল সেও যাবে। নিজের খরচাতেই যাবে। আমাকে বলল, তুমি দুধের ছেলে, তোমাকে একলা পাঠিয়ে আবার শোকের ওপর শোকের মুখে পড়ব। আমি যাবই তোমার সঙ্গে। তাছাড়া সুযোগ যখন পাচ্ছি, আমাকেও দেখতে হবে ভাইয়ের অমন হাল কেন হল। লুসির জন্য কোনো চিন্তা নেই, দশ-বারো দিনের তো ব্যাপার—তাকে আমার বান্ধবীর কাছে রেখে যাব। ওকে একটা নতুন ইজেল কিনে দেব বললেই ও খুশি হয়ে থেকে যাবে।

"ইজেল মানে ছবি আঁকার স্ট্যান্ড। ওই এক ছবি পাগল মেয়ে। ছবি আঁকতে বসলে নাওয়া-খাওয়া ভুলে যায়। আঁকেও বেশ। ক'দিন ধরে পিসির কাছে নতুন ইজেলের বায়না করছিল। কিন্তু আশ্চর্য, ইংল্যান্ড যাওয়া হচ্ছে শুনে সেই ইজেল-ফিজেল ভুলে গেল। গোঁ ধরে বসল সেও সঙ্গে যাবে। লন্ডনের রেডফোর্ট কাস্‌ল দেখবে। ওই কাস্‌লটার জন্যই ওর বাবা পাগল হয়ে ফিরেছিল এ কতবার শুনেছে ঠিক নেই। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, বড় হয়েই সে সেখানে যাবে। এখন আন্টি আর পিন্‌ডি যেখানে যাচ্ছে যখন, তার যাওয়াও কেউ আর ঠেকাতে পারবে না। ও যাবেই যাবে, মরে গেলেও যাবে।

"অগত্যা মিসেস জোনস বলল, তাহলে তিন জনেই যাওয়া যাক। আমি থাকতে কার কি হবে। গনগনে কুকিং প্যান হাতে নিয়ে আমি ডাকাত তাড়া করেছি। ভূতটুত আমি মানি না। গাল ফুলিয়ে লুসিও বলল, আমিও ভূতকে একটুও ভয় করি না—সামনে পেলে তাকে জোর করে সামনে বসিয়ে ছবি এঁকে নেব। সত্যি আমারও দারুণ ভালো লাগল, এমন সাহসের অমর্যাদা করতে ইচ্ছে করল না। ফলে তিন জনের একসঙ্গে যাওয়াই ঠিক হল।

"এরোপ্লেনে দূরের পথও কত আর পথ। দলবলের সঙ্গে মিসেস জোনস আর লুসিকে নিয়ে রওনা হলাম। পৌঁছলাম। দলের লোকেরা হোটেলে চলে গেল। ঠিক সময়ে মাঠে হাজির থাকব কথা দিয়ে আমার মিসেস জোনস-এর আর লুসির জন্য রিজার্ভ করা আলাদা মোটরে উঠলাম।

ম্যানেজার শুধু আমার জন্য একগণ্ডা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে সব ব্যবস্থা পাকা করে রেখেছিল। অমন বিলিতি গাড়িতেও কম করে দু'ঘন্টার পথ রেডফোর্ড কাস্‌ল। চারদিক নির্জন খাঁ-খাঁ করছে। মাইলখানেকের মধ্যেও লোকবসতি নেই। কাস্‌ল-এর পেল্লায় লোহার ফটক খোলাই ছিল। ভিতরে ঢুকেই আমার দুই চোখ ছানাবড়া। ভিতরে কম করে বিশ বিঘে জমি। সবটাই উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ভিতরে গাছ-গাছড়ায় ছাওয়া। মস্ত বড় বাগান ছিল বোঝা যায়, তাও এখন ঘন জঙ্গলের মতো হয়ে গেছে। তার মাঝখানে এক পেল্লায় চারতলা পাথুরে বাড়ি। বিশাল বিশাল থাম। আর তেমনি বড় বড় ঘর। ওই বাড়ির মধ্যে কেন, গেট দিয়ে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে গা-ছমছমানি শুরু হয়। আর বাড়ির মধ্যে ঢুকলে তো নিজের বুকেরই টিপ-টিপ শব্দ শোনা যায়।

"আমরা বাড়িতে ঢুকতেই ছ'ছটা জোয়ান লোক এগিয়ে এলো। তারা এখানকার ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের শ্রমিক কর্মচারী আর দু'জন হোটেলের বেয়ারা। আমাদের থাকার জন্য দোতলাটা সংস্কার করেছে। থাকা খাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা রেডি। রাতের হিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট চালু, খাবার মজুত রাখার ফ্রিজ চালু, টেলিফোনও চালু—কোনো কিছুতে ত্রুটি হওয়ার কারণ নেই। তবু কিছু দরকার হলে কাল সকালে যেন ফোন করা হয়। কারণ বিকেলের পর কেউ আর এ তল্লাটে আসে না, তারাও আসবে না। আর হোটেলের বেয়ারা জানালো, রোজ সকালে তারা গাড়ি নিয়ে একবার করেই আসবে, ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার সমস্ত দিনের টি আর কফি ইত্যাদি সবই দিয়ে যাবে।

"খাওয়ার ব্যাপারে আমার একটু দুর্বলতা আছে জানিসই তোরা। অনেক দিনের দোস্তি, ফুটবল টিমের ম্যানেজারও জানে। তাই আমার খাওয়ার সব থেকে জাঁদরেল ব্যবস্থা রাখার তাগিদ টেলিগ্রামেই দিয়ে রেখেছিল জানি। কিন্তু সমস্ত দিনের জন্য কি ব্যবস্থা হয়েছে বা দেখে বেয়ারা দুটোকে ছাড়ি কি করে। ওরা এক পেল্লায় ফ্রিজ খুলে দেখালো কি ব্যবস্থা। দুধ, এক পাউন্ডের একটা মাখনের তাল, ব্রেড, তিন রকমের দু'ডজন স্যান্ডউইচ, থোকা থোকা আঙুর, কলা, সুপ, ইনডিয়ান ডিশের চিকেন বিরিয়ানি আর প্রন ফ্রায়েড রাইস, আস্ত চারটে চিকেন রোস্ট, মস্ত এক রোল মার্টন স্টেক, ফ্রুট স্যালাড, আইসক্রিম। পাশের মিট সেফে, হরেক রকমের বিসকিট, জ্যাম, জেলি, টফি, স্ন্যাকস। দেখে আমার চক্ষু জুড়িয়ে গেল। তবু একটু খুঁতখুঁত করতে লাগল, সুইট-ওয়াটার ফিশের কোনো প্রিপারেশন নেই। আজ যা এনেছে কাল তার সঙ্গে ওই ব্যবস্থার হুকুম দিয়ে হোটেলের বেয়ারা দুটোকেও বিদায় দিলাম। ওরা চলে যেতেই লুসি লাফিয়ে উঠল, পিন্‌ডি! আমরা কি সব রাক্ষস যে রোজ এত খাবার আসবে!"

"যাক, সে-দিনটা ভালোয় ভালোয় কেটে গেল। কেবল সন্ধ্যা থেকে গা ছমছমানি একটু বাড়ল। চলতে ফিরতে কাছেই যেন ফোঁসফোঁস শব্দ, আর ওদিকে গাছপালার অবিরাম সড়সড় শব্দ। তার ওপর একটা মুশকিল ইলেকট্রিক লাইট নেই। ওরা চারটে বড় হ্যাসাক রেখে গেছে। দু'টো জ্বাললেই যথেষ্ট হয়, কারণ আমরা তো বড় হলঘরটাতেই থাকব ঠিক করেছি। একদিকে দুটো বেড জোড়া করা হয়েছে মিসেস জোন্‌স আর লুসির জন্য তারপর হলের আধাআধি একটা কার্টেন টাঙানো হয়েছে—কার্টেনের এধারে আমার বেড। সেই আসার পর থেকে আমার তো বেশির ভাগ সময় খেয়েই কেটে গেল। যা বলছিলাম, দুটোর জায়গায় চারটে হ্যাসাকই জ্বালা হল। হাড় কাঁপানো শীত। রুম হিটার চালিয়ে দিয়ে রাতের খাওয়া একটু তাড়াতাড়ি সেরে শুয়ে পড়া গেল। তখন অন্য হ্যাসাকগুলো নিভিয়ে বাথরুমে একটা হ্যাসাক শুধু জ্বলতে থাকল। মিসেস জোনস-এর তাতেও আপত্তি ছিল। তার আবার ঘুটঘুটে অন্ধকার না হলে ঘুম হয় না। সকলের কাছেই তো জোরালো টর্চ আছে, হ্যাসাক জ্বেলে রাখার দরকার কি? তবু প্রথম রাত, একটা আলো কাছাকাছির মধ্যে থাকাই ভালো মনে হল আমার।

"সকলেই ক্লান্ত ছিলাম। তাড়াতাড়ি শোয়া সত্ত্বেও সকালের আগে আর ঘুম ভাঙল না। প্রথম রাত এত নিরুপদ্রবে কাটতে সকলেই খুশি। পরে ধীরেসুস্থে সমস্ত বাড়িটাই তল্লাসি করার সংকল্প আমার। শুধু বাড়িটা কেন, কাস্‌লের গাছপালা ঝোপঝাড়ও। কিন্তু সকালে চা খেতে খেতে মিসেস জোনস-এর একটা কথা খচ করে কানে বিঁধল। সে বলল, মাঝরাতে একবার ঘুম ভাঙতে দেখলাম বাথরুমের দিকে হ্যাসাকটা নেভানো—কখন নেভালে? আমি নেভাইনি শুনে প্রথমে সে-ও অবাক একটু। তারপর বলল, ঘুমের চোখে কখন উঠে নিভিয়েছ এখন মনে করতে পারছ না।

"এ নিয়ে আমি আর তর্ক করলাম না। আমার বেশি ভয় লুসির জন্য। ও না ভয়টয় পায়। যাক সকালে আবার হোটেলের সেই দুই বেয়ারা এসে এক গাড়ি বোঝাই খাবার নামিয়ে দিয়ে গেল। ঘরদোর পরিষ্কার করে পুরনো বাসনপত্র নিয়ে চলে গেল। বেলা বারোটার প্রথম একজিবিশন খেলা। সময় ধরে গাড়ি এলো। আমরা চলে গেলাম। খেলা শেষ হবার পর আমাকে নিয়েই সকলে মিলে খানিক হৈ-চৈ করল। কারণ খেলা শুরু হওয়ার আগে আমি ওদের উৎসাহ দিয়ে বলেছিলাম, ছ' গোলে না জিতলে আমার মন ভরবে না, মনের দুঃখে আমি হয়তো ব্রেজিল ফিরে যাব। লাস্ট মিনিটের গোলে সেই ছ' গোলেই জিত্।

"বিকেল সাড়ে পাঁচটায় ব্যাক টু দি কাস্‌ল। প্রকাণ্ড গেট দিয়ে ঢুকতেই মনে হল হঠাৎ যেন বাতাসে ঘাটতি পড়েছে। গাছপালার পাতাও নড়ছে না। দোতলায় উঠেই মনে হল, একটু সোঁ সোঁ করে শব্দ করে সামনে থেকে খানিকটা বাতাস সরে গেল। তারপর থেকে যে-যখন হেঁটে চলে বেড়াচ্ছি মনে হচ্ছে পিছনে কেউ আসছে। পিছন ফিরলে কিছু না। শুধু আমি নয়, মিসেস জোন্‌স আর লুসিও মাঝে মাঝে চমকে চমকে পিছন ফিরে তাকাতে লাগল। হঠাৎ মিসেস জোন্‌স চেঁচিয়ে উঠল, পিন্‌ডি—ওই লোহার রডটা ওভেনে গুঁজে দিয়ে ডগডগে লাল করে রাখো তো—ছ্যাঁকা দিয়ে আমি ভূতের জন্মো ঘোচাতে পারি কি না দেখি—

"অমনি লুসি বলে উঠল না, আন্টি না, আমি কখনো ভূত দেখিনি, তুমি ভয় পাইয়ে দিও না। তারপর লুসিও চেঁচিয়ে উঠল, পিছন পিছন ঘুরঘুর করছ কেন, সামনে এসে দাঁড়াও না, একটু দেখতে দাও—আমি চট্ করে একখানা ছবি এঁকে ফেলি।

"সঙ্গে সঙ্গে অবাক কাণ্ড। হঠাৎ খানিকটা জমাট বাতাস যেন কিছুটা দূরে সরে গেল। তারপর কেউ যেন বেশ উত্তেজিত হয়ে ধুপধুপ শব্দ করে হাঁটতে লাগল। হাঁটছেই। এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে এদিক। খুব রাগ করে পা মাটি আছড়ে হাঁটলে যেমন হয়, তেমনি। এবারে আমি তাচ্ছিল্যের সুরে বললাম, অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন তোমরা, আমার নাম পিন্‌ডি, ওর পিন্ডি চটকাব বলেই তো এখানে এসে উঠেছি—ও যা করছে করুক, তোমরা দেখে যাও।

"পায়ে হাঁটার শব্দ থেমে গেল। কেউ যেন থমকালো। তারপর সাড়াশব্দ নেই।

"সন্ধ্যা হতে আবার চারটে হ্যাসাক জ্বালা হল। কিন্তু আধঘন্টা না যেতে ঝনঝন শব্দে দুটো হ্যাসাক ভেঙে গেল। কেউ যেন ডাণ্ডাপেটা করে ভাঙল ও দুটোকে। সঙ্গে সঙ্গে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, মিসেস জোন্‌স, এখুনি আমাদের হোটেলে ফোন করো, আমার ব্যবস্থা মতো এখুনি ট্রাক-বোঝাই এক রেজিমেন্ট সেই ট্রেনড্ লোক পাঠাতে বলো, আমাদের শান্তি নষ্ট করলে ওর শান্তিরও আজ বারোটা বাজিয়ে ছাড়ছি।

"মিসেস জোন্‌স টেলিফোনের দিকে ছুটল। তার ধারণা সত্যিই আমি ও রকম কিছু ব্যবস্থা করে রেখেছি। কিন্তু আশ্চর্য, গিয়ে পৌঁছানোর আগেই রিসিভারটা ক্রাডল থেকে আপনি উঠে মাটির ওপর আছড়ে পড়ল। মিসেস জোন্‌স ছুটে সেটা তুলে নিতে গেল। কিন্তু কেউ যেন লাথি মেরে ওটা আর একদিকে সরিয়ে দিল। একটা গাল পেড়ে মিসেস আবার ওটা ধরতে গেল। আবার কেউ

ওটা লাথি মেরে আর একদিকে সরালো। এই চলল প্রায় মিনিটখানেক। লুসি হঠাৎ হাততালি দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল।

"মিসেস জোন্‌স দাঁড়িয়ে গিয়ে হাঁপাতে লাগল। আমি চেঁচিয়ে বললাম, থাক মিসেস জোন্‌স, আর যদি একটা হ্যাসাক ভাঙে তাহলে ওই হতভাগাকে আমি যিশুখ্রিস্টের নাম নিতে শেখাব। কথা শেষ হতে না হতে একটা ঝড়ো হাওয়ার মতো কিছু হল ছেড়ে বেড়িয়ে গেল। আমি এগিয়ে এসে রিসিভারটা জায়গা মতো রাখলাম।

"সেই রাতটা মোটামুটি ভালোই কেটে যাবে ভাবলাম। সামনের দুটো রাত এখানে থাকা যাবে না কারণ, এর পরের এগজিবিশন খেলা পড়েছে ম্যানচেস্টারে, তার পরেরটা লীডস-এ। তারপর টীমের ম্যানেজারের সঙ্গে আমার ব্যবস্থা অনুযায়ী তিন রাত এই কাস্‌ল-এ থাকার সুযোগ পাব। হেস্তনেস্ত যা হয় তখন হবে। যাক, এই রাতের কথাই বলি। তোফা খেয়ে বেশ পাকা ঘুম এসেছিল। মাঝরাতে একটা স্বপ্ন দেখলাম। আশ্চর্য সেই স্বপ্নের মধ্যে যে নিজেও কথাবার্তা কইছি খেয়াল নেই। দেখলাম, জানালার কাছে একটা ধোঁয়াটে মূর্তি, পরনে ইংরেজদের সেকেলে পোশাক-আশাক। বেজায় গম্ভীর, বেজায় বিরক্ত, কানে টেলিফোনের রিসিভার লাগিয়ে কথা কইছে। তারের ভিতর দিয়ে তার গলা বিচ্ছিরি রকমের ফ্যানফেনে শোনাচ্ছিল। টেলিফোনেই শুনছি, বলছি! প্রথমেই বলল, খুব সাহস দেখাতে এসেছ—কেমন?

—সাহসের কি দেখলে? আমি জিগ্যেস করলাম।

—কোন সাহসে তোমরা আমার শান্তির ব্যাঘাত ঘটাতে এসেছ? তোমাদের আগে যারা এসেছে, তাদের হাল কি হয়েছে জানা আছে? নেহাত তোমাদের সঙ্গে ওই বাচ্চা মেয়েটাকে দেখে মায়া পড়ে গেছে তাই এখনো সহ্য করছি!

—কে তুমি?

—মাইকেল।

—কে মাইকেল?

—দেড়শ বছর আগে জন্মালে জানতে পারতে। অত খোঁজে দরকার কি—ওই বাচ্চা মেয়েটার জন্যেই তোমরা এখনো বেঁচে আছ.....ভালোয় ভালোয় কেটে পড়ো।

আমি জিগ্যেস করে বসলাম, বাচ্চা মেয়েটার জন্য কি রকম? তোমাদের আবার দয়া মায়া আছে?

—গাধার মতো কথা বোলো না! চটেই গেল।—গোরু ছাগল থেকে ভূত হয়েছি—না মানুষ থেকে? তাহলে মানবিক গুণ মানে মায়া দয়া থাকবে কেন? যাক এখন চললাম, এটা আমার লাস্ট ওয়ার্নিং মনে রেখো।

'হঠাৎ গায়ে ধাক্কা খেয়ে ধড়ফড় করে উঠে বসলাম। লুসি ঠেলছে আমাকে!—পিন্‌ডি, তুমি ঘুমের মধ্যে কি বকছ সেই থেকে?

'বলতে যাচ্ছিলাম স্বপ্ন। তার আগেই বন্ধ জানালার দিকে চোখ পড়তে আমি অবাক! ফোনের রিসিভার ছিঁড়ে কে জানলার কাছে ফেলে গেছে। লুসিও দেখে চেঁচিয়ে উঠল, আন্টি দেখে যাও, ওই পাজী ভূত কি কাণ্ড করেছে—একবার দেখা পেলে এমন বিচ্ছিরি করে ওকে আমি আঁকব যে লজ্জায় আর মুখ দেখাতে পারবে না।

—এবারে শোন্ আসল কাণ্ড। প্রোগ্রাম মতো দু'রাত বাইরে এগজিবিশান ম্যাচ শেষ করিয়ে দিয়ে আমরা আবার কাস্‌ল্-এ ফিরলাম। এবারে একটু সাবধানও হতে হল। ছোট দুটো 'ক্রস' লুসি আর মিসেস জোন্‌স-এর গলায় ঝুলিয়ে দিলাম। আর চকের গুঁড়ো দিয়ে নিজের বুকে বড় করে একটা রাম নাম লিখে রাখলাম। কিন্তু সন্ধে থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত কোন উপদ্রবের ব্যাপার

ঘটল না। তিনজনে ডাইনিং টেবিলে গিয়ে বসলাম, আর আমি বেশ জোর একখানা খ্যাঁট সেরে উঠলাম। লুসির খাওয়া আগেই শেষ হয়েছিল, সে শোবার ঘরে গেল।

—পিন্‌ডি! আন্টি শিগ্‌গির এসো। শিগ্‌গির!

'লুসির চিৎকার শুনে আমরা দু'জনে ছুটে এলাম। তারপর আমাদেরও চক্ষুস্থির। ঘরে মেঝেতে টকটকে রক্তের ধারা—ওদের শয্যার কাছ থেকে সেই রক্ত আমার শয্যার পাশ দিয়ে জানলার দিকে চলে গেছে।

'খানিকক্ষণ হাঁ করে থেকে আমি মেঝেতে ঝুঁকে রক্তটা পরীক্ষা করলাম। তারপর মিসেস জোন্‌সকে বললাম, জল নিয়ে এসো, ধুয়ে ফেলি। বসে বসে ভালো লাগছিল না, তবু একটা কাজ জুটল।..... সেই রাতেও তোফা ঘুমটি লাগিয়েছিলাম। কিন্তু তার মধ্যে জানলার কাছে আবার সেই মূর্তি। রাগে গরগর করে বলল, শিক্ষা হয়েছে, না এর পরেও আরো কিছু দরকার হবে? এই শেষবারের মতো আমি জানতে চাই, কালকের মধ্যে তোমরা এখান থেকে যাবে কি যাবে না?

'ফিরে জিগ্যেস করলাম, কাল কতক্ষণের মধ্যে?

—ছোট মেয়েটা সঙ্গে আছে, দুপুরের লাঞ্চ সেরেই কেটে পড়ো। নয়তো এমন বিভীষিকা দেখবে যে হাড়সুদ্ধ জমে যাবে।

'—আমি বললাম, লাঞ্চের পর যাওয়া হবে না—রাত দশটা পর্যন্ত সময় দাও।

'ফ্যাসফেসে গলায় খেঁকিয়ে উঠল, রাত দশটায় তোমরা এখান থেকে যাবে কি করে?

—সে আমরা বুঝব। না যাই তখন তুমি যা পারো কোরো। কিন্তু কথা দাও রাত দশটার আগে আমাদের ঘরের এই ত্রিসীমানায় তুমি ঘেঁষবে না।—ডান্?

—ডান্।

'—রাজি হয়ে সে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। পরদিন আর লুসি বা মিসেস জোন্‌সকে এ ব্যাপারে কিছুই বললাম না। সকাল থেকে তেমনি ফুর্তি করে খাওয়া-দাওয়া গল্পগুজব চলল। দুপুর গড়ালো, সন্ধে হল, রাত হল। ন'টায় ডিনারও সেরে ফেললাম। তারপর আমার কাজের পালা। ফিসফিস করে মিসেস জোন্‌স আর লুসিকে বললাম, এখন আমি এমন কিছু করতে যাচ্ছি যা তোমরা শুধু চোখ চেয়ে দেখবে—একটি কথাও বলবে না—কি-চ্ছু জিগ্যেস করবে না। আমার কাজ শেষ হলে সব ঘর অন্ধকার করে শুয়ে পড়বে। তারপরে একঘন্টা অন্তত জেগে থেকে লুসির সঙ্গে গল্প করবে হাসাহাসি করবে—লুসি ইচ্ছে করলে শুয়ে গলা ছেড়ে একটা-দুটো গানও গাইতে পারে।

'—চারদিকের দরজা-জানলা বন্ধ করে এবারে আমি লুকনো জায়গা থেকে আমার দুটো সরঞ্জাম বার করলাম। একটা কালো রঙের সরু দড়ি, আর একটা বড় মাটির হাঁড়ি। ফ্রিজ থেকে কনকনে ঠাণ্ডা জল এনে হাঁড়িতে ভরলাম। তারপর জানলা থেকে তিন হাত দূরে সেই দড়ি বেঁধে হাঁড়িটা ঝুলিয়ে দিলাম। কিন্তু আড়াআড়ি দড়িটার একদিক ভিতরের দেয়ালের হুকের সঙ্গে এমন করে বাঁধলাম যাতে একটু নাড়া পড়লেই ওটা খুলে যায়। সব ব্যবস্থা করতে আধঘন্টাও লাগল না। তারপর মিসেস জোনস আর লুসিকে বিছানায় পাঠিয়ে আমি আলো নিভিয়ে সন্তর্পণে জানলাটা খুলে দিলাম। চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার এখন। পা-টিপে আমি নিজের বিছানায় চলে এলাম।

'—মিসেস জোনস আর লুসির টুকরো কথা আর হাসি কানে আসছে। একটু বাদে লুসি গানও ধরল। আরো মজা, হেঁড়ে গলায় মিসেস জোন্‌সও তার সঙ্গে বেসুরে গাইতে লাগল। আমি এদিক থেকে গলা চড়িয়ে তারিফ করতে লাগলাম। আমার হাতঘড়িতে অন্ধকারেও সময় দেখা যায়। রাত তখন দশটা বেজে এক মিনিট। হুড়মুড় করে একটা জমাট বাতাস খোলা জানলা দিয়ে ঢুকে পড়ল। তারপরে কিছুর সঙ্গে বড়সড় একটা ঠোক্কর খাওয়ার শব্দ। ফ্যাসফ্যাস গলার জোর আওয়াজ একটা কেউ যেন ধরাশায়ী হল—আর একই সঙ্গে কনকনে ঠাণ্ডা জল ভরতি মাটির

হাঁড়িটা, পড়ে ভেঙে চৌচির। তাড়াতাড়ি আমরা যে যার টর্চ জ্বাললাম। মেঝেময় ভাঙা হাড়ির টুকরো। জলে জলাকার। আমি হেসে মিসেস জোন্‌সকে বললাম, এবার নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোও আর জাগার দরকার নেই।

'—মিসেস জোন্‌স জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু ব্যাপারখানা কি হল?

'—ব্যাপারখানা কি হল সেটা হয়তো কাল বোঝা যাবে। আমিও বলতে পারছি না। এখন যে যার শুয়ে পড়ো।

'পরদিন। সকালটা আমরা বেশ হৈ-চৈ করে কাটিয়ে দিলাম। পড়ো বাগান দেখালাম, জঙ্গল গাছপালাগুলো ঘুরে ঘুরে দেখলাম। কাস্‌ল-এর এক তলায় ঘুরলাম। কোথাও অস্তিত্ব টের পেলাম না। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ঘন্টা দেড়েক গড়াগড়ি করে আমি একলাই পা টিপে উঠে এলাম। তিনতলা আর চারতলাটা দেখার মতলব।.....তিনতলাটা খাঁ খাঁ করছে। আমার সাড়া পেয়ে বাদুড় চামচিকে ঝটপট করছে। কিন্তু চারতলার সিঁড়িটা কোন দিকে? কোণের দিকে লোহার একটা সরু প্যাঁচানো সিঁড়ি চোখে পড়ল। ওটার সামনে দাঁড়িয়ে উঠব কি উঠব না ভাবছিলাম। হঠাৎ ওই চারতলা থেকেই ফ্যাঁসফেসে গলায় একটা হাঁচি কানে এলো। আমি কান পাতলাম, একটু পরে পরেই আরো গোটাকতক হাঁচি। পায়ে পায়ে লোহার ঘোরানো সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠতে লাগলাম। হাঁচির শব্দ বাড়ছেই.....ছাদে পৌঁছলাম। কিন্তু এমন দৃশ্য দেখব কল্পনা করিনি। ছাতের চিলেকোঠার সামনে হাত-পা ছড়িয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে সেই ধোঁয়াটে মূর্তি। তার আলখাল্লা টালখাল্লা তখনো জবজবে ভিজে। একের পর এক হেঁচে চলেছে। আর এমন বিমর্ষ মুখে বসে আছে যে আমারও খারাপ লাগল।

"পায়ে পায়ে সামনে এগিয়ে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, মাইকেল?

"—জানোই তো আবার জিগ্যেস করছ কেন। কি হাল আমার করেছ ভালো করে দেখ। মানুষ না হয়েও আমার যেটুকু মানবিক বোধ আছে, মানুষ হয়েও তোমার তা নেই। অমন হাড় জমানো শীতের রাতে বজ্জাতি করে এভাবে ভিজিয়ে মারলে, আমরা আগুনের কাছে যেতে পারি না—সেই থেকে হেঁচে হেঁচে মরে যাচ্ছি—একটু মায়া দয়াও নেই তোমার?

"আমি বললাম, অতটা করা আমার সত্যি অন্যায় হয়েছে মাইকেল—কিন্তু তুমিও বজ্জাতি কম করোনি, লুসির ছবি আঁকার রঙের বাক্স থেকে লাল রং চুরি করে তাই গুলে তুমি রক্তের দাগ এঁকে ভয় দেখাতে চেয়েছিলে। বাচ্চা মেয়েটা তার রং খোয়া গেছে জানলে কেমন দুঃখ পাবে বলো তো?

"আবার তিনটে হাঁচি দিয়ে সে মুখ গোমড়া করে বলে উঠল, তুমি একটা বদ-খৎ চালাক লোক।

"আমি বললাম, তা ছাড়া তুমি আরো অন্যায় করেছ—ওই লুসির বাবাকে তুমি ভয় দেখিয়ে পাগল করেছ—তাইতেই সে গাড়ি চাপা পড়ে মারা গেছে।

"আবার হাঁচতে হাঁচতে মনে করতে চেষ্টা করল। তারপর বলল, সেই লোকটা লুসির বাবা বুঝি....। কিন্তু আমি তার ক্ষতি করতে চাইনি, ভয় দেখিয়ে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম শুধু।

"—কি ভয় দেখিয়েছিলে?

"নিচের ওই বাগানে আমার স্ত্রীর ষড়যন্ত্রে কি ভাবে আমাকে গলা টিপে মারা হয়েছিল, আর তারপর কিভাবে আমার এক বিশ্বস্ত বন্ধুকে বুকে ছুরি বসিয়ে হত্যা করা হয়েছিল—সেই দুটো দৃশ্য।

"শুনে আরো দুঃখ হল। বললাম, থাকগে, এখন আমাদের আর কোনো রাগ নেই তোমার ওপর। আমরা কালই এখান থেকে চলে যাব।

"আবার দুটো হাঁচি দিয়ে ধোঁয়াটে মুখখানা বেজার করে মাইকেল বলল, এরপর তোমরা গেলেই বা কি আর থাকলেই বা কি—আমি এক্ষুনি আত্মহত্যা করব।

"আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম—কেন তোমার আত্মহত্যা করার কি হল?

"—কি হল সে তুমি বুঝবে কি করে। মাইকেলের গলার স্বর আরো বিষণ্ণ, কিন্তু একটু তপ্তও। বলে গেল, এ জীবন আমার এমনিতেই ভালো লাগছিল না....তার মধ্যে একমাত্র সান্ত্বনা ছিল মানুষ আমাকে ভয় করে—মানুষের এই ভয়টুকুই সব ভূতের সম্বল—কিন্তু মানুষ যদি ভয়ই না করল, আর বেঁচে থেকে লাভ কি—তুমি ছেড়ে ওই বাচ্চা মেয়েটা আমাকে ভয় পেল না। আর তিন মিনিটের মধ্যে দেখবে ওই পেল্লায় উইলো গাছের মস্ত একটা ডাল মাটিতে ভেঙে পড়েছে—তক্ষুণি বুঝবে আমি খতম।

"আমি অবাক। বলে উঠলাম, এতটুকু উঁচু থেকে লাফিয়ে পড়লে ভূতেরা মরে যায়।

"শেষ তিনটা হাঁচি দিয়ে মাইকেল উঠে দাঁড়াল। সজল গলায় বলল, অত বুদ্ধি ধরেও বোকার মতো কথা বলো কেন। ওই গাছের ডালে বসে ছোট এক টুকরো ডাল দিয়ে ক্রস্ বানিয়ে বুকে ঠেকালেই ভূতের খেলা শেষ।

"কথা শেষ হবার আগেই মাইকেল অদৃশ্য হয়ে গেল। দেখতে দেখতে উইলো-গাছের একটা মস্ত ডাল দুলে উঠল। আমি হাঁ হয়ে দেখছি। দেখতে দেখতে সেই বিশাল ডালটা চচ্চড় করে ভেঙে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ল।"

হাবুল, কার্তিক, কেবলু, চটপটি আর আমি বিমূঢ়ের মতো বসে আছি। পিন্‌ডিদা থামার পরেও আমরা সেই রেড কাস্‌ল এর মধ্যেই ঢুকে বসে আছি। পিন্‌ডিদা একটুও দম নেবার সময় না দিয়ে চট্ করে আমার দিকে ঘুরে জিগ্যেস করল, কিরে সোনা, মনবিক ভূত মাইকেলকে কেমন লাগল?

আমার তেমনি অভিভূত অবস্থা। গলা দিয়ে আপনি বেরিয়ে এলো, চমৎকার!

এবার ঘাড় বেঁকিয়ে আমার দিকে তেরছা চোখে তাকালো পিন্‌ডিদা।— বলছিস?

এতক্ষণে খেয়াল হল কি ভুলটা করে ফেললাম। কিন্তু আশ্চর্য, এর পরে গচ্চার কথাটা ভেবেও ভিতরে ভিতরে আমার খুব একটা আফসোস নেই।

## পিন্‌ডিদা ও মা উৎকোচেশ্বরী

খবরটা গোটা বর্ধমান শহরেই ছড়িয়ে পড়ল বোধহয়। আমার বাড়ি থেকে বেরুনো দায়। চেনাজানা যার সঙ্গেই দেখা হয়, মুখে এক প্রশ্ন ব্যাপারখানা কি? তোমার বাবার মতো মানুষ, তাঁর নামে কিনা...ইত্যাদি। আমার মনে হয়, ওই সরল বিস্ময়ের পিছনে একটা হুল উঁচিয়ে আছে। আসলে তারা যেন বলতে চায়, তোমার বাবাটির বাইরে এমন ভালো মানুষের মুখোশ, আর ভিতরে এই চীজ্।

আমার রাগ হয়ে যায়। আর শেষে এমন দাঁড়ালো যে যাকে নিয়ে হঠাৎ এত কাণ্ড, তার ওপরেই, অর্থাৎ কিনা, আমার বাবার ওপরেই রাগ হতে লাগল। না, আমার বাবা যথার্থই এমন একটা ছোট কাজ করতে পারে এ আমি একটু বিশ্বাস করি না। বাবার সঙ্গে আমার হাজারো ব্যাপারে মতের অমিল। বাবা ডাইনে যেতে বললে ভিতরে ভিতরে আমার বাঁয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

বাবার উপদেশগুলো অনেক সময় আমার চিরতার জলের থেকেও তেতো লাগে। তার হুকুমেই সকালে উঠে রোজ ওই অখাদ্য তরল জিনিসটা আমাকে গিলতে হয়। হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুলেই দেখা যাবে আমি প্রথম না হই, প্রথম দশ জনের মধ্যে একজন হয়েছি, তবু বাবার ধারণা, আমি এক নম্বরের ফাঁকিবাজ, আর যেভাবে একজন স্কলারের নিজেকে তৈরি করা দরকার, আমি নাকি তার কয়েক মাইলের মধ্যেও নেই। অথচ আমি মাকে বুঝতে না দিয়ে গল্পের ছলে মায়ের কাছ থেকে কথায় কথায় জেনেছি, বাবা তার সময়ের টায়েটোয়ে ফার্স্ট ডিভিসন, ইন্টারমিডিয়েটে তার থেকে সামান্য ভালো। বাবার ভালো রেজাল্ট শুরু হয়েছে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হবার পর থেকে। সেই বাবা যখন একজন হবু জেনারাল স্কলারকে উঠতে-বসতে টাইট্ দেয়, তখন কার ভালো লাগে? তবু আমি ভাবতেই পারি না, বাবা কক্ষনো কোনো ছোট কাজ করতে পারে। এই বর্ধমান শহরে বাবা সেরা ডাক্তারদের একজন! এখন তো এ-জায়গায় বিলেতফেরত ডাক্তারের ছড়াছড়ি। কিন্তু মনে মনে বোধহয় বাবাকে তারাও হিংসে করে। আমার ধারণা, পুরনো দিনের সম্পর্ক ছাড়াও এর একমাত্র কারণ, বাবা রোগীকে ভালবাসে, তার সুবিধে-অসুবিধের কথা বোঝে। সকলে বলে, এই পসারে বাবার অঢেল টাকা। অঢেল কাকে বলে, আমার তেমন স্পষ্ট ধারণা নেই। তবে এটা ঠিক, আমাদের অভাব-টভাব কিছু নেই। কিন্তু একমাত্র ছেলে হয়েও টাকার দরকারে আমাকে মায়ের পিছনে ঘুরঘুর করতে হয়, ফাঁক পেলে ঠাকুমার হাত-বাক্স হাতাতে হয়। অঢেল কথাটায় অর্থ আমি বুঝব কি করে? যাই হোক, যদি ধরেই নেওয়া যায় আমাদের অবস্থা মোটামুটি ভালো, সেটা কি বাবার রোগীর মাথায় ডাঙশ মেরে, না রোগী ঠকিয়ে? বাবা কত রোগীকে বিনে পয়সায় দেখে, দরকার হলে যেচে বিনে পয়সায় ওষুধপত্র পর্যন্ত দেয়, এ আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি! বাবার প্রতি দারুণ বিশ্বাস না থাকলে, এই গোটা এলাকার রোগীরা এত ডাক্তার থাকতে সবার আগে বাবার কাছে ধরনা দেয় কেন?

এই বাবাকে নিয়ে এত কথা, এত কৌতূহল আর হয়তো বা এত কানাকানি ছেলে হয়ে আমি বরদাস্ত করি কি করে! আমি বাবার সুপুত্তুর না হই, নিজেকে খুব কুপুত্তুরও ভাবি না। ভাবি না বলেই, থেকে থেকে আমার বাবার ওপরে পর্যন্ত রাগ হয়। আমি তার একমাত্র ছেলে। আর দু'দিন বাদে হায়ার সেকেন্ডারির রেজাল্ট বেরুবে। আমার ধারণা, এই বর্ধমানের চেনা-মহলে তখন অন্তত একটা হইচই পড়ে যাবে। (ঠাকুর দোষ নিও না, আমি গর্ব করে কিছু বলছি না—বাবার জন্যে মনের তাড়নাতে এমন চিন্তা মাথায় আসছে।) সেই আমি কি না যাকে বলে একেবারে অন্ধকারের মধ্যে পড়ে আছি! বিষয়ের লোভে বাবা এত ছোট আর এত নীচ কাজ করতে পারে, আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু কৌতূহল যাদের হয়, এ নিয়ে যারা আমাকে পাঁচ কথা শুধোয়, সহানুভূতিও দেখায়, তাদের মুখ ভোঁতা করে দেবার মতো কিছু হদিশ তো আমাকে পেতে হবে। বাবা তো যেচে আমাকে একটি কথাও বলে না। মাকে জিগ্যেস করলে ধমক খেতে হয়, বলে তুই ছেলেমানুষ, তোর এ সবে মাথা দেওয়ার দরকার কি— পড়াশুনার পাট কি শেষ হয়েছে, না বাকি আছে?

আমার ধারণা, ব্যাপারটা নিয়ে মায়েরও ভিতরে ভিতরে দুশ্চিন্তা আছে। নইলে আমি হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দিয়েছি—তাই ভুলে গেল কি করে? ঠাকুমা যেটুকু জানে তাও বোধহয় ভাসা ভাসা। রাতে তাকে জড়িয়ে ধরে (এ আমার বরাবরের অভ্যাস) কথাটা তুলতে রাগে দুঃখে ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতেই লাগল, আর সেই সঙ্গে গলা দিয়ে গরম আগুন ছড়াতে লাগলো...যারা বলে লোভে পড়ে তোর বাপ অন্যের বিষয়ে গেলার চেষ্টায় আছে, তাদের অদেষ্টে অনেক দুঃখু আছে— বুঝলি? মাথার ওপর একজন আছে না, সব দেখছে না। —সব বুঝছে না? এত বড় মিথ্যের জাল ফেলে বসে ওই সাধন উকিলের ভালো হবে আমার অমন শিবের মতো ছেলের মাথায় এত বড় অপমানের বোঝা চাপিয়ে সে পার পাবে ভাবিস?

গণ্ডগোলটা বেঁধেছে পাশের বাড়ির উকিল সাধন চট্টরাজের সঙ্গে, এ আমি জানি। আর এও জানি, গণ্ডগোল শুরু হয়েছে আমাদের দু'বাড়ির মাঝে পার্টিশন ওয়াল অর্থাৎ দেয়াল তোলা নিয়ে। সাধন চট্টরাজ দেওয়াল তুলতে গিয়েছিল। বাবা লোক ডাকিয়ে সেই দেওয়াল ভেঙে দিয়েছে। আর তার পরেই কোর্টকাছারি শুরু হয়ে গেছে, এটুকু আঁচ করার মতো বুদ্ধি আমার আছে।

কিন্তু মূল ব্যাপারখানা কি, আমি তাই জানি না। বাবা ও এলাকার নামডাকের ডাক্তার—তার একটা বিশেষ মান-সম্মান আছে। সেই মান-সম্মানের আমিও একটু ভাগীদার এ অস্বীকার করব না। ওই বাবার ছেলে বলে এ এলাকার অনেকেই আমাকেও একটু খাতির-টাতির করে। আরো খাতির করে এইজন্যে যে, বাবা পাড়ার কোনো লোকের থেকে ফীজ্ নেয় না। সকলেই অনেক দিনের পুরনো চেনাজানা। তাদের জন্য বাবার একটু দরদ থাকা তো স্বাভাবিক কথা। কিন্তু পাড়ার লোক এটুকুই বড় করে দেখে। অসুখ না হলে তারা বাবার নাগাল পায় না, আমার নাগাল হামেশাই পায়। ফলে বাবার পাওনা খাতির যত্নটুকু অনায়াসে আমার দিকে গড়ায়।

যাক, বাবাকে দিনকে দিন একটু বেশি গম্ভীর দেখে আর তার মন-মেজাজের হাল দেখে আমার চিন্তা বেড়েছে। গোটা ব্যাপারখানা জানার জন্য আমি ছটফট করছি। কারণ ঠারে-ঠোরে পাড়া-পড়শীর কৌতূহল আমারও বিরক্তির কারণ হয়ে উঠেছে। শেষে সবকিছু জানা বা বোঝা গেল চটপটির চেষ্টায়। আমি জানতাম বাবার সঙ্গে সাধন চট্টরাজের কেস শুরু হয়ে গেছে—আর এও জানতাম বাবার দিকের উকিল চটপটির এক দূর সম্পর্কের কাকা। তার নাম ধূর্জটি ঘোষাল, বাবার খুব বন্ধু মানুষ। আমাদের বাড়িতে আত্মীয়ের মতো বহুকালের যাতায়াত। উকিল হিসেবেও বেশ নামডাক আছে তার।

আমার দুশ্চিন্তা তো দেখছেই, তার ওপরে পাঁচ মনের পাঁচ রকম কথা শুনে চটপটি নিজের থেকেই তৎপর হয়ে উঠল। দূর সম্পর্কীয় কাকার বাড়িতে তার যাতায়াত শুরু হল। দূর সম্পর্কের সেই কাকিমা আর খুড়তুতো ভাইবোনের সঙ্গে নতুন করে ভাব জমিয়ে ফেলল। আমার থেকে পঞ্চাশ টাকা নিয়ে তাই দিয়ে একটা কতলা মাছ কিনে ওই মাছ ওমুক বন্ধুর পুকুরে ধরেছে বলে তাদের দিয়ে এলো। তারা নিতে আপত্তি করেছিল, অত বড় একটা মাছ ধরা হয়েছে যখন, বাড়িতে না নিয়ে গিয়ে এখানে কেন? অম্লানবদনে চটপটি মিছে কথা বলেছে। বলেছে, এমনই বরাত জোর, একটা নয়, দু' দুটো মাছ ধরা হয়েছে। বাড়িতে যেটা নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেটা এক থেকেও বড়। এমন সাধের মাছ পচবে, নষ্ট হবে? তাই ওখানে নিয়ে আসা।

এর পর ওই মাছ নিতে কার আর আপত্তি হতে পারে? মোট কথা, সাত দিনের মধ্যে অনেক দিনের অদেখা ধূর্জটি ঘোষালের ভাইপোটি ভারি আপনার জন হয়ে উঠল। চটপটি তাদের কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করল!

ওদিকে ধূর্জটি কাকিমা বা তার ছেলেমেয়ের সঙ্গেও আমাদের বাড়ির সঙ্গে খাতিরের সম্পর্ক। আমাদের বাড়িতে তাদের যথেষ্ট আনাগোনা। ফলে প্রসঙ্গ উঠতে তারাই গলগল করে সব বলে দিলে। এমন এক চক্রান্ত যা শুনে আমারও শিরায় শিরায় আগুন জ্বলতে থাকল।

চটপটির আর আমাদের বাড়ির খবর জুড়লে যা দাঁড়াল তা তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠার মতোই। আট মাস হল বর্ধমানে খুব কড়া এক নতুন সাব-জজ এসেছে। সে নাকি আবার শাখায়-প্রশাখায় সাধন চট্টরাজের আত্মীয়। ওই হাকিম আসার পর থেকেই অনেক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে। বাবার বিরুদ্ধে তার কাছে একের পর এক উড়ো চিঠি যাচ্ছে। অভিযোগের সার কথা একই।— ওমুক টাকার পিশাচ ডাক্তার (অর্থাৎ আমার বাবা) নানা ছলে বলে-কৌশলে রোগীর হাড় নিঙড়ে টাকার পাহাড় করেছে। এখনও করছে। গরিবেরা তাই ধর্মাবতারের শরণাপন্ন—এমন বিপজ্জনক মানুষ সমাজের বুকে দুষ্ট ক্ষতের মতো, এর বিহিতের জন্য গরিবেরা কার কাছে যাবে? অভিযোগ, অমুক

বাড়ি ওমুক রোগী মারা গেল (সত্যিই মারা গেছে) স্রেফ ওমুক ডাক্তারের (অর্থাৎ আমার বাবার) গাফিলতিতে। ওই অর্থগৃধ্নু ডাক্তার একটুকু কর্তব্যপরায়ণ হলে একটি গরিবের সংসার বেঁচে যেত। কিন্তু অনেক আগে খবর পেয়েও ওই ডাক্তার যখন এলো তখন সব শেষ। মৃতের অসহায় বিধবা পত্নীর কাছ থেকে ওই অর্থপিশাচ ডাক্তার তার ফী আদায় করে তবে ডেথ্ সার্টিফিকেট দিলে। ফী না পেলে সে ডেথ্ সার্টিফিকেট দেবে না এবং তার ফল কি হবে, সেই হুমকি দিয়ে টাকা আদায় করে সে চলে গেছে। এদেশে কি আইন নেই, বিচর নেই? বাবার বিরুদ্ধে ওই সাব-জজের কাছে বেনামী চিঠি আসছেই, আর অভিযোগেরও শেষ নেই। —ওমুক ডাক্তারের সঙ্গে (বলা বাহুল্য আমার বাবার সঙ্গে) অনেক নিকৃষ্ট স্তরের সমাজবিরোধীর যোগাসাজশ, টাকার বিনিময়ে সে তাদের অসুস্থতার সার্টিফিকেট দেয়—অর্থাৎ ওমুক ডাকাতি বা ওমুক খুনের সময় অভিযুক্ত লোক তার চিকিৎসাধীনে ছিল। এরকম সার্টিফিকেট পেলে ফাঁসির আসামীও কলা দেখাবে না তো কী?

একজন সাব-জজের সঙ্গে আমার বাবার মতো এক প্রাইভেট ডাক্তারের সম্পর্কটা কি, যে এমন করে তার কান বিষনো হচ্ছে! সমস্ত ব্যাপারখানা বোঝা গেল যখন এসবের পরে পাশের বাড়ির উকিল আমাদের খানিকটা জমি দখল করতে গেল, আর বাবা রেগেমেগে লোক ডাকিয়ে সেই দেয়ালে সেই দেয়াল ভেঙে দেবার ফলে সাধন চট্টরাজ বাবার নামে কোর্টে কেস ঠুকে দিলে। বিচারক তার দূর সম্পর্কের আত্মীয়। সব জানার পর আমার এখন বদ্ধ ধারণা, কেস শুরু কারার আগেই সাধন চট্টরাজ যেভাবে হোক, ওই কড়া সাব-জজের কাছে ধরনা দিয়ে বুঝিয়েছে, আমার লোভী বাবা কীভাবে তার জমি দখল করার মতলবে পার্টিশান দেওয়াল ভেঙে দিয়েছে। বাবার বিরুদ্ধে উড়ো চিঠি পেয়ে যার কান-মন এত বিষিয়েই আছে—সে সাধন চট্টরাজের কথা বিশ্বাস করবে, এ আর বিচিত্র কি? এমনও হতে পারে, দূর সম্পর্কের আত্মীয় সাধন চট্টরাজকে সে-ই কেস ঠুকে দেবার পরামর্শ দিয়েছে। আগে থাকতে আট-ঘাট বেঁধে বাবার বিরুদ্ধে ওই সব উড়ো চিঠি যে সে-ই পাঠিয়েছে, তাতে আর সন্দেহ কি? নইলে কে কবে শুনেছে যে প্রাইভেট ডাক্তারের বিরুদ্ধে একজন সাব-জজের কাছে গাদা গাদা উড়ো চিঠি যায়?

কিন্তু তখনো আমি তিমিরে সেই তিমিরে। আমার স্থির বিশ্বাস, ওই জমি আমাদের না হলে বাবা চট্টরাজের তোলা দেয়াল ভেঙে দিত না। আরো বিশ্বাস, চট্টরাজ যদি তার সুবিধের জন্যে বাবার কাছে আগে থাকতে ওই জমিটুকু চাইতো, বাবা তাও দিয়ে দিত। কারণ বাবা সর্বদা মিষ্টিমুখ ওই চট্টরাজকে তো একটুও অপছন্দ করত না। তার ওই বাড়ির জমিও তো এক সময় আমাদেরই ছিল। সতীর্থ ধূর্জটি ঘোষাল চট্টরাজের হয়ে অত সুপারিশ করতেই না বাবা জলের দরে ওই জমিটুকু তাকে ছেড়ে দিয়েছিল! ধূর্জটি ঘোষালও কি তখন জানত চট্টরাজ এই চরিত্রের মানুষ! ইদানীং এই অশান্তির মধ্যে মা আর ঠাকুমার কথাবার্তা থেকে জেনেছি, জমি কেনার সময়েই চট্টরাজ নাকি ওই বাড়তি জমিটুকুর দখল পাবার জন্য বাবার কাছে অনেক হাত কচলেছিল। কিন্তু বাবা রাজি হয়নি, কারণ সময়ে তার সামনের দিকেও ঠাকুমার জন্য একটু জবা ফুলের বাগান করে দেবার ইচ্ছে ছিল। আমার বিশ্বাস, বাবা বরাবরই অনুনয়ে গলে যায়, তার বদলে চট্টরাজ কয়েক বছর বাদে ওই জোচ্চুরির রাস্তায় এগোতে বাবা খেপে গিয়ে তার দেওয়াল ভেঙে দিয়েছিল। কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না, চট্টরাজ কি করে কোর্টে প্রমাণ করবে যে ওই জমি তার? কিন্তু কেস-এর ফলাফল যে ক্রমশ তার দিকেই ঢলছে, তা বাবা মায়ের মুখ দেখে আর ঠাকুমার গনগনে কথা শুনেই বোঝা যাচ্ছে। আমি মাথা খুঁড়েও বুঝতে পারছি না চট্টরাজ কোন্ জোরে কেসে জেতার আশা করছে? করছে যে, এ তার মুখ দেখেই বোঝা যায়। আসতে যেতে তার মুখে ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপ উছলে পড়ে। যেতে আসতে দেখা হলে বিনয়ের যেন একেবারে আমসত্ত্বখানা, দুধে গলানোর মতো করে এখনো জিগ্যেস করে, ভালো আছ তো? কিন্তু আমার তাকে দেখলে একটা

হিংস্র জানোয়ারের মতো মনে হয় এখন। ওই হাসির তলায় যেন দাঁত কড়মড় করছে আর বলছে, দেখো, তোমাদের এত সুনাম কেমন চিবিয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিই আমি।

সাধন চট্টরাজের ওই মুখ দেখলে এক কথায় এখন আমার গা জ্বলে যায়. মুখের দিকেও তাকাই না।

চট্টরাজের এই জোরের খবরটা বাবার বন্ধু উকিল ধূর্জটি ঘোষালের বাড়ি থেকেই চটপটি সংগ্রহ করল। আপনার জনের মধ্যে এমন একখানা ব্যাপার, ঘোষাল গিন্নি নিজে থেকেই সোয়ামীকে জেরা করে করে সব খবর শোনে। চটপটি যা বলল, শুনে তো আমার চক্ষু চড়কগাছ।

চার মাস আগে বাবার কাছে এক পেশেন্ট এনে হাজির করেছিল সাধন চট্টরাজ। তারই বড় সম্বন্ধী। কলকাতার কোন এক মার্চেন্ট অফিসের ভালো চাকুরে। ক্রমাগত অসুখে ভোগার ফলে বাধ্য হয়েই তখন সদ্য সদ্য রিটায়ার করেছে। গল ব্লাডার, ডায়বেটিস, সঙ্গে আরো কত কি। আমরাও সপরিবারে তাকে সাধন চট্টরাজের বাড়িতে থাকতে দেখেছি। বড় সম্বন্ধীকে সে বুঝিয়েছে, ডাক্তার বলতে বিধান রায়ের পরে পশ্চিমবাংলায় একজনই আছে —সে হচ্ছে ওমুক, অর্থাৎ আমার বাবা। সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী, তাঁর মনে জন্মজন্মান্তরে বাবা নিশ্চয় অশ্বিনী ভাই দু'জনের একজন ছিল। তার প্রাণের দায়ে ভদ্রলোক কলকাতা ছেড়ে ভালো চিকিৎসার আশায় এই বর্ধমানে ছুটে আসবে, সে আর বেশি কি। প্রাণের মায়ার থেকে বড় আর কিছু আছে না কি।

সাধন চট্টরাজ বাবাকেও ঠিক ওই এক কথাই বলেছে—বড় আশা করে আর বড় মুখ করে বড় শালাকে আপনার হাতে সঁপে দিচ্ছি—দেখলাম তো অনেক, আমার এত বিশ্বাস ভূ-ভারতের আর কোনো ডাক্তারের ওপর নেই—আপনি দয়া করে ভার নিন, যা করা দরকার করুন, খরচের জন্য কিছু ভাববেন না—একটি অবধি পয়সার জন্য আমি দায়ী থাকলাম।

এ কথার অর্থ, ওই বড় সম্বন্ধী ভদ্রলোক সবে রিটায়ার করেছে, তার আগে এদিকে কলকাতায় চিকিৎসা করতে করতে ফতুর হয়ে গেছে না কি, প্রভিডেন্ট ফান্ড আর গ্র্যাচুইটির টাকা পেতে মাস দেড় দুই লাগবে—চিকিৎসা খরচের কড়াক্রান্তি তখন দিয়ে দেবে।

কলকাতায় ডাক্তারের চিকিৎসা বন্ধ করে বড় সম্বন্ধীকে বাবার চিকিৎসার জন্য এই বর্ধমানে ধরে আনা হয়েছে শুনে বাবা বেশ বিব্রত হয়েছিল। কিন্তু অমন তোয়াজে কার না মন ভেজে। এনেই ফেলেছে যখন, বাবা চিকিৎসায় মন দিল। সত্যিই অনেক রকমের ব্যাধি ভদ্রলোকের—সবার ওপর গল ব্লাডারে স্টোনের ব্যাপার তো আছেই। বাবা চিকিৎসা শুরু করে। আর একটা সুবিধে, বাবা এখানকার সব থেকে বড় হাসপাতালের সঙ্গে অ্যাটাচড। সমস্ত ডাক্তার আর সার্জন বাবার বন্ধু। অন্যদিকে, রোগী হাতে নিলে বাবা টাকার কথা মোটে ভাবেই না।

তাছাড়া পাশের বাড়ির অমন অমায়িক ভদ্রলোক যখন দায়িত্ব নিয়েছে ভাবার আছেই বা কি।

প্রায় দু'মাস চিকিৎসার পর ভদ্রলোকের সত্যিই অনেকটা উপকার হল, অনেক উপসর্গ কমল। কিন্তু গল ব্লাডারের গণ্ডগোল গেল না। ওদিকে রোগীটি বেজায় ভীতু, অপারেশনে কিছুতে রাজি না। শেষে বাবা তাকে এমন কথাও বললে, আপনি নির্ভয়ে অপারেশন করুন, আপনার জীবনের জন্য আমি জামিন থাকলাম। এতদিন চিকিৎসার ফলে বাবার ওপর ভদ্রলোকের অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা। শেষ পর্যন্ত অপারেশনে রাজি হল। বাবাই সব ব্যবস্থা করল। এখানকার সব থেকে নামী সার্জন দিয়ে অপারেশন হয়ে গেল। তখন পর্যন্ত রোগী বা সাধন চট্টরাজের এক পয়সাও খসে নি। মাঝখানে বাবা আছে, বাবারই পেশেন্ট—টাকার প্রশ্ন ওঠেই নি। ও তো পাওয়া যাবে।

ভদ্রলোক মোটামুটি সুস্থ হয়ে কলকাতায় ফেরার দিন কতকের মধ্যেই টাকা পাওয়া গেছে। সাধন চট্টরাজই তাগিদ দিয়ে বাবার কাছ থেকে বিল নিয়েছে! সেই বিলে বাবা হাসপাতালে থাকার চার্জ, অপারেশনের চার্জ আর ওষুধপত্রের চার্জ আর বাবার যা খরচ হয়েছিল, তাই শুধু ধরেছে।

নিজের চিকিৎসার ফী ধরেও নি। হাসপাতালের চার্জ বাবা নিঃসন্দেহে আগেই নিজের পকেট থেকে মিটিয়ে দিয়েছিল। এ রকম একজন রোগী ভালো হয়ে গেল, বাবার এইতেই আনন্দ। তাই বিল-এ নিজের ফী আর ধরে নি।

সর্বসাকুল্যে বিল হয়েছিল তিন হাজার টাকা। কৃতজ্ঞতায় পঞ্চমুখ হয়ে সেই টাকা সাধন চট্টরাজ নিজে হাতে করে দিয়ে গেছে! কিন্তু দিতে এসেছিল এমন সময়, বাবা যখন এক-ঘর রোগী নিয়ে বিষম ব্যস্ত। বাবা নগদ তিন হাজার টাকা পকেটে পুরতেই সাধন চট্টরাজ বলেছে, আপনি তো ভীষণ ব্যস্ত দেখছি, আমি আবার এই দশটার গাড়িতে কলকাতা যাচ্ছি—আপনি রোগী দেখুন, আমি আপনার হয়ে একটি কাজ সেরে নিই।

বাবা সঠিক না বুঝেই পরের রোগী দেখার জন্য ভিতরের চেম্বারে ঢুকল। সেই রোগী দেখা শেষ করে বাবা আবার বাইরে এসে দেখে, সাধন চট্টরাজ তারই ছাপা প্যাডে তিন হাজার টাকার একটা রিসিট লিখে অপেক্ষা করছে। বাবা আসতেই সেটা তার সামনে ধরে বলল, রুগি কলকাতায় যখন, আপনি আমার কাছে থেকে টাকাটা পেলেন এই শুধু লিখলাম—ডিটেলড রিসিট দরকার হলে পরে জানাব'খন, আপনি এটা সই করে দিন।

বাবা পড়ে দেখল, লেখা আছে সাধন চট্টরাজের কাছ থেকে দু'হাজার টাকা নগদ পেলাম।

ব্যস্ত বাবা সই করতে যেতেই চট্টরাজ সবিনয়ে বাধা দিয়ে কাগজটা টেনে নিয়ে একটু ভাঁজ করে বলল, এখানটায় সই করুন, মাঝখানে একটা রেভিনিউ স্ট্যাম্প এঁটে ক্রস করে দেব'খন।

বাব কিছু না ভেবেই সই করে দিল।

কিন্তু কেস-এ নেমে দেখা গেল, সেই রিসিটে লেখা আছে, সাধন চট্টরাজের কাছ থেকে দু'হাজার টাকা নগদ পেলাম! তার এবং আমার বাড়ির মাঝের জমিটুকুর এই টাকার বিনিময়ে বিক্রির লেখাপড়া যথাসময়ে হবে। তার নিচে ক্রস করা রেভিউনিউ স্ট্যাম্প এবং তার নিচে বাবার নিজের হাতেই সই।

অর্থাৎ ওই প্রথম লেখাটুকুর চার আঙুল নিচে বাবাকে দিয়ে সই করে নিয়েছে ধূর্ত সাধন চট্টরাজ। আগেরটুকুও তার লেখা, পরে যেটুকু যোগ করেছে, তাও তারই লেখা। ওদিকে বাবার নিজের নামের ছাপা প্যাড। কড়া সাব-জজ সেটাই বিশ্বাস করবে, তাতে আর অবাক হবার কি আছে! বিশেষ করে এর আগে বাবার পরপর উড়ো চিঠি পেয়ে তার মন যখন বিষিয়েই আছে।

ধূর্জটি ঘোষালের উকিল হিসেবে নামডাক আছে। হাকিমরাও তাকে একটু-আধটু খাতির করে। ওই সাব-জজকে সে সমস্ত ব্যাপারটা বোঝাতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কড়া হাকিম বলতে গেলে তাকে অপমান করেই তাড়িয়ে দিয়েছে। বলেছে, ওরকম একটা হীন চরিত্রের ডাক্তারকে সে এবারে দেখে নেবে। ওরকম লোকের লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া উচিত, এমন কথাও বলেছে।

সব শোনা আর বোঝার পর আমার ভেতরটা যেমন মুষড়ে গেল, তেমনি ওই সাধন চট্টরাজকে জ্যান্ত ভস্ম করতে ইচ্ছে করল। বাবার ওপর যে আমার এত মমতা নিজেই জানতাম না। তার ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ মুখের দিকে তাকাতে পারি না। রাগের মাথায় সেদিন ঠাকুমাকে বলেই ফেললাম, কেস-এর রায় যদি বাবার বিরুদ্ধে হয় তো ওই সাধন চট্টরাজকে হাসপাতালে যেতে হবে জেনে রেখো।

কিন্তু ঠাকুমা যে ওই শুনে ভয়ে অস্থির হয়ে আবার মাকে বলবে, আর মা বাবাকে বলবে, এ কি জানতাম। পরদিনই বিপত্তি। বাবা আমাকে ডেকে জিগ্যেস করল, এ কি শুনছি?

আমি হাঁ করে চেয়ে রইলাম। বুঝতেই পারলাম না বাবা কি শুনেছে। বাবাই কঠিন গলায় আবার বলল, ঠাকুমাকে বলেছিস আমি কেস-এ হারলে সাধন চট্টরাজকে হাসপাতালে যেতে হবে?

আমার তো মাথায় আকাশ ভাঙার দাখিল। মনে মনে ঠাকুমার শ্রাদ্ধ করা ছাড়া আর কি করার আছে?

বাবার মুখ থমথমে—দিনকে দিন একটা বাঁদর তৈরি হচ্ছিস—বুদ্ধি-সুদ্ধি একেবারে গেছে—কেমন? খবরদার এসব কথা যেন আর না শুনি। বিনা দোষে কেস-এ হারলে এর ওপর হাইকোর্ট আছে, তার ওপর সুপ্রিম কোর্ট আছে— এটুকু কমন সেন্স তোর আছে স্টুপিড কোথাকার?

মাথা নিচু করে চলে এলাম। না হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্টের কথা আমার মাথায়ও আসে নি। প্রথমে খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করলাম। সব বিচারকই তো আর সাধন চট্টরাজের দূর সম্পর্কের আত্মীয় নয়, বা সব বিচারকের কাজেই সে আগে থাকতে বাবার বিরুদ্ধে উড়ো চিঠি পাঠিয়ে তাদের মন বিষিয়ে রাখতে পারে না। কিন্তু কিছুক্ষণ না যেতেই আবার আমার মন খারাপ। পরের বিচারে কি হবে, না হবে সে তো ঈশ্বর জানে। কিন্তু এখনকার বিচারে বাবা হারলে তো চারদিকে ঢি-ঢি পড়ে যাবে—বাবার মুখে চুনকালি পড়বে।

পরপর তিন দিন মাঠের আড্ডায় যাই নি। চটপটি ডাকতে এসে ফিরে গেছে। বলেছি, মন-মেজাজ কেমন খিঁচড়ে আছে জানিস তো, কিছু ভালো লাগে না। আর নিজেই বেরিয়ে পড়লাম যদি খানিকটা অন্যমনস্ক থাকতে পারি। পিন্‌ডিদার ভাণ্ডারে তো অনেক ঘটনা, হয় তো আমার মন খারাপ দেখেই নিজের কিছু অভিজ্ঞতার কথা বলবে যা শুনতে শুনতে খানিকক্ষণের জন্যে অন্তত এই কুচ্ছিত ব্যাপারটা থেকে মন দূরে সরবে।

পিন্‌ডিদা তার সেই উঁচু টিবির আসনে বসে আছে। তার সামনে হোঁতকা হাবুল চটপটি কেবলু কার্তিক। ওদের আবার ভালো জমছে না, এ আমি দূর থেকে দেখেই বুঝলাম। কারণ পিন্‌ডিদার আসর জমাতে হলে পকেটে কিছু রেস্ত থাকা চাই। জিভের খোরাক না পেলে পিন্‌ডিদার রসনায় ভাঁটা পড়ে। ঠাকুমার কাঠের হাত-বাক্স মেরে হোক, বা মাকে জ্বালাতন করে হোক, এ রসদ বরাবর আমিই যোগান দিয়ে থাকি। আজ আমার পকেট কলকাতার গড়ের মাঠ— পয়সা আনার কথা মনেও ছিল না। আর সেরকম মনও ছিল না।

আমাকে দেখামাত্র সংস্কৃতনবিশ কেবলু আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, স্বাগতম্—স্বাগতম্। আমি মনে মনে তোকেই স্মরণং কৃত্য—আমরা ভাবছিলাম মনের দুঃখ তুই বনং ব্রজেৎ। মা শোচং—মা শোচং।

এই তড়বড়ানি কার্তিকেরই প্রথম অসহ্য হল। ও ধমকে উঠল, এই কেবলুং! চুপ করং—চুপ করং!

পিন্‌ডিদার বাঁ পাশে আমি বসে থাকি— এগিয়ে গিয়ে তাই বসলাম। আসতে না আসতে কেবলু হতভাগা আমার মেজাজ চড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু সামনে আসা আর বসার পর পর্যন্ত লক্ষ্য করলাম, পিন্‌ডিদা কুত-কুত করে আমাকেই দেখছে—যেন আমি বেশ একটা দ্রষ্টব্য জিনিস। কোন কারণ নেই, তবু কেন যেন আমার মেজাজ আরো বিগড়ে গেল। কারণ নেই-ই বা বলি কেন, আমার বাবা লোকসমাজে এত হেয় হতে চলেছে—তার ছেলেকে এমন ঘটা করে দেখার কি আছে? বরং দু'চারটে সহানুভূতির কথা শুনলে ভালো লাগত।

আমি জানি, আমাদের এ ক'জনের মধ্যে হাবুল, মানে হোঁতকাই সব থেকে নিরেট। আমার এই মনের অবস্থা, তার মধ্যে ওর গুরু পিন্‌ডিদার ক'টা বিকেল ধরে জিভ উপোস করছে—আগে সেটাই ওর মনে হল। দু'তিন বার গলা খাঁকারি দিয়ে ও আমার মনোযোগ আকর্ষণ করল। শুধু আমার কেন, সবারই যে করল, এ কাণ্ডজ্ঞানও নেই, এমনি নির্লজ্জ মোসায়েব বটে পিন্‌ডিদার। আমি তাকাতেই হাবুল ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর তার পাশের আঙুল যুক্ত করে টাকা বাজানোর কল্পিত শব্দ করে ইশারায় জিগ্যেস করল, পকেটে আছে কিছু?

রাগে আমার সমস্ত শরীর রি-রি করে উঠল। একে একে সকলের মুখ ক'টা দেখে নিলাম। এমন

কি পিন্‌ডিদারও। তরপর সোজা হাবুলের দিকে চেয়ে জামার দু'পাশের দুই পকেট উল্টে দেখালাম। একটি কপর্দকও যে নেই, মুখে ওই মোসায়েবকে সেটা বলতেও আমার ঘেন্না ধরে গেল।

আমার মেজাজের অবস্থা অল্প-বিস্তর সবাই টের পেয়েছে। কিন্তু সকলের থেকে বেশি বুঝেছে বোধহয় স্বয়ং পিন্‌ডিদা। তার মগজের ধার কে অস্বীকার করবে?

বেজায় গম্ভীর মুখ করে পিন্‌ডিদা হাঁক পাড়ল, হেবো—!

হাবুল হোঁতকা তটস্থ—কি পিন্‌ডিদা?

পিন্‌ডিদা জবাব না দিয়ে চোখ দুটো দিয়ে ওই হাতির শরীরখানা গিলতে চাইল। ব্যাপার কিছু না বুঝে হাবুল হোঁকতা কেঁচো একেবারে।

পিন্‌ডিদার দু'চোখ এবারে কেবলুর দিকে— কেবলু!

কেবলুও হকচকিয়ে গেল—কি পিন্‌ডিদা?

—তুই মনের সাধে হাবুলকে সংস্কৃততে কিছু বল্ তো—ব-ল্ বলছি!

ঘাবড়ে গিয়ে কেবলু হাবুলের দিকে ফিরল! তারপর হঠাৎ চোখ পাকিয়ে বলে উঠল, জাহান্নমেং গচ্ছ!

আমার হাসিই পেয়ে যাচ্ছিল। তবু চেষ্টা করে গম্ভীর থাকলাম।

কিন্তু তার পরেই আমার আবার গা গরম হতে থাকল। হাবুলের শাস্তি বিধানের পরেই আবার তার সেই মজা-ছোঁয়া কুতকুতে চাউনি।

—হ্যাঁ রে সোনা—ব্যাপারখানা কি র‍্যা তোর?

কেবলুর মতোই একটা সংস্কৃত গাল দিয়ে উঠতে ইচ্ছে করেছিল আমার। কিন্তু পিন্‌ডিদা পিন্‌ডিদা-ই। জবাব দিলাম, জানই তো, আবার জিগ্যেস কচ্ছো কি?

একটু ঝাঁজিয়ে কথা বলতে দেখেও মোসায়েব হাবুলের সহ্য হল না। খাপ্‌পা হয়ে বলে উঠল, সুখ-দুঃখ সকলের জীবনেই আসে, তা বলে পিন্‌ডিদার মুখের ওপর তুই এভাবে কথা বলবি? আর আমরা তা সহ্য করব ভাবিস?

আসলে একটু আগে পিন্‌ডিদা যে ওর ওপর তেতে উঠেছিল, সেটুকুই জল করার চেষ্টা। আমার ইচ্ছে করছিল, ইয়ে, না লাথি কথাটা খারাপ শোনায়—ইচ্ছে করছিল ওকে একটা পদাঘাত করি। কিন্তু পরমুহূর্তে পিন্‌ডিদার বজ্রকণ্ঠ শুনে চকিতে ঘুরে তাকালাম।

—হেবো!

ওই গলা শুনেই হাবুলের হয়ে গেল। কুতকুতে চোখ দুটোকে কোনওরকমে তার মুখের ওপরে রাখল।

—তোর বাবা নেই?

করুণ সুরে হাবুল বলল, ছিল পিন্‌ডিদা—এখন নেই।

—যখন ছিল বাপকে কখনো শ্রদ্ধাভক্তি করেছিলি?

—অত সুযোগ পাইনি পিন্‌ডিদা, মুখোমুখি হলেও খড়ম পিটুনির ভয়ে পালিয়ে যেতে হত।

—হতভাগা কোথাকারের, তাহলে আর বাপের মর্ম বুঝবি কি করে?

কেবলু ফসফস করে উঠল, পিতাহি পরমং তপঃ!

টিকটিকি যেমন করে দেয়ালের আরশোলার দিকে তাকায় হাবুলের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে পিন্‌ডিদা খানিক কেবলুর দিকে চেয়ে রইল—তার আগের দুটো পঙক্তি কি বনবাসং গতঃ?

কেবলু মাথা চুলকে আগের কথাগুলি চিন্তা করতে লাগল।

—স্টুপিড!

কেবলু কোঁচো। হাবুলের মুখে স্বস্তির হাসি।

—তুই নয়, আমি হেবোকে বলছি। পিন্‌ডিদা হাবুলের দিকে চোখ পাকালো।

এবারে আবার হাবুল কেঁচো।

দাঁতে দাঁত ঘষে পিন্‌ডিদা বলল, তুই একটা হাতির মতো গাধা—বাপের অপমানে যে ছেলে অপমান বোধ না করে—যে ছেলের মনমেজাজ তিরিক্ষি না হয়ে যায়, সে একটা কুলাঙ্গার—বুঝলি? সোনার কথায় আমি রাগ করেছি?

পিন্‌ডিদার কথায় আমার রাগ জল। হেবো মিনমিন করে জবাব দিল, তোমার যে কচ্ছপের মতো ধৈর্য পিন্‌ডিদা—

—তার মানে? ভুরু কুঁচকে পিন্‌ডিদা চাপা গর্জন করে উঠল।

হাবুল আরো ভেবাচাকা—ইয়ে—বলছিলাম কি কচ্ছপ গলা কাটলেও রাগ করে না।

পিন্‌ডিদা খেঁকিয়ে উঠল, বলিহারি উপমা তোর—ফের কচ্ছপ-মচ্ছপ বলবি তো খাট্টা হয়ে গাঁট্টা মেরে বসব বলে দিলাম!

কেবলু মোলায়েম মন্তব্য করল, কূর্মঃ বললেও হত, সোজা কিনা অলুক্ষণে কচ্ছপের সঙ্গে তুলনা দিলি পিন্‌ডিদার!

—চটপটি!

পিন্‌ডিদার গলা শুনে এবার চটপটি আঁতকে উঠল—কি পিন্‌ডিদা?

—ওদের দু'জনেরই চুলের ঝুঁটি ধরে মাথা দুটো বেশ করে ঠুকে দে তো!

পিনডিদার হুকুম। চটপটি কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। হাসি চেপে এবারে আমিই বললাম, যাক গে পিন্‌ডিদা, এবারকার মতো ওদের ক্ষমা করে দাও।

পিন্‌ডিদা আমার দিকে থমকে চেয়ে রইল একটু। তারপর প্রশংসার সুরে বলল, তোর মনটা বেজায় নরম রে সোনা। যাক, ক্ষমা করেই দিলাম। —তা এখন বল দেখি, তোর বাবা, মানে আমাদের মেসোমশাইয়ের নামে যতটা রটেছে, তার কতটা বটে?

শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথায় চড়াত করে রক্ত উঠে গেল। ঝাঁঝালো চোখে তাকালাম—তার মানে?

পিন্‌ডিদার অমায়িক গলা। —এটা আর বুঝলি না? শাস্ত্র বচন আছে না—যা রটে তার কিছুটা বটে—তাই জিজ্ঞেস করছিলাম, তোর বাবার বেলায়—খুড়ি, আমাদের মেসোমশাইয়ের বেলায় কতটা বটে?

রাগের চোটে আমি ভিতরে কাঁপতে লাগলাম। আমার বাবা কি মানুষ খুব ভালো করে জানে, বাবাকে সামনে দেখলে বিনয়ে গলে যায়, বাবা-মা-ঠাকুমা সবাই নানা অঘটনের ফলে তার ওপর বেজায় খুশি বলে বাবারই টাকায় খাওয়া, দেওঘর বেড়ানো, কি না হয়েছে? শুধু তাই নয়, বাবা খরচপত্র দিয়ে আমাদের দেওঘর বেড়াতে পাঠিয়েছিল—সে টাকা তো গোটাগুটি বেঁচেই গেছে—তার ওপর আমাকে টোপ বানিয়ে স্বামী পাকড়াওনন্দজী ওরফে রামবাদশার মতো দুঁদে ডাকাতকে হাজতে পুরতে পারার জন্য মোটা টাকা পুরস্কার পেয়ে বাবার টাকা আর সে টাকা মিলিয়ে বেড়ানোর তহবিল করা হয়েছে—সবই বাবার দৌলতে হয়েছে ('লিডার বটে পিন্‌ডিদা' পড়।)—আর সেই বাবার সম্পর্কে কিনা এই কথা—এমন জঘন্য সন্দেহ! কোন্ ছেলে তা সহ্য করতে পারে?

আমি রাগে চিড়বিড় করে উঠলাম। উপযুক্ত জবাব দিতে সময় লাগল একটু। তারপর পাথর ঠুকে আওয়াজ বার করার মতো গলায় বললাম, বাবাকে তোমার নাম করে জিগ্যেস করব।

পিন্‌ডিদা সচকিত—কি জিগ্যেস করবি?

—জিজ্ঞেস করব, পিন্‌ডিদা জানতে চেয়েছে তুমি কতটা চোর আর কতটা নও।

—সে কি রে—পিন্‌ডিদার রণে ভঙ্গ দেওয়ার গলা। তুই এই বুঝলি?

তবু আমার মাথায় দাউ দাউ আগুন জ্বলছে। চনমনে গলায় ফিরে বললাম, আর কি বোঝবার আছে? আর কি বোঝাতে চাও তুমি? কেবল তোমার মাথাতেই মগজ বলে কিছু আছে আর সকলের মাথায় গোবর—কেমন? বাবাকে চেনো না তুমি? বাবার সম্পর্কে এভাবে কথা বলতে তোমার লজ্জা করে না?

রাগে আমারই মাথাটা বোধহয় খারাপ হয়ে গিয়েছিল—নইলে পিন্‌ডিদাকে কিনা এরকম বললাম! কিন্তু বলার পরেও রাগে ফুঁসছি আমি। ওদিকে চটপটি, কেবলু ও কার্তিক বোবা মেরে গেছে। ওরাও ভেবে পাচ্ছে না আমার মাথাই বিগড়ে গেল কি না। প্রথম ধাক্কা সামলে মোটা শরীরটাকে আস্তে আস্তে দু'পায়ের ওপর টেনে তুলেছে। পিন্‌ডিদার একটু ইঙ্গিতের অপেক্ষা কেবল, আমাকে ইঁদুরের মতো টেনে দু'হাতে মাথার ওপর তুলে আছাড় মারার ইচ্ছে।

কিন্তু আশ্চর্য মানুষ পিন্‌ডিদা। তার এমন হাবা-গোবা গোছের চাউনি দেখেই রাগ সত্ত্বেও আমি কেমন ভড়কে যাচ্ছি। তারপর আরো অবাক কাণ্ড, পিন্‌ডিদা এবারে হাসতে শুরু করেছে। আমার দিকে চেয়েই হাসছে। প্রথমে অল্প অল্প হাসি। তারপর খিক খিক হাসি। তারপর বেদম হাসি। এত হাসি যে শেষে নিজের পেটটা নিজেই দু'হাতে চেপে ধরেছে। তবু হাসি আর থামেই না—থামেই না।

আমরা সঙের মতো পিন্‌ডিদাকেই দেখছি। হাবলু দাঁড়িয়েই আছে। বসতেও ভুলে গেছে।

কোনরকমে হাসি থামিয়ে পিন্‌ডিদা প্রথমে ওকেই ধমকে উঠল—এই গাধা কোথাকারের—বোস!

আবার একপ্রস্থ হাসির দমক সামলে পিন্‌ডিদা বলল, সোনারে—সত্যি তুই একটা সোনার ছেলে! এতটুকু খাদ নেই, এতটুকু ভেজাল নেই—শেষের এই পরীক্ষায়ও পাস করে গেলি—একেবারে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট!

আমি এত বোকা! অনুশোচনায় আমার ভিতরটা মুচড়ে উঠছে—পিন্‌ডিদা পরীক্ষা করছে আর আমি কি না তা বুঝতেও পারি না! কোনরকমে বললাম, আমাকে ক্ষমা করো পিন্‌ডিদা, আমি একটা অপদার্থ।

সঙ্গে সঙ্গে হাবলু খেঁচিয়ে উঠল, অপদার্থ? যা নয় তাই বললি পিন্‌ডিদাকে আর এখন ন্যাকে কান্না! পিন্‌ডিদাকে জানতে বুঝতে তোর ক'জন্ম লাগবে রাসকেল কোথাকারের, সে কাণ্ডজ্ঞান আছে?

এবারে ওরই মুণ্ডুটা আমার চিবিয়ে খেতে ইচ্ছে করছে। তবু হাসি-হাসি মুখ করে পিন্‌ডিদার দিকে ফিরলাম।—আচ্ছা পিন্‌ডিদা, এবারে তুমিই বলো, হেবোটা আমার থেকেও কত টাইমস হাঁদা-গাধা, তুমি হেসে ওঠা মাত্র আমি নিজের বোকামি বুঝতে পেরেছি—আর ও এখন পর্যন্ত গণ্ডারের মতো গাঁ-গাঁ করছে!

হাবুল ঘুঁষি বাগিয়ে তেড়ে আসতে যাচ্ছিল, পিন্‌ডিদা একটা হাত তুলতেই থমকালো।

পিন্‌ডিদা বলল, এই ইডিয়েট্ লাইক্ ননসেন্স—শাট্ আপ্ অ্যান্ড্ সীট্ ডাউন্।

কেবলু খুশি মুখে সংস্কৃত ঝাড়ল, সব বালভাষিতং অমৃতং পিন্‌ডিদা।

চটপটি ঝংকার দিয়ে উঠল, থাম! আর ন কচকচং—পিন্‌ডিদা, এবার আসল যেটা ব্যাপার, সোনার বাবার—মানে অমন ভালো মানুষ মেসোমশাইয়ের প্রবলেমটা নিয়ে একটু সীরিয়াস্‌লি ভাবো—ওই জোচ্চোর উকিল সাধন চট্টরাজকে আমারই আলুকাবলি বানিয়ে খেতে ইচ্ছে করছে—সোনার তাহলে কি অবস্থা ভাবো।

—আ-হা রে, সহানুভূতিতে পিন্‌ডিদার মাখন গলা মুখ।— অচ্ছা সোনা, সমস্ত ব্যাপারটা তুই আমাকে একবার বল্ দেখি—যদিও মোটামুটি জানি, তবু আর একবার ঝালিয়ে নিই।

আমি আজ মাঠে এসেছি অশান্তিটা দু'দণ্ড ভুলে থাকতে, উল্টে কিনা এখানেও এই শুরু হল। যেখানে বাবার বন্ধু, আর চটপটির দূর সম্পর্কের কাকা ওই দুঁদে উকীল ধূর্জটি ঘোষাল ঘোল খেয়ে গেল—সেই কোর্ট-কাছারির ব্যাপারে পিন্‌ডিদা কি করবে?

তাই খুব উৎসাহ বোধ না করে বললাম, বাবার উকিল ধূর্জটি ঘোষাল সম্পর্কে চটপটির কাকা হয়—আমার থেকে চটপটি ভালো জানে—ওর মুখেই শোনো।

—তুই বেজায় মিইয়ে গেছিস দেখছি, অচ্ছা চটপটি, খুব পটপট না করে চটপট বল্।

চটপটি কর্তব্য পালন করল। ব্যাপারটা মোটামুটি স্পষ্ট করেই বোঝালো।

উঁচু ঢিবির আসনে পিন্‌ডিদা দুই হাঁটুতে মুখ গুঁজে মনোযোগ দিয়ে শুনে গেল।

শেষ হতে কার্তিক বলে উঠল, উঃ, আমার যদি নিজের নামের মতো শক্তি থাকত তাহলে সাধন চট্টরাজের মুণ্ডুটা ছিঁড়ে আনতাম।

চটপটি বলল, আর আমি তখন ব্রেজিলের ফুটবল স্টার পিন্‌ডিদার মতো ওই মুণ্ডুর ওপর একটা টেরিফিক সট্ নিতাম।

কেবলু বলল, আমি তাহলে ওই মুণ্ডুটাকে মন্ত্র ভস্মিতং করতাম।

এর পর হেবোই সব থেকে বুদ্ধিমানের মতো বলে উঠল, এরা সব জেগে স্বপ্ন দেখছে, তুমি একবারটি শুধু হুকুম দাও পিন্‌ডিদা, আমি ওই সাধন চট্টরাজকে কীচক বধ করে আসি।

কিন্তু পিন্‌ডিদার কোনও সাড়াশব্দ নেই। দুই হাঁটুতে মুখ গুঁজে দু'চোখ বুজে ভেবেই চলেছে। অনেকক্ষণ বাদে চোখ-বোজা অবস্থাতেই প্রশ্ন ছুড়ল, লোক কেমন?

আমরা সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি, কে লোক কেমন রে বাবা!

কিন্তু কতক্ষণ আর বোবা বনে বসে থাকা যায়। ভয়ে ভয়ে কার্তিক গলায় বিনয়ের মধু ঢেলে জিজ্ঞেস করল, কার কথা বলছ পিন্‌ডিদা?

পিন্‌ডিদা তেমনি হাঁটুতে মুখ গুঁজে চোখ বুজে জবাব দিল, কার আবার—ওই জজ সাহেব—লোক কেমন?

এবারে চটপটি ফটফট করে বলল, দারুণ খাস্তা মানুষ পিন্‌ডিদা—মানে টেরিফিক অনেস্ট—কিন্তু আগে থাকতে ওই উড়ো চিঠির ঝাঁকে অন্ধ হয়ে এখন সোনার বাবার ওপর বেজায় খচে আছে—ধূর্জটি ঘোষালের মতো উকিলকে পর্যন্ত পাত্তা দিচ্ছে না।

আবার দু'মিনিট পিন্‌ড্রপ্ সাইলেন্স।

—ঘুষ-টুষ খায়?

পিন্‌ডিদার প্রশ্ন শুনে আমি একেবারে হতাশ। এতক্ষণ বাদে কিনা পিন্‌ডিদার এমন সহজ রাস্তা ধরে মুশকিল আসানের চিন্তা!

চটপটি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, অমন চিন্তা মনেও এনো না পিন্‌ডিদা—কেউ ঘুষ দিতে গেলে ওই সাবজজ তার একেবারেই বারোটা বাজিয়ে ছেড়ে দেবে। এদিক থেকে লোকটা একেবারে হরিদ্বারের গঙ্গাজল, এমন চেষ্টা করতে গেলে সোনার বাবাকে উল্টে বর্ধমান ছাড়া করে ছাড়বে।

আবার সেই বিতিকিচ্ছিরি রকমের চুপচাপ সকলে। আমার মনে হয় দুই হাঁটুতে মুখ গুঁজে ভাবতে ভাবতে পিন্‌ডিদা বোধহয় ঘুমিয়েই পড়ল। হঠাৎই একটা বোমা পড়ার শব্দে যেন আমরা বাকি পাঁচজনই একসঙ্গে চমকে উঠলাম।

—চানাগ্রাম!

দুই হাঁটুতে মুখ গোঁজা, কিন্তু হুঙ্কারটা পিন্‌ডিদার। নিজেদের দিকে একেবারে মুখ চাওয়া-চাওয়ি

করে মাঠের পারের রাস্তার দিকে চোখ পড়তেই সকলে অবাক। রাস্তা দিয়ে চানাওয়ালা ব্যাটাই চলেছে বটে।

আমি আর কি করতে পারি? যে মেজাজে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, আমার পকেটে কানাকড়িও নেই। বাকি চারজনের উদ্‌গ্রীব চার জোড়া চোখ আমারই দিকে। অর্থাৎ যদি আমার কোমরেটোমরে টাকা গোঁজা থাকে—পকেট তো আগেই উল্টে দেখিয়েছি! পিন্‌ডিদার মুখ এখনো হাঁটুতে গোঁজা, দেখে ফেলার ভয় নেই—তাই আমি ওদের দিকে হাতের বুড়ো অঙুলটা নেড়ে বুঝিয়ে দিলাম, আমার কাছে এক কপর্দকও নেই। তারপর অশ্চর্য হয়ে দেখলাম, বিরস বদনে চটপটি উঠে গেল আর হনহন করে হেঁটে গিয়ে চানাওলাকে গিয়ে ধরল। ফিরল যখন, দেখেই বুঝলাম তার হাতে এক সিকির একটাই ঠোঙা।

পিন্‌ডিদা হাত বাড়িয়ে ঠোঙাটা নিল। কিন্তু সে কি আর এ জগতে আছে যে আমাদের মধ্যে যে আর কেউ খাচ্ছে না সেটা লক্ষ্য করবে? চোখ বুজে দুই হাঁটুতে থুঁতনি গুঁজে চানা-গ্রাম চিবুতে চিবুতে ভাবনা সমুদ্রে তলিয়ে যাচ্ছে, আবার ভেসে মসলা-চানা মুখে পুরে চিবুচ্ছে, আবার ভাবনায় তলিয়ে যাচ্ছে।

চানা শেষ হতে ঠোঙাটা হাত থেকে খসে পড়ল। তারপার আর সাড়াশব্দ নেই। ভাবতে ভাবতে পিন্‌ডিদা আবার বোধহয় ঘুমিয়ে পড়ল।

—আলুকাবলি।

তেমনি হঠাৎ আবার হুঙ্কার পিন্‌ডিদার। আমি তো হতভম্ব। পাঁচজনের দশখানা চোখ আবার মাঠের শেষের রাস্তার দিকে। আশ্চর্য, সত্যি আলুকাবলিওলাটা ঢিমেতালে দূরের রাস্তা দিয়ে চলেছে। আবার সকলের মুখ চাওয়া-চাওয়ি। এবারে উঠল বিরসবদন কার্তিক। কোনাকুনি মাঠ ভেঙে আলুকাবলিওলাকে ধরল। ফিরল যখন, শালপাতার ঠোঙা দেখেই বুঝলাম, ওর হাতেও চার আনারই মাল। ওদের পকেটে পয়সা—আজ ব্যাপারখানা কি মাথায় ঢুকছে না!

না, পিন্‌ডিদা বুঝি সত্যিই এ জগতে নেই। আলুকাবলি মুখে দেবার জন্য এক-একবার চোখ খুলছে যখন, চাউনিই অন্য রকম। ঢুলু ঢুলু চোখ। সেই চোখজোড়া এক-একবার টান করে আকাশের দিকে তাকাচ্ছে। যেন কিছু দেখার বা কাউকে দেখার আকুতি। তারপর খানিকটা আলুকাবলি মুখে দিয়ে আবার হাঁটুতে মুখ গুজছে। এই করে ঠোঙাটা শেষ হতে আপনি ওটা হাত থেকে খসে পড়ে গেল। পিন্‌ডিদার হুঁস নেই।

উদ্‌গ্রীব মুখে আমরা জোড়া জোড়া ঠোঁট সেলাই করে বসে আছি তো বসেই আছি।

—ঝালমুড়ি !

এবারকার হুংকার শুনে আমরা অতটা না চমকালেও নড়েচড়ে বসলাম। হ্যাঁ, ঝালমুড়িওয়ালাও যাচ্ছে ঠিকই। হোঁতকা হাবুলকে ছেড়ে আমি কেবলুর দিকে তাকালাম। ঠিকই ধরেছি। এবারে কেবলুরই পালা। শুকনো মুখে ও উঠল। চলল। দু'হাঁটুতে মুখ গোঁজা পিন্‌ডিদা আবার ঝিমুনির জগতে চলে গেছে।

আর কৌতূহল সামলাতে না পেরে আমি খুব নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালাম। পা টিপে আট-দশ গজ গিয়ে তারপর ছুটে কেবলুকে ধরলাম। আমাকে দেখেই তিরিক্ষি মেজাজে কেবলু বলে উঠল, কড়কড়ে চার আনা খসিতং!

—খসিতং তো বুঝলাম, কিন্তু তোরা সব চার আনা করে আনিতং—কি ব্যাপার?

পাল্টা ঝাঁঝে কেবলু বলল, না এনে কি করব? তুই না থাকলে পিন্‌ডিদার খাই-খাই রোগ সামলাবে কে? ক'দিন ধরে তোর পাত্তা নেই, আর পিন্‌ডিদাও খিঁচফিড়াই—কাল রাগ করে বলেই উঠল, বাতাস গিলিয়ে পিন্‌ডিদাকে ধরে রাখা যায় না বুঝলি—মগজের এক রত্তি ঘিলুও নড়াচড়া

করতে চায় না—কাল সোনা এলে তো এলো, নইলে পরশু থেকে আর আসবই না।...তুই আসবি কি আসবি না ঠিক নেই বলে কোনরকমে চার আনা পয়সা যোগাড় করে এসেছিলাম—এখন দেখছি চটপটি আর কার্তিক তাই এনেছে। তোকে দেখে ভেবেছিলাম পয়সা ক'টা বাঁচল, তা যস্মিন কপালে যা—আজ তোরই পকেট ফাঁকা।

কেবলুকে ছেড়ে আমি দ্রুত ফিরে এলাম। কাছে এসে আবার পা টিপে নিজের জায়গায় বসলাম।

কেবলু ফিরল। চার আনার ঝালমুড়ির ঠোঙাটা সামনে ধরল। কিন্তু পিন্‌ডিদাকে কি কেউ হিপনোটাইজ করে ফেলল! সে এখন কোন্ জগতে? নরম করে কেবলু দু'বার গলা খাঁকারি দিল, তাতেও সাড়াশব্দ নেই।

এবারে কেবলু গলার মিছরির জল ঢেলে বলল, গ্রহণং কুরু পিন্‌ডিদা—

—হ্যাঁ, সংস্কৃত বটে কেবলুর। হাঁটুর ওপর থেকে পিন্‌ডিদার মাথাটা আস্তে আস্তে উঠল। কিন্তু ফ্যালফেলে চাউনি। টেনে টেনে জিগ্যেস করল, কি?

—ঝালমুড়ি পিন্‌ডিদা।

পিন্‌ডিদার কথা জড়িয়ে যাচ্ছে—কি বল-ছি-স বু-উ-ঝতে পা-রছি না।

কেবলু হকচকিয়ে গেল। সংস্কৃত শুনে সাড় এলো অথচ বাংলা বুঝতে পারছে না! এবারে গলা চড়িয়ে বলল, ঝাল মু-ড়িং পিন্‌ডিদা।

কাজ হল—ও, দে।

আবার সেই একই দৃশ্য। পিন্‌ডিদা এক-একবার আকাশের দিকে তাকায়, ঝালমুড়ি মুখে দেয়, আবার হাঁটুতে মুখ গুঁজে কোথায় যেন চলে যায়। আমাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে এক সময় ঝালমুড়ির ঠোঙাও শেষ হল। ওটা হাত থেকে খসে পড়ল।

এবার আমি উদ্‌গ্রীব, এবার পিন্‌ডিদা কোন্ দ্রব্যটির জন্য হাঁক পাড়ে? তাহলে হাবুলের পালা হবে। কিন্তু হাবুলের পকেটেও কিছু থাকতে পারে, এ আমার বিশ্বাসই হয় না। একটু বাদেই হতাশ হলাম। দূরের ওই রাস্তা দিয়ে ফুচকাওলা চলে গেল, চিনেবাদামওলা চলে গেল, কুলপিমালাই চলে গেল—নাঃ, পিন্‌ডিদা আর এই জগতেই নেই।

আরো ছ'সাত মিনিট যে কত লম্বা তা এই প্রথম জানলাম। তারপর অনড় দেহে প্রাণের সাড়া এলো। পিন্‌ডিদার রোগা শরীরটা এক-একবার কেঁপে কেঁপে উঠছে। আস্তে আস্তে মাথা তুলে সোজা হতে লাগল। চাউনি বদলে যাচ্ছে দু'চোখ আমার মুখের ওপর ঝকঝকে হয়ে উঠছে। যেন আমি পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্যের একটি। তারপর উল্লাসে চেঁচিয়েই উঠল, সোনা রে! মা মুখ তুলে চেয়েছে—পথ পেয়ে গেছি! কি আনন্দ—কি আনন্দ—সোনা তুই বুঝবি না!

এবারে আমার খাবি খাবার দাখিল। বলে উঠলাম, মা পথ দেখিয়েছে মানে? কোন্ মা—কার মা?

পিন্‌ডিদা দারুণ বিরক্ত, কোন্ মা মানে? তুই দুনিয়ার সব মা-কে চিনিস, না জানিস?

নিরাপদ ভেবে চুপচাপ চেপে রইলাম।

পিন্‌ডিদা হাসতে লাগল—সোনা রে সোনা, কি ভাগ্যি—মা পথ দেখালো! এর আর কোনো মার নেই—তোর বাবা মানে, আমাদের মেসোমশাই, হিমালয়ের মতো মাথা উঁচিয়ে কোর্ট থেকে বেরিয়ে আসছে, আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম—মা দেখিয়ে দিল। যাক, তোর আর সে চোখ কোথায়। তোকে আর ভাবতে হবে না, কিন্তু টাকার ব্যবস্থা কর।

পিন্‌ডিদার মুখে টাকার কথা শুনলেই আমি গার্ড নিতে শুরু করি।—ট-টাকা...আমার কাছে তো এখন বিশেষ কিছুই নেই।

—ধেৎ, তোর কাছে কে চাইছে, এবারে আর তোর হিম্মতে কুলোবে না—তোর মাকে, মানে আমাদের মাসিমাকে বল কিছু টাকা বার করতে—আমার নাম করে বলবি, কোনো মার নেই পুজোটা দিয়ে ফেলতে পারলেই সাধন চট্টরাজ জন্মের মতো টিট।

পিন্‌ডিদা এমন কথা বললে ভাবতেই হয়। অবশ্য মা-ঠাকুমার কাছে পিন্‌ডিদার এখন দারুণ খাতির কদর—এমন কি আমার রাশভারী বাবা পর্যন্ত স্বীকার করে, ছেলেটা একখানা মাথা বটে। হবে না কেন, হাড় কাঁপানো ডাকাত রামবাদশার কব্জা থেকে জমিদার গিন্নির গোপালের হীরের চোখজোড়া উদ্ধার করা আর শেষে মাথার জোরে দেওঘরে বসে তাকে হাজতে পোরার পর থেকে ('লিডার বটে পিন্‌ডিদা' পড়) সমস্ত বর্ধমান জুড়ে এখন পিন্‌ডিদার নাম। ওই রামবাদশার কল্যাণে সরকারি পুরস্কার পেয়ে আর বাবার দেওয়া টাকা মিলিয়ে এখন আমাদের এই পিন্‌ডিদা অ্যান্ড কোম্পানির আড়াই হাজার টাকার মতো একটা ফান্ড পর্যন্ত হয়েছে।

জিগ্যেস করলাম, মায়ের কাছে কত টাকা চাইব?

পিন্‌ডিদা বেশ ভেবে-চিন্তে জবাব দিল, শ'তিনেকে হয়ে যাবে মনে হয়—

আমি আঁতকে উঠলাম, পুজোর জন্যে তিনশো টাকা!

কেবলু কার্তিক চটপটি, এমন কি হোঁতকা হাবুলের মুখও তিনশো টাকা শুনে ভিজে পাঁপরখানা। কিন্তু পিন্‌ডিদা রেগেই গেল। তোর বাপ, মানে আমাদের মাননীয় মেসোমশায় যে গাড্ডায় পড়েছে, তাতে তিনশো টাকা বেশি? নস্যি নাকি বলিস, সেন্ট পারসেন্ট গ্যারান্টি, পুজোর পর মা যদি ভোজবাজি না দেখায় তো নাকে খত দেব—আর আমাদের ফান্ড থেকে ওই তিনশো টাকা রিফান্ড করব। জয় মা উৎকোচেশ্বরী, অধমের মুখ রেখো!

মা উৎকোচেশ্বরী শুনে আমরা তো হাঁ। আমি বলে উঠলাম উৎকোচ—উৎকোচ মানে তো ঘুষ—তারও অবার দেবী আছে নাকি?

—যাঃ কলা! পিন্‌ডিদার মুখ কাঁচুমাচু, আনন্দে মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল। তারপরেই চোখ লাল—একটু আগে বললাম না, কোথায় কত দেবী আছে তুই জানিস?

আমি সাফ বলে দিলাম, কিন্তু মা উৎকোচেশ্বরী শুনলে মা মানে আমার মা টাকা দেবে না।

—নাঃ, পিন্‌ডিদা তেতেই উঠল, এত বুদ্ধিমান হয়েও মাঝে মাঝে এমন বোকার মতো কথা বলিস সোনা—মাসিমাকে তুই ও কথা বলতে যাবি কেন—বলবি পিন্‌ডিদার এক উপাস্য দেবীর পুজো হবে—ফুরিয়ে গেল।

তবু আমি মরিয়া হয়ে বললাম, কিন্তু ঘুষের দেবীর পুজো কি ভালো?

পিন্‌ডিদা এবার খেঁকিয়ে উঠল, কেন, ফল ভালো হলে ভালো নয় কেন? মা শীতলার পুজো দিলে ফল ভালো হয়, না বসন্ত বাড়ে? মা মনসার পুজো দিলে ফল ভালো হয়, না সাপে বেশি কামড়ায়? খারাপ জিনিসের দেবীকে পুজো দিলে ফল কখনো খারাপ হয়, বোকা কোথাকারের? কিন্তু খবরদার মেসোমশায় যেন জানতে না পারে!

অকাট্য যুক্তি।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে মা আর ঠাকুমাকে একসঙ্গে ডেকে পিন্‌ডিদার কথা সব বললাম। তার এক উপাস্য দেবীর পুজোর জন্য তিনশো টাকা চাই—বাবা তাহলে কেস-এ জিতবেই জিতবে—না জিতলে পিন্‌ডিদা নাকে খত দেবে বলেছে আর অমাদের ফান্ড থেকে তিনশো টাকা ফেরত দেবে বলেছে।

মা-ঠাকুমা কেন, বর্ধমানের অনেকের কাছেই এখন প্রদীপনারায়ণ দত্তর পিন্‌ডি নাম জানা হয়ে গেছে। ঠাকুমা তো শুনে লাফিয়েই উঠল, দিয়ে দাও—দিয়ে দাও বউমা—পিন্‌ডি যখন বলেছে আর একটুও দ্বিধা রেখো না। আমার অমন ছেলে—মা একটা রাস্তা করবে না? এক্ষুণি তিনশো টাকা নিয়ে এসো—

মাও তাড়াতাড়ি ঘরের দিকে এগোতে আমি সাবধান করলাম বাবার নামে পুজো—বাবা যেন কক্ষনো আগে না জানতে পারে—পিন্‌ডিদা বারণ করে দিয়েছে।

তিনশো টাকা এত সহজে হাতে আসবে ভাবি নি। টাকা নিয়ে ওই রাতেই পিন্‌ডিদার বাড়ি এলাম। টাকা নিয়ে গম্ভীর মুখে পিন্‌ডিদার বাড়ি এলাম। টাকা নিয়ে গম্ভীর মুখে পিন্‌ডিদা বলল, এখন থেকেই আমার অনেক কাজ।

পরদিন সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ পিন্‌ডিদা আমাদের বাড়ি এলো। একমুখ হাসি। বাবা তখন রোগী দেখতে বেরিয়েছে। তাকে দেখে মা-ঠাকুমাও শশব্যস্তে এগিয়ে এলো। পিন্‌ডিদা বলল, আজ সকালে পুজো হয়ে গেল, আপনারা আর কোনো দুশ্চিন্তা মাথায় রাখবেন না, আমার মনে হয় আজকালের মধ্যেই বুঝতে পারবেন।

মা আর ঠাকুমার আনন্দ ধরে না, কিন্তু অত আশা করতেও ভয়।

বাইরে এসে পিন্‌ডিদা বলল, আজ রাতে তুই বাড়িতে খাবি না বলে দিস, বিনোদের দোকানে আজ আমাদের গ্রান্ড ফিস্ট—হাঁ করে আছিস কি রে—মা কি আর নিজে প্রসাদ খায়? পুজোর প্রসাদ তো সব ভক্তরাই খায়—আমার বাড়িতে তো আর কিছু হবার জো নেই—সব বিনোদের দোকানে তুলে দিয়েছি—বিকেলে মাঠে আসিস, সেখান থেকে চলে যাব।

পিন্‌ডিদা চলে গেল। আমি বিস্ময়ে হাবুডুবু। মায়ের এমন কি প্রসাদ যা সকলের বাড়ি বাড়ি না দিয়ে বিনোদের দোকানে চালান দিল।

কিন্তু বিস্ময়ে আনন্দে আমি একেবারে দিশেহারা বিকেলে। সবে মাঠের দিকে পা বাড়াবো ভাবছি, দেখি বাবা আর তার উকিল ধূর্জটি ঘোষাল খুব হাসতে হাসতে বাড়ি ফিরল। বাবার মুখে অন্তত এমন হাসি শিগগির দেখি নি। ঘরে পা দিয়েই জোর গলায় হাঁক দিল, কই গো, ধূর্জটিবাবু এসেছেন—খুব ভালো খবর আছে।

আনন্দে আমার বুকের ভিতরে টিপ্‌টিপ। ওদিকে মায়ের পিছনে ঠাকুমাও ছুটে এসেছে! বাবা হেসে বলল, ধূর্জটিবাবু এক মস্ত সুখবর এনেছেন, আজ একটা ম্যাজিকই হয়ে গেল—আমি বোধহয় কেস-এ জিতেই গেলাম।

ধূর্জটি ঘোষাল বাধা দিয়ে মায়ের দিকে চেয়ে বলল, বোধহয় কি, হানড্রেড পারসেন্ট সিওর!

মা-ঠাকুমা দু'জনেই উদ্‌গ্রীব, তাদের পিছনে আমিও।

ধূর্জটি ঘোষাল যা বলে গেল, শুনে আমারও স্থানকাল ভুল। এ কি আজব কাণ্ড দেখালে পিন্‌ডিদা!

শুনলাম, বাবার কেস্ প্রায় শেষই হয়ে গেছে, বলতে গেলে কড়া সাবজজ সাহেবের শুধু রায় লিখতে বাকি। রায়ে বাবার হার যে নির্ঘাত তাতে বাবা আর ধূর্জটি ঘোষালের কোনো সন্দেহ ছিল না। সাবজজ সাহেব আজ বিকেল তিনটের সময়ে কোর্টে এসেছে। তারপরেই ভোজবাজীর ব্যাপার। এসে জজ সাহেব ধূর্জটি ঘোষালকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠালো। তার থমথমে মুখ। ধূর্জটি ঘোষালকে আগে তাকে কি বোঝাতে চেয়েছিল আর এই কেস সম্পর্কে সত্যি ব্যাপারটা কি, জজ সাহেব আদ্যোপান্ত শুনতে চাইল। আর খুব মন দিয়ে আগাগোড়া শুনেও গেল। তারপর দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, ওই স্কাউন্ড্রেল সাধন চট্টরাজের ওকালতির লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া উচিত। বলল, এমন ধূর্ত লোকটা যে আমার মন বিষিয়ে রাখার জন্য একের পর এক কত আগে থেকে আপনার ডাক্তার ক্লায়েন্টের এগেন্সট-এ বেনামী চিঠি পর্যন্ত পাঠিয়ে গেছে! আজ সকালে একটা বিশেষ ব্যাপার ঘটে গেছে, যার জন্য আমার সমস্ত কিছু নতুন করে ভাবতে হয়েছে—তারপর আমি বহু জায়গায় আপনার ডাক্তার ক্লায়েন্টের সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছি—সকলেই খুব প্রশংসা করেছে—আর আমি কিনা একটা ঠগবাজের পাল্লায় পড়ে এমন অবিচার করতে যাচ্ছিলাম! আপনি নিশ্চিন্ত

থাকুন, আর আপনার ক্লায়েন্টকেও নিশ্চিন্ত থাকতে বলুন, এর পর যা করার আমি করছি—কিন্তু আপনাদেরও চেষ্টা করতে হবে 'বার' থেকে ওই ক্রিমিন্যাল উকিল লোকটাকে তাড়াতে।

ঠাকুমা একেবারে হাঁউমাউ করে উঠল, ওরে সোনা, ওই পিন্‌ডিকে ডাক্ একবার—ও-ই আমার গোপাল ঠাকুর—ওকে আমি পুজো করব—তুই ডেকে নিয়ে আয় ওকে!

বাবা আর ধূর্জটি ঘোষাল বিষম অবাক। বাবা মাকে জিগ্যেস করল, কি ব্যাপার?

আনন্দে মায়ের চোখেও জল আসার দাখিল। জবাব দিল, প্রদীপের কথা বলছে—আজ সকালেই কোন্ মায়ের কাছে পুজো দিয়ে এসে বলেছিল, নিশ্চিত থাকুন, আজকালের মধ্যেই ফল পাবেন।

বাবার দেব-দেবীতে বিশ্বাস নেই। তাই আমি বলে উঠলাম, আর পিন্‌ডিদা আমাদের বলেছিল, ফল না পেলে নাকে খত দেবে, আর আমাদের ফান্ড থেকে পুজোর তিনশো টাকাও ফেরত দেবে!

বাবা আর ধূর্জটি ঘোষাল হাঁ করে চেয়ে রইল খানিক। বাবা বলল, তিনশো টাকার পুজো! তোর মা দিয়েছে? আমি তো কিছু জানি না!

মা বলল, তোমাকে জানানো নিষেধ ছিল।

বাবা আর ধূর্জটি ঘোষাল খানিক মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। তারপর বাবা আমার দিকে ফিরল। —কি ব্যাপার রে?

আমি ঢোঁক গিলে বললাম, পিন্‌ডিদা মায়ের পুজো দিয়েছিল শুনলে তো।

—কোন্ মায়ের?

আমি চুপ। বাবার কাছে মিছে কথা বলা যে কি শক্ত!

—কোন্ মায়ের পুজো বলছিস না কেন?

—মা উৎকোচেশ্বরীর। ফল যখন হয়েছে বলেই ফেললাম।

—উ-উৎকোচেশ্বরী! বাবা ধমকেই উঠল, কি বলছিস হাঁদার মতো? উৎকোচ মানে তো ঘুষ!

মহা ফ্যাসাদ। —বলে ফেললাম, পিন্‌ডিদা বলেছে, শীতলার পুজো দিলে যেমন বসন্ত না হয়ে ফল ভালো হয়, আর মনসার পুজো দিলে যেমন সাপে কামড়ায় না, তেমনি ঠিকভাবে মা উৎকোচেশ্বরীর পুজো দিলেও ফল ভালো হয়। তাই তো হয়েছে।

আবার বাবাতে আর ধূর্জটি ঘোষালে মুখ চাওয়া-চাওয়ি।

বাবা গম্ভীর।—প্রদীপ কোথায়?

—ওরা সকলেই এখন মাঠে।

—আমার নাম করে এক্ষুণি ডেকে নিয়ে আয়।

আমি পাঁইপাঁই করে ছুটলাম।

কিন্তু পিন্‌ডিদা শুনেই কাঁপতে কাঁপতে আর্তনাদ করে উঠল, আমার যে হার্টফেল হয়ে যাচ্ছে রে সোনা!

আমি আশ্বাস দিলাম, কিছু ভয় নেই—বাবা কেসে জিতেই গেছে ধরে নিতে পারো—ধূর্জটি কাকাও আছে—সক্কলে দারুণ খুশি তোমার ওপর!

—খুশি তো আমাকে নিয়ে আবার টানাটানি কেন! বল্ গে আমার হঠাৎ দারুণ জ্বর হয়েছে—আমি বাড়ি চলে গেছি।

—কি মুশকিল! বাবা ডাক্তার না, তক্ষুণি তোমাকে দেখতে ছুটবে না?

সকলে মিলে টানাটানি করে তাকে নিয়ে এলাম। ঘরে ঢুকেই পিন্‌ডিদা বাবার পা ছুঁয়ে একটা প্রণাম।

—থাক, থাক। কি ব্যাপার বলো তো, তুমি আজ সকালে কার পুজো দিয়ে বাড়িতে বলে গেছো কেসে আমি জিতবই—আর আজকের মধ্যেই বুঝতে পারব?

—আজকের মধ্যে বলি নি মেসোমশাই—আজকালের মধ্যে বলেছিলাম। পিন্‌ডিদার গলার স্বর কাঁদো কাঁদো।

—ওই হল...কার পুজো?

—শুনলে আপনি রেগে যাবেন মেসোমশাই।

বাবা অবাক, তুমি যা বলেছ তাই হয়েছে, আমি রেগে যাব কেন? তারপরেই বাবার কি রকম সন্দেহ হল। গম্ভীর। —শোনো, আমি সোনার বাবা, তাই তোমারও গুরুজন, কোনরকম বাজে কথা না বলে ঠিক ঠিক বলো কি করেছ?

মিনমিন করে পিন্‌ডিদা জবাব দিল, ভে-ভেট নিয়ে গেছলাম মেসোমশাই...।

—ভেট! —মানে ঘুষ? কার কাছে?

ঘরের সকলে উদ্‌গ্রীব। কেবলুর গলা দিয়ে একটা সংস্কৃত গোছের শব্দ বেরিয়ে এলো, ই...ই...ং!

পিন্‌ডিদা জবাব দিল, ওই জজ সাহেবের কাছে।

—হোয়াট! ধুর্জটি ঘোষাল লাফিয়ে উঠল—ওই সাবজজ ঘুষ ছোঁবে— ইম্‌পসিব্‌ল!

পিন্‌ডিদা সবিনয়ে জবাব দিল, ছোঁয় নি তো। আমাকে আর যে লোকের মাথায় চাপিয়ে সব নিয়ে গিয়েছিলাম তাকে প্রায় গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দিয়েছিল।

আমরা সকলে হতভম্ব। বাবা জিগ্যেস করল, তাহলে?

পিন্‌ডিদা বলল, আমি শুনেছিলাম ওই জজ সাহেব ঘুষ শুনলে তার পাঁচশো ব্লাড প্রেসার চড়ে যায়—তাই কার্ডে সুন্দর করে লিখে সাধন চট্টরাজের নামে ভেট নিয়ে গেছলাম। মুখে বলেছিলাম, তিনি আপনার কাছে চিরঋণী তাই আপনাকে এই সামান্য জিনিস ক'টা পাঠিয়ে কৃতার্থ হতে চেয়েছেন।

ঘরসুদ্ধ লোক নির্বাক হতভম্ব, বিমূঢ়। বুঝতেও সময় লাগছে।

সর্বপ্রথম ধূর্জটি ঘোষালের ঘর ফাটানো অট্টহাসি। ফলে সকলেই আত্মস্থ। বাবা হেসেই বলল, হাসছেন বটে, কিন্তু এ ছেলে তো একেবারে ডাকাত!

সাধন চট্টরাজ বলে উঠল, যে ডাকাতিতে সত্যের অনুসন্ধান হয় আমার তাতে আপত্তি নেই।

বাবা আর চেষ্টা করেও তেমন গম্ভীর থাকতে পারছে না।—তুমি তিনশো টাকার কি ভেট নিয়ে গিয়েছিলে?

আমতা আমতা করে পিন্‌ডিদা জবাব দিল, একশ টাকা দিয়ে একটা পাঁচ কেজি রুই, ষাট টাকার তিনটে ড্রেসড্ ব্রয়লার মুরগি, নব্বুই টাকার সন্দেশ আর রাজভোগ...দশ টাকার ফুল...আর...আর...

—আর কি?

—ইয়ে, আর চল্লিশ টাকার একটা ছোট বোতল।

—বোতল! কিসের বোতল?

—হু—হুইস্কির!

ঘরের সকলে আর এক দফা তাজ্জব! বাবা এবার সত্যি গম্ভীর—সে সব কি করেছ?

—আজ্ঞে মাছ মাংস টাংস সব বিনোদের দোকানে দিয়ে এসেছি, রাতে ফিস্ট হবে—তাছাড়া তার ফ্রিজ আছে। আর হুইস্কির বোতলটা পাঁচ টাকা কম নিয়ে আবার সেই দোকানেই ফেরত দিয়ে এসেছি, বাকি পঁয়ত্রিশ টাকা ব্যাঙ্কে আমাদের ফান্ডে জমা করে দিয়েছি।

আমাদের দলের সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল, কারণ বাবাও আর হাসি চাপতে পারল না। সঙ্গে সঙ্গে পিন্‌ডিদা এগিয়ে এসে আর একদফা বাবার পায়ের ধুলো নিল।

ধূর্জটি ঘোষাল তখনও বেদম হাসছে।

বাবা বলল, শোনো প্রদীপ, আমি কিন্তু তোমার ওপর রেগেও গেছি। যদি প্রতিজ্ঞা করো আর এমন দুঃসাহসের কাজ করবে না, তাহলে কেস-এর রায় বেরুলে আমি তোমাদের ফান্ডে আরো এক হাজার টাকা দেব।

পিন্‌ডিদা তক্ষুণি নিজের দুই কান মুললো। —এই প্রতিজ্ঞা করলাম মেসোমশাই। চল রে সোনা, ওদিকে বিনোদটা কি করছে—

যাবার আগে পিন্‌ডিদা ঘর ছেড়ে উঠোনে নামল। পিছন থেকে বিগলিত ঠাকুমা বলে উঠল, ও পিন্‌ডি, গোপাল আমার, সামনের রোববারের দুপুরে তোমাদের সক্কলের এখানে নেমন্তন্ন রইল।

গম্ভীর মুখে পিন্‌ডিদা ফিরে এসে ঠাকুমা আর মায়ের পায়ের ধুলো নিয়েই আবার সবার আগে হনহন করে এগিয়ে চলল।

## পিন্‌ডিদার মেনু

বিকেলে পিন্‌ডিদা তার ঢিবির আসনে এসে বসল আর তার দশ সেকেন্ডের মধ্যে উদাস হয়ে গেল। যেন অভ্যাসের বশে এসে গেছে, আসল মানুষটা এ রাজ্যে নেই। যেন বর্ধমান ছেড়ে, এই বাংলা ছাড়িয়ে কোথায় কোথায় কোন দূরে উধাও হয়ে গেছে। কেবল কার্তিক চটপটি এমনকী পিন্‌ডিদার চোখ-কান কাটা মোসায়েব হাবুল হোঁতকাও পিন্‌ডিদার মুখখানা দেখছে আর আমার দিকে ফিরে ফিরে পিটপিট করে তাকাচ্ছে। যদি আমি পিন্‌ডিদার এই ভাব-সাবের কিছু হদিস পেয়ে থাকি আর ইশারায়ও ওদের কিছু বোঝাতে পারি।

পিন্‌ডিদার ওপরে নয়, ওই চারজনের ওপরেই মুহূর্তের মধ্যে আমার মেজাজ চড়ে গেল। পিন্‌ডিদার এই ভাব-বদল এতদিনে প্রায় সকলেরই মুখস্থ। যখনই কারো ট্যাঁক থেকে কিছু খসানোর মতলব আঁটে তখনই তার এমনি উদাস হাবভাব। যেন এই জগতে বেঁচে থাকা বা বাস করার মধ্যে বড় অর্থ কিছুই নেই। নিরর্থক ছেলেমানুষগুলোর কাছে আসা, বসা, কচকচি করা। কেবল একটাই ম্যাজিকে তার এই উদাস ভাব বদলানো সম্ভব। সেটা তার জিভের খোরাক বা জঠরের রসদ যোগানো। জিভ নড়ানোর ব্যবস্থা করলে পিন্‌ডিদার ঝিমুনি ভাব চলে যায়, সব্ব অঙ্গে সাড়া জাগে, আর তখন তার মগজসুদ্ধু নড়ে চড়ে। কিন্তু তার জিভের এই যোগানদারিটা শতেকে নব্বুই দিন আমাকে করতে হয়। ট্যাঁকের পয়সা আমারই ডানা মেলে উড়ে যায়। ওরা জানে, আমার একটা ব্যাঙ্ক আছে, সেটা হল ঠাকুমার কাঠের হাতবাক্স। ঠাকুমার আদরের নাতি, অর্থাৎ তার নামকরা ডাক্তার একমাত্র পুত্রের এই বংশধরটি যে কত ভাবে কত কায়দায় তার হাতবাক্স ফাঁক করে আসছে ঠিক নেই। বাবা তার পুণ্যবতী মা-টিকে মাস গেলে মোটা টাকা হাতখরচ দিয়ে থাকে—কারণ তার বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই আছে। কিন্তু বাবা যা দেয় তার সিকিও ঠাকুমার খরচ হয় না। তবু ছেলেকে সেকথা বলে না বলতে পারে না। আমার কল্যাণে তার বারো মাসে তেরো পার্বণ ছেড়ে তেতাল্লিশ পার্বণ।

...আমার পকেটের টাকা ওড়া মানে কি? শুধু পিন্‌ডিদার জিভ নড়ে আর ওরা সব মুখ সেলাই করে বসে থাকে? ক্বচিৎ কখনো ওদের পকেট থেকে কিছু খসলে তাই হয় বটে। পিন্‌ডিদার দায় উদ্ধার হলেই ওদের সব দায় শেষ। কিন্তু আমার বেলায় সে-রকম হবার জো নেই। পিন্‌ডিদার জিভ নড়া মানেই সকলের জিভ নড়া। অবশ্য পিন্‌ডিদার সর্বদাই সিংহভাগ। কিন্তু তা বলে বাদ তো কেউ যায় না। সেই জন্যেই আজ পিন্‌ডিদার এই মুখ আর এই হাবভাব। কেবলু কার্তিক চটপটি আর হাবলুও তাই আশায় আশায় এমন জুলজুল চোখ করে আমার দিকে তাকাচ্ছে। ভাজা মাছখানা কেউ উল্টে খেতে জানে না এমনি সরল সব।

কিন্তু সকলের এই গোছের মুখের ছবি পড়ে নেওয়া আমার কাছে এমন জল-ভাত ব্যাপার এখন যে আমিও অনায়াসে চোখ উল্টে বসে থাকতে পারি। সত্যি কথা বলতে কি পিন্‌ডিদাকে খাওয়াতে বা তার জন্য ট্যাঁকের টাকা খসাতে আমার খুব খারাপ লাগে না। কারণ তার মতো এমন মগজের ধার পৃথিবীর কম লোকেরই আছে এটা মনে মনে অন্তত আমি অস্বীকার করি না। সেই মগজ যদি পিন্‌ডিদার পেটে কিছু পড়লে খোলতাই হয় সেটা দোষের কিছু নয়। কিন্তু তার সঙ্গে হেবো চটপটি কেবলু কার্তিকেরও এমন তাল-ঠোকা কেন। তাদেরও ভাবখানা যেন আমার জন্যেই আসর নষ্ট হতে চলেছে। ...আরো একটা কারণে স্বয়ং পিন্‌ডিদার ওপরে আমি খুশি নই খুব। শুধু অখুশি নয়, মনের তলায় এই নিয়ে একটু অস্বস্তিও আছে যা প্রকাশ করতে সংকোচ। ...পিন্‌ডিদার কাণ্ডকারখানার চমক লাগানো ব্যাপারগুলো যাঁরা পড়ে যাচ্ছেন, তাঁরা সকলেই নিশ্চয় জানেন, আমাদের বর্ধমানের এই বাবুগঞ্জের পিন্‌ডি অ্যান্ড কোম্পানির ফান্ডে ব্যাঙ্কে প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকার মতো জমেছে। ডাকাতের শিরোমণি সেই হাড়কাঁপানো রামবাদশাকে দেওঘরে সদলে ধরে দেবার ফলে (লিডার বটে পিন্‌ডিদা উপন্যাস দেখো) ঘোষণা অনুযায়ী আমরা দু'হাজার টাকা পুরস্কার পেয়েছিলাম। তার ওপর বাবার দেওয়া দেওঘর বেড়ানোর সেই সব টাকাই বেঁচে গেছল। এ ছাড়াও সে-যাত্রায় যার পকেটে যা ছিল, লিডার হিসেবে পিন্‌ডিদা তার ওপরেও খাবা বসিয়ে একটা মোটা ভাগ নিজের কাছে রেখেছিল। ...আর শেষে বাবাকে অমন প্রাণান্তকর অপমান আর দুর্নাম থেকে স্রেফ বুদ্ধির জোরে উদ্ধার করার ফলে (পিন্‌ডিদা ও মা উৎকোচেশ্বরী পড়ো) বাবা আমাদের ক্লাবের ফান্ডে কড়কড়ে যে এক হাজার টাকা দিয়েছিল—তাও ব্যাঙ্কে জমা পড়েছে। অবশ্য ব্যাঙ্কের সেই সাড়ে তিন হাজার টাকা থেকে চার গন্ডা পয়সাও কারো সরাবার রাস্তা নেই। কারণ আমার আর পিন্‌ডিদার দু'জনের সই ছাড়া ব্যাঙ্ক থেকে ও টাকার এক পয়সাও তোলার উপায় নেই। পিন্‌ডিদা লিডার, টাকা তোলার পরোয়ানায় তার নাম তো থাকবেই। মোসায়েব হেবো হোঁতকার ইচ্ছে ছিল ব্যাঙ্ক থেকে এই ফান্ডের টাকা তোলার পরোয়ানা পিন্‌ডিদার একারই থাক। কিন্তু শুনে আমাদের বাকি চারজনের হাড় পিত্তি জ্বলেই গেছল। যা-ই হোক পিন্‌ডিদারও চক্ষুলজ্জার বালাই একেবারে নেই বলতে পারি না। নিজেই বলেছে, তা হয় না, টাকা বড় পাজি জিনিস, বাপে ছেলেয় খুনোখুনি হয়ে যায়, আমরা তো বন্ধু। ...টাকাটা থাকবে ক্লাবের নামে—পিন্‌ডি অ্যান্ড কোম্পানির নামের একটা রবার স্ট্যাম্পও করে নেব—আর টাকা তোলার সময় তুলতে হবে দু'জনের জয়েন্ট সিগনেচারে—এখন আমাকে যদি তোরা লিডারই ভাবিস তাহলে আমি একজন আছি, আমার সঙ্গে আর একজন কে থাকবে তোরাই ঠিক কর।

শুনেই হেবোলার দু'চোখ লোভে চিকচিক করে উঠেছিল। তার ধারণা পিন্‌ডিদার সঙ্গে যদি ওর নামটা থাকে, তাহলে সাড়ে তিন হাজার টাকার দখল কেবল ওদের দু'জনার। দু'জনে সই করে যেমন খুশি টাকা তুলবে, যেমন খুশি খরচ করবে। পিন্‌ডিদার এই কথা শুনে আমার দারুণ রাগ হয়ে গেছল। পিন্‌ডিদার সঙ্গে আর কার নাম থাকা উচিত এ কি বলে দিতে হবে! মনে মনে এই রাগের দরুন কিরকম লজ্জা পেয়েছিলাম তা একটু পরেই বলছি।

...হেবোটার যদি চোখের পর্দা বলেও এতটুকু কিছু থাকত। সাড়ে তিন হাজার টাকার ওপর কর্তৃত্ব পাবার সম্ভাবনায় ওর মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছল। ওই হাতির মতো শরীর নিয়ে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়িয়েছিল। —একটু বোসো পিন্‌ডিদা, আমি এক্ষুণি আসছি—

বলেই থপথপ করে মাঠের পিছন দিকে দৌড়লো। আমরা হাঁ করে চেয়ে আছি। ওদিকের রাস্তার ধারে একটা চানাচুরওয়ালা আর একটা আলুকাবলি শসাওয়ালা এসে বসেছে। একটু বাদেই সকলে হাঁ করে দেখলাম শালপাতায় একটা বড়সড় ছালছাড়ানো শসা হাতে হাবুল তেমুনি হন্তদন্ত হয়ে ফিরছে। শসাটা চার-ফালি করা, আর তাতে ঝাল নুন ছড়ানো। দেখলে সকলেরই জিভে জল আসে। চোখ-কান কাটা হোঁতকা হেবো সেই শসার সবটা পিন্‌ডিদার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, ধরো পিন্‌ডিদা, তোমার মুখখানা সেই থেকে শুকনো দেখছি—কারো তো আর চোখ নেই! আমার পকেটে কানাকড়িও ছিল না, ও-ব্যাটার সঙ্গে চেনা-জানা আছে বলে চার আনার কড়ারে ধারে দিলে।

চিন্তাচ্ছন্ন মুখে পিন্‌ডিদা হাত বাড়িয়ে ওটা নিয়ে শসা চিবুতে চিবুতে শুকনো মুখ ভেজানোয় মন দিয়েছিল। হাবুল তারপর গ্যাঁট হয়ে বসে বলেছিল, হ্যাঁ, কি বলছিলে পিন্‌ডিদা? ...ব্যাঙ্ক থেকে ফান্ডের টাকা তোলার ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আর কে থাকবে আমরা ঠিক করব? কেন—আমরা কেন? তুমি লিডার তুমি ঠিক করবে—আমাদের এই বাকি পাঁচজনের মধ্যে তুমি যাকে সব থেকে অনুগত আর বিশ্বস্ত ভাববে—তাকেই নেবে—এর মধ্যে আর কথা কি? তুমি যা বলবে সকলের তাই বেদবাক্য বলে ধরে নিতে হবে।

আমরা চারজন কটমট করে ওর দিকে চেয়ে আছি। পিন্‌ডিদা যদি শসা খেয়ে হাবুলকে টানতে চায় তাহলে স্পষ্ট বলে বসব, আমি তোমার জন্য মুরগীর রোস্ট নিয়ে আসছি, আর আমি চাইলে চটপটি কেবলু কার্তিকও মোগলাই পরোটা, কাবাব আর রাজভোগ নিয়ে আসবে—চার আনার শসার দৌলতেই রায় দিয়ে ফেলো না! মোট কথা হেবোর নাম করলে আমি হেস্তনেস্ত কিছু করবই।

আধখানা শসা শেষ করে পিন্‌ডিদা দেয়ালের টিকটিকির আরশোলা দেখার মতো মুখ করে চুপচাপ ওর দিকে খানিক চেয়েছিল। তারপর মন্তব্য করেছিল, আমার চোখে তোরা সকলেই সমান, সবাই বিশ্বস্ত সবাই অনুগত...তোরাই বিবেচনা করে ঠিক কর, আমি কোনরকম পক্ষপাতিত্বের মধ্যে নেই।

হেবোর থলথলে মুখখানা চুপসে গেছল। এবারে কপালের ওপর নির্ভর করা ছাড়া গতি নেই ভেবে প্রস্তাব দিয়েছিল, তাহলে আমাদের বাকি পাঁচজনের মধ্যে লটারি হোক—যার নাম ভাগ্যে ওঠে।

হাবুলের মাথাটা আমার তখনো চিবুতে ইচ্ছে করছিল। কারণ লটারি করলে পিন্‌ডিদার সঙ্গে আমার নাম থাকার সম্ভাবনা পাঁচ ভাগের এক ভাগ হয়ে গেল। আর তলায় তলায় রাগ চটপটি কেবলু আর কার্তিকের ওপরেও। ওরা তো জানে, অন্তত জানা উচিত, পিন্‌ডিদার সঙ্গে কার নাম থাকাটা সব থেকে নিরাপদ। আর কারই বা দাবি সব থেকে বেশি। কিন্তু ওদেরও তলায় তলায় লোভ আছে নিশ্চয়, নইলে অমন চুপ করে ছিল কেন? লোভ যে আছে সেটা স্পষ্টই বোঝা গেছল কেবলুর কথায়। বলেছিল, হেবো এটা মন্দ বলেনি, ভাগ্যং ফলতি যস্য...

শসার শালপাতা ছুড়ে ফেলে দিয়ে পিন্‌ডিদা খেঁকিয়ে উঠেছিল, তব ভাগ্যে এক টিপং নস্য! ইডিয়েট কোথাকারের—

...পিন্‌ডিদার হঠাৎ এই মেজাজ দেখে আমিও হকচকিয়ে গেছলাম। খরখরে গলায় হাবুলের দিকে চেয়ে পিন্‌ডিদা তড়পে উঠেছিল, ব্যাঙ্কের এ-টাকা কি আমার আর যে আমার সঙ্গে জয়েন্ট সিগ্‌নেচার করবে টাকা তোলার সময়—তার? টাকা যখন তোলা হবে সকলের ভোগ আর আনন্দের জন্যেই তোলা হবে—এর মধ্যে ভাগ্যের কি ব্যাপার দেখলি তোরা?

তারপরেই গনগনে দু'চোখ হাবুলের দিকে। —চেহারার মতো গবেট মার্কা বুদ্ধিও দেখছি তোর দিনে দিনে পাকছে। কোথায় সাত-পাঁচ বিবেচনা করে কারো নাম বলবি, না লটারি দেখিয়ে দিলি! ধর, লটারিতে যদি তোর নামই ওঠে তাহলে কি হবে? নিজের নাম সই করতে গেলে তিনটে কলম ভাঙে, আমার সঙ্গে তার সইয়ের ওপর নির্ভর করলে কোনদিন আর ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলা যাবে—তোর দুটো সই কোনো কালে মিলবে?

হাবুলের মুখের দিকে চেয়ে আমার হাততালি দিয়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল। ওর চার আনার শসাই মাঠে মারা গেল। হাবুল অবশ্য এত সহজে এত বড় অবজ্ঞা হজম করতে চায়নি। মিনমিন করে বলেছে, সই মিলবে না কেন পিন্‌ডিদা, আমি যে স্কুলে সোনা চটপটিদের থেকেও এক বছরের সিনিয়র ছিলাম, ক্লাস এইটে তিনবার ফেল করতে ধৈর্য খুইয়ে বাবা স্কুল ছাড়িয়ে দিলে —কিন্তু স্কুলের সেই ফেল-করা খাতায়ও তো নিজের নাম ঠিক-ঠাক লিখতাম— আর সেই নাম পড়তে পারত বলেই না হাড়কিপটে মাস্টারগুলোর হাত দিয়ে আর নম্বরই বেরুতে চাইত না।

ওর কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে পিন্‌ডিদা একে একে চটপটি কেবলু আর কার্তিককে চোখা চোখে দেখে নিয়ে বিরক্তির সুরে বলে উঠেছিল, তোদেরও যে মাথায় এক-একজনের কি আছে আমি বুঝি না—কার নাম বলবি তা-ও ভেবে পাচ্ছিস না? আচ্ছা, ফান্ডের এই যে সাড়ে তিন হাজার টাকা এটা কার দৌলতে?

ওরা তিনজন একসঙ্গে বলে উঠেছিল, তোমার পিন্‌ডিদা—তোমার দৌলতে!

—তা তো বটেই। আমি লিডার—লিডারের কাজ করেছি কিন্তু এই টাকা পাওয়ার ব্যাপারে আমার আসল সহায় সব সময় কে? ...সোনার বাবার টাকা-কড়ি দিয়ে আমাদের দেওঘরে বেড়াতে পাঠিয়েছিল, সেখানে সোনার বাবারই বন্ধুর প্রাসাদের মতো বাড়িতে আমাদের অতিথি হিসেবে থাকতে পেয়ে আমাদের এক পয়সাও খরচ হল না বলে সেই কয়েকশো টাকাও ফান্ডে চলে এলো। ...তারপর সেখানে বাঘের মুখের সামনে ভেড়া রাখার মতো করে রামবাদশার সামনে এই সোনাকে টোপের মতো রেখেই অমন দুর্ধর্ষ ডাকাতটাকে জেলে পুরে দু'হাজার টাকা পুরস্কার পাওয়া গেল। ...আর শেষে মা উৎকোচেশ্বরীর দশায় এই সোনার বাবারই মুশকিল আসান করে দিতে পারার ফলে আরো এক হাজার টাকা আমাদের ফান্ডে চলে এলো। এখন তোরাই বল আমার ডান হাতখানার মতো সোনা আমার পাশে না থাকলে এর কোন্‌টা হত? এই ফান্ড কি হাওয়া থেকে খসে আমাদের সামনে পড়ত? এর পরেও আমার সঙ্গে আর কার নাম থাকবে তোদের ভাবতে সময় লাগছে!

এই সোনা যে কে পাঠকের বুঝতে বাকি নেই। সোনা আমারই বাড়ির আদরের নাম। আর বন্ধুদের মুখে আমার এই নামই চালু।

সত্যি কথা স্বীকার করতে সংকোচ নেই, সেদিন জয়েন্ট নাম পিন্‌ডিদার সঙ্গে আর কার থাকবে এই আলোচনায় দারুণ আমার রাগ হয়ে গেছল বলে নিজের কাছেই নিজে আমি ছোট হয়ে গেছলাম। মনে মনে পিন্‌ডিদার কাছে আমি ক্ষমা চেয়েছি। আর মনে মনেই অনেক বার করে নিজের কান মলেছি। এই পিন্‌ডিদাকে কিনা আমি ছোট করছিলাম। হেবো পাজিটাকে শসা আনতে দেখেই রাগে আমার বুদ্ধি-বিবেচনা লোপ পেতে বসেছিল।

...কিন্তু সেদিন হেবোর দুর্দশার আরো কিছু বাকি ছিল। ব্যাঙ্ক থেকে দরকারে টাকা তোলার ব্যাপারে পিন্‌ডিদার সঙ্গে তার সই করার সাগরেদ কে হবে ফয়সালা হয়ে যেতে পিন্‌ডিদাই আমার কদর একটু বাড়িয়ে দিল। বলল, আজ সোনার অনারেই একটু কিছু করা দরকার। হেবো, যা-তো এই শসাওলা তোকে যখন চেনে ধারে ছ'জনের জন্য আরো ছ'টা শসা নিয়ে আয়—

শুনে হাবুলের চোখ ছানা-বড়া। গলা দিয়ে আর্তনাদ গোছের কথা বেরিয়ে এলো। —পি পি —পিন্‌ডিদা, আরো দেড়টাকা ধার শোধ করতে হলে আমি তো মারা যাব!

শুনে পিন্‌ডিদা বীতশ্রদ্ধ। ধমকে উঠল, হাতির মতো শরীরে ছুঁচোর প্রাণ একেবারে দেড় টাকা ধার শোধের চিন্তায় হেদিয়ে পড়ল! বাজে না বকে চটপট নিয়ে আয়, বাজার থেকে যে রোজ চার ছ'আনা করে ঝাড়িস, আমার জানতে বাকি আছে? পাপের পয়সা পুণ্যিতে লাগছে বলে কোথায় আনন্দে ছুটে যাবি তা না—

বিরস বদনে হাবুলকে উঠতে হয়েছে। আমি কেবলু কার্তিক আর চটপটি আনন্দে মনে মনে তিড়িং তিড়িং করে লাফাচ্ছি! হাবুল পা বাড়াতে সদয় বন্ধুর মতো আমি পরামর্শ দিলাম, ছ'টা শসা না এনে তুই বরং আমাদের পাঁচ জনের জন্য পাঁচটা নিয়ে আয় হাবুল, তোর মোটা শরীরে অবেলায় শসা খেয়ে কাজ নেই, রাত পর্যন্ত ঢেকুর উঠবে—তাতে চার আনা ধারও কম হবে।

হাবুল মনে মনে আমার মাথাটাই শসার মতো চিবুতে চিবুতে চলে গেছল।

পুরনো কথা থাক আমার মনে, শুধু আমার কেন, চটপটি আর কেবলু কার্তিকের মনে যে অস্বস্তি অনেকবার উঁকিঝুঁকি দিয়ে গেছে তা অন্য কারণে। আমাদের ফান্ডের টাকা ব্যাঙ্কে পড়ে আছে তো পড়েই আছে। সুদে আসলেও বাড়ছে কিছু। কিন্তু কোনোরকম আমোদ-আহ্লাদে পিন্‌ডিদার তার থেকে একটি পয়সা তোলার নাম নেই। কথা প্রসঙ্গে সে-কথা তুললেই পিন্‌ডিদা অন্য দিকে চেয়ে আকাশ দেখে, পকৃতি দেখে, দূরের গোরু-ছাগল দেখে। কোনোদিন বা রাগ করে বলে, কলসির তোলা-জল ঢেলে খেলে ক'দিন আর থাকে? নতুন জলের খোঁজ নেই, বসে খেলেই হল? তোরা এমন জিভ সর্বস্ব কেন। জিভ পেরিয়ে চার আঙুল গেলেই তো খাওয়ার আনন্দ শেষ, চার বছর ধরে আনন্দ পাব এমন কোনো প্রেম মাথায় এলে বলিস—তখন দেখবি পিন্‌ডিদার খরচের হাত কত উদার।

পিন্‌ডিদার মতলবখানা কি আমরা ভেবে পাই না। অথচ বিকেলে ঢিবির আসরে মুখ নড়ার মতো কিছু না পেলে আসর তো জমেই না, উল্টে পিন্‌ডিদার মেজাজ চড়ে। সকলের এই মুখ নড়ার বা জিভ নড়ার আনন্দটুকু অন্তত ব্যাঙ্কের টাকা তুলে চার বছর ধরে চলতে পারে। সপ্তাহে দুদিন করে ফিস্ট হলেও কত টাকা আর লাগতে পারে। আমাদের ফিস্ট বলতে তো আর চর্বচোষ্য-লেহ্য-পেয় কিছু নয়। বিনোদের দোকানের সপ্তাহে দু'দিনের স্পেশাল আইটেম কেবল—একটা কি দুটো পদ। আমরা আভাসে ইঙ্গিতে অনেক বার সেই বাসনা প্রকাশ করেছি। কিন্তু আভাস-টাভাস পিন্‌ডিদার মাথায় ঢোকেই না।

চটপটি ওরা আমাকে আড়ালে জিগ্যেস করে পিন্‌ডিদার মতলবখানা কি বল্ তো, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলার নাম নেই, জিভ সুড়সুড় করলেও প্রাণে ধরে খরচ করার নাম নেই!

মতলব আমিও ভেবে পাই না। তবু বলি, জয়েন্ট সিগনেচার ছাড়া ব্যাঙ্ক থেকে এক পয়সাও তোলা যাবে না যখন, কুমতলব তো কিছু থাকতে পারে না। তার দেশ বেড়াতে ভালো লাগে, এখানে এসে প্রায় কুনো হয়ে বসে আছে বলেই হয়তো বেশি টাকা জমিয়ে আবার কোথাও বেরুনোর মতলব আছে। কারণ খাওয়ার নাম পিন্‌ডিদার জিভে যত জল আসে বেড়ানোর নামে তার থেকে বেশি ছাড়া কম আসে না—সে-তো আমরা দেওঘর অ্যাডভেঞ্চারের সময়েই দেখেছি।

না, পিন্‌ডিদার খারাপ মতলব কিছু আছে এমন চিন্তার ছায়া কারো মনের ত্রিসীমানায় আসা উচিত নয়। তবু এই এক ব্যাপারে পিন্‌ডিদা এমন স্ট্যাচুখানার মতো চুপ বলেই আমাদের সময় সময় অস্বস্তি একটু। হায়ার সেকেন্ডারির রেজাল্ট বেরুলেই তো আবার আমাকে পড়াশুনার চাপের মধ্যে পড়তে হবে। আমি যত ভালো রেজাল্টই করি না কেন, বাবা-মায়ের ধারণা আমার মতো ফাঁকিবাজ কোনো ফেল-করা ছাত্রও নয়। এর মধ্যে একটু ফুর্তিটুর্তির ব্যবস্থা না হলে কবে

আর হবে! আমি পড়ার চাপের অজুহাত দেখিয়ে পরের কোনো প্রোগ্রাম থেকে যদি সট্‌কে যাই, তাহলে পিন্‌ডিদার মাথাতেই তো বাজ পড়ার দাখিল হবে!

যাই হোক, আমাদের মনোভাব বুঝেই পিন্‌ডিদা একদিন হাল ছাড়ল। পকেট থেকে একটা ছ'আনা দামের নোট বই (এটাও কেনা নয়, কারণ নোট বইয়ের ওপরে প্রায় মুছে যাওয়া সোনালি অক্ষরের সালটা দু'বছর আগের।) আর একটা আট আনা দামের ডট পেন (বলা বাহুল্য এ-ও বাড়ির মাসতুতো ভাইবোনদের কারো হবে) আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে গম্ভীর মুখে বলল, লেখ—

কি লিখতে হবে না বুঝে আমি হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। পিন্‌ডিদা তাতেও বিরক্ত। —মুখের দিকে চেয়ে আমার চেহারার ডেসক্রিপশন লিখতে বলছি না, যা বলছি লেখ—

আমি কলম আর নোট বই হাতে তৈরি হয়ে বসলাম। অন্য সকলেও উৎসুক।

—লেখ, সোমবারে পাঁঠার ঘুঘনি। মাংসের চপ।

লেখা ছেড়ে আবারও পিন্‌ডিদার মুখের দিকে তাকাতে হল।

ফের ধমক। —শুনেই চক্ষু গোল হয়ে গেল যে, লেখ না! দেখিস, লিখতে গিয়ে নোট বইয়ে জিভের জল না পড়ে— যেমন হয়েছিস তোরা—এই ক্লাবের নাম রাখা উচিত ছিল খাই-খাই ক্লাব। লিখেছিস, সোমবারে পাঁঠার ঘুগনি, মাংসের চপ?

লেখা হল।

—মঙ্গলবারে খাসির মাংসের কষা আর রুমালি রুটি।

—বুধবারে ফ্রায়েড প্রন, চিকেন কাটলেট।

—বেস্পতিবারে ডিমের ঘুগনি, ডিমের কারি, ফুলকো লুচি।

লিখতে লিখতে আমার অন্তত মনে হচ্ছিল, জ্যৈষ্ঠর এই পচা গরমেও ভিতরে যেন বসন্তের ছোলাছুলি বাতাসে শরীর মন জুড়িয়ে যাচ্ছে। অন্য সকলে প্রায় হুমড়ি খেয়ে পিন্‌ডিদার দিকে চেয়ে আছে। আর হোঁতকা হাবলু অল্প অল্প দুলছে।

—তারপর লেখ, শুক্রবার চিকেন রোস্ট আর টোস্ট।

—শনিবার মোগলাই পরোটা, মাংসের কোর্মা।

—রবিবার রাবড়ি আর রাজভোগ।

লিখতে লিখতে, নোট বইয়ে আমার জিভের জল না পড়লেও হাতের ঘামে লেখা পাতাটা ভিজে গেছে।

পিন্‌ডিদা তেমনি গম্ভীর। —কি লিখলি, মেনুটা পড়।

আমি পড়ে গেলাম।

আসলে এটা বিনোদের দোকানেরই মেনু চার্ট। ঠিক এই ভাবেই পর পর তার স্পেশাল আইটেমগুলো খড়ি দিয়ে কালো বোর্ডে লেখা থাকে। সেটা পড়েও অনেক ভোজন রসিকের জিভে জল গড়ায়, আর পকেটে রেস্ত থাকলে বসেও যায়।

চোখ চালিয়ে পিন্‌ডিদা একে একে পাঁচ মূর্তির পঞ্চমুখ দেখে নিয়ে বলল, সব চুপ মেরে গেলি কেন—মেনু পছন্দ হল তো? ...এ-গুলো স্পেশাল আইটেম, এর ওপর ছোটখাটো যেদিন যেমন হয় সে তো থাকবেই।

জবাবে চটপটি উঠে দাঁড়িয়ে তিড়িং তিড়িং করে কয়েকটা লাফ মেরে বলে উঠল, থ্রি চিয়ারস্ ফর পিন্‌ডিদা!

আনন্দে কাঁসি হারিয়ে কার্তিকটা আমাকেই ব্যাক-স্ট্যাব করে বসেছিল আর কি! বলে উঠেছে, কিরে সোনা, দ্যাখ এবার—পিন্‌ডিদা কিছু করছে না ভেবে তুই তো হেদিয়ে মরছিলি!

কথায় পিন্‌ডিদা তলিয়ে ভাবার ফুরসত পেলে না। কারণ কেবলুর সংস্কৃত বাংলার খিচুড়ি উচ্ছ্বাস তার আগেই আছড়ে পড়েছে। —তুমি শত বর্ষং জীবতু পিন্‌ডিদা, শত বর্ষং জীবতু!

—ডোন্ট টক ফালতু! পিন্‌ডিদা, খেঁকিয়ে উঠল, শত বর্ষং জীবতু হলে এই মেনুর সব কিছু চিবুতে পারব না হজম করতে পারব!

হোঁতকা হাবুল আরো বেশি দুলেছে। আমার দিকে চেয়ে বলল, মেনুটা আরো দু'চারবার পড় না সোনা—শুনেও এত শান্তি জানতাম না।

কার্তিক হুস করে জিভের জল টেনে জিগ্যেস করল, এই মেনু আমরা কবে থেকে স্টার্ট করছি পিন্‌ডিদা?

কেবলু বলে উঠল, শুভস্য শীঘ্রং পিন্‌ডিদা—শুভস্য শীঘ্রং।

পিন্‌ডিদা গম্ভীর একটু। —মা চড়বড়ং ...আমার রাইট হ্যান্ড ম্যান সোনা হঠাৎ কি ভাবছে দ্যাখ তোরা—কিরে সোনা, মেনু তোর মনে ধরল না বুঝি?

সত্যি আমি বিমনা হয়ে গেছলাম। সাহস করে বলতে পারব না বটে, কিন্তু হিসেবের মাথা আমার পিন্‌ডিদার থেকেও পাকা। কমপালসারি অঙ্ক, অ্যাডিশনাল অঙ্ক মিকানিকস-এ প্রায় ফুল মার্কসই পেয়ে থাকি। চটপটি কেবল কার্তিক আর হেবো গবেটের এই আনন্দের ফাঁকেই আমি একটু হিসেব সেরে নিয়েছি। তাই আমতা আমতা করে বললাম, মেনু সম্পর্কে আর বলার কি আছে, এর থেকে ভালো আর কি হতে পারে—তবে এই মেনু ঠিক ঠিক ফলো করতে হলে আমাদের ক'জনের সপ্তাহে দু'শ কুড়ি টাকার মতো লাগবে—

চটপট চিড়বিড় করে আমার কথায় বাদ সাধতে চাইলো—সপ্তাহে দু'শ কুড়ি! তুই বলিস কি রে সোনা!

—মেনু ধরে ছ'ডিশের হিসেব করে দেখ...

মোসায়েব হেবো তক্ষুণি ত্রুটি ধরেছে, লিডার হিসেবে পিন্‌ডিদার জন্য দু'ডিশ ধরে সাত ডিশের হিসেবে করা উচিত।

মনে মনে ওর মুন্ডুপাত করে রোজ ছ'ডিশেরই হিসেব কষা হল আর তাতে সপ্তাহে দু'শ কুড়ি টাকাই দাঁড়ালো। তাও টেনেটুনে।

পিন্‌ডিদার দিকে চেয়ে আমার মন্তব্য, তাহলে মাসে যদি ন'শ টাকা ধরো—আমাদের ব্যাঙ্কের জমা টাকায় বড়জোর চার মাস চলতে পারে।

পিটপিট করে আমার দিকে তাকিয়ে পিন্‌ডিদা যেন অর্ব্বাচীনের দুশ্চিন্তা উপভোগ করছিল, তারপর টিপ্পনীর সুরে বলল, পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুলে দেখা যাবে তুই স্কলারশিপ পেয়েছিস সোনা—কিন্তু তবু এক-একসময় দেখছি তোর থেকে ওই হেবোর মাথা বেশি পরিষ্কার।

এই টিপ্পনীর অর্থ আমাদের সকলের কাছেই ধোঁয়াটে লাগল। হেবোর কাছেও হয়তো। পিন্‌ডিদার জন্য ডবল ডিশের প্রস্তাব করা ছাড়া ও আর কি করেছে! আর পেটুক পিন্‌ডিদা ডবল ডিশ ঘুগনি টপটপ খেতে পারে বটে— কিন্তু ডবল ডিশ রোস্ট তার পেটে ধরবে? এই মন্তব্য শুনে হেবোই কেবল হৃষ্ট বদনে বোকার মতো দুলতে থাকল।

পিন্‌ডিদা গম্ভীর হঠাৎ। —যাক, লিডার হিসেবে আমি মেনু করে দিয়েছি—কিছু করতে গেলে হাত টেনে করা তোদের লিডারের স্বভাব নয়, আরো দুই একটা আইটেম কি বাড়ানো যায় তা বরং ভাবতে রাজি আছি—তা হলেও লিডার বলেই ডিকটেটরি করা আমার স্বভাব নয়—মেনু যার পছন্দ নয় সে হাত তুলতে পারো।

বলা বাহুল্য কেউ হাত তুলল না। আমিও না।

একগাল হেসে পিন্‌ডিদা আমার দিকে চেয়ে বলল, তোর সমস্যা তাহলে মেনু নয়—টাকা?

আরে বাবা, আমি লিডার—আর টাকার ভাবনা তোদের থেকে আমার কম? বললাম তো, মাঝে মাঝে তোর থেকে হেবোর মাথাও বেশি খোলে। ...যাক, বড় রকমের একটা শুভ কাজ হয়ে গেল, পকেটে কি আছে বার করে দে, চটপটি আর কার্তিক ছুট্টে চলে যা, বিনোদের দোকানে আজ মাংসের সিঙাড়া হচ্ছে খোঁজ নিয়ে এসেছিলাম। ওর মাংসের সিঙাড়ার সাইজ দেখলেও প্রাণ জুড়োয়।

সাইজ যেমন, দামও তেমনি। এক একটা দেড় টাকা। ছ'জনের ছ'টা সিঙাড়া মানে ন'টাকা। আমার পকেটে মাত্র চারটে টাকা ঠংঠং করছে। কিন্তু এমন দিনে কাউকে নিরাশ করতে মন চাইল না। উঠে বললাম, অত টাকা সঙ্গে নেই, চটপটি সঙ্গে আয়—বাড়ি থেকে আরো পাঁচটা টাকা নিতে হবে।

হেবো কি বলি-বলি করছিল, আমি হনহন করে বিশ-পঁচিশ গজ এগিয়ে গেলাম। জানি, ফাঁক পেলেই ও পিন্‌ডিদার জন্য দুটো সিঙাড়া আনতে বলবে।

আমার সঙ্গ নিয়ে চটপটি বলল, এত দিন বাদে পিন্‌ডিদার হাত তাহলে খুলল রে সোনা—

আমি বললাম, খুলল তো...তবে বড় বেশি খুলে গেল বলে ভাবনা হচ্ছে, মতলব বুঝছি না। নিজেদের হেপাজতের সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি টাকা চার মাসে ফুঁকে দেবার ছেলে তো পিন্‌ডিদা নয়।

ভেবেচিন্তে চটপটি বলল, রোজই ওই খাঁটি হবে পিন্‌ডিদা তো বলেনি, বোধহয় যেদিন যেদিন হবে সেদিনের বার ধরে ওই মেনু ফলো করা হবে। সোমবারে খেলে সোমবারের মেনু বেস্পতিবার হলে বেস্পতিবারের মেনু—এমনি।

আমিও একটু ভেবে সায় দিলাম। তাই হবে বোধহয়।

কিন্তু পরদিন থেকেই আমাদের অশান্তি শুরু হল। মেনু অনুযায়ী কবে থেকে খাওয়া শুরু হবে পিন্‌ডিদা আর বলেই না। জিগ্যেস করলে হাই তুলে ফিরে বলে, কাল কি মেনু দ্যাখ তো...।

আমি সাগ্রহে নোট বই দেখে বলি, কাল শুক্রবার—চিকেন রোস্ট আর টোস্ট পিন্‌ডিদা!

—বাঃ, চমৎকার! আজ যা হোক কিছু চিবুনোর ব্যবস্থা কর।

ছ'সাত দিন ধরে রোজই এমন হচ্ছে। আমি রোজই আশায় থাকি পিন্‌ডিদা নিজে চেক সই করে আমাকে দিয়ে সই করিয়ে নিতে বাড়ি আসবে—কারণ দু'জনের সই ছাড়া ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলা যাবে না। কিন্তু সকালে পিন্‌ডিদা বে-পাত্তা। বাড়িতে গেলেও শুনি বেরিয়ে গেছে।

বিকেলে আবার আমরা তাকে ছেঁকে ধরি, কি হল পিন্‌ডিদা?

—কাল বুধবারের মেনুটা দ্যাখ তো।

—ফ্রায়েড প্রন, চিকেন কাটলেট।

—হাই ক্লাস। এখন একটু কিছু আনা তো।

বুধ-বেস্পতিও কেঁদে কেঁদে চলে যায়।

এবারে আমাদের তেতে ওঠার পালা। অপ্রীতিকর কাজটা আমাকেই বরাবর করতে হয়। সোজাসুজি জিগ্যেস করলাম, তোমার এই মেনু করার কি অর্থ তাহলে পিন্‌ডিদা?

পিন্‌ডিদার ভ্রূ কুঁচকে গেল। —তুই কৈফিয়ত চাস?

—তুমি লিডার, তোমার কাছে কৈফিয়ত কেন চাইতে যাব! কিন্তু ওরকম একটা জিভে জল আসা মেনু করে আমাদের কি বোঝাতে চাও বা ভাবাতে চাও তা বলবে তো?

—তাই বল। একগাল হাসি। —শোন তাহলে, ক্ষীরের নদী, দুধের সাগর, সন্দেশের পাহাড় কোনদিন পুরনো হয় না, বুঝলি—ছোট ছেলেমেয়ে ছেড়ে বুড়োদেরও ওই স্বপ্ন দেখতে ভালো লাগে। একটু বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা শোন, ব্রেজিলে আমার দারুণ ভক্ত চার বন্ধু ছিল। দস্তুরমতো

গরিব মানুষ কিন্তু খুব আশা চারজনে ব্যবসা করে একদিন মস্ত একটা কাঠের ইনডাস্ট্রি গড়ে তুলবে। কিন্তু মুশকিল হল ওই চার বন্ধুই রাম পেটুক। তখনকার ওদের ছোট কাঠের ব্যবসা থেকে যা লাভ হয় তার সবটাই খেয়ে উড়িয়ে দেয়। এমন খাওয়া খায় যে একসময় পরদিনের কাঁচামাল আনার টাকা থাকে না—

এই পর্যন্ত বলেই পিন্‌ডিদা থেমে গেল। কার্তিক আর তাড়া দিল, তারপর পিন্‌ডিদা?

—তারপর আমার গলা শুকিয়ে কাঠ—ওই তো আইসক্রিমঅলা যাচ্ছে।

হেবো শয়তান তক্ষুণি উঠে দাঁড়িয়ে আইসক্রিমঅলাকে ডেকে বসল।

রাগে আমার গা জ্বলছে। এক আত্মীয়ের বিয়ে উপলক্ষে বাবা আর মা তিন-চার দিনের জন্য কলকাতা গেছে। আমাকেও যাবার জন্যে বলেছিল। কিন্তু বোকার মতো এই আড্ডা ছেড়ে আমি নড়তে চাইনি। আর বাবা-মাও বেশি সাধাসাধি করেনি, কারণ, আমি গেলে ঠাকুমাকে পাহারা দেবার জন্য কার্তিক আর চটপটিকে এ-বাড়ি এসে থাকতে হয়। তাছাড়া বাবার বিশ্বস্ত কম্পাউন্ডারকেও বললেই বাড়িতে থাকবে। তবু নাতি থাকা আর বাইরের লোক এসে থাকার মধ্যে তফাত আছে। তাই আমি ঠাকুমার দোহাই দিয়েই থেকে গেছি। কারণ বাবা-মায়ের কখনো একসঙ্গে কোথাও যেতে হলেই আমা মওকা। বাবা আমার হাতে কিছু টাকা দিয়ে বলে গেছে, যদি হঠাৎ দরকার হয়তো খরচ করবি—বাজে খরচ একদম করবি না। আর একমাত্র ছেলেকে বাড়িতে রেখে মা কলকাতার বিয়ে বাড়িতে যাচ্ছে তিন-চার দিনের জন্য—কোন প্রাণে আমার হাতে ত্রিশ-চল্লিশ টাকা না দিয়ে যেতে পারে? এ-ছাড়া তখন সংসার খরচের টাকা ঠাকুমার হাতে মানেই তো আমার হাতে। ঠাকুমাকে যা বোঝানো যায় তাই বোঝে। (আমার পাপ নিশ্চয় হয় না, কারণ এটা তো ঠাকুমাকে ভালোবাসার জুলুম! এর ওপর এই তিন-চার দিন ঠাকুমার হাতবাক্স হাতাবার পাপ থেকে তো আমি বাঁচলুম!) আমার না যাওয়ার আরো কারণ, কবে এর মধ্যে পিন্‌ডিদা তার মেনু চালু করতে চায় তার ঠিক কি? তখন আমি না থাকলে তো ব্যাঙ্ক থেকে টাকাই তোলা যাবে না!

কিন্তু এখন দেখছি বাবা-মায়ের সঙ্গে কলকাতা চলে গেলেই ভালো হত। বাবা-মা সবে কাল গেছে—আর কাল বিকেল থেকেই এরা আমাকে আবু হোসেন ঠাউরেছে। এরা বলতে পিন্‌ডিদাই আসল। আগেও অনেকবার বলেছি বোধহয়, পিন্‌ডিদা টাকার গন্ধ পায়। বাবা-মা আমাকে রেখে তিন-চার দিনের জন্য কলকাতায় বিয়ে বাড়ির নেমন্তন্নে চলে গেল শুনে এক চোখ ছোট করে আমার দিকে এমন করে তাকিয়েছিল, যার অর্থ, তোরই তো রাজত্ব তাহলে এখন! গতকাল বিকেলেই বিনোদের দোকান থেকে মাংসের ঘুগনি এসেছে, আর কোয়ালিটির আইসক্রিম—যার এক-একটার দাম আড়াই টাকা।

আইসক্রিম খাওয়া হতে কেবলু ফরফর করে জিজ্ঞেস করল, অত! কিম্ পিন্‌ডিদা—সেই গরিব চার পেটুক বন্ধুদের কি হল?

—কি আর হবে। চার বন্ধুই একদিন আমার কাছে এসে হত্যা দিয়ে পড়ল। আমি তাদের হিরো, আমাকেই সমস্যার সমাধান করে দিতে হবে—তাদের বাঁচার উপায় না বাতলে দিলে একদিন প্রাণের সাধে খেয়ে চারজনে একসঙ্গে আত্মহত্যা করবে বলল।

...শুনে আমারও খুব দুশ্চিন্তা হল। বেচারারা সত্যি ভালো মানুষ। দোষের মধ্যে খাওয়ার লোভ সামলাতে পারে না। তা বলে ওর আত্মহত্যা করে মরবে? অনেক ভাবনাচিন্তার পর সেই ক্ষীর নদী দুধসাগর আর সন্দেশের পাহাড়ের রূপকথাই মাথায় এলো। ওদের দেশের ক্ষীর নদী বলতে অবশ্য সব্ব-রকমের সুইট্‌স, দুধসাগর বলতে বিয়ার শ্যাম্পেন হুইস্কি আর সন্দেশের পাহাড় বলতে নানারকম মাংসের রোস্ট, কোর্মা, স্ন্যাকস, কারি—এইসব। ভেবেচিন্তে বললাম, আমার কথা তোমরা শুনে চলবে হলপ করে বলতে পারো?

তারা দিব্বি কেটে হলপ করল। তারপর জিগ্যেস করল, তুমি সমস্যার সমাধান করার মতো কোনো ফরমুলা পেয়েছ?

বললাম, পেয়েছি। আমার ফরমুলা হল, রিয়েল প্লেন ইটিং আর একই সঙ্গে রিয়েল হাই থিংকিং। রাজি তো?

ওরা বলল, হলপ করেছি যখন রাজি তো নিশ্চয়! কিন্তু তোমার পরামর্শটা কি?

আমি তখন ঠিক এইরকম সাতদিনের সাত রাত্রি একটা মেনু চার্ট করে দিলাম। রাতের চার্ট, কারণ ওদের দেশে দিনের খাওয়া নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই—যা লোক কিছু মুখে দিয়ে কাজের মধ্যে ডুবে থাকে। খাওয়ার যত ভাবনা রাতে। প্রত্যেক রাতের সেই মেনু চার্ট দেখে ওদের জিভে জল গড়াতে লাগল। যাকে বলে রাজসিক চার্টই করেছি। জিভ আর ঠোঁট চেটে চেটে ওরা বলল, কিন্তু এই চার্ট মেনে চললে আমরা তো দুমাসের মধ্যে একেবারে ফতুর হয়ে যাব!

আমি বললাম, চার্টে মেনু তোমরা মন দিয়ে ফলো করবে জিভ বা মুখ দিয়ে নয়। বলছি না, রিয়েল প্লেন লিভিং বাট রিয়েল হাই থিংকিং। রোজ চারজনে রাতে একসঙ্গে হয়েই দেখবে আজ নয়, কাল কি খাওয়ার মেনু। সেটা দেখেই বিশ্বাস করবে আর আনন্দে আত্মহারা হবে। তখন সেই রাতের মতো শুকনো রুটি চাপাটি তল করতে তোমাদের খুব অসুবিধে হবে না দেখো। মনে হবে পরদিন তো কপালে ওই রাজসিক খাওয়া আছে। এইভাবে সর্বদা 'আজকের দিনে'র মধ্যে নয়—সর্বদা 'কালকের দিনে'র স্বপ্নে রাত কাটিয়ে দেবে।

...তারা আমার উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিল। আমি যখন ব্রেজিল ছেড়ে আসি তখন তাদের বিজনেস ক্যাপিট্যাল দশ লক্ষ ডলার—মানে আমাদের এক কোটি টাকার ওপরে।

গপ্‌প শুনে আমরা হাঁ হয়ে বসে রইলাম। আমার দিকে চেয়ে পিন্‌ডিদা ঘায়ের ওপর যেন একপ্রস্থ নুন ছড়ালো। বলল, মেনু করার দিন কেন তোকে বলেছিলাম সময় সময় তোর থেকে হেবোর মাথাও বেশি পরিষ্কার মনে হয়—কেন বুঝছিস? মেনু শুনে ও তোকে বলেছিল, মেনুটা আরো দু'চার বার পড়তে, কারণ, শুনেও এত শান্তি ও আনত না। তাদের ছোঁক-ছোঁকানি বন্ধ করার জন্যে ওই শান্তির ব্যবস্থাই আমি করছিলাম—প্লেন ইটিং আর হাই থিংকিং-এর মর্ম একটু তোরাও বুঝতে শেখ। টাকা ঢেলে পোলাও কালিয়া সবাই খেতে পারে।

পরদিন বিকেলে যে সাজে আমি মাঠে এলাম তাইতেই উঁচু টিবির আসনে বসে পিন্‌ডিদা বার কয়েক আমাকে টেরিয়ে দেখে নিল। মুখে কথা নেই। উদাস উদাস। আমার পরনে ধোপের পাট-ভাঙা পা থেকে হাঁটু পর্যন্ত চাপা পাজামা আর গায়ে লম্বা ঝুলের আদ্দির পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবিতে একটাই মাত্র বুক পকেট, সাইড পকেট নেই। বুক পকেটে পিন্‌ডিদার সেই মেনুর চটি নোট বই।

চটপটির সঙ্গে এই সকালেই আমার কিছু পরামর্শ হয়ে গেছল। আমার পরে একটু আধটু সাহস ওরই আছে। ও প্রশংসার ছলে বলল, বেড়ে পোশাক পরেছিস তো!

হাত দিয়ে ঘাস পরিষ্কার করে আমি জায়গা মতো বসে বললাম, বাবা আবার এ-সব পোশাক দু'চক্ষে দেখতে পারে না—এই মওকায় পরলাম।

বসার সময় পাঞ্জাবিটা কোমরের ওপর পর্যন্ত তুলে নিয়ে তরপর সন্তর্পণে বসেছি। ও-ভাবে জামা তোলার সাদা উদ্দেশ্য, পিন্‌ডিদা বা অন্য সকলকে বুঝিয়ে দেওয়া আমার পাজামার কোমরের কোথাও কোনরকম নোটের টুকরো গোঁজা নেই। মেনুর নোট বইটা বুক পকেট থেকে তুলে চটপটির কোলের ওপর ছুড়ে দিলাম।—এই পোশাকে এটা বেঢপ লাগছে। এটা আপাতত তোর জিম্মায় থাক।

চপটটি নোট বাইয়ের পাতা কটা একবার ফরফর করে উল্টে নিজের পকেটে রেখে দিল। অর্থাৎ বোঝানো হয়ে গেল ওতেও একটা একটাকার নোটের কুচি নেই। আমি যাকে বলে একেবারে ঝাড়া হাত-পায়ের মানুষ আজ।

পিন্‌ডিদা এ-দিক ও-দিক তাকাচ্ছে, আকাশ দেখছে, দূরের গাইবাছুর দেখছে আর মাঝে মধ্যে হাই তুলছে। পিন্‌ডিদার দিকে চেয়ে আমি তোষামোদের হাসি হাসলাম একটু। বললাম, তোমার ব্রেজিলের সেই চার পেটুক বন্ধুর কথা রাতে আমি যত ভেবেছি তাতো অবাক হয়েছি পিন্‌ডিদা—সত্যিই ওরা শুধু প্লেন ইটিং আর হাই থিংকিং ফরমুলা রপ্ত করে দশ লক্ষ ডলার ক্যাপিট্যাল করে ফেলল?

—হুঁ। পিন্‌ডিদার ঝাপটা-মারা জবাব।

কেবলুটা বরাবরই ক্যাবলা গোছের। বলল, কিন্তু ওরা ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ করত কিনা সেটা কি পিন্‌ডিদা জোর দিয়ে বলতে পারে!

পিনডিদা একবার সোজা তাকিয়ে দু'চোখের ছুরির ফলা ওর মুখে বসিয়ে দিল।

কিন্তু কার্তিকেরও সংশয় যায় না। বলল, কিন্তু প্লেন ইটিং করে ওই বন্ধুরা ক'টাকা বাঁচাতো যে তাই খাটিয়ে শেষে দশ লক্ষ ডলার পুঁজি করে ফেলল!

এদের উদ্দেশ্য পিন্‌ডিদার মুখ খোলানো। কিন্তু পিন্‌ডিদা আবার জ্যৈষ্ঠের আকাশ দেখছে। আমি কার্তিক অর কেবলুর উদ্দেশে বললাম, তোরা বোকারাম, পিন্‌ডিদার ফরমুলার ফিলসফিটাই ধরতে পারিসনি। প্লেন ইটিং-এ দীক্ষা নেবার ফলে ওদের মাথা থেকে খাওয়ার দুশ্চিন্তা লোভ-টোভ সবই চলে গেল—সেই এনারজি তারা ব্যবসায় লাগালো—একই সঙ্গে মূলধনের আর ঘাটতি না পড়ার ফলে ব্যবসাও আস্তে আস্তে ফেঁপে উঠতে লাগল—তাই না পিন্‌ডিদা?

আমি কার্তিকের মতো বোকা নই যে পিন্‌ডিদার চোখের ছুরির ফলা মুখে বসতে দেওয়ার জন্য তার দিকেই চেয়ে থাকব। তক্ষুণি চটপটির দিকে ফিরে তেমনি তোয়াজের সুরে বললাম, সত্যি কাল রাতে ফরমুলাটা নিয়ে অনেক ভেবেছি আর তারিফ করেছি—প্লেন ইটিং অ্যান্ড হাই থিংকিং! হাই ক্লাস!

এবারে পিন্‌ডিদা আমার দিকে চেয়ে গুরু-গর্জন করে উঠল। দু'হাত নেড়ে বলল, আমার ফরমুলায় প্লেন ইটিংটা ছিল—এখানে সেটা কোথায়?

আমি ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলাম খানিক। তরপর বোকামুখ করে জবাব দিলাম, বাঃ, সে তো যে-যার বাড়ি গেলেই পাব!

পিন্‌ডিদা তার সামনে থেকে একমুঠো ঘাস তুলে নিয়ে হাতের মুঠোয় পিষতে লাগল। আমি চটপটিকে বললাম, কাল শুক্রবারের মেনুটা কি দ্যাখ তো?

নোট বই খুলে চটপটি জবাব দিল, চিকেন রোস্ট আর টোস্ট!

—বাঃ, চমৎকার।

পিন্‌ডিদা ঝটকা মেরে উঠে দাঁড়ালো। তারপর হনহন করে মাঠ ছেড়ে চলল। ভোজ একটু বেশি হয়ে গেল বুঝেও আমি দমলাম না—ব্যাঙ্কের টাকায় মরচে পড়বে আর এ-দিকে আমার পকেট ফাঁক হবে, এ কাঁহাতক বরদাস্ত করা যায়!

কিন্তু এর ফলে আর এক বিপদ যে যমের মতো মাথা তুলে দাঁড়াবে তার জন্য তো তৈরি ছিলাম না। পিন্‌ডিদা মাঠ পার হয়ে যাবার আগেই রাগে ফুলতে ফুলতে হেবো হোঁতকা উঠে দাঁড়ালো। গাঁ-গাঁ করে বলল, বড়লোকের ছেলে বলে আর লেখাপড়ায় ভালো বলে এত অহংকার তোর যে পিন্‌ডিদাকে রাগিয়ে মাঠ থেকে তাড়ালি? এত সাহস তোর? আজ আমি তোর মাথাটা চ্যাপ্টা করে দিয়ে ফাঁসিকাঠে যেতে হয় তাও যাব—তোর মরণ আজ আমার হাতে।

ও এক পা এগোতেই আমি ছিটকে সাতপা সরে গিয়ে একটা বড় পাথর হাতে তুলে নিলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে গর্জন করে যা বললাম তা বিপদকালে ঈশ্বরই বলালে বোধহয়। আর এইটুকু বলতে পারি হঠাৎ-হঠাৎ উপস্থিত বুদ্ধিও আমার আশ্চর্য রকম খুলে যায়।

পাথরটা হাতে নিয়ে গলা ফাটিয়ে গর্জন করে বললাম, এই ও! দাঁড়া ওখানে—আজ কার মরণ ঘনিয়েছে এখুনি টের পাবি—এই চটপটি কেবলু কার্তিক তোরা যে-যার পাথর নিয়ে দাঁড়া না—আমাদের কথা ছিল না—পিন্‌ডিদাকে যে অপমান করবে তার হাড়গোড় গুঁড়িয়ে তবে ছাড়ব! পিন্‌ডিদার ফরমুলার এই অপমান তোরা সহ্য করছিস? পাথর নিয়ে দাঁড়া শিগ্‌গির—ওর মতো পাজি উল্লুক গাধা হিপোকে আজ খুন করব নয়তো নিজেরা খুন হব—কাল পিন্‌ডিদা এসে এজন্যে আমাদের যে বিচার করবে তা মাথা পেতে নেব—

কার্তিককে একটা হ্যাঁচকা টান মেরে চটপটি তিন লাফে আর একটা বড়সড় পাথর কুড়িয়ে রুখে দাঁড়ালো। আমার বিপদটা ওরই মাথায় ঢুকেছে। সেও গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলল, কার্তিক তুই ওদিকটায় পাথর নিয়ে দাঁড়া—লিডার গুরু—গুরুর অপমান প্রাণ থাকতে আমরা সহ্য করব? [কি অপমান সেটা চটপটির নিজের মাথায়ও তখন পর্যন্ত ঢোকেনি, তবে আমার মাথার ওপর তার আস্থা আছে বলেই রক্ষা।]

হোঁতকা হেবোকে অমন থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে হোক বা আমাদের এই মূর্তি দেখে হোক, কার্তিকও এনার্জি পেয়ে একটা ঢিল কুড়িয়ে দাঁড়িয়ে গেল। সাহসেরও একটা ছোঁয়াচে গুণ আছে বোধহয়। কেবলু পর্যন্ত লাফিয়ে উঠে এদিক ওদিকে ঢিল খুঁজতে খুঁজতে বলে উঠল, লোট্টুং—কুত্র লোট্টুং! হেবোর ওপর কার না রাগ।

এমন একটা তাজ্জব কাণ্ড হোঁতকা হাবুল চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছে না। যে-দিকে তাকায় সেদিকেই আমরা কেউ না কেউ ইট উঁচিয়ে মারমুখি। তো তো করে আমার দিকে চেয়েই বলল, ব্যা-ব্যা-ব্যাপারখানা কি তোদের—নিজে পিন্‌ডিদাকে অপমান করলি আর বলছিস আ-আ-আমি অপমান করলাম—চালাকি পেয়েছিস?

—চালাকি! আবার বলছিস চালাকি? চটপটি শোন, পিন্‌ডিদাকে কে অপমান করল ও এখন বুঝতেই পারছে না!

চটপটি হুমকি দিল, ওর মাথাটা থেঁতলে দিয়ে বুঝিয়ে দে না! নইলে ওকে গার্ড দিয়ে এইভাবে আটকে রাখ তোরা, আমি বোঁ করে ছুটে গিয়ে পিন্‌ডিদাকেই ধরে নিয়ে আসি—সেই বিচার করুক—

দরকার পড়লে চটপটিরও মাথা মন্দ খেলে না। আমি বললাম, তা-ও করতে পারিস, কিন্তু আমাদের এক কথা, তাকে বলব গুরুর অপমানের ক্ষমা নেই, হেবোর মতো গবেট নিরেট পাষণ্ডকে না তাড়ালে আমরা আর দলে থাকব না—যা, ধরে আনা চাই—তাকে বুঝিয়ে বলবি আমাকে মারতে এসেও তার ফরমুলাকেই গলা টিপে মারতে যাচ্ছিল, তার মানে পিন্‌ডিদার গায়েই হাত তুলতে যাচ্ছিল।

চটপটির ছুটি ছুটি ভাব। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে কেবলু বা কার্তিকের মাথায় তখন ভালো করে কিছু ঢোকেনি। বিপদে বুদ্ধিভ্রংশ দশা হাবুলের। চটপটি সত্যি পিন্‌ডিদাকে ধরে আনতে ছোটে কিনা সেদিকে চোখ রেখে রণে ভঙ্গ দেওয়া সুরে বলল, আমার বুদ্ধি না-হয় তোর মত অত পাকা নয় সোনা—কিন্তু পিন্‌ডিদাকে কি অপমান করলাম বলবি তো? যদি করেও থাকি বুঝতেই তো পারছিস, না জেনে করেছি।

আমি ভেঙচি কেটে বলে উঠলাম, না জেনে করেছি! না জেনে না বুঝে আমার মাথাটা ছাতু করলে তখন বলতিস না জেনে না বুঝে করেছি? পাজি গাধা হাতি হিপো কোথাকারের!

—গাল দিবি না। আগে বুঝতে দে পিন্‌ডিদাকে কি অপমান করলাম?

ঘেন্নায় হাতের ইট ছুড়ে ফেলে দিলাম। ওরাও দেখাদেখি তাই করল। এগিয়ে এসে হুকুম করলাম, বোস্ এখানে—বুঝিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু আগেই বলে রাখছি, শুধু বুঝিয়েই দিচ্ছি, কাল পিন্‌ডিদার সামনে তোর বিচার হবে—এই তোরাও শোন।

ওকে ঘিরে সকলে বসলাম, আমি বললাম, হ্যাঁ রে হেবো, কার্তিক কেবলুও যা বুঝে মুহূর্তে মারমুখী হয়ে উঠল—তোর মাথায় সেটুকুও ঢোকে না—তোর লজ্জা করে না?

হাবুল ড্যাবড্যাব করে মুখের দিকে চেয়ে আছে।

—পিন্‌ডিদা উঠে চলে গেল কেন, তারই ফরমুলা অনুযায়ী কালকের মেনু জিগ্যেস করেছিলাম বলে তো?

হাবুল মাথা নাড়ল। তাই বটে।

—পিন্‌ডিদার ফরমুলা ফলো করেই তার ব্রেজিলের চার পেটুক বন্ধু দশ লক্ষ ডলার মানে এক কোটিরও বেশি টাকার মালিক হয়েছে—পিন্‌ডিদার সে ফরমুলা খারাপ না ভালো?

—খুব—খুব ভালো।

—আর পিন্‌ডিদার এই ফরমুলার দৌলতেই আমাদের ব্যাঙ্কের সাড়ে তিন হাজার টাকায় হাত পড়ছে না—তাহলে এই ফরমুলা খারাপ না ভালো?

—বললাম তো খুব ভালো!

—তাহলে আমার মুখে তারই ফরমুলার কথা শুনে পিন্‌ডিদা উঠে গেল বলে তুই রাগ করে উঠে গেলি আর আমি তাকে অপমান করলাম ভাবলি কেন?

—দেখলাম তো রাগ করে চলে যেতে!

—রাগ করে চলে যেতে দেখলি তুই? নিজের সফল হল বলে তুই তাকে রাগ করে চলে যেতে দেখলি? তোর একবারও মনে হল না, কষ্ট চাপতে না পেরে চলে গেল?

—কষ্ট! কষ্ট কেন?

—কষ্ট নয়? পিন্‌ডিদার ব্রেজিলের চার বন্ধুর একদিনেই ওই ফরমুলা রপ্ত হয়ে গেছল? অভ্যাস করতে গিয়ে দিনের পর দিন তাদের কষ্ট হয়নি? করো পেটে কিছু পড়ল না, তাইতে পিন্‌ডিদার সঙ্গে আর আমাদের সকলেরই কষ্ট হয়নি?

এবার কার্তিক আর কেবলু ঘন ঘন মাথা নাড়ল। তা অবশ্য তা অবশ্য। হেবোর বোবা মূর্তি।

—আর তুই কিনা কিছু না বুঝে আমার গলা টিপতে এসে পিন্‌ডিদার ফরমুলার গলা টিপতে যাচ্ছিলি! আমার গায়ে হাতে তুলে ঘুরিয়ে পিন্‌ডিদার গায়েই হাত তুলতে যাচ্ছিলি! এর পরেও তোকে ছাড়ব আমরা?

এবারে হাবুলের আমাল মুখে চিঁ-চিঁ কথা বেরুলো। বলল, সোনা রে, তোর মতো অত বুঝলে তিন তিন বার ক্লাস এইটে ফেল করি ...এবারকার মতো আমাকে ক্ষমা করে দে...আচ্ছা এই আমি নাক কান মলছি, আর কক্ষণো চট করে রেগে যাব না...তোরা ভাই পিন্‌ডিদাকে কিছু বলিস না।

আমি তবু গুম হয়ে আছি দেখে চটপটি আমার পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, এবারকার মতো ওকে ক্ষমা করেই দে সোনা, হাজার হোক, কত কালের বন্ধু, তার ওপর এক বছরের সিনিয়ার ছিল আমাদের, পরে না হয় দু'বছরের জুনিয়ার হয়ে গেছে।

গম্ভীরমুখে কেবলু মন্তব্য করল, ক্ষমা হি পরমং তপঃ।

হেবো হোঁতকাকে টাইট দিতে পেরে আমারও বুকের পাটা বেড়েছে। ফেরার সময় বাড়ির কাছে এসে চটপটিকে বললাম, তুই যেন ঠিক থাকিস, পিন্‌ডিদাকে দিয়ে ব্যাঙ্কের টাকা কিছু অন্তত না খসিয়ে আমি আর এতটুকু টলছি না। ব্যাঙ্কের টাকা কিছু না খসা পর্যন্ত আমার পকেটে কেউ আর কানাকড়ির শব্দও পাবে না।

পরদিন। শুক্রবার।

আমি গত কালের পোশাকেই মাঠে উপস্থিত। অর্থাৎ আজ শূন্য পকেট। কিন্তু আমার হাবে-ভাবে নিরানন্দের কিছু নেই। পিন্‌ডিদার বাঁ দিকেই আমার জায়গা। গ্যাঁট হয়ে বসলাম। পিন্‌ডিদার

বেড়ালের মতো সন্ধানী দু'চোখ আমার আপাদমস্তকে হাঁচড়-পাঁচড় করছে তাও যেন চোখে পড়ছে না। দুই ভুরুর মাঝে থেকে ভাঁজ পড়তে দেখলাম।

মিনিট দশেক চুপচাপ থেকে তারপরে চনমনে গলায় পিন্‌ডিদা বলে উঠল, এই সোনা, তোর বাপ, মা—

আমি তাকাতেই সামলে নিয়ে বলল, আই মিন তোর বাবা-মা অর্থাৎ আমাদের পূজনীয় মেসোমশাই আর মাসিমা কবে কলকাতায় গেছেন?

—গত মঙ্গলবার...কেন?

—কবে ফিরবেন?

—আগামী কাল ফেরার কথা ছিল, আজ সকালে মায়ের ফোন পেলাম পরশু রোববার ফিরবে। ...কেন পিন্‌ডিদা?

চোখ পাকিয়ে পিন্‌ডিদা আমার স্নায়ুর ওপর জোর ফলাতে চেষ্টা করল। —তুই বলতে চাস, তাঁরা বাড়ি থাকতে তোর পকেটে টাকার বাজনা শোনা যায়, আরে পাঁচ ছ'দিনের জন্য কলকাতায় গেলেন অথচ তোর হাতে কিছু দিয়ে গেলেন না?

—বাড়ি খরচের টাকা ঠাকুমার হাতে দিয়ে গেছে।

—সে-কথা জিগ্যেস করা হয়নি, তোকে কিছু দিয়ে গেছেন কি যাননি?

যেন দিয়ে থাকলে সে-টাকার ওপরে সকলের অধিকার। বললাম, দিয়ে গেছে...যেদিন গেল মঙ্গলবারই আমাদের পাঁচ আর তোমার দু-প্লেট এই সাত প্লেট ঘুগনির জন্য সাড়ে দশ টাকা খসেছে।

—মাত্র তো...তারপর?

—বুধবার ছ'টা আইসক্রিম গেছে পনেরো টাকা।

—হল সাড়ে পঁচিশ...তারপর?

—তারপর আবার কি?

—তারপর আবার কি?

মাত্র সাড়ে পঁচিশ নিয়ে তুই তাদের রেহাই দিয়েছিস এ আমাকে বিশ্বাস করাতে চাস? এ-ছাড়া খরচের জন্য তাঁরা যে টাকা ঠাকুমার কাছে দিয়ে গেছেন সে-ও কার কব্জায় পড়েছে আমরা বুঝি না ভেবেছিস—কি বোঝাচ্ছিস তুই আমাকে?

আমি ভিতরে ভিতরে তেতে উঠছি। আবার এ-ও বুঝছি আমি রাগলে আনন্দই মাটি। তাই মুখে হাসি টেনে বললাম, আমি তো তোমাকে কিছু বোঝাতে চাচ্ছি না পিন্‌ডিদা, তুমি বুঝতে চাইছ কেন?

থমকে চেয়ে রইলো একটু। ও...আমি বুঝতে চাইছি কেন? তোর বাবা-মা এখানে নেই, তাদের একমাত্র স্নেহের ছেলেকে আমরা আগলে রাখব আনন্দে রাখব—আর হাতে টাকা থাকতেও শূন্য হাতে তুই মাঠে হাওয়া খেতে আসবি?

জবাবে আমি চটপটির দিকে তাকালাম। —চটপটি, কাল শনিবারের কি মেনু রে?

তক্ষুণি নোট বই বার করে চটপটি জবাব দিল, মাংসের কোর্মা আর মোগলাই পরোটা।

আমার মন্তব্য, একসেলেন্ট!

পারলে পিন্‌ডিদা আমার মাথাটাই চিবোয়। কিন্তু এখন আমি আকাশ দেখছি। আবার আড়চোখে হেবোর মুখখানাও দেখছি। এটাও পিন্‌ডিদার রাগ কি কষ্ট ও ভেবে পাচ্ছে না।

পিন্‌ডিদার গলার স্বর আরো কোমল কিন্তু আরো নির্মম। —ও...আমি একটা দিন ওই মেনু ফলো না করলে তুই আর পকেট থেকে এক পয়সাও বার করবি না...এই?

—তুমি মিথ্যে রাগ করছ পিন্‌ডিদা, আমি কিছুই বলিনি—আর তোমার মেনু নিয়েও কোনো অসম্মানের কথা বলিনি।

—বুঝেছি বুঝেছি! পিন্‌ডিদার থমথমে মুখ। —আগে এক বেলার জন্যে তোর বাবা-মা কোথাও বেরুলে তুই ফিস্ট লাগিয়ে দিতিস—এখন খুব সেয়ানা হয়ে গেছিস। ঠিক আছে, কালকের মেনু ফলো করা হবে। ওই মাংসের কোর্মা আর মোগলাই পরোটাই হবে—ছ'ডিশ কোর্মা ছ-আটে আটচল্লিশ টাকা, আর বারোটা মোগলাই পরোটা বারো দুগুণে চব্বিশ টাকা—মোট ষাট টাকা। ডান্—ডান্— ডান্ ! হল? এবার তাহলে তুই রোববারের মেনু ফলো করবি বল?

—বাঃ, আমি আঁতকে উঠলাম, আমার টাকা তো ফাণ্ডের টাকা নয়, আমারই টাকা—রোববারের মেনুতে রাবড়ি আর রাজভোগ— ষাটের জায়গায় সত্তর টাকা লাগবে, অত টাকা কোথায় পাব?

চটপটির দিকে চেয়ে পিন্‌ডিদা চাপা গর্জন করে উঠল সোমবারের মেনু দ্যাখ—

নোট বই না দেখেই চটপটি চটপট জবাব দিল, সোমবারে পাঁঠার ঘুগনি আর মাংসের চপ।

পিন্‌ডিদা এক প্লেটের জায়গায় দু-প্লেট ঘুগনি আর দুটোর জায়গায় চারটে চপ খেলেও পঁচিশ টাকার মধ্যে হয়ে যাবে। তাই পিন্‌ডিদা বাতিল করার আগেই বললাম, কালকের মেনু ফলো করলে সোমবারের এই মেনুতে আমি রাজি।

এ-ও তো সত্যি কথা, বাবা-মা বাড়ি না থাকলে পিন্‌ডিদাসুদ্ধু সকলেই আমাকে একটু বেশি সঙ্গ দিতে চায়। তাই ওদের মুখ একটু নড়বে চড়বে এ আশা তো করতেই পারে।

—ঠিক আছে। পিন্‌ডিদা উঠে দাঁড়ালো। বসলে আমার মুখ দেখতেই হবে। এই রাগেই যেন উঠে পড়ল। —কাল সকাল সাতটা নাগাদ একবার আমার বাড়ি আসিস—

তার বাড়িতে সকালে আসার দরকার কেন সকলেই জানে চেকের ওপর পিন্‌ডিদা আর আমায় দুজনকেই সই করতে হবে।

আর একবারও পিছনে না তাকিয়ে পিন্‌ডিদা হনহন করে চলে গেল। হাবলু, আজ সারাক্ষণ কেঁচো হয়ে বসেছিল। ওর ভয় পাছে কালকের ব্যাপারটা কোনভাবে পিন্‌ডিদার কানে যায়।

হাবুলের দিকে চেয়ে আমি বললাম, কি রে, আজও তো ওই গুরু চোখ দিয়ে আমাকে ভস্ম করতে করতে চলে গেল, আজ যে বড় খাপ্পা হয়ে উঠলি না?

হাবুল বলল, নাক-কান তো মলেছি, আর বিঁধিস কেন—তা ভাই তোর হিম্মত আছে বলতেই হবে, পিন্‌ডিদাকে দিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলিয়ে ছাড়লি...মাঝখান থেকে আমাদের শনি আর সোম দু'দিনের খ্যাঁটের ব্যবস্থা হয়ে গেল! আজ তোর নামে একটা থ্রি-চিয়ারস্ দিতে আমাদের আপত্তি নেই—কি বলিস রে তোরা?

পরদিন সকাল ঠিক সাতটায় সাইকেলে চেপে আমি পিন্‌ডিদার বাড়িতে। প্রায় সাত-আট মিনিট ডাকাডাকির পর একটা কাজের মেয়ে বেরিয়ে এসে জানান দিল, দাদাবাবু একটু দরকারে বেরিয়েছেন, আপনাকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে চলে যেতে বলেছেন। তার মধ্যে উনি না ফিরলে আপনাকে আবার বেলা দশটায় আসতে বলেছেন।

আমাকে আসতে বলে এই সাত সকালে কোথায় আবার কি দরকারে বেরুলে রে বাবা! যাক সাতটা দশ হয়েছে, বলে গেছে যখন সাড়ে সাতটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। সাতটা চল্লিশ পর্যন্ত সাইকেল নিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার পরেও পিন্‌ডিদার দেখা নেই। বিরক্ত হয়েই চলে গেলাম। দশটায় ব্যাঙ্ক খোলে, সকালে না এসে একবারে দশটায় আসতে বললেই তো পারত।

ফের দশটায় এলাম। কিন্তু এবারে আমার একটু অবাকই লাগল। সেই কাজের মেয়েটা আবার এসে জানান দিল, খুব একটা দরকারে দাদাবাবুকে আবার বেরুতে হয়েছে, আপনাকে অপেক্ষা করতে বলে গেছে।

মেজাজটা খিঁচড়ে যাচ্ছে। —এবারে কতক্ষণ অপেক্ষা করতে বলেছে?

—তা কিছু বলেনি।

লাও ঠেলা! মনে মনে বললাম, খাওয়াচ্ছে তো বাপু ফান্ডের টাকায়, কিন্তু শাহেন শা বাদশার মতো ভাবখানা, যেন নিজের টাকায় দয়া করে খাওয়াচ্ছে—এখন এসে অপেক্ষা কর, তখন এসে অপেক্ষা কর—হুকুম করলেই হল!

যাক, এবারে মিনিট কুড়ির মধ্যে পিন্‌ডিদার দেখা মিলল। মাঠের দিকের রাস্তা-ধরেই বাদশাই চালে হেঁটে আসছে। কিন্তু কালকের মেজাজ আর নেই। একগাল হেসে বলল, কি রে, অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিস নাকি?

—একবার না, দু'বার। সকালেই কোথায় বেরিয়েছিলে?

—মর্নিংওয়াকে।

পিন্‌ডিদা জীবনে মর্নিংওয়াক করেছে শুনিনি। সকালে চা না পাবার ভয়ে একেবারে সাতটায় ওঠে। তারপর সাড়ে আটটা পর্যন্ত বিছানায় গড়ায়, কাগজ-টাগজ পড়ে।

—আর দশটায় আসতে বলে এখন আবার কোথায় বেরিয়েছিলে?

—বিনোদের সঙ্গে বিকেলের ব্যবস্থা সব সেরেই এলাম। আগে থেকে সময়ে না দিয়ে এলে ব্যাটা কি করতে কি করবে ঠিক আছে! ...দ্যাখ সোনা, খাওয়া যখন হচ্ছে একদিন, ভালো করেই হোক, রাতে বাড়ি ফিরে সব আবার রুটি চিবুবে—কি দরকার! বিনোদকে তাই ছ'ডিশের জায়গায় ন'ডিশের কোর্মার অর্ডার দিলাম...এক-একজনের ভাগে দেড় ডিশ করে হবে। আর, দুটোর জায়গায় কারো কারো তিনটে মোগলাই লাগতে পারে তাও বলে দিয়েছি—যে যেমন খায়। ...আর শোন, অত মাংস পরোটার পর একটু মিষ্টি ছাড়া কি ভালো লাগবে—বিনোদকে তাই ছ'টা কোয়ালিটির আইসক্রিম আনিয়ে তার ফ্রিজে রেখে দিতে বলেছি—ভালো করিনি?

আমারই দু'চক্ষু বিস্ফারিত। পিন্‌ডিদা হঠাৎ দাতা কর্ণ হয়ে বসল! মনে মনে ততক্ষণে আমার হিসেব কষা হয়েছে। ন'ডিশ কোর্মা বাহাত্তর টাকা, পেটে না ধরতে চাইলেও তিনটে করে মোগলাই পরোটা সকলেই খাবে জানা কথা—তাহলে আঠারোটা মোগলাই পরোটা ছত্তিরিশ টাকা—আর ছ'টা কোয়ালিটির আইসক্রিম পনেরো টাকা—সব মিলিয়ে একশ তেইশ টাকা—এত খাওয়ার পর পানও দু'টাকার চাইই—তাহলে একশ পঁচিশ!

নাঃ, এরপর পিন্‌ডিদা একবছর আর ব্যাঙ্ক থেকে টাকা না তুলতে চাইলেও কিছু বলা যাবে না। বললাম, খুব ভালো করেছ পিন্‌ডিদা, ফান্ডের টাকায় যেদিন খাব মনে রাখার মতো করেই খাব—বিনোদকে খাসিটা বেশ দেখেশুনে আনতে বলেছ তো?

—সে আর তোকে বলতে হবে না। ডিশের মাংসও চোখ দিয়ে ওজন করে নেব বলেছি। ভালো জিনিস বেশি বেশি না দিলে ওর গর্দান থাকবে? ...ভালো কথা, বিনোদকে পরশু সোমবারের মেনুটাও বলে দিয়ে এসেছি কিন্তু—

আমি আঁতকে উঠলাম, সেদিনও আবার বাড়িয়ে অর্ডার দাওনি তো—সেদিন তো আমার গাঁটের টাকা খসবে!

—না রে না, তুই কি আমাদের পর তো তোকে জব্দ করতে যাব—সোমবারের অর্ডার তোর হিসেব মতোই দিয়েছি...যাতে বাছাই ভালো জিনিস আগে থাকতে আমাদের জন্য সরিয়ে রাখে সেজন্যেই বলা।

চেক সই করার কথা বলতে পিন্‌ডিদা বলল, সে হবে'খন, পালিয়ে যাচ্ছি নাকি আমরা! বিনোদ আমাদের খুব চেনে। বেশ খোশ-মেজাজে বাড়ি ফিরে এলাম। আসার পথে চটপটিকেও খবরটা

দিয়ে এলাম। ও আবার কেবলু কার্তিককে বলতে গেল—রাতের মিল তো অফ্ করে বেরুতে হবে। হাবুলের জালা মার্কা পেটের জন্য আমাদের কোনো ভাবনা নেই—যত ভরাবে তত ভরবে।

বাড়ি ফিরে দেখি ঠাকুমার খুশি খুশি মুখ। বললাম, কি কলকাতার কোনো খবর আছে নাকি?

একমুখ হেসে ঠাকুমা বলল, খবর আর কি, তোর বাবা-মা কালই আসছে এ খবর তো কালই ফোনে পেয়েছি।

—ও সেই জন্যেই তোমার আনন্দ?

—হ্যাঁ রে ছোঁড়া, ক'দিন নিরিবিলিতে ঘর করলাম তোকে নিয়ে, এখন তারা আসছে বলে আমার আনন্দ! ...হ্যাঁ রে সোনা, আসার আগে তোর বাবা কলকাতা থেকে কোনভাবে তোর পরীক্ষার রেজাল্টটা জেনে আসতে পারে না?

আমি হতভম্ব। আমার পরীক্ষা নিয়ে ঠাকুমার এত আগ্রহ কখনো দেখিনি। ভালোই লাগল। বললাম, তোমার নাতি পরিচয় দিলে যদি জানতে পারে, তা না হলে আরো দেড়মাসের ধাক্কা। ...কেন, আমার রেজাল্ট নিয়ে তুমি বুঝি খুব ভাবো?

—খুব ভাবতে যাব কেন, তুই স্কলারশিপ পাবি জানা কথাই তো?

বিকেলে মাঠে আনন্দের বন্যা। ফিরতে সন্ধ্যা পার হয়ে গেল। মুখ হাত ধুয়ে আবার বেরুনোর জন্য রেডি হয়ে দেখি ঠাকুমা তার রাতের জপে বসে গেছে। দরজার কাছ থেকে বললাম, ঠাকুমা, রাতে আমি বাড়িতে খাব না, হরিহরকে বলে দিও।

জপের সময় মুখে রা কাটা চলে না। আমার দিকে ফিরে ঠাকুমা একমুখ হেসে মাথা কাত করল।

...হ্যাঁ, ভোজন হলো বটে একখানা। পিন্‌ডিদা সকলকে তদারক করে খাওয়ালে (নিজেও খেতে খেতেই), সব থেকে বেশি চোখ আমার দিকে। খাওয়ার পর আইসক্রিম। সে-ও আবার শুধু আমাকে দুটো সাধা হল। কিন্তু আমার বা কারো পেটে তখন আধখানা আইসক্রিমেরও জায়গা নেই।

খাওয়া শেষ হতে আমিই শুরু করলাম, থ্রি-চিয়ারস্ ফর—

পিন্‌ডিদা দু'হাত তুলে আমাকে আর সেই সঙ্গে সকলকেই থামিয়ে দিল। বলল, আজ কেবল সোনার জন্যই এমন আনন্দটা পাওয়া গেল—সকলে বল্, থ্রি-চিয়ারস্ ফর সোনা!

প্রাণের আনন্দে ওরা তাই বলল। এটা সকলেই বুঝল, আমি পিন্‌ডিদার সঙ্গে দ্বন্দ্বে না নামলে ফান্ডের টাকায় আজ এ ফুর্তি হত না। সেই কদরে আমার নামে থ্রি-চিয়ারস্।

পান মুখে দিয়ে সকলে যে যার বিদায় নিতে যাব, পিন্‌ডিদা বাধা দিল, এখনও একটু কাজ বাকি আছে রে...যার জন্য এতটা হল তাকে সকলে মিলে সসম্মানে আমাদের আগে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া উচিত। এই বিবেচনাও তোদেরই নেই!

আমি দারুণ লজ্জা পেয়ে বাধা দিতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু লিডারের হুকুম পেয়ে কেউ তা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না। সকলে হই-হই করে আমাকে বাড়ির দরজা পর্যন্ত নিয়ে এলো।

তারপরেই অবাক আমি। সামনের ঘর আর বারান্দায় আলো জ্বলছে। আর ঠাকুমা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। আর তার সমস্ত মুখে হাসি চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছে। কিন্তু আমি এত অবাক সে জন্যে নয়, অবাক কারণ, গম্ভীর মুখে পিন্‌ডিদা প্রায় ছুটে গিয়ে ঠাকুমার পায়ে মাথা-কপাল রেখে দারুণ ভক্তিভরে এক মিনিট ধরে প্রণাম করছে। আধখানা ঝুঁকে ঠাকুমা তার গায়ে পিঠে গভীর স্নেহে হাত বুলোচ্ছে আর বলছে, গোপাল আমার...গোপাল আমার...গোপাল আমার...।

গেল বারে বাবাকে সংকট থেকে অমন আশ্চর্যভাবে উদ্ধার করবার পর থেকেই ঠাকুমা পিন্‌ডিদাকে দেখলেই গোপাল-গোপাল করে আর তখন তো এই গোপালকে পুজোই করতে

চেয়েছিল! (পিন্‌ডিদা ও মা উৎকোচেশ্বরী পড়) কিন্তু ঠাকুমা আরো কি বলছে! বলছে...গোপাল তোমার স্বপ্নের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক, তোমার স্বপ্নের ষোলো আনা সত্যি হোক গোপাল!

আমি হাঁ। অন্য সকলেও।

প্রণাম সেরে উঠে পিন্‌ডিদা সকলের উদ্দেশে ধমকে উঠল, এই তোরা সঙের মতো দাঁড়িয়ে আছিস কেন! ঠাকুমাকে প্রণাম কর সব!

আমি ছাড়া সবাই টিপ টিপ প্রণাম করে উঠল। কেন প্রণাম কেউ জানে না।

পিন্‌ডিদা বলল, ঠাকুমা এবার আমার স্বপ্নের কথাটা সোনাকে বলে দিতে পারেন। নিষ্ফল হয় সেই ভয়ে আগে বলতে বারণ করেছিলাম—এখন তো সব হয়েই গেল—এই চল্‌রে সব, রাত হয়ে গেল—

আর অপেক্ষা না করে পিন্‌ডিদাই আগে পথে নেমে এলো। পরে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে করতে অন্য সকলে।

...এরপর বিশদ করে বলার মতো কিছুই নেই। পিন্‌ডিদা ভোর রাতে স্বপ্ন দেখেছে, পরীক্ষায় সোনা দারুণ ভালো রেজাল্ট করে পাস করেছে। স্বপ্নে সেই আনন্দে সকলে মিলে মাংসের কোর্মা, মোগলাই আর আইসক্রিম খাচ্ছে। সোনাও। কিন্তু এমন আশ্চর্য স্বপ্ন যে, তখন পর্যন্ত কেবল সোনাই জানে না, কেন সকলের এত ফুর্তি এত আনন্দের খাওয়া-দাওয়া। খাওয়ার পরে জেনেছে আর আনন্দে হেই হেই করে নেচেছে।...স্বপ্নটা দেখে পিন্‌ডিদা সেই সাত সকালে ঠাকুমার কাছে ছুটে এসেছে (তখন আমি পিন্‌ডিদার বাড়িতে তার জন্য অপেক্ষা করছি)। স্বপ্নের কথা শুনে ঠাকুমার আনন্দে গায়ে কাঁটা, কিন্তু পরে গালে হাত। সোনার বাবা-মা কলকাতায়, সে এখন এ ব্যবস্থা করে কি করে? পিন্‌ডিদা বলেছে, তাকে কিছুই করতে হবে না, শুধু খবরটা জানানোর জন্য এসেছে। আর বলেছে, স্বপ্ন যাতে সফল হয় সেই জন্য ব্যাঙ্ক থেকে ক্লাবের ফান্ডের টাকা তুলে এনে ঠাকুমার হাতে দেবে—কারণ, মেসোমশাই-মাসিমা যখন কলকাতায়, এই উদ্যোগটা ঠাকুমার হাত দিয়েই হওয়া উচিত। ঠাকুমা বিনোদের হাতে টাকাটা দিয়ে দিলে সে-ই সব ব্যবস্থা করবে। তা এত বড় আনন্দের ব্যাপারে ঠাকুমা ক্লাবের ফান্ডের টাকা নিতে যাবে কেন, আনন্দে আটখানা হয়ে নিজেই সে-টাকা দেবে বলেছে। বেলা দশটার সময় বিনোদকে নিয়ে পিন্‌ডিদা আবার ঠাকুমার কাছে এসেছে। (তখনও আমি পিন্‌ডিদার বাড়ির দরজায় তার জন্য অপেক্ষা করছি।) ঠাকুমা বিনোদের হাতে আগাম টাকা দিয়ে পই পই করে বলে দিয়েছে, সকলের যেন তৃপ্তি করে খাওয়া হয়, টাকা আরো লাগলে আরো দেওয়া হবে।

...পিন্‌ডিদা সকালে আর বিনোদকে টাকা দেবার সময়েও ঠাকুমাকে বিশেষ করে অনুরোধ করেছে, স্বপ্নটা যেন ঠিক-ঠিক মানা হয়, খাওয়া-দাওয়ার আগে সোনা যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে কেন এই খাওয়া, কেন এই ফুর্তি আর আনন্দ। আগে জেনে ফেলে স্বপ্ন নিষ্ফল হলে তার থেকে দুঃখের আর কী আছে! ...তা ঠাকুমা কি এত কাঁচা মেয়ে যে আগে থাকতে আমাকে জানতে বুঝতে দিয়ে স্বপ্ন নিষ্ফল হতে দেবে!

কিন্তু এখন আমি কি করব?

যা খেয়েছি গলায় আঙুল দিয়ে সব বার করে দেব?

...তা করেই বা লাভ কি। পরশুদিনের মেনুতেও তো আমারই সব খরচ। আর ওদের সঙ্গে বসে আমাকে সব গিলতেই হবে!

# যাঃ কলা!

কিছুদিন ধরে আমাদের মন-মেজাজ ভালো যাচ্ছে না। ভোটের ফয়সলা হয়ে যাবার পর থেকেই এখানে-ওখানে গণ্ডগোল শুরু হয়েছে। এই বর্ধমানের আনাচ-কানাচেই তো ক'টা খুন-জখম হয়ে গেল। গাঁয়ের দিকের খবর আরও খারাপ। ছোট-বড় জোতদার রাতারাতি সিংহ-অবতার হয়ে উঠেছে। কেউ পুরনো রাগের ঝাল মেটাচ্ছে, কেউ বা আত্মরক্ষার নামে দণ্ড হাতে নিয়েছে। আমরা অবশ্য পলিটিকস্-এর সাতে-পাঁচে নেই, তবু অশান্তি বা অশান্তির খবর কানে আসতে থাকলে কার ভালো লাগে? বিশেষ করে যে সময় দল বেঁধে আমরা একটা ছোটখাটো আউটিং-এর মতলব আঁটছি। মাঝে-সাজে নতুন কিছু প্রোগ্রাম করে উৎসাহের খোরাপ জোগান দিতে না পারলে পিন্‌ডিদার মতো রত্নকে নিজেদের মধ্যে আগলে রাখি কী করে? কিছুদিন ধরেই লক্ষ করছিলাম পিন্‌ডিদার মন উড়ু উড়ু। আমাদের সঙ্গে টিপির উঁচু আসনে বসেও তাকে খুব কাছের লোক মনে হত না। বিনোদের দোকানের রসদও তার রসনা কতটা সিক্ত করতো ঠিক বোঝা যেত না। খেতে খেতে দূরের আকাশ দেখত, চিল দেখত। বিনোদের দোকান থেকে কিছু আসা মানেই মনের মতো কিছু শোনার আশা। কিন্তু সে-গুড়েও বালি পড়ছিল, তাগিদ দিলে পিন্‌ডিদার একই সুরের ক্লান্ত জবাব, আর ভাল্লাগে না।

ভালো যে লাগে না সেটা আমরা বিলক্ষণ টের পাচ্ছি। একদিন-দু'দিন অন্তর মাটির ঢিবির উঁচু আসন খালি পড়ে থাকছে। ওটা যেন আমাদের এক এবং অদ্বিতীয় প্রাণপ্রিয় শাহেনশা বাদশার পরিত্যক্ত সিংহাসন—উদাস দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে। আর ওটার দিকে চেয়েই আমরা পিন্‌ডিদার বিহনে তার কদর পাঁচ গুণ বেশি বুঝতে পারি। পিন্‌ডিদার এই উদাস ভাব দেখেই আমি কার্তিক আর চটপটি ছোট রকমের একটা এক্সকারশনের প্ল্যান ভাঁজছিলাম। এ আলোচনায় কেবলুকে টানিনি, কারণ সংস্কৃত বুলি কপচানোর ঝোঁকে ওর পেট থেকে কখন কী ফাঁস হয়ে যায় ঠিক নেই। আগে প্ল্যান ঠিক হোক, যাবার জায়গা ঠিক হোক তাক্-লাগানো ঘোষণাটা তারপরে হওয়াই ভালো। আমার অদৃষ্টে কিছু খরচের গচ্চা আছে, তার আর কী করা যাবে! গুণিজনকে আসরে ধরে রাখার জন্য রাজা-বাদশারাও গাঁটের কড়ি কম খরচ করত না। পিন্‌ডিদা কোন মগডালের গুণিজন সে কেবল আমরা তার অভাবে যার যার বুক দিয়ে অনুভব করতে পারি। টাকা বেশি খরচ করতে পারলে দল বেঁধে সব সাইকেলে কলকাতা থেকেই ঘুরে আসা যায়। মামাবাড়ি-টাড়ি নয়, একরাত দু'রাতের জন্য কোনও আধা সস্তা হোটেলে থেকে মনের সাধে ফুর্তি করে আসা যায়। বাড়িতে গোপন করতে হবে। সাইকেলে যাব শুনেলে বাবাই বাদ সাধবে। কিন্তু তাতেও যে খরচ, আমার তহবিলে কুলোবে না। খরচের বেলায় তো কেবল এই সোনারচাঁদ সোনা। ওদিকে ক্লাবেরই কত টাকা ব্যাঙ্কে পচছে, আমার আর পিন্‌ডিদার জয়েন্ট সিগনেচারে সে-টাকা ডানা মেলে আমাদের হাতের মুঠোয় চলে আসতে পারে। কিন্তু ভালো সময়েই সে-টাকা তোলার চেষ্টা করে কতবার নাজেহাল হয়েছি, এ-সময়ে ব্যাঙ্কের টাকা তোলার প্রস্তাব করা মানে তো ওই ঢিবির সিংহাসন ছেড়ে পিন্‌ডিদাকে বরাবরকার মতো চলে যেতে বলা।

যাক, বর্ধমানে এ-সময়ে কোনো ঘুপচি খুন-জখমের মহড়া চলেছে বলে নয়, গত তিন সপ্তাহ ধরে আমরা—আমরা বলতে আমি চটপটি কেবলু কার্তিক আর হাবলু হোঁতকা অশান্তির পাহাড় বুকে বয়ে বেড়াচ্ছি; কারণ পিন্‌ডিদা থেকে থেকে আমাদের বিরহের আগুনে ঝলসে চলেছে। প্রথম সপ্তাহে সে তিন দিন টানা অনুপস্থিত। তার মামাবাড়িতে খবর নিতে গিয়ে মামাটির দাবড়ানি খেয়ে

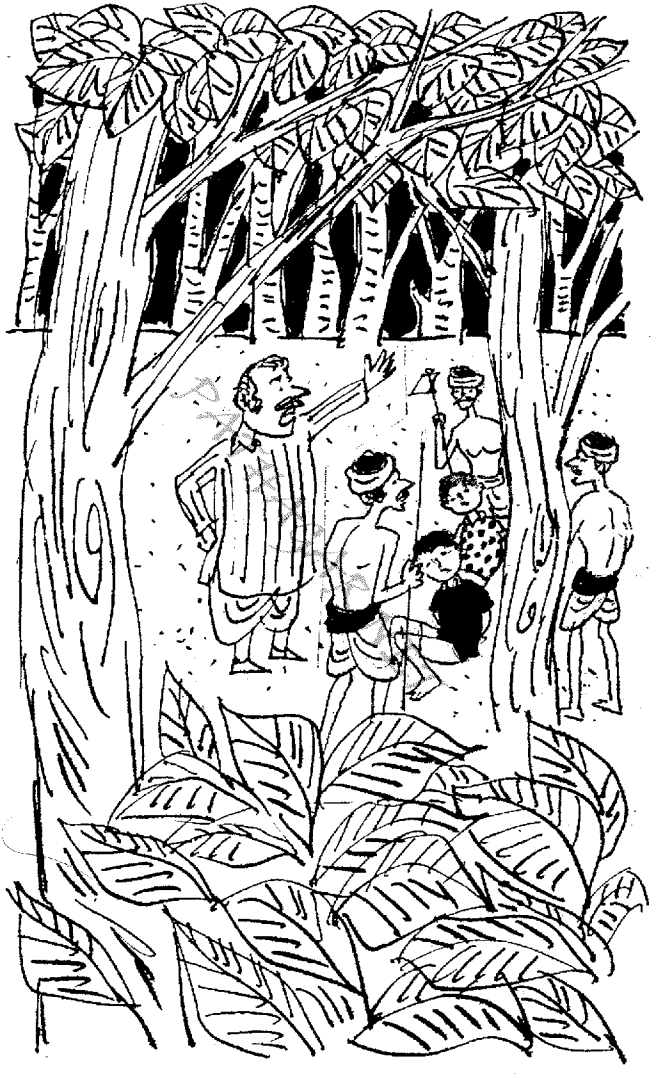

এসেছি। পিন্‌ডিদার ওই মামা অমাদের এই দলটিকে কোনওদিনই তেমন পছন্দ করে না। নকুড় সরকার মানে পিন্‌ডিদার মামা হেবোকে খেঁকিয়েই উঠেছিল, কেন, পদা না থাকলে তোমাদের আড্ডার নরক আর গুলজার হয়ে উঠতে পারছে না? সে বর্ধমানে নেই!

একে খেঁকানো, তায় গুরুর অপমান! মামা হোক আর যা-ই হোক পিন্‌ডিদাকে পদা বলবে? ব্রেজিল ফুটবলের বাছাই একাদশের মুকুটমণি প্রদীপনারায়ণ দত্ত সেখানকার ভক্তদের উল্লাসের পি.এন.ডি. থেকে পিন্‌ডি হয়ে ফুটবল আকাশের অদ্বিতীয় সূর্য হয়ে বসেছিল—তার মামার মুখে সে কিনা পদা! গুরুর এ অপমান কানে শুনলে কান বিষাক্ত হবে না! হাবুল কিছু না বলে চলে এসেছে বটে, কিন্তু পিন্‌ডিদার ওই নকুড় মামাকে তার কুড়মুড় করে চিবিয়ে খেতে ইচ্ছে করছিল।

এর পরের সপ্তাহে পিন্‌ডিদা টানা চার দিন নিপাত্তা। তিন দিন যা-ও এসেছিল নানা ভণিতায় খুঁচিয়েও তার পেট থেকে বার করা যায়নি কোথায় গেছল বা কেন গেছল। আমাদের মনে আরও অশান্তি, কারণ মামার কাছ থেকে নয়, বাড়ির চাকরের কাছ থেকে হাবুল খবর এনেছিল পিন্‌ডিদা বর্ধমানে নেই। তা মামারই তো চাকর, কেন নেই জিগেস করতে হাবুলের মুখে যেন ঠাস করে একখানা চড় মেরেছিল, কত্তাকে ডেকে দিই, তিনি বলে দেবেন ভাগ্নেবাবু কেন নেই।

—তারপর এই সপ্তাহে টানা পাঁচ দিন হয়ে গেল ওই ঢিবির আসন খালি—পিন্‌ডিদা নেই। তার ওপর আরও দুশ্চিন্তার ব্যাপার, এবারে ঝোলা-কাঁধে স্টেশনের দিকে যাবার সময় কার্তিকের সঙ্গে পিন্‌ডিদার মুখোমুখি দেখা। কার্তিক তাদের কোনও আত্মীয়কে স্টেশনে সি-অফ করে ফিরছিল। কার্তিক হাঁ হয়ে জিগেস করেছিল, স্টেশনের দিকে কেন পিন্‌ডিদা, কোথায় যাচ্ছ? মুখের দিকে চেয়ে পিন্‌ডিদার সোজা জবাব, তোদের ওই বসে বসে একঘেয়ে গুলতানি আর কত ভালো লাগবে—কয়েকদিনের জন্য কলকাতা যাচ্ছি।

আর না দাঁড়িয়ে হন হন করে চলে গেল। কেবল ঝোলা কাঁধে কয়েক দিনের জন্য কেউ কলকাতায় যায়, কার্তিকের ধারণা ছিল না। কিন্তু পিন্‌ডিদার মতো স্পোর্টসম্যানের চালচলন যে দশজনের মতো হবে না, জানা কথাই।

কার্তিকের মুখে খবরটা শুনে আমরা বজ্রাহত। কলকাতা লক্ষ করে সাইকেলে এক্সকারশনে বেরুনোর চিন্তা তো মাথা থেকে উবে গেলই, এরপর আমাদের চিন্তা আর আলোচনার বিষয়, বর্ধমান বাবুগঞ্জ মাঠের এই ঢিপির আসনে পিন্‌ডিদার অরুচি ধরে যেতে পারে, কিন্তু এমন ঘনঘন কলকাতায় যাবার আকর্ষণটা কী? আগের দু'সপ্তাহ ক'দিন করে যে কলকতাতেই কাটিয়ে এসেছে তাতে আর সন্দেহ কী?

কেবলু সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ঝাড়ল, কলিকাতা ফুর্তিনাং স্বর্গঃ অস্তু! মুখ বদলাতে হলে কলকাতার মতো আর কা দ্বিতীয়ঃ?

সংস্কৃতের কসরত শুনে এখন হাসার মেজাজ নয় কারও। চটপটি বলল, কলকাতার কোনো টিমের কোচ-টোচ হয়ে বসেনি তো পিন্‌ডিদা?

আমি মাথা নাড়লাম, মনে হয় না, কোচ হওয়া মানে তো মোটা টাকা মওকার ব্যাপার—পিন্‌ডিদা তাহলে আমাদের বলবে না কেন?

হেবো হোঁতকা যাকে বলে পিন্‌ডিদার চোখ-কান-কাটা মোসায়েব। ফোঁস করে উঠল, পিন্‌ডিদা কি তোর-আমার মতো টাকার কাঙাল? তাহলে ব্রেজিল টিমের কোচিং ছেড়ে দেশের টানে পালিয়ে আসে! হাতে পেলে পিন্‌ডিদাকে তারা মমি বানিয়েও স্মৃতি হিসেবে রেখে দিত শুনিসনি?

আমার বিরূপ চক্ষু ওর দিকে ঘোরার আগেই চটপটি দু'হাত তুলে লাফিয়ে উঠল, হুররে—পিন্‌ডিদা!

সকলের জোড়া-জোড়া চোখ রাস্তার দিকে ধাওয়া করল।

পিন্‌ডিদার ট্রেড-মার্ক চেহারা কি ভুল হবার? অলস পায়ে ঢিমেতালে রাস্তা ছেড়ে মাঠে

নেমেছে। পাঁচ-পাঁচটা দিনের অদর্শন, জবরদখলের অপেক্ষায় না থেকে পকেটের দশ টাকার নোটটা বার করে হাবুলের হাতে দিলাম। –যা, আর দেরি করিস না, কী আছে দেখে নিয়ে চলে আয়!

হাবুল উঠে হাতির মতোই দুলতে দুলতে স্পিড বাড়িয়ে চলল। ও পাশ কাটানোর সময়ও পিনুডিদার মুখভাব একটুল বদলাতে দেখলাম না–একবার টেরিয়ে দেখে যেমন আসছিল তেমনি আসছে।

আমাদের দিকেও ভালো করে না তাকিয়ে পিনুডিদা তার আসনে বসল। আর কাউকে লক্ষ না করেই বলল, হেবোটা হন্তদন্ত হয়ে গেল কোথায়?

সঙ্গে সঙ্গে কেবলু গলে-গলে পড়ল, কিঞ্চিৎ ভোজন ব্যবস্থাপনায় পিনুডিদা–

–স্পেশাল-টেশাল কিছু আছে নাকি আজ? এবারের প্রশ্নটা আমার দিকে ফিরে।

যতটা সম্ভব গলায় করুণ রস মাখিয়ে বললাম, পাঁচ-পাঁচটা দিন তুমি নেই পিনুডিদা, স্পেশাল-টেশালের কোনও খবর আমরাই কী রাখি? আজ যে দেখা পাবার ভাগ্য হবে তা-ও কী জানতুম! তোমাকে আসতে দেখে পকেটে দশটা টাকা ছিল, তা-ই বার করে হাবুলের হাতে দিলাম। –এভাবে আমাদের ফেলে বারবার তুমি কোথায় চলে যাচ্ছ পিনুডিদা?

তোষামোদের সুরে কেবলু বলল, তোমার চিন্তায় আমার জিভের ডগা থেকে সংস্কৃত-লক্ষ্মীও বিদায় নিতে বসেছিল পিনুডিদা।

কার্তিক শুধরে দিল, সংস্কৃত-সরস্বতী বল্।

চটপটির চটপট মন্তব্য, ওই হল, দিন-কাল যা, আজকাল সরস্বতীও কম লক্ষ্মী নয়–কী বলিস কেবলু?

কেবলু খুশি হয়ে মাথা ঝাঁকাল, নিশ্চিতং! আজকাল লক্ষ্মী সরস্বতী মুদ্রাণাং দুই পিঠং (টাকার এ-দিক ও-দিক)!

নাঃ, পিনুডিদার মুড একেবারেই অফ দেখছি, নইলে এই সংস্কৃতর জ্বালায় কেবলুর পিঠে শপাং করে কিছু পড়ার মতোই পিনুডিদার মুখ থেকে কিছু বার হবার কথা।

না চোখ এ-দিকে না কান, পিনুডিদা মাঠের ও-ধারের রাস্তার দিকে চেয়ে আছে। আগে হলে ভাবতে পারতাম হাবুলের আশায় ও-পথ চেয়ে আছে। কিন্তু পিনুডিদা তিন সপ্তাহ ধরে এমন ভাবান্তর দেখে তা মনে মনে ভাবতেও ভয়।

হেবো হোঁতকা একেবারে চোখের পাতাকাটা মোসায়েবই বটে। দশ টাকার চার টাকা দিয়ে শুধু পিনুডিদার জন্য একটা চিকেন কবিরাজি কাটলেট এনেছে, আর পিনুডিদাসহ আমাদের জন্য ছ'টাকা দিয়ে ছ'টা আলুর ঢ্যাপা–অর্ডার না দিলে বিনোদ যে-জিনিস চপ বলে চালায়। তাছাড়া পিনুডিদাকে খাইয়ে খুশি করতে পারা কৃতিত্বটাও যেন ওরই। গদগদ গলায় তাকে শোনাল, গরম-গরম এই কবিরাজি ভাজা হচ্ছে দেখে আর লোভ সামলাতে পারলাম না, তোমার জন্য একটা কিনেই ফেললাম পিনুডিদা–

এরকম শুনলে আমার অন্তত গা জ্বলে যাওয়াটা কি অন্যায়? অন্য দিক থেকে কার্তিক আর চটপটি আমার মুখের দিকে তাকিয়েই মেজাজ বুঝেছে, দু'জনেই মাথা নেড়ে ইশারা করল। অর্থাৎ, ঠোঁটে কুলুপ এঁটে থাক। ওকে এ নিয়ে কিছু বললে পিনুডিদার মেজাজ বিগড়োতে পারে বটে। কিন্তু হাবুলের ওপর একটু শোধ নেবার সুযোগ পেয়ে গেলাম চপ সহযোগে পিনুডিদার চিকেন কবিরাজি কাটলেট চিবুনোর ফাঁকে। অমাদের দিক থেকে অনেকটাই আড়াআড়ি বসে পিনুডিদা তন্ময় হয়ে আকাশে কয়েকটা পাখির ভাসমান লীলা দেখছে, মুখ চলছে কেবল কলে দম-দেওয়া যন্ত্রের মতো–তার প্রাণপাখি বুঝি ওই উড়ন্ত বিহঙ্গের সাথী হয়েছে। চোখের পলকে আমি হাবুলের ঝাঁকড়া চুলের মুঠি ধরে মাথাটা কানের কাছে টেনে নিয়ে এলাম, ফিসফিস করে বললাম, আমাদের

মধ্যে তোকেই পিন্‌ডিদা সব থেকে ভালোবাসে বলে এতক্ষণ মুখ খোলেনি, তোর ফেরার অপেক্ষায় ছিল, এবারে জিগেস কর, পিন্‌ডিদার মনে কী আছে, থেকে থেকে এরকম ডুব দিচ্ছে কেন?

খুশি হয়ে হেবো হোঁতকা একটু দুলে নিয়ে ডাকল, ও পিন্‌ডিদা, পাখির থেকে আমরা কি তোমার কম আপনার—?

কাটলেট চিবুনো থেমে গেল, চোখ নেমে এল, এ-দিকে ফিরল। পালিশ-করা মুখ, ভাবলেশশূন্য চাউনি।— কী বলছিস?

—বলছিলাম—আমরা যে জানার জন্য আঁকুপাকু করছি, পাঁচ-পাঁচটা দিন হুট্ করে তুমি কলকাতা গিয়ে বসে রইলে কেন—থেকে থেকেই আজকাল তিন-চার দিনের জন্য আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ কেন—আমরা তো আর ডিটেকটিভ নই যে চট করে রহস্য ধরে ফেলব—

হেবোর চোখের দিকে তেমনি অপলক চেয়ে থেকেই কাটলেটটুকু শেষ করে নিল। এই চাউনিতেই ঘায়েল হয়ে অজ্ঞাত ভয়ে হাবুল তার মস্ত শরীরটাকে কুঁচকে ছোট করতে চেষ্টা করছে। মুখ মোছার জন্য পকেট থেকে রুমাল বার করার সময়েও পিন্‌ডিদার চীনাম্যান মার্কা চাউনি ওর মুখ থেকে নড়েনি। তার পরেই চাপা অথচ গুরু গর্জন—আমার চালচলন মজাদার রহস্যের ব্যাপার—কেমন? আমি কোথা যাই, কেন যাই কী করি সেটা বারোয়ারি ব্যাপার—সব্বাইকে জানান দিয়ে যেতে হবে? তোদের কাছে এখানে আমি দাসখত লিখে দিয়ে বসে আছি?

কী কথায় কী মেজাজ, হাবুল ছেড়ে আমরাও ভেবাচাকা। প্যালপিটিশনে হেবোর ঘাম ছোটার দাখিল, মুখ আমসি। —না পিন্‌ডিদা—আমি—আমি না—ওই সোনা বলছিল—

ফের দাবড়ানি। —সোনা যা বলছিল সোনা বলবে, তুই গাধার ডাক ডাকছিস কেন—হোয়াই ইউ ব্রে-ইং?

হাঁসফাঁস দশা হাবুল দু'হাত জোড় করে ফেলল, ক্ষ-ক্ষমা করে দাও পিন্‌ডিদা, ওই সোনা উল্লুকটাই আমাকে—

বেগতিক দেখে আমি হড়বড় করে বলে উঠলাম, অব্‌জেকশান পিন্‌ডিদা, তোমার প্রেজেন্স-এ এ-রকম নিম্নস্তরের গালাগাল অ্যালাউড কিনা তুমিই বলো? ছোটকে গাধা বলাটা প্রত্যেক গুরুজনের রাইট—কিন্তু এ বন্ধু হয়ে বন্ধুকে উল্লুক বলল!

পিন্‌ডিদার গুরুগম্ভীর হুকুম।—হেবো, সোনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নে!

সঙ্গে সঙ্গে হেবোর জোড় হাত আমার দিকে ঘুরল, সোনা, ক্ষমা করে দে ভাই!

—ঠিক আছে, ঠিক আছে। মুখ যতটা সম্ভব নরম করে আর গলার স্বরে চিনি ঢেলে এবার আমিই পিন্‌ডিদার মুখোমুখি হলাম। —হেবো ঠিকমতো কথাটা বলতে পারেনি পিন্‌ডিদা, তুমি আমাদের লিডার—তুমি আমাদের ফ্রেন্ড, ফিলোসফার অ্যান্ড গাইড্—কিন্তু এমন একঘেয়েভাবে দিন কাটাতে তোমার ভালো লাগছে না, দেখতেই পাচ্ছি—আমাদেরই ভালো লাগছে না তোমার লাগবে কী করে? তুমি আমাদের অনায়াসে মাঝে মাঝে ছেড়ে যেত পারো, কারণ মহাদেবের মতোই তুমি নির্লিপ্ত, কিন্তু আমাদের তো হৃৎকম্প—তাই ক'দিন থেকে আমরা—আমরা বলতে আমি কার্তিক আর চটপটি ভাবছিলাম, সকলে মিলে কোথাও ছোট খাটো একটা এক্সকারশন অথবা অ্যাডভেঞ্চারে বেরুলে কেমন হয়?

আমার লম্বা আবেদন শুনে পিন্‌ডিদার মুখখানা একটু মনোযোগী হল। কিন্তু ভাবনার মধ্যে কেবলুকে নিলাম না বলেই বোধহয় হতভাগা ব্যাগড়া দিয়ে উঠল, আপৎকালে বুদ্ধিমান গৃহে তিষ্ঠতি—চারদিকে খুন-জখমের উৎসব চলেছে, এ-সময়ে এক্সকারশন বা অ্যাডভেঞ্চার!

ওকে আক্কেল দেবার জন্য বললাম, কেবলু বাদ তাহলে, ও ঘরে বসে বুদ্ধিমানের মতো নিজের প্রাণ বাঁচাক—এবারে তুমি বলো পিন্‌ডিদা, কোথায় যাওয়া যায়? আরও খুশি করার আশায় যোগ করলাম, কমের ওপর দিয়ে হলে খরচের টাকা যে-ভাবে হোক আমিই না হয় জোগাড় করব।

সবাই উৎসুক, কেবল কেবলুর মুখ চুন।

একটু ভেবে পিন্‌ডিদা বলল, এক্সকারশন না অ্যাডভেঞ্চার, সেটা আগে ঠিক কর—অ্যাডভেঞ্চারে বেরুতে হলে যে হিম্মত দরকার, তা কার কতটা আছে আমার সন্দেহ আছে।

আমার আঁতে লাগল—কেন, বদিনাথধামে রাম-বাদশার মতো জাঁদরেল ডাকাতকে যে আমরা জেলে পুরলাম, সেটা অ্যাডভেঞ্চার নয়? সেই অ্যাডভেঞ্চারের ফলেই তো দু'হাজার টাকার সরকারি পুরস্কার আর সেই সঙ্গে বাবার দেওয়া টাকা ক্লাবের ব্যাঙ্কের ফান্ডে পচছে না?

শেষেরটুকু খোঁচা। এতক্ষণে পিন্‌ডিদার মুখে হাসি। বলল, তুই একটু ভুল করলি সোনা, ওই অ্যাডভেঞ্চার আমাদের ঘাড়ে এসে চেপেছিল ('লিডার বটে পিন্‌ডিদা' পড়) সেধে বিপদে নাক গলানোটাই আসল অ্যাডভেঞ্চার। সকলের দিকে ফিরল, সোনার সাহস আছে বোঝা গেল, তোরা কে কে অ্যাডভেঞ্চারে রাজি?

সবার আগে হেবো হাত তুলল, তারপর একে একে সকলেই, এমন কি কেবলুও। আমি তাড়া দিলাম, তুই আবার কেন?

কেবলু মিনমিন করে জবাবদিহি করল, ওটা বালভাষিতং হয়ে গেছে রে সোনা—

পিন্‌ডিদার তবু কিন্তু কিন্তু ভাব। বলল, আমার মাথায় যা আসছে তা একটু রিস্কি ব্যাপার, তুই এ প্রস্তাবের পান্ডা, সোনা—সব খেড়িয়ে বসলে কিন্তু বিনোদের দোকানে তোকেই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

আমার ভিতরটা তক্ষুনি সজাগ। পিন্‌ডিদার মাথা আমার থেকেও ঢের আগে খেলে, এ অস্বীকার করার উপায় নেই। অ্যাডভেঞ্চারের নামে টোপ ফেলছে কি না কে জানে? আমি গার্ড নিয়ে বললাম, আগে শুনি কোথায় যেতে চাও, কী করতে চাও, তারপর প্রায়শ্চিত্তের কড়ার।

—অমনি ঘাবড়ে গেলি তো, পিন্‌ডিদার মোলায়েম হাসি, না রে না, তোর কাছে জল-ভাত ব্যাপার, আমি এদের নিয়েই একটু ভাবছিলাম—যাক, শোন, সকলে মিলে দুই-একদিনের জন্য সাইকেলে মানচুপি গেলে কী হয়—মাইল কুড়ি পথ, ট্রেনেও যাওয়া যায়, কিন্তু তাহলে আবার পাঁচ-ছ'মাইল হাঁটতে হয়—সাইকেলেই ভালো।

কিছু না ভেবেই হাবুল সবার আগে বলে উঠল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সাইকেলেই বেস্ট!

এর কারণ আছে। একবার সাইকেলে এক্সকারশনে বেরুনোর উদ্যোগ ওর জন্যই পণ্ড হয়েছিল। তখন ও সাইকেল চালাতেই জানত না, পিন্‌ডিদার হুকুমে চটপট শিখে নিতে গিয়ে মারাত্মক কয়েকটা অ্যাকসিডেন্ট করে বসেছিল। এখন ও এক্সপার্ট সাইক্লিস্ট, ফটোগ্রাফির দোকানের মাইনেয় নিজের সাইকেল হয়েছে, ক্যারিয়রে ঢাউস ক্যামেরা নিয়ে দূরে দূরে চলে যায়।

কিন্তু মানচুপি শব্দটা শুনে আমার কানে অন্তত খট্ করে লাগল। —মানচুপি—মানচুপি—হ্যাঁ, মনে পড়েছে, সেখানে এই পিন্‌ডিদার মামা নকুড় সরকারেরই বাগানবাড়ি, জায়গা-জমি, আনাজ আর ফলের বাগান-টাগান আছে! তারপর আরও কিছু মনে পড়ল। মানচুপির মস্ত জোতদার হল গিয়ে ঘনশ্যাম বারুই—গন্ডা চারেক গুমখুনের সুনাম আছে যার— এই সেদিনও কাগজে পড়েছি, দু'দুটো খুনের দায়ে পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে গেছল, বোঝাই গেছে সেটা চোখ-ঠেরানো ধরা—একদিন না যেতেই বেকসুর খালাস। কাগজে পড়েছি যে-লোক পুলিশে খবর দিয়েছিল, সে-ই এখন ঘনশ্যাম বারুইয়ের ভয়ে ঘর-বাড়ি ছাড়া। আর জন্ম থেকে এই বাবুগঞ্জে বাসের ফলে কানাঘুষায় এ-ও মোটামুটি জানি, ওই বেপরোয়া জোতদারের সঙ্গে পিন্‌ডিদার মামা নকুড় সরকারের গলায় গলায় ভাব—ঘনশ্যাম বারুই নকুড় মামার বাগান-জমি দ্যাখে, ভাগে চাষ করে দেয়। কেবল আমি কেন, কেবলু কার্তিক চটপটি আর হেবোও জানে—সেদিনও খুন নিয়ে আলোচনা হতে ঘনশ্যাম বারুইয়ের কথা উঠেছিল, আর তার সঙ্গে পিন্‌ডিদার মামা নকুড় সরকারের ভাবের কথা ওঠা মাত্র আমরা যে-যার মুখ চাপা দিয়েছিলাম।

কিন্তু মামা সম্পর্কে এত জানি, সে তো আর পিন্‌ডিদার কাছে প্রকাশিতব্য নয়। জিজ্ঞেস করলাম, মানচুপিতে কী?

–মানচুপিতে আমার মামা-কুমিরের বাগানবাড়ি।

মামার ওপর পিন্‌ডিদা আদৌ তুষ্ট নয়, সে অবশ্য জানি। মামী বরং পিন্‌ডিদাকে একটু যত্ন-আত্তি করে।

আবার জিগেস করলাম, সেখানে অ্যাডভেঞ্চারের কী আছে?

–আমার মামার পুকুর আছে, তাতে তাগড়াই তাগড়াই রুই কাতলা কালবোশ আছে, ছিপ ফেললেই খায়–হাড়-কেপ্পন মামার ওই পুকুর থেকে আট দশ সের মাছ তুলতে পারলে সেটা খুব কম অ্যাডভেঞ্চার হবে? ওই মাছের স্বাদ ভুলতে পারবি না।

হ্যাঁ, হাততালি দিয়ে ওঠার মতোই একটা অ্যাডভেঞ্চারের প্রস্তাব পিন্‌ডিদা দিয়েছে বটে। কিন্তু চটের পরের প্রশ্নটা তার মেজাজ একটু বিগড়ে দিল। অত বড় বড় মাছের নামে জিভ চুকচুক করে জিগেস করল, হালে ওই পুকুরের মাছ তুমি খেয়ে দেখেছ বুঝি?

–হ্যাঁ, দেখেছি খেয়ে! মাথায় যে তোদের কী আছে বুঝি না– নিউ কাস্‌লস্‌-এ পৃথিবীর সেরা কয়লা আছে, সেটা তুই গিয়ে দেখে বিশ্বাস করিস, না শুনে? মামার সংসারে অর্ধেক খরচ চলে ভোজের বাড়ি মাছ চালান দিয়ে, সেটা জেনেও আমি বুঝব না কেমন মাছ?

আমি স্যামাল দিলাম, ও লোভ সামলাতে না পেরে বলেছে পিন্‌ডিদা–কিন্তু দিনের বেলায় মাছ যে ধরব, কেউ টের পাবে না–মালি বা দারোয়ান-টারোয়ান নেই?

–দারোয়ান যে মালীও সে–হরিচরণ, তাকে দুই-এক টাকা দিলে রাতে সে তার আফিমের মাত্রা ডাবল করে দেবে–সকাল সাতটায় তাকে ঠেলে তুলতে হবে দেখিস।

সমস্যার এ সমাধান আমাদের কারও মাথাতেই স্পষ্ট হল না, বললাম, ইয়ে মানে, তাহলে কী রাতে মাছ ধরা হবে নাকি?

পিন্‌ডিদা যেন আমাদের নিয়ে আর পেরে ওঠে না, এমনি মুখ করে বলল, রাতে মানে কী সাঁঝরাতে? একেবারে মাঝরাতে, তা না হলে দারোয়ান ছেড়ে ওই ঘনশ্যাম বারুইও টের পেয়ে যাবে না, ওই শাঁসালো জোতদারটি কী যে বজ্জাত, তোরা ধারণা করতে পারবি না–সব ব্যাটার চোখ ধুলো দিতে না পারলে আর অ্যাডভেঞ্চার হল কী?

প্রস্তাবনার পর্বেই কেবলুর বোধহয় গা ছমছম করছিল, সংস্কৃত ভুলে সাদা বাংলায় সংশয়ের দিকেই আঙুল তুলল, মাছেরা রাতে ঘুমোবে না?

–হ্যাঁ, পিন্‌ডিদা মাঝারি রকমের খেঁকিয়ে উঠল, একেবারে ট্র্যাংকুইলাইজার খেয়ে ঘুমোবে–পোলাও মাংসের গন্ধ পেলে তুই ঘুম ভেঙে উঠে আসিস না? সে-রকম চারের গন্ধ পেলে মাছেদের ঠাকুরদা পর্যন্ত ঘুম ভেঙে উঠে আসবে।

আমাদের মধ্যে হোঁতকা হাবুল আর চটপটির মাছ ধরার দারুণ নেশা–ওদের দু'জনেরই হুইল ছিপ আছে। তা আবার ভাঁজ করে ছোট করে নেওয়া যায়। আর চটপটির তো চার বানানোর যাকে বলে পাকা হাত। অতএব কোথাও কিছুই সমস্যা নেই। চার এখান থেকে বানিয়েই নিয়ে যাওয়া হবে। পিন্‌ডিদা জানাল আর একটা ছিপও মামার বাগানবাড়িতে পাওয়া যাবে।

এরপর পিন্‌ডিদা প্ল্যান অফ অ্যাকশন বোঝাল আমাদের। সামনের মঙ্গলবার সকাল পাঁচটার মধ্যে পাঁচটা সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়া হবে। (পিন্‌ডিদা অবশ্যই কারও সাইকেলের পিছনে সোয়ার হবে–হাবুলই সানন্দে এ ভার বহন করবে আশা করা যায়)। কোথায় যাওয়া হচ্ছে, কারও বাড়িতে কেউ যেন ঘুণাক্ষরে টের না পায়–কারণ কোনওভাবে নকুড়মামার কানে উঠলেই সব ভেস্তে গেল। কাছে-পিঠে কার্তিকের মাসির বাড়ি, সেখানে যাওয়া হচ্ছে বললেই হবে। থলেয় করে কিছু চাল ডাল আর ডিম নিয়ে যেতে হবে, মাছের খ্যাঁট তো সেই পরদিন, তার আগে দু'বেলা

খেতে তো হবে। –আফিমের নেশায় মালী হরিচরণ, বেলা সাতটা-আটটা হলেও তাকে ডাকা হবে না। যখনই উঠুক, মাছ দেখে তার চক্ষু ছানাবড়া হবে–কিন্তু মাছের গায়ে তো আর মামার নাম লেখা থাকবে না–হরিচরণকে বলা হবে বাবুরা কাকভোরে বেরিয়ে বুধবারের হাট থেকে মাছ কিনে এনেছে–ব্যাটা জুতসই করে রাঁধ এখন। সে-ও আনন্দে নাচবে নিশ্চয়, কারণ মনিবের এক নম্বরি মাছ তো কখনও জিভে ঠেকিয়ে দেখেনি! ব্যাটা রাঁধে কিন্তু চমৎকার–

নকুড়মামার পুকুরের এক নম্বরি মাছ যেন আমাদের জিভের কাছাকাছি এসেই গেছে। বললাম, তুমি ওর হাতের রান্না খেয়ে দেখছ বুঝি?

একটু আমতা আমতা করে পিন্‌ডিদা জবাব দিল, না খেলে আর বলছি কী করে–খেয়ালখুশিমতো তো বাগানবাড়িতে এক রাত দু'রাত কাটিয়ে আসি– সেখানকার নির্জনতা কী যে ভালো লাগে! হরিচরণও আমাকে খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, সেই জোরেই তো মামাকে না জানিয়ে তোদের নিয়ে যেতে পারছি।

মাঝের দুটো দিন আর কাটতে চায় না। পিন্‌ডিদা আমাদের অ্যাডভেঞ্চারের নেশা ধরিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, তার কলজের জোর আছে বটে, নিজের মামার পুকুর চুরির অ্যাডভেঞ্চার। আমার আরও বেশি আনন্দ, এই প্রথম আমার পকেটে মোটে টান পড়ছে না। সাইকেলে যাওয়া, উদার হয়ে ডিম পিন্‌ডিদা নিজেই নিয়ে যাবে বলেছে, তার হুকুমে কার্তিক চাল নিচ্ছে আর চটপটি ডাল। আমার অনেক খসিয়ে পিন্‌ডিদার এবারে হয়ত বিবেক লেগেছে।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে পাঁচটায় আমরা দুর্গা দুর্গা করে রওনা হলাম।

সরঞ্জাম সামান্যই, দুটো ভাঁজ-করা ছিপ, একটা ছোটো থলেতে মশলা-চার, একটা মাঝারি থলেতে ডিম-গোঁজা চাল, একটা থলেতে ডাল। আর সঙ্গে কিছু সাইকেল মেরামতি সরঞ্জাম, আমারই একটা বড় টর্চ।

হাবুলের পিছনে পিন্‌ডিদা। পাঁচ-পাঁচটা সাইকেলে আমরা ঘেঁষাঘেঁষি করেই চলেছি। চলেছি না তো, মনের আনন্দে হাওয়ায় ভাসছি। পিন্‌ডিদাও মেজাজে ফিরেছে, কেবলুকে বলল, এখন তুই একটা সংস্কৃত গান করলে আমি রাগ করব না।

সত্যি, দারুণ লাগছিল। কুড়ি মাইল পথ আমরা তিন ঘন্টায় পাড়ি দিলাম। মানচুপিতে ঢুকে পিন্‌ডিদার পথ ধরে চলেছি। যত এগোচ্ছি পিন্‌ডিদার মুখ তত ঠান্ডা। এক জায়গায় এসে পিন্‌ডিদা চট করে রুমালে নিজের মুখ ঢেকে ফেলল। বলল, ওই ঘনশ্যাম বারুইয়ের বাড়ি, ব্যাটা তোদের চিনবে না কিন্তু আমাকে দেখলে চিনবে–জোরে চালিয়ে চল্‌।

জোরে চালানোর তাগিদে বাড়িটা ভালো করে দেখা গেল না। মস্ত দোতলা পাকা দালান, এটুকু মালুম হল। খানিকটা এসে পিন্‌ডিদা মুখ থেকে রুমাল সরাল। আর আধ মাইলের মধ্যে মামার বাগানবাড়ি–তার আগে জোতদার ঘনশ্যাম বারুইয়ের বিশাল বাগান।

দেখলাম ছোট পাঁচিল ঘেরা মস্ত বাগানই বটে। নিচু পাঁচিলে ঘেরা হরেক রকম ফলের গাছের জঙ্গল যেন একটা। ভিতরে পুকুরও আছে শুনলাম। পিন্‌ডিদা বলল, ওই পুকুরের ধার খুঁড়লে কত ডেড-বডি বেরুবে ঠিক নেই–পাষণ্ডদেরই যুগ এটা, বুঝলি?

শুনে বা বুঝে আমাদের কেন যেন খুব ভালো লাগল না।

নকুড়মামার বাগানবাড়িও দেয়াল ঘেরা, কিন্তু নামেই দেয়াল। জায়গায় জায়গায় এমন ধসে পড়েছে যে গরু-বাছুরও ভিতরে ঢুকতে পারে। এ-বাগানেরও চারদিকে ফলের গাছ, সবজির চাষ। মাঝখানে পুরনো দোতলা বাড়ি। ভাঙা গেট দিয়ে ঢুকে আমরা বাড়ির সামনে এসে নামলাম। তক্ষুনি যে লোকটা সামনে হাজির সে-ই হরিচরণ। বছর পঁয়তাল্লিশ বয়েস, পরনে লুঙ্গি, গায়ে ফতুয়া। চোখ ঢুলুঢুলু, নাদুসনুদুস, হাবভাব অমায়িক। দুহাত জুড়ে যতটা সম্ভব মাথা নুইয়ে পিন্‌ডিদাকে শ্রদ্ধা জানাল।

পিন্‌ডিদার গলায়ও বাৎসল্য রস। –ভালো আছো তো হরিচরণ? আমার বন্ধুরা সব তোমার বাগানবাড়ি দেখতে এল, রাতেও থাকব।

হরিচরণ দু'হাত জোড় করে একে একে আমাদের সকলের উদ্দেশেই আনত হল।

পিন্‌ডিদা লোভের টোপ ফেলল, বাবুদের সেবা-যত্ন করো–ভালো বখশিস পাবে, তোমার দিনকয়েকের আফিমের খরচও উঠে যাবে।

হরিচরণ বিগলিত। –বাবুমশায়রা মহৎ, আমাকে হুকুম করবেন আজ্ঞে–

নিচতলার ঘরগুলির বোধহয় অনেকদিন সংস্কার হয়নি। অন্ধকার অন্ধকার। পায়রা আর চড়ুই পাখি আসছে যাচ্ছে। দোতলাটা মোটামুটি পরিচ্ছন্ন। তবে চারদিকের গাছপালার দরুন আলো কম। পিন্‌ডিদা বলল, রাতেরবেলায় দেখিস, হাইক্লাস লাগবে।

আমার এখনই হাইক্লাস লাগছে। এ রকম পরিবেশে তো আর থাকিনি।

এখানে এসে পিন্‌ডিদা অতিথিপরায়ণ হয়ে উঠেছে। চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে এক ধামা লুচি ভাজিয়ে নিয়ে এসেছে। সঙ্গে আলুর তরকারি, বাগান থেকে তোলা খাসা বেগুন আর চ্যাঁড়স ভাজা। চায়ের স্বাদ যদিও তেমন নয়, তবু আমাদের আনন্দের মিশেলে সে-ও অমৃত।

পিন্‌ডিদা দুপুরের মেনু করে দিল–খিচুড়ি, ব্যাসন দিয়ে বেগুন আর বাগানের কুমড়োর কাটলেট, আর পার হেড দুটো করে ডিমের পেঁয়াজি। হুকুম করতে করতে পিন্‌ডিদা নিজেই একবার হুস করে জিভ টেনে নিল। তারপর আমার দিকে ফিরল, কিন্তু রাত্তিরে কী হবে–দু'বেলাই ডিম ভালো লাগবে?

হরিচরণ প্রস্তাব করল, আজিজের ঘর থেকে দুটো মুরগি কেটে নিয়ে আসতে পারি–

আমি সঙ্গে সঙ্গে গৌরী সেন, পকেট থেকে একটা পঞ্চাশ টাকার আর একটা পাঁচ টাকার নোট বার করলাম। গাঁয়ে মুরগি সস্তা, পঞ্চাশ টাকার মধ্যে দুটো ঢাউস মুরগি হবে। বড় নোটটা তার হাতে দিয়ে বললাম, এটা মুরগির। পরে ছোট নোটটা, এই তোমার আগাম বখশিস।

পিন্‌ডিদা বলল, রাতে আমরা একটু হইচই করে কাটাবো, তুমি আফিমের মাত্রা একটু চড়িয়ে দিও–আমরা রাত আটটার মধ্যে মাংস ভাত ঠেসে তোমাকে ছুটি দেব।

হরিচরণ ভীষণ লজ্জা পেতে পেতে চলে গেল।

পুরনো বাড়ি হলেও দু'দিকের প্রশস্ত বারান্দাটি বাহারের। একটাই বারান্দা সমস্ত দোতলাটাকে বেষ্টন করে আছে। হরিচরণ সরে যেতে পিন্‌ডিদা আমাদের সামনের বারান্দায় নিয়ে এল। সাবধান করল, দেখিস বেশি ঝুঁকিস না, রেলিং ভেঙে একতলায় আছড়ে পড়বি তাহলে।

আমরা যথোচিত সতর্ক। হাবুল তো রেলিং-এর তিন হাত তফাতে। আঙুল তুলে পিন্‌ডিদা সামনেটা দেখাল। –ওই হল ঘনশ্যাম বারুইয়ের বাগান, লোকটা যত নৃশংসই হোক, গাছপালা ভালোবাসে–অবশ্য ফলশূন্য গাছ নয়, তার সব গাছই ফলপ্রসূ–একটা মানুষের থেকে তার কাছে একটা ভালো গাছের দাম বেশি, দস্তুরমতো পয়সা খরচ করে নানা জায়গা থেকে স্পেশাল চারা আনিয়ে লাগায়। এখানে বেনারসের ল্যাংড়া আর পেয়ারা গাছ পাবি, হুগলির হিমসাগর, সরিখাস, মালদার ফজলি, মজঃফরপুরের লিচু, মাইসোরের পেঁপে, মায় সিলোনের লাল ডাবের গাছ পর্যন্ত পাবি। সব গাঁটের পয়সা খরচ করে করিয়েছে। যখন যে বীজ বা চারা আসুক, তার নিজের তদারকে তা পোঁতা হবে, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সবকিছু করায়। এ ব্যাপারে আলস্যি নেই, গাছ তার প্রাণ–বাপ মেহনতি মানুষ ছিল, ছেলেও পয়সার মুখ দেখে 'বাবু' বনে যায়নি। স্বার্থের বেলায় যত শয়তানই হোক, বড় হতে হলে কিছু গুণ থাকতেই হয়। তা হলেও আমার বিশ্বাস একদিন না একদিন লোকটা ফাঁসিকাঠেই ঝুলবে–মানুষ খুন করে কত আর পার পাবে–গাছের ভালোবাসা শেষ পর্যন্ত তাকে বাঁচাতে পারবে না।

লক্ষ করছি, ঘনশ্যাম বারুইয়ের কথা বলতে বলতে পিন্‌ডিদার মুখখানা কেমন দার্শনিক গোছের হয়ে উঠেছে। আর মন্তব্যও সেই গোছেরই।

এ-বাড়ি ভাঙা প্রাচীরের ওধার থেকেই ঘনশ্যাম বারুইয়ের বাগান শুরু। বিশাল বাগান যে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এদিকটায় সব দিশি ফলের গাছই আমাদের চোখে পড়ছে। সেটাই স্বাভাবিক অবশ্য। দামি দামি গাছ কী সব সামনের দিকে মাথা উঁচিয়ে থাকবে? ও-সব নিশ্চয় ভিতরের দিকে।

কার্তিক বলল, এত বড় বাগানে অনেক মালি আর পাহারাদার আছে নিশ্চয়?

পিন্‌ডিদার জবাব, ভিতরের দিকে দুটো মালির সংসার, পাহারাদার একটিও নেই।

—চুরি হয় না? হাবুলের বিস্ময়।

চুরি? চোরের প্রাণে ভয় নেই? ঘনশ্যাম বারুইয়ের বাগান, চোরের হার্ট অ্যাটাক হবার মতো এটুকুই যথেষ্ট, আরে তার তো দূরের কথা, ওই আফিমখোর হরিচরণের জিম্মায় মামার বাগানটা টিকে আছে কী করে? আছে স্রেফ ঘনশ্যাম বারুইয়ের ভরসায়—লোকে জানে—চোরে জানে মামার বাগানের আসল কেয়ারটেকার ঘনশ্যাম বারুই—ব্যস, হানড্রেড পারসেন্ট সেফ! পিন্‌ডিদা আজ যেন সহিষ্ণু ভাষ্যকার।

কেবলু বলে উঠল, তাহলে তো তোমার মাতুলালয়ের পুকুরে আমাদের মৎস্যচৌরকার্যং ধরা পড়লে প্রাণসংকট ভবেৎ হতে পারে!

পিন্‌ডিদা আজ মোটে আমাদের কড়া লিডার নয়, কয়েকটি নাবালকের স্নেহপ্রবণ অভিভাবক যেন। আমার দিকে চেয়ে হেসে বলল, এই ভিতুটাকে আনলি কেন বল তো?

ভয় না হোক এই প্রশ্নটা আমার মনেও উঁকিঝুঁকি দিয়েছে, আর অন্য চারজনের মনেও।

প্রথমে সায় দিলাম, ওটা রামভিতু, তারপর একটু কৌতূহলের সুরে জিগেস করলাম, আচ্ছা পিন্‌ডিদা, সাইকেলে আসার সময় ঘনশ্যাম বারুই তোমাকে চেনে বলছিলে...তোমার সঙ্গে আলাপও আছে?

ট্যারচা চোখে আমার দিকে চেয়ে জবাব দিল, জলে বাস করতে এসে কুমিরের সঙ্গে ঝগড়া না করে একটু ভাবসাব রেখেই চলতে হয়—মামাই সেটা শিখিয়ে দিয়েছিল, ঘনশ্যাম বারুই আমাকেও ভাগ্নে বলেই ডাকে...কেন?

—না, তুমি এত খবর রাখো, এজন্যই জিগেস করছিলাম।

মনে মনে নিশ্চিন্ত, দৈবের কথা বলা যায় না, ধরা পড়লেও ওই নিষ্ঠুর লোকটা নকুড়মামার ভাগ্নের বন্ধুদের প্রাণে মারবে না—হেনস্তা যা হবার নকুড়মামার হাতেই হবে।

কথা বলতে বলতে আমরা বারান্দা প্রদক্ষিণ করছি। পিছনের চাঁদোয়া দিকটায় এসে পিন্‌ডিদা থামল। এদিকটায় দেয়ালের চিহ্নও নেই, গাছ-গাছালিতে নকুড়মামা আর ঘনশ্যাম বারুইয়ের বাগান মিলেমিশে গেছে। বাড়ির চৌহদ্দির গজ দশেক দূর দিয়ে একটা পায়ে-চলা সরু আঁকা-বাঁকা রাস্তা চলে গেছে। ডাইনে অর্থাৎ পুবের দিকে আঙুল তুলে পিন্‌ডিদা দেখাল, ওই নকুড়মামার ফিশারি পুকুর। ভাঙা রেলিং বাঁচিয়ে আমরা সাগ্রহে পুকুর পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। বেশ বড়সড় লম্বাটে পুকুর, চার ভাগের তিন ভাগ শ্যাওলায় ঢাকা—ভাঙা ভাঙা চওড়া সিঁড়ি। সিঁড়ির বাঁ দিকে ছোট-বড় বুনো গাছের ঝোপ, কিছু বাঁশঝাড়। তারপরেই সেই আঁকা-বাঁকা সরু পায়ে-চলা রাস্তা। এতটা দূর থেকেই আমরা বুঝতে চেষ্টা করছি, ওই পুকুরে কত মাছ থাকা সম্ভব।

হঠাৎ আমরা পাঁচজনেই আঁতকে উঠলাম। পিন্‌ডিদার চাপা গলা, এই! এই! বসে পড়! সব বসে পড় শিগগির!

পিন্‌ডিদা বসে পড়েই আমাদের এই সশব্দ নির্দেশ দিচ্ছে। কিচ্ছু না বুঝে আমরা এ-ওর গায়ে ধাক্কা খেয়ে হুড়মুড় করে বসে পড়লাম। রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে পিন্‌ডিদা পায়ে-চলা রাস্তাটা দেখাল,

অস্ফুট গলায় বলল, ঘনশ্যাম বারুই...এই ছয় মূর্তিকে বারান্দায় দেখলেই অ্যাডভেঞ্চারের বারোটা বেজে যেত!

ঝোপ আর বাঁশঝাড়ের ফাঁক দিয়ে খুব ভালো দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। আরেব্বাস! এ যে দেখি ক্লাইভ হেস্টিংস আমলের হুঁকোবরদার সঙ্গে নিয়ে চলেছে লোকটা! ভালো করে দেখার তাড়নায় রেলিংয়ের ফাঁকে আমাদের নাক-মুখের চামড়া ছড়ে যাচ্ছে। ...একজনের হাতে বাঁধানো বাদশাই হুঁকো, কল্কে বসানো প্যাঁচ-দেওয়া কাঠের নলটা হুঁকোধারীর মাথা ছাড়িয়েছে, তিন গজ লম্বা, ওপরে সোনালি জরি দিয়ে মোড়া আলবোলা ঘনশ্যাম বারুইয়ের হাতে এবং মুখে। আয়েস করে তামাক টানতে টানতে আর জনা দুই মোসায়েবের সঙ্গে কথা বলতে বলতে নিজের বাগানের দিকে চলেছে। কিন্তু মানুষটাকে মোটেই ভয়াবহ মনে হল না, কালো ছিপছিপে, পাঁচ সাড়ে পাঁচের বেশি লম্বা হবে না, বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পুরুষ্টু গোঁফজোড়ার দু'মাথা সাইকেলের হ্যান্ডেলের মতো ঝুলে পড়েছে। বয়েস পঞ্চাশের মধ্যেই হবে। মাথায় কদমছাঁট চুল, পরনে খাটো ধুতি, গায়ে ফতুয়া, পায়ে একটা সাধারণ চপ্পল।

তারা চলে যেতে সবাই উঠে দাঁড়ালাম। আমি বলে উঠলাম, এই এত হাঁকডাকের ঘনশ্যাম বারুই! একলা পেলে একে তো আমিই আলু-কাবলি বানিয়ে ছেড়ে দিতে পারি!

পিন্‌ডিদা ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল। --একলা পেলে—কেমন?

অর্থাৎ একলা পাওয়া ভগবানকে পাওয়ার শামিল।

দুপুরের তোফা খিচুড়ি-ভোগ জঠরে চালান দিয়ে উঠতে বেলা আড়াইটে গড়াল। সকালের আড়াই গন্ডা লুচি হজম হবার পরে তো খেতে বসা। ঢেঁকুর তুলতে তুলতে মাঝের বড় ঘরের শতরঞ্চি আর ফরাস বিছানো শয্যায় বসে পিন্‌ডিদা বলল, খানিকটা বেলা গড়াল, ভালো হল, বিকেলে খাওয়ার ভাবনা থাকল না! তারপর লিডারোচিত নির্দেশ, এখন আর কেউ স্পিকটি নট্, ব্রেন ফ্রেশ আর সাফ রাখতে হলে কয়েক ঘণ্টা সব ঘুমিয়ে নাও, সমস্ত রাত আর ঘুমের আশা নেই, মনে রেখো—রাত আটটায় মাংস-ভাতের ডিনার, তারপর হরিচরণকে ছুটি দিয়ে আমাদের রণসজ্জা।

ঘুম-টুম কারো হবে ভাবিনি। তবু লিডারের নির্দেশমতো শুয়ে পড়লাম। ঘুরে-ফিরে ঘনশ্যাম বারুইয়ের মুখখানাই মনে আনাগোনা করতে থাকল। অমন সাদামাঠা দেখতে মানুষ এমন নৃশংস হয় কী করে!

চোখ মেলে উঠে বসে দেখি প্রায় সন্ধ্যা। ঘড়ি দেখে অপ্রস্তুত, ছ'টা দশ। পিন্‌ডিদা আগেই উঠে মৌনীর মতো বসে আছে। বলল, ঘুমোলি বটে—এগুলোকে টেনে তোল এবার।

টেনে তুলতে হল না, দু'চার মিনিট আগে-পরে নিজেরাই মোড়ামুড়ি দিয়ে উঠে পড়ল।

সন্ধ্যা পেরুল, রাত এগুল। বাড়িটার আবহাওয়াও যেন ভোল বদলাতে লাগল। ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাত, কিন্তু বারান্দায় এসে আকাশের দিকে ছাড়া সবদিকে যেন সাদার ছোপ-লাগা স্তূপ-স্তূপ অন্ধকার। সামনে যতদূর চোখ চলে, ঘনশ্যাম বারুইয়ের গাছ-বোঝাই বাগান। এর থেকে অমাবস্যা হলে ওগুলো পুরো অন্ধকারে ঢেকে যেত। কিছুই দেখা যেত না। ভিতরেও একটা মাত্র লণ্ঠনের আলো অন্য ঘরগুলোকে যেন রহস্যময় করে তুলেছে। মাঝে মাঝে শেয়াল-কুকুর ডেকে উঠছে, ভয় নয়, অনভ্যস্ত নির্জনতা-চেরা এই ডাকও অস্বস্তি হয়ে কানে ছড়াচ্ছে। হঠাৎ অদূরে কী চোখে পড়তে আমার দু'চোখ আর স্নায়ু টান-টান। তারপরেই ব্যাপারটা বুঝলাম। হেবো হোঁতকার এমনিতে বেশ সাহস আছে, কিন্তু ভীষণ ভূতের ভয়।

বারান্দায় ঘুরে দাঁড়িয়ে ডাকলাম, হাবুল, একবার দেখে যা—

হেবো উঠে এল। কাছে আসতে ফিসফিস করে বললাম, দেখিস, রেলিং-এ ঝুঁকিস না, ওই দ্যাখ্ আগুনের গোলার মতো চোখ জ্বলছে আর বন্ধ হচ্ছে! ওই যে, ওই যে! আঙুল তুলে একটা ছোট গাছ দেখালাম।

হাবুল আমার গাঁ ঘেষে এল, দ্যাখ্, এ-সব ইয়ারকি ভালো লাগে না–

–আঃ! দ্যাখ্ না ভালো করে–ওই তো!

হেবোর চোখেও পড়ল, একটা হাত তুলে আমাকে জড়াল। গলায় আওয়াজ বেরোয় না। –তা-ই-তো রে! কী বল্ তো, কোনো জানোয়ারের চোখ না তো! পিন্‌ডিদাকে ডাকি?

–চুপচাপ ঘরে চল্, কার চোখ বুঝতে পারছিস না?

ঘরে ঢুকতে হেবোর মুখের দিকে চেয়েই পিন্‌ডিদা জিগেস করল, হেবোর কী হয়েছে–ওকে ডেকেছিলি কেন?

–ভূতের জ্বলন্ত চোখ দেখে ভিরমি খাচ্ছে।

পিন্‌ডিদা বাদে ওরা ঘন হয়ে এগিয়ে এল। আমি হেসে বললাম, মাদার গাছের দুটো ফুলে এক দঙ্গল জোনাকি জাঁকিয়ে বসেছে, হাবুলকে জ্বলন্ত দুটো চোখ জ্বলছে আর নিভছে দেখাতে এই দশা।

হাবুল রাগে লাল হয়ে শাসাল, তোকে আমি মজা দেখাব, বর্ধমানে ফিরে চল্–

হাসাহাসির মধ্যে পিন্‌ডিদা বলল, ভূত অত হাসির জিনিস নয়। হরিচরণ বলে, রাতে এই মামার বাড়িরও আনাচে-কানাচে ভূত ঘুরে বেড়ায়–আফিমের ঘোরে পড়ে থাকে বলে ভূতেরা ওর ওপর উৎপাত করে না–ঘনশ্যাম বারুইয়ের বাগানে কত লাশ পোঁতা আছে, তাদের ভূতগুলো রাতে একটু চরে বেড়াবে না?

সকলকে হাসতে দেখে হাবুলও অস্বস্তি চেপে হাসছে। হ্যাঁ, তুমি তো এ-বাড়ির দোতলায় একলা রাত কাটিয়েছ!

জবাব, আমার কথা আলাদা, আমার নাম হলো পিন্‌ডি–ভূতেরা গয়ার পিন্ডি ভেবে ভয়ে পালায়।

জমেছে বেশ। স্বল্পবাক্ কার্তিক বলল, হারিকেনের আলোয় আমাদের ঢাউস ছায়াগুলোকেও ভূতের মতো লাগছে।

সবারই ছায়াগুলোর দিকে চোখ গেল। হাবুলের এই টপিক আর বরদাস্ত হল না, ঝাঁঝাল বিরক্তিতে বলে উঠল, এত বড় একটা কাজে নামতে যাচ্ছি–এই অলুক্ষণে ফাজলামোগুলো তোদের না করলেই নয়?

পিন্‌ডিদা বলল, তার থেকে কালকের মৎস্যভোজের মেনুটা করে ফেলা যাক, কী বলিস হেবো?

হাবুলের একমুখ হাসি। কেবলু আরও খানিকটা এগিয়ে দিল, ত্বংহি অস্মাকম লিডার, তব মেনু শিরোধার্যঃ।

–আমার মেনু বেঙ্গলি স্টাইলের হয়ে যাবে, পিন্‌ডিদার যেন আত্মবিশ্বাস কম, শোন্, সকালে স্রেফ গরম মুড়ি মাছভাজা আর কাঁচালঙ্কা–কেমন?

–জবাব নেই! চটপটির উৎফুল্ল সমর্থন।

–দুপুরে মাছের মাথা দিয়ে মুগডাল, মাছের তেলের বড়া, ডিম বেরুলে ডিমভাজা, মুড়িঘন্ট, মাছের কোর্মা, মাছের ঝাল আর মাছের অম্বল, ব্যস!

সক্কলের জিভে হিসহিস উল্লাস। মিনমিন করে কেবল কার্তিক বলল, পুকুরের মাছ...এসে গেলে পরে মেনুটা করলে হত না...?

হাবুল গাঁ-গাঁ করে উঠল, পিন্‌ডিদা যখন মেনু করছে, মাছ এসেই গেছে ধরে নিতে অসুবিধে হচ্ছে তোর?

রাতের খাওয়া সারতে সেই নটা বেজে গেল। তাড়াতাড়ি খেয়ে নেওয়ার ব্যাপারে পিন্‌ডিদারই খুব তাগিদ দেখা গেল না। পরিবেশনের সময়েই লক্ষ করছিলাম হরিচরণের একটু ঝিমভাব এসেছে। বাবুদের দেরি দেখে সে ছোটগুলি একটা চালান দিয়েইছে।

তাকে রাতের মতো বিদায় দিয়ে আমার সরঞ্জাম গুছিয়ে নিতে লাগলাম। বেশি তো কিছুই না। ছিপগুলো রেডি করা, চার আর টোপের থলি হাতের কাছে রাখা, টর্চের মুখে একটু চোঙার মতো কাগজ মুড়িয়ে নেওয়া—যাতে ফোকাস বেশি না ছড়ায়, কেবল ফাত্‌নার ওপর পড়ে। মাছ আনার একটা ছালার মতো বড় থলে পিন্‌ডিদা আগেই জোগাড় করে রেখেছিল। এবং দশটার মধ্যেই প্যান্ট-শার্ট পরে আমরা রেডি। কিন্তু পিন্‌ডিদা বসেই আছে, তার যেন কোনো তাড়া নেই, পরনের পা-জামাটাও বদলায়নি।

—কি হল পিন্‌ডিদা? আমিই সজাগ করলাম তাকে।

—তোদের কাণ্ডখানা দেখছি, আরে আগে হরিচরণকে নাক ডাকানোর সময় দিবি তো? তারপর পুকুরের পাশে ওই পায়ে-চলা রাস্তা দিয়ে এক একসময় রাত বারোটা সাড়ে বারোটা পর্যন্তও লোক চলাচল করে, আমাদের অপারেশন ক্যামপেন রাত একটার আগে হবে কী করে, তাড়াহুড়ো করে সব ডোবাবার পাত্র আমি!

আমরা থ। এই গ্রামের বাড়িতে এখনই মাঝরাত্রি মনে হচ্ছে। এরপরেও আরও প্রায় তিন ঘন্টার ধাক্কা! কিন্তু পিন্‌ডিদা যা বলল, সেটাই যুক্তির কথা।

জামা-কাপড় পরা অবস্থাতেই আবার আমরা ফরাসে বসলাম। কেউ কেউ শুয়ে পড়ল। দশ মিনিট না যেতেই পিন্‌ডিদা কেবলু আমি আর কার্তিক হাসতে লাগলাম। হাবুলের নাক ডাকছে, আর চটপটির নাক দিয়ে নানারকম বাঁশির শব্দ বেরুচ্ছে।

কেবলুদার মন্তব্য, কুক্কুট-ভেজাস্তে নিদ্রাসুখং!

আমরা একটা আলো-আঁধারি নৈঃশব্দের মধ্যে ডুবে যেতে লাগলাম। কোনও সময় নিজেরাও গা এলিয়ে দিয়েছি খেয়াল নেই।

পিন্‌ডিদার ঠেলা খেয়ে ধড়মড় করে উঠে বসলাম। ওদেরও তুললাম। পিন্‌ডিদা ছোট করে টিপ্পনী কাটল, খুব অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়েছিস সব!

ঘড়িতে রাত ঠিক একটা।

পা টিপে টিপে নেমে এলাম। টর্চের ফোকাস পায়ের কাছে ফেলে বাড়ির পিছন দিয়ে পুকুরের দিকে চললাম। পিন্‌ডিদা অস্ফুটস্বরে বলল, এ শালার জ্যোৎস্না আমাদের সঙ্গে আড়ি করে ব্যাগড়া দিতে চাইছে।

সত্যি গাছপালার ওপর জ্যোৎস্না যেন সাদাটে চাদর বিছিয়ে জাঁকিয়ে বসেছে।

নিজেদের পায়ের শব্দেও চমকে চমকে উঠছি। শুকনো কাঠকুটো মাড়িয়ে ইট-পাথরে ঠোক্কর খেতে খেতে পুকুরধারের ভাঙা ঘাটে পৌঁছুলাম। অত জ্যোৎস্নায় একটা সরু গাছ যেন মাথায় ঘোমটা টেনে স্থির দাঁড়িয়ে আছে। হাবুল যাকে সামনে পায় তারই গা ঘেঁষে দাঁড়াচ্ছে।

খুব চাপা গলায় লিডার পিন্‌ডিদা হুকুম করল, বসে যা, স্টার্ট অপারেশন, কথা খুব কম—টর্চ জ্বালার দরকার নেই, জ্যোৎস্নায় ফাতনা স্পষ্ট দেখা যাবে। দরকার হলে জ্বালবি।

চার ফেলে অপারেশন স্টার্ট করতে ঠিক রাত দেড়টা। সাত-আট হাত ফারাকে পিন্‌ডিদা হাবুল আর চটপটি ছিপ ফেলে বসেছে। হাবুল আমাকে টেনে তার পাশে বসিয়েছে। এখন খুব ভাব আমার সঙ্গে।

আধ ঘন্টা যায় এক ঘন্টা যায় মাছেদের কোনও সাড়া নেই। আমরা কোনও শব্দ না করলেও চাপা অস্থিরতা পিন্‌ডিদা অনুভব করছে। প্রায় ফিসফিস গলায় তর্জন করল, শ্যাওলার চাদর ফুটো করে চারের গন্ধ ভালো করে আগে মাছেদের নাকে ঢুকুক, আসবে যখন ঝাঁক বেঁধে আসবে—ধৈর্য না থাকলে মাছ ধরা যায় না।

কিন্তু আমাদের অস্বস্তির কারণ অনভ্যস্ত দুটো কান আর চোখ। আমরা যেন এক

শব্দ-নৈঃশব্দ্যের রহস্যে ঠাসা কোনও ভয়াবহ জায়গায় এসে পড়েছি। ঝিঁঝির ঐকতান কানে সয়ে সয়ে এখন ওই শব্দ-নিঃশব্দের সঙ্গে মিতালি পাতিয়েছে। বাগানে বাঁশে-বাঁশে লেগে কটর-কটর আওয়াজে চমকে চমকে উঠছি। হঠাৎ মনে হল অদূরের তালগাছের ওপর থেকে একটা শিশুর কান্না কানের পর্দা ছিঁড়ে বুকে এসে লাগল। আমাদের ভয় বুঝতে পেরে পিন্‌ডিদা চাপা গলায় জানান দিল, ওটা শকুনির বাচ্চার কান্না। থেকে থেকে প্যাঁচা ডাকছে, তক্ষক ডাকছে, আমাদের বুক ধড়াস ধড়াস করে উঠছে। প্রহরে প্রহরে শেয়ালের পালা-ডাকও কম অস্বস্তিকর নয়।

হাবুল ফাতনায় মন দেবে কী, এক হাতে আমার একটা হাত চেপে ধরে আছে।

ঘড়ি দেখলাম, রাত তিনটে দশ।

পাশে বাঁশঝাড়ের দিকে তাকাতেই আমার শরীরের রক্ত শিরশির করে পায়ের দিকে নামতে লাগল। বাঁশ আর ঝোপের ফাঁক দিয়ে পায়ে-চলা রাস্তায় দুটো চলন্ত আলো, এদিকেই এগিয়ে আসছে! হাবুলের হাত ছাড়িয়ে হামাগুড়ি দিয়ে পিন্‌ডিদার কাছে এসে ব্যাপারটা দেখালাম।

পিন্‌ডিদার গলা দিয়ে অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এল, এত রাতে লণ্ঠন হাতে কারা এদিকে আসছে!

মানুষ দেখা যাচ্ছে না, আলো দুটো পায়ে-চলা রাস্তা ধরে এগিয়েই আসছে।

পিন্‌ডিদা বলল, ভালো বুঝছি না, চল বাঁশঝাড়ের ফাঁক দিয়ে দেখি।

নিজে আগে চলল। উত্তেজনায় টান-টান হয়ে আমরাও। বাঁশঝাড়ের ফাঁকে মুখ রেখে দেখছি। আরও কাছে আসতে জ্যোৎস্না আর লণ্ঠনই লোক চিনিয়ে দিল। সামনের লণ্ঠন হাতে মানুষটা ঘনশ্যাম বারুই! স্পষ্ট দেখা না গেলেও চেনা যাচ্ছে। কিন্তু ওর পিছনে ওরা কারা? কী বয়ে নিয়ে যাচ্ছে? আমরা কাঠ, পায়ের নিচে মাটি ভীষণ দুলে উঠল। চার জনের কাঁধে চারটে লাশ, চটে মোড়া মনে হল, প্রত্যেকটা লাশের দুটো করে হাতই হবে—সামনে ঝুলছে। পিছনের লোকের হাতে আর একটা লণ্ঠন।

চার-চারটে লাশ নিয়ে ঘনশ্যাম বারুই পথ দেখিয়ে আগে আগে তার বাগানের দিকেই চলেছে!

চলে গেল! আমরা ঘেমে নেয়ে উঠেছি।

পিন্‌ডিদা বলল, ওর বাগানের পুকুরের ধারে পুঁতবে মনে হচ্ছে।

ভয়ে নয়, এখন আমরা উত্তেজনায় কাঁপছি। চোখের সামনে দিয়ে চার-চারটে লাশ বয়ে নিয়ে গেল, পুঁতে ফেলবে, কেউ জানবে না, যাদের গেল তাদের বাড়িতে কান্নার রোল উঠবে—আমরা কেবল সঙের মতো দাঁড়িয়ে দেখলাম, আমরা কী মানুষ নই? কী করছে কোথায় পুঁতছে দেখে নিয়ে আমরা তো পুলিশে খবর দিতে পারি!

এবারে হাবুলই আগে সায় দিল, এটা তো আর ভূতের ব্যাপার নয়, মানুষ খুন, কী করে আমাদের দেখতেই হবে।

কিন্তু পিন্‌ডিদার সায় নেই, আবছা আলোয় মুখ ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে, বলল, লোকটা ভয়ংকর, কী দরকার ঝামেলার মধ্যে গিয়ে—

দাঁতে দাঁত চেপে আমি বললাম, ভয়ংকর লোকের ভয়ংকর রকমের শাস্তি কপালে আছে, আমরা রিস্ক নেব না, বাড়ির পিছন দিয়ে নিঃশব্দে ওর বাগানে ঢুকে দেখব লাশ কোথায় পুঁতছে—ওদের হাতের লণ্ঠনই আমাদের নিশানা দেখিয়ে দেবে—পুকুরটা ওই পায়ে-চলা রাস্তার দিকেই তো?

পিন্‌ডিদা মাথা নাড়ল। স্পষ্টই দেখছি ভয়ে তার মুখ পাংশু। পিন্‌ডিদা নয়, এই মুহূর্তে লিডার যেন আমি, আর হাবুল আমার যোগ্য শাগরেদ। কেবলু কার্তিক চটপটিও পিছিয়ে নেই। ছিপ টিপ সব পুকুরধারেই পড়ে থাকল। মাছ ধরা মাথায় উঠেছে, মানুষের শত্রুনিপাতের অ্যাডভেঞ্চার আমাদের ডাকছে। স্নায়ুর উত্তেজনা চরমে। পায়ে পায়ে পিছন দিয়েই বাড়ির দিকে এগোচ্ছি।

আমাদের তাড়া নেই, ওরা গর্ত খুঁড়ে লাশ পুঁততে একটু সময় নেবে। প্রত্যেকে যে-যার বুকের ধপ-ধপানি শুনছি।

দম নেবার জন্যে বাড়ির পিছনের দাওয়ায় বসলাম। তারপরেই কার্তিকের কথায় সচকিত সকলে।

পিন্‌ডিদা! পিন্‌ডিদা কোথায়?

সঙ্গেই তো ছিল এতক্ষণ, এর মধ্যে কোথায় গেল?

ফিসফিস করে হাবুল বলল, আমরা এই দাওয়ার দিকে আসার সময় পিন্‌ডিদা নিশ্চয়ই একাই এগিয়ে গেছে—চল্ শিগগির চল্!

তড়িঘড়ি কিছুটা সামনে এগিয়ে ঘনশ্যাম বারুইয়ের বাগানে ঢুকলাম। আমার মনে অন্য ডাক দিচ্ছে। পিন্‌ডিদার মুখে আমি স্পষ্ট ভয় দেখেছি, অনিচ্ছা দেখেছি, মুখেও বলেছে, কামেলার মধ্যে গিয়ে কাজ নেই। মন বলছে, ভয়ে পিন্‌ডিদা সরে পড়েছে। তাই যদি হয় তাকে লিডার বলে মানতে আমার অন্তত আপত্তি আছে।

হাতের টর্চ জ্বালতে পারছি না, এত গাছপালার দরুন দস্তুরমতো অন্ধকার। এক দেড় হাত ফারাকে সন্তর্পণে চলেছি আমরা। চমকে উঠলাম, তারপর মনে মনে গাল দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিলাম। হাবুল আমার একটা হাত চেপে ধরেছিল। ওর বোধহয় মনে পড়েছে, ঘনশ্যাম, বারুইয়ের পোঁতা লাশের ভূতগুলো দুই বাগানে ঘুরে বেড়ায়।

এগোতে এগোতে ওকে হিস হিস করে বললাম, মাথা ঠান্ডা রাখ—

ওই তো বারুইয়ের পুকুরপাড়, ওই তো লোকগুলো!

দুটো নয়, তিনটে লণ্ঠন দেখছি, আর মানুষও আটজন। ঝোপ-জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে কারও মুখ দেখা যাচ্ছে না, আবছা মূর্তিগুলোই দেখা যাচ্ছে। বাড়তি লোকদুটো নিশ্চয়ই মালি। দু'জনের হাতে কোদাল, দু'জনের হাতে শাবল। লণ্ঠনের আলোয় দেখতে পাচ্ছি লাশ চারটে মাটিতে শোয়ানো।

—ওরে বাবারে—গেছিরে! মরে গেলাম—বাঁচাও!

কী যেন একটা শব্দ হল, তার পরেই হাবুলের এই আর্তনাদ। আমাদের হৃৎপিণ্ডগুলি বুঝি ঠেলে বেরিয়ে আসবে। দিশেহারার মতো আমি টর্চ জ্বেলে ঘুরে দাঁড়ালাম।

—কে? কে রে? কে? কে ঢুকেছে বাগানে? ধর—ধর—ধর! লণ্ঠন হাতে পুকুরধারের লোকগুলো চিৎকার করে ছুটে আসছে। কিন্তু আমি কী করব? একটা গাছের সামনে হাবুল মাটিতে গড়িয়ে গোঁ গোঁ করছে। কেবলু চটপটিরা পালাতে গিয়ে আছাড় খেল। বাগান ওই লোকগুলোর তো চক্ষুস্থ, বিশপঁচিশ সেকেন্ডের মধ্যে আমাদের ঘিরে ফেলল। তাদের হাতে কোদাল, শাবল, বাঁশ। লণ্ঠন তুলে চার মূর্তি আর ধরাশায়ী হাবুলকে দেখে ঘনশ্যাম বারুই চিৎকার করে উঠল, একটাকেও পালাতে দিবি না, সব ক'টাকে আজ জ্যান্ত পুঁতব—আমার বাগানে চুরির মতলব!

—না না, কেবলু দু'হাত জোড় করে ককিয়ে উঠল, আমরা চোর না বারুইমশাই—আমরা পিন্‌ডিদার বন্ধু—

—পিন্ডি ভালো করেই চটকাচ্ছি তোমাদের, ঘনশ্যাম, বারুই গর্জন করে উঠল, একজন ছুটে গিয়ে পুকুরপাড় থেকে দড়িগুলো নিয়ে আয়—আগে পিছমোড়া করে বাঁধ্ এদের—তোরা সব কোদাল শাবল উঁচিয়ে রাখ— নড়লে চড়লে বসিয়ে দিবি।

সোনা-কার্তিক-হাবুল তোরা কোথায়? পিন্‌ডিদার গলা! আমরা যেন প্রাণ ফিরে পেলাম।

কেবলু চিৎকার করে জবাব দিল, এই যে, আমরা এখানে পিন্‌ডিদা! বারুইমশাই আমাদের চোর ভাবছেন!

এই নাটকের জন্যে ঘনশ্যাম বারুই বা ওরা কেউ প্রস্তুত ছিল না। হন্তদন্ত হয়ে পিন্‌ডিদা হাজির।

—এ কী! তোরা সব এখানে! রাত থাকতে বারুইমশায়ের বাগান দেখতে বেরিয়েছিস—তোদের কাণ্ডজ্ঞান কবে হবে?

ঘনশ্যাম বারুই হাঁ খানিক। —পদাভাগ্নে, এরা সব তোমার বন্ধু?

—হ্যাঁ, বারুইমশাই, আজই আমার সঙ্গে বর্ধমান থেকে বেড়াতে এসেছে—এ কী! হাবুল, তোর কপালের চামড়া উঠে গেল কী করে—নাক দিয়ে এত রক্ত পড়ছে কেন?

সত্যি, কপাল নাক রক্তারক্তি। হাবুল কাঁপতে কাঁপতে বলল, ভূতে পিছন থেকে ধাক্কা মেরেছে পিনুডিদা...আমি টের পেয়েছি, হাতের স্পষ্ট ধাক্কা। এত জোরে যে গাছের গায়ে থুবড়ে পড়ে আমার নাক গেছে, কপাল গেছে!

ঘনশ্যাম বারুই চিড়বিড় করে উঠল, বলিহারি বুদ্ধি আর সাহস তোমার বন্ধুদের, পদাভাগ্নে—তুমি এসে না গেলে তো আমি এদের ছালচামড়া তুলে নিতাম!

—ছেলেমানুষ, মাপ করে দিন বারুইমশাই। এই, চল্-চল্ শিগগির। ইস্, হেবোটার কীরকম রক্ত পড়ছে—ঘরে ডেটল-ফেটল আছে, চল্, চল্।

পিনুডিদা আগে আগে চলল।

হাবুলের শুশ্রূষা শেষ হতে ভোর ভোর। নাকের হাড় ভাঙেনি, আর কপালটা একটু বেশি ছড়ে গেছে। পিনুডিদা তিরিক্ষি মেজাজে গজগজ করছে, তোদের নিয়ে বেরুনো মানে কতগুলো ছাগল নিয়ে বেরুনো, কী পোঁতা হচ্ছে আমি চুপিচুপি দেখে আসতে গেছি—তোদের সবুর সইল না—সব বীরপুরুষের মতো বেরিয়ে পড়লি! এর পর মামার কাছে আমি মুখ দেখাব কী করে—তার কাছে খবর যাবে না? এইজন্যেই বলেছিলাম, কেউ ধেড়িয়ে বসলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে—উঃ! সবাই মিলে এমন ধ্যাড়াবি যদি জানতাম! বোবার মতো বসে আছিস কি সব—সাইকেল নিয়ে চটপট কেটে পড়—বারুইমশাইকে ঠান্ডা করে আমি দিন দুই পরে ফিরব।

আমি গম্ভীর মুখে বললাম, আমরা এখন সামনে যে থানা পাব সেখানে যাব—চার-চারটে লাশ পুঁতে তোমার বারুইমশাই এবারে পার পাবে না।

পিনুডিদার চোখ-মুখ দিয়ে শ্লেষ আর ব্যঙ্গের ফোয়ারা ছুটল—। থানায় যাবি তোরা! ঘনশ্যাম বারুই পুকুরধারে চার-চারটে লাশ পুঁতেছে বলবি? যা—যা—বলগে, নিজেদের নাক-কানের বাকিটুকু কেটে নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফের—আমার তক্ষুণি সন্দেহ হয়েছিল, ওগুলো লাশ হতে পারে না—বারুইমশাই তার বাগান বলতে পাগল, ওগুলো আর কিছু হবে—তাই চুপি চুপি দেখতে গেছলাম—

আমাদের গলা দিয়ে সমবেত কোরাস বেরুলো, লাশ নয়— ও চারটে তাহলে কী?

—প্ল্যানটাগো জিনিস্। শেষ রাতের ঠান্ডায় ভিজে মাটিতে পুঁততে হয়, পয়সা খরচা করে আনিয়েছে কোথা থেকে—প্ল্যানটাগো জিনিস্! ঢুকেছে মাথায়? না ঢুকলে বাড়ি গিয়ে ডিকশনারি উলটে দ্যাখ্‌গে যা—বুদ্ধির জাহাজ সব!

আমাদের মুখ দেখারও আর প্রবৃত্তি নেই যেন, হন হন করে আবার ঘনশ্যাম বারুইয়ের বাগানের দিকে চলল।

আমরা বোবার মতো ফিরে চলেছি। মাথাটা আস্তে আস্তে পরিষ্কার হচ্ছে। সমস্ত ব্যাপারটাই গোড়া থেকে পিনুডিদার সাজানো। মাঝে মাঝে এখানে আসে—মামাই পাঠায় নিশ্চয়। কী পোঁতা হয় বা হবে আগের থেকে জানত। এইজন্যেই আগে থাকতে প্রায়শ্চিত্তের কথা বলে রেখেছিল।

তবু আমার মগজে দুটো প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। এক, হাবুলকে সত্যিই ধাক্কাটা দিল কে? ও হলপ করে বলছে, ভূতে ধাক্কা দিয়েছে। কিন্তু আমার যা সন্দেহ হচ্ছে, তা বলার নয়। ...কেউ বিশ্বাস করবে না। আর, হাবুলই পিনুডিদাকে বলে দেবে।

দই, প্ল্যানটাগো জিনিস্!

বাড়ি এসেই মোটা অক্সফোর্ড ডিকশনারিটা খুললাম। কার্তিক চটপটি কেবলু হাবুলও হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

হাতড়ে পেলাম—প্ল্যানটাগো জিনিস্....

যাঃ কলা!

'প্ল্যানটাগো জিনিস্' হলো কলাগাছের ল্যাটিন নাম।

# পিন্‌ডিদার মগজ ডাকাতি

এমন মওকা আমরা কমই পেয়েছি। বেচারা হাবুল হোঁতকার জন্যে আমাদের দুঃখই হওয়া উচিত। কিন্তু উলটে কেবলু কার্তিক চটপটি আর আমার উৎকট আনন্দ হচ্ছে। অথচ কত আনন্দ করেই না এই দু'বছর বাদে আমাদের সকলের জন্যে নিজের পকেট থেকে ও করকরে দশ-দশটা টাকা খরচ করল। আমাদের ছ'জনের জন্যে ছ'টাকা দিয়ে ছ'খানা যাত্রার টিকিট কাটল। আর একটু একটু করে বাকি চার টাকা খরচ করে বাদামভাজা চানাচুর আলু-কাবলি ঝাল-মুড়ি খাইয়ে আমাদের মুখ চালু রেখেও কিনা ওর এই কপাল! যে-ফটোগ্রাফির স্টুডিওতে সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত কাজ করে, আজ দু'বছর বাদে সেই কাজে ওর দশ টাকা ইনক্রিমেন্ট হয়েছে। বাড়িতে না জানিয়ে প্রথম মাসের সেই বাড়তি দশ টাকা মনের আনন্দে আমাদের জন্যেই খরচ করেছে—তার কিনা এই ফল? অবশ্য খরচটা যে ও মনের আনন্দে আমাদের জন্যেই করেছে এটা কবুল করতে আমার কেবলু কার্তিক চটপটির অঘোষিত আপত্তি আছে! হেবো হোঁতকা আসলে তোয়াজ করতে চেয়েছে পিন্‌ডিদাকে—আমরা গৌরবে বহুবচন হয়েছি।

কিন্তু জিভের রসদ ফুরোতে হাই তুলতে তুলতে যাত্রার আসরে বসে পিন্‌ডিদা কিনা শেষ পর্যন্ত প্রায় ঘুমিয়েই পড়ল। অবশ্য ঘুম ঠিক নয়, মাঝে মাঝে চোখ টান করে দেখছে, হাই তুলছে, যাত্রার পালায় মন দিতে চেষ্টা করছে, আবার চোখ বুজছে।

নানাভাবে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে 'মারীচ বধ' পালা হচ্ছিল। স্বর্ণ-মৃগ হয়ে মারীচ সীতার সামনে নেচে বেড়াচ্ছিল, সীতার আব্দারে রাম ছুটল তাকে ধরতে। মারীচের কি সোনার হরিণ না হয়ে উপায় ছিল? সে জানে সোনার হরিণ হতে না চাইলে ক্রুদ্ধ রাবণের হাতে মরবে, আর হলে শেষ পর্যন্ত রামের হাতে মরবে। রাক্ষস জীবন থেকে ত্রাণ পেতে হলে রামের হাতে মরে পুণ্যি করাই ভালো। তাই নেচে নেচে রামকে ভুলিয়ে সে দূরে নিয়ে যাচ্ছে, রাক্ষস বুঝতে পেরে রাম শরসন্ধান করতে সে রামের গলা নকল করে আর্তনাদ করছে। যাতে রাম বিপদে পড়েছে ভেবে লক্ষ্মণ সাহায্য করতে আসে আর সেই ফাঁকে রাবণ সীতাহরণ করতে পারে।

আমি যাত্রায় মন দেব কী, সারাক্ষণ তো আমার একটা চোখ পিন্‌ডিদার দিকে। এক ফাঁকে হাবুলের কানে কানে বলেছিলাম, তোর কোনও কাণ্ডজ্ঞান আছে! ফুটবলের সুপার সুপার সুপার স্টার প্রদীপনারায়ণ দত্ত সমস্ত পৃথিবীর ফুটবল পাগলদের কাছে পি এন ডি থেকে পিন্‌ডি হয়ে গোটা বিশ্ব চষেছে—তাকে কিনা তুই এই অজ্ পাড়াগেঁয়ে যাত্রা দেখাতে নিয়ে এলি—তার এত মূল্যবান সময় নষ্ট করলি? কাল তোর অদৃষ্টে কী যে আছে ভগবান জানে!

হোঁতকা হাবুলের মুখ শুকিয়ে আমসি একেবারে।

আমাদের চারজন, মানে আমি কেবলু কার্তিক আর চটপটির মধ্যে সকালেই একটা পরামর্শ হয়ে গেছল। বিকেলে পিন্‌ডিদা মাঠে এলেই আমরা গত সন্ধ্যার মারীচ বধের আলোচনা তুলব। আর তার পরে যে পিন্‌ডিদার বাক্যবাণে ওরই যে মারীচ বধের দশা হবে তাতে আর সন্দেহ কী? ও যেমন নির্লজ্জ মোসায়েব পিন্‌ডিদার, ওর গুরুর মানে পিন্‌ডিদার হাতেই ওর একটু টিট হওয়া দরকার।

মাঠে এসে আমরা যে-যার জায়গায় গোল হয়ে বসেছি। হেবোও হাত-পা ছাড়িয়ে তার জায়গায় বসে ঘন ঘন সন্দিগ্ধ চোখে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। কালকের মারীচ বধ যাত্রার কথা আমরা মোটে তুলছি না বলেই ওর মনে খটকা লেগেছে। অর্বাচীনের মতো ও ওরকম যাত্রার টিকিট কেটে বসে আমাদের সন্ধ্যেলের সন্ধে রাতটা নষ্ট করেছে বলে আমরা যদি ওকে নিয়ে পড়তাম, তাহলেও ও স্বস্তি বোধ করত। আর কাকুতি-মিনতি করে পিন্‌ডিদাকে একটু ঠান্ডা করার আবেদন জানানোর সুযোগ পেত। কিন্তু মোটে আমরা ওদিকে ঘেঁষছিই না।

পিন্‌ডিদার উঁচু টিপির আসন খালি। সতৃষ্ণ চোখে রাস্তার দিকে নজর রেখে আমরা এটা-ওটা বলছি।

আসছে! পিন্‌ডিদা আসছে! তার ট্রেড-মার্ক লম্বা রোগা পটকা চেহারাখানা যে কত প্রিয় আমাদের, সে-যেন নতুন করে অনুভব করছি। হাবুল শুকনো জিভে করে শুকনো ঠোঁট দুটো বার বার ভিজিয়ে নেবার চেষ্টা করছে।

কাছে আসতে গলায় চিনি ঢেলে আমিই বললাম, এসো পিন্‌ডিদা, আমরা বসে বসে তোমার কথাই ভাবছিলাম.....শরীর-টরির খারাপ হয়নি তো?

ধীরে-সুস্থে পিন্‌ডিদা নিজের টিপির আসনে বসল। আর সেই ফাঁকেই সন্ধ্যেলের মুখগুলো দেখে নিল। বসে এইটুকু পথ হাঁটার ক্লান্তিতে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে আমার দিকে তাকাল। —আমার শরীর হঠাৎ খারাপ হতে যাবে কেন?

এ-রকম পাল্টা প্রশ্ন আশা করিনি, ভেবেছিলাম এর জবাবে কটমট করে হেবোর দিকে তাকাবে। তবু আমার হতাশ হবার কোনও কারণ নেই। তারিফের সুরেই বললাম, সব কিছু সহ্য করার মতো শরীর বটে একখানা তোমার কাল রাতে হাবুলের যাত্রা দেখে এসে আমি তো মাথাধরার যন্ত্রণায় বাবার ওষুধের আলমারি থেকে তিন-তিনটে ঘুমের ওষুধ চুরি করে বেঁচেছি—কার্তিক আর চটপটি বেচারা সমস্ত রাত ছাদে পায়চারি করে সকালের দিকে ঘুমিয়েছে, আর কেবলু—

আমার আগেই সংস্কৃতনবীশ কেবলু ফরফর করে বলে উঠল, উঃ! শিরঃপীড়া কী ভীষণং পীড়া—যাত্রা দেখে আসার পর সমস্ত রাত ধরে প্রাণ-বিহঙ্গ কেবলং ছটফটান্তি আর দেহস্য খাঁচা ছাড়ো-ছাড়ো করন্তি—হেবো হোঁতকা করুণ দু'চোখ গোল করে একবার আমাদের দিকে আর একবার পিন্‌ডিদার দিকে তাকাচ্ছে। কেবলুর খিচুড়ি ভাষা শেষ হতে তার দিকে চেয়ে বলল, তুই কি এখন সংস্কৃত ছেড়ে ওড়িয়া ভাষা কপচাতে শুরু করলি নাকি? ব্যাপারখানা কী?

কার্তিক তো আমাদের মধ্যে একটু ধীর-স্থির। এবারে সে-ও মুখ খুলল, কালকের মারীচ বধ দেখতে গিয়ে আমরাই কী বধ হচ্ছিলাম না পিন্‌ডিদা, রাক্ষস সোনার হরিণ সেজে নাচবে হাসবে ভোলাবে, তারপর মানুষের ভাষায় আর্তনাদ করবে—বসে বসে এই অ্যাবসার্ড ব্যাপারটা একটা টরচার নয়?

চটপটি চটাং চটাং বলে উঠল, আমি তো যাত্রা দেখতে হাবুলের মাথাটাই একটা ফুটবল ভাবছিলাম—এক শট্‌এ ওর ওই মাথা আমার স্টেজে নিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছিল—

পিন্‌ডিদা এবারে একটু সোজা হয়ে বসে সোজা হাবুলের মুখের দিকে তাকাল। ওই বিরাট শরীর নিয়ে হেবো-হোঁতকা কুঁকড়ে দুমড়ে একাকার। তারপর পিন্‌ডিদার খুদে দুচোখ আমাদের দিকে ঘুরল। —তার মানে রামায়ণ যুগের সায়েন্সের দিকটা তোরা কেউ মোটে ভাবিসইনি। এ-যুগে

তোরা স্পুটনিক বিশ্বাস করিস, রকেটে চেপে মানুষের চাঁদে যাওয়া বিশ্বাস করিস, ফ্লাই-ইং সসারও বিশ্বাসের পর্যায়ে এসে গেছে–কিন্তু এ-সব যে কত পুরনো যুগের সায়েন্স নতুন করে উদ্ধার হচ্ছে এটা তোদের মাথায় আসে না। মারীচ যে সত্যিই রাক্ষস ছিল, আসলে হরিণই ছিল না, এটা তোদের কে বলল?

আমি হতভম্বের মতো বলে উঠলাম, সে কী কথা পিন্‌ডিদা, রামায়ণে তো জ্বলজ্বলে অক্ষরে লেখা আছে, রাবণ মারীচ রাক্ষসকে সোনার হরিণ সাজিয়ে সীতার কাছে পাঠিয়েছিল।

–ছাপার অক্ষরগুলোই কেবল পড়লি আর ভাবলি না কিছু? রাবণ কত বড় সায়েনটিস্ট সে কথা একবারও মনে হয়েছে? রামের পুষ্পক রথ মানে আজকের দিনের এরোপ্লেন থাকলে সে তো তাইতেই চেপে সীতা উদ্ধারে যেতে পারত–বাঁদর দিয়ে সেতু-বন্ধনের দরকার ছিল কী? তার মানে রামের পুষ্পক রথ ছিল না, সে-সম্পর্কে তার কোনও ধারণাও ছিল না, কিন্তু সায়েনটিস্ট রাবণের শুধু ধারণা নয়, নিজের হেপাজতেই পুষ্পক রথ ছিল। হেবোর মাথার ঘিলু যদি তোর ঘিলু সরিয়ে তোর মাথায় চালান করা যায় তাহলে তোর বুদ্ধি-সুদ্ধি চাল-চলন সব হেবোর মতো হবে না তো কী? সায়েনটিস্ট রাবণ সত্যি সত্যি মারীচকে সোনার হরিণ সাজিয়ে সীতার কাছে পাঠায়নি, স্রেফ একটা হরিণকে ধরে মারীচের মাথার কিছু স্পেশাল সেল তুলে তার মাথায় চালান করেছে–ফলে সেটা মারীচের মতোই আচরণ করেছে...আর সোনার রং? তোর গায়ে সাপের বিষ ইনজেকশন করে দিলে তোর গায়ের রং দেখতে দেখতে নীল বর্ণ হয়ে যাবে না–তাহলে তেমন কিছু আরক ইনজেক্ট করে রাবণের মতো সায়েনটিস্টের হরিণের গায়ের রং সোনার মতো করে দিতে অসুবিধে কী?

আমরা, এমনকি হাবুলও হাঁ হয়ে পিন্‌ডিদার দিকে চেয়ে। একটু থেমে পিন্‌ডিদা আবার বলে গেল, কাল হেবো যে ওই নাটকের ভিতর দিয়ে আমাকে কোন রাজ্যে নিয়ে গেছল তোরা ভাবতে পারবি না–দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে আমার চোখের সামনে ডক্টর লেঁবোর মুখখানা ভেসে উঠছিল–আর বার বার আমি তন্ময় হয়ে যাচ্ছিলাম।

এক হাবুল ছাড়া আমরা সমস্বরে বলে উঠলাম, ডক্টর লেঁবো! সে আবার কে?

–ব্রেজিলের স্যানটসের ঘন-গভীর জঙ্গলে যার ল্যাবরেটারি–সেই বিরাট প্রতিভার এক পাগলা ডাক্তার ডক্টর লেঁবো–প্রতিভার প্রমাণ দাখিল করতে চাইলে সে কম করে সাত বার নোবেল প্রাইজ পেত–তার খপ্পরে পড়ে আমার জন্মগত ফুটবল-প্রতিভার ব্রেন-সেল ডাকাতি হয়ে যাচ্ছিল প্রায়, নেহাত চৌদ্দ পুরুষের সুকৃতিতে পার পেয়ে গেছি। আর যাত্রার সোনার হরিণের কথা শুনতে শুনতে আমি কি সোনার হরিণ দেখছিলাম না ভাবছিলাম? আমি ভাবছিলাম–ভাবছিলাম কেন–চোখের সামনে দেখছিলাম জিংগরোকে–ঠিক সোনার হরিণের মতো তার হাব-ভাব আর মনভোলানোর ছল-চাতুরি!

তারপর ভাবোন্মত্ত গলায় গত রাতের যাত্রার খানিকটা হুবহু আবৃত্তি করে গেল :

'মারীচ সশঙ্ক হয়ে যায় ধীরে ধীরে।
আগে ধায় পিছে ধায় চায় ফিরে ফিরে।
ক্ষণে চায় ক্ষণে যায় ক্ষণে বহুদূর,
নানা রঙ্গে চলে মৃগ মায়ায় প্রচুর।
ক্ষণেক নিকটে যায় ক্ষণেক অন্তরে,
শ্রীরাম গেলে সে পালায় বহুদূরে।'

পিন্‌ডিদা গদগদ, চাউনি কোন সুদূরে, বলে উঠল, আমাদের সামনে এসে জিংগারো অবিকল তাই করে আমাকে আর নারলেকারকে জঙ্গলের গভীরে ডক্টর লেঁবোর ল্যাবরেটারিতে টেনে নিয়ে গেছল–কী বাঁচা যে বেঁচেছি মনে পড়লে এখনও হৃৎকম্প হয়।

আমরা হাঁ। এত অবাক যে হাবুলের ওপর রাগও ভুলেছি। কার্তিক বলে উঠল, জিংগারোই বা কে?

পিন্‌ডিদা যেন স্মৃতির পুকুরে এখনও ডুবে আছে, কোনওরকমে একটু গলা তুলে বলল, ডক্টর লেঁবোর মগজ বদলানো গ্রেট-ডেন কুকুর। –'আগে ধায় পিছে ধায় চায় ফিরে ফিরে'–কী-ভাবেই না আমাকে আর নারলেকারকে ভুলিয়ে ভালিয়ে আধ মাইল জঙ্গলের পথ ভেঙে ডক্টর লেঁবোর ল্যাবরেটারিতে ঢুকিয়ে ছাড়ল! ঠিক সময়ে নেবুচিকে হাত করতে না পারলে ফুটবলের ব্রেন-সেল ডাকাতি হয়ে আজ মারীচের দশা না হোক, তোদের পিন্‌ডিদাকে আজও ব্রেজিলের কোনও পাগলা-গারদে পড়ে থাকতে হত...কী সাংঘাতিক লোক অক্স-ডন্ ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হুটেনটেটর লোকটা! বেচারা গোল্ডস্টোন আর ক্যান্‌ডি, কোথায় কী-ভাবে আছে এখন কে জানে! ওরা অক্স-ডনের ক্যাপটেন আর গোল-কিপার।

আমি হাঁ করে পিন্‌ডিদার মুখের দিকে চেয়ে আছি। হাবুল ছাড়া অন্যদেরও একই অবস্থা। হেবো-হোঁতকা বুঝে ফেলেছে ওর ফাঁড়া তো কেটে গেছেই, উলটে পিন্‌ডিদাকে মারীচ বধ যাত্রা দেখানোর ফলে রোমহর্ষক কিছু শোনার সম্ভাবনা এখন প্রবল।

একটু অপেক্ষা করেও কেবলু দেখল, পিন্‌ডিদা আবার স্মৃতির সমুদ্রে তলিয়ে গেছে। ও বলে উঠল, যাঃ কলা–শব্দব্রহ্মং কেবলম্ মগজে প্রবেশস্তি!

পিন্‌ডিদার কানে গেল না। ফ্যালফেলে চোখে অতীতে তলিয়ে আছে।

গলা খাঁকারি দিয়ে কার্তিক বলল, নেবুচি অক্স-ডন্ হুটেনটেটর গোল্ডস্টোন ক্যান্‌ডি...এরা সব মানুষ না অন্য গ্রহের কেউ?

ঝিমুনো গলায় পিন্‌ডিদা জবাব দিল, তোরা যে গ্রহের ওরাও সেই গ্রহের।

তাকে একটু তাতানোর জন্য চটপট চটপট অন্য পন্থা ধরল। –কিন্তু পিন্‌ডিদা তুমি এমন ঝিম মেরে গেলে কেন, তোমার ব্রেন-সেলে তো মারীচের মতো ছুরি পড়েনি...নাকি খানিকটা খোয়া গেছল...মনে পড়তেই কাহিল হয়ে গেলে?

পিন্‌ডিদা টেনে টেনে বলল, তুই একটা গাধার মতো বাঁদর, ক্রিয়েটিভ ব্রেন-সেল অপারেশন করে সরাতে ডক্টর লেঁবোর ছুরি-কাঁচির দরকার হয় না–লেসারে বিম্ দিয়েই সে সব কাজ সারে...

আমি আর চুপ করে থাকতে না পেরে বলে উঠলাম, তার মানে লেসার বিম্ দিয়ে তোমার ব্রেনের ক্রিয়েটিভ সেল, মানে ফুটবল প্রতিভার সেল ডাকাতি হয়েছিল বলছ?

এবারে পিন্‌ডিদা খেঁকিয়ে উঠল, ডাকাতি হয়েছিল বলেছি, না হতে হতে জোর বাঁচা বেঁচে গেছি বলেছি?

আমি শুধরে নিলাম, না না, হতে হতে বেঁচে গেছই বলেছ...তার মানে মারীচ বধ তোমার কাছে খাঁটি সায়েনটিফিক ব্যাপার একটা, আর তুমিও ডক্টর লেঁবো না কে তার হাতে পড়ে মারীচের মতোই ভিকটিম হতে যাচ্ছিলে?

আকাশের দিকে মুখ তুলে পিন্‌ডিদা মন্তব্য করল, আমাদের ভাবী স্কলার সোনা সব-কিছু বড় তাড়াতাড়ি বোঝে।

সোনা বলতে আমি, আর ভাবী স্কলার বলতে এবারে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দিয়ে স্কলারশিপ পাব আশা করছি। কৌতূহল এত বেশি যে টিপ্পনী গায়ে না মেখে জিগেস করলাম, ব্রেন-সেল অপারেশন করে পার্টিকুলার কোনও কিরয়েটিভ সেল চেনা যাবে কী করে?

–কী করে চেনা যাবে জানলে তুইও পাঁচবার নোবেল প্রাইজ পেতিস–পৃথিবীতে ডক্টর লেঁবোর মতো পাগল জিনিয়াস একটাই জন্মায়–বুঝলি? আর তার খপ্পর থেকে বাঁচতে হলে চোদ্দ পুরুষের পুণ্যি চাই–সাত ফুট লম্বা নিগ্রো নেবুচিকে তিন ফুটের বাঁটকুল বানিয়ে রেখেছিল–সেই

বিদ্যার জোরেই ডক্টর লেঁবো একটা নোবেল প্রাইজ পেতে পারত—নাঃ আমি আর ভাবতে পারছি না—হেবো যে কী কুক্ষণেই আমাকে কাল সন্ধ্যায় মারীচ বধ দেখাতে নিয়ে গেছলি—

করুণ গলায় হাবুল বলল, আমি কি জানতাম পিন্‌ডিদা, মারীচ বধের পিছনে এমন সত্যিকারের বিরাট রহস্য আছে!

কেবলু বলে উঠল রহস্যস্য ঘনঘটাঃ!

চটপটি আর কার্তিক হাঁ করে পিন্‌ডিদার মুখের দিকে চেয়ে আছে। কৌতূহলে ওদেরও দম আটকে আসছে। কিন্তু পিন্‌ডিদা এখনো এই বর্ধমানের আকাশের দিকে চেয়ে আছে না ব্রেজিলের স্যানটসের আকাশে ডান মেলেছে ঠাওর করা যাচ্ছে না।

এবারে মিনতির সুরে আমিই বললাম, দোহাই পিন্‌ডিদা, আর আমাদের এমন দম বন্ধ করে রেখো না—তোমার মগজ ডাকাতির ব্যাপারখানা কী একটু খুলে বলো—

কিন্তু এমন আবেদনও পিন্‌ডিদার কানের পর্দা ভেদ করল বলে মনে হল না। কিছু মনে পড়তেই বোধহয় একবার শুধু শিউরে উঠল।

অনুনয়ের সুরে চটপটি ডাকল, ও পিন্‌ডিদা...

নিষ্ফল।

হাত জোড় করে এবারে কেবলু সংস্কৃতের কামড় বসাল। —পিন্‌ডিদা, কৃপাং কুরু, রহস্যাঘাতে অস্মাকম জঠর ফুলিতং!

পিন্‌ডিদা সব সহ্য করতে পারে, কিন্তু কেবলুর সংস্কৃত শুনলে মড়া খাট থেকেও জেগে ওঠে। আকাশ থেকে দু'চোখ মাটিতে নেমে এল। সোজা ওর মুখের ওপর। নড়েচড়ে বসা থেকে ওঠার উপক্রম। গলা দিয়ে দু'শব্দের একটা বাক্য বেরুল, আমি চলিতং।

সঙ্গে সঙ্গে আমি কেবলু আর কার্তিক একযোগে হাত জোড় করে ফেললাম। আমি বললাম, বোসো পিন্‌ডিদা, কেবলু ক্যাবলা বলেই ও ভাবে ওর সংস্কৃত শুনে তুমি খুশি হও। কিন্তু দোহাই পিন্‌ডিদা, আর আমাদের যন্ত্রণার মধ্যে রেখো না, তোমার মগজ ডাকাতির কথাটা শোনা পর্যন্ত আমাদের পাল্‌স রেট দুটো করে হয়ে গেছে—এরপর তুমি মুখ না খুললে আমরা গণ-হার্টফেল করব।

পিন্‌ডিদা অপলক চোখে আমার দিকে খানিক চেয়ে রইল। মনে হল চোখের এক্স-রে দিয়ে আমার কংকালসুদ্ধ দেখে নিচ্ছে। —আজ বিনোদের দোকানের মেনুর খবর রাখিস?

আমি হতচকিত। মাথা নাড়লাম, রাখি না।

—তা রাখবি কেন, তার থেকে তোদের আনন্দ দেবার জন্য বকে বকে পিন্‌ডিদা গলা বুক শুকিয়ে মরুক। ...জীবনে এত খেয়েছি যে আমারও আর অত খাবার লোভটোভ নেই, তবু গন্ধটা নাকে আসতে ঢুকে পড়লাম। শুনলাম, আজকের স্পেশাল মেনু মেটে চচ্চড়ি আর মোগলাই পরোটা। বিনোদ জিগ্যেস করল, ছ'টা মোগলাই পরোটা আর ছ'ডিশ মেটের চচ্চড়ি টিফিন ক্যারিয়ারে তুলে রেখে দেবে কি না? আমি বললাম, রাখতে পারো কিন্তু পরে বেচে দেবার জন্য প্রস্তুত থেকো—আমাদের সোনার যা মতি-গতি, হয়তো পকেট উল্টে দেখাবে গড়ের মাঠ। বিনোদটাও কি সোজা পাত্তি, তক্ষুনি বলল, সোনাবাবুর নাম ধাম লিখে রাখব তাতে আর কী—ও তো ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখারই শামিল। ...ওর বজ্জাতির কথা শুনে আমি রাগ করে চলে এলাম।

আমার টনক তক্ষুনি নড়েছে। ছ'টা মোগলাই পরোটার দাম দেড় টাকা করে ন'টাকা, আর ছ'ডিশ মেটে চচ্চড়ি আড়াই টাকা করে পনেরো টাকা। এক বিকেলে চব্বিশ টাকার মামলা।

আমাকে হতবাক দেখে এবারে হেবো হোঁতকাই খেঁকিয়ে উঠল, অত ভাবছিস কী, তোর কি একটু দয়ামায়া নেই—পিন্‌ডিদার মুখের দিকে চেয়ে দেখেছিস?

ভিতরে ভিতরে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলাম। কিন্তু ঠান্ডা মুখে ওকে বললাম, যা, ছুটে গিয়ে পিন্‌ডিদার জন্যে কেবল একটা পরোটা আর এক ডিশ মেটের চচ্চড়ি নিয়ে আয়।

হেবো হোঁতকা এই জবাব আশা করেনি। হয়তো বাকি ক'জনও করেনি। বিমূঢ় মুখে হাবুল পিন্‌ডিদার দিকে তাকাতেই সে খেঁকিয়ে উঠল। ডক্টর লেঁবোকে হাতের কাছে পেলে তোর মাথায় খানিকটা মানুষের ঘিলু ইন্‌জেক্ট করার ব্যবস্থা করতাম—সোনা ঠাট্টা করছে এ-ও বুঝতে দেরি হচ্ছে তোর? যা, বিনোদের টিফিন কেরিয়ার রেডিই পাবি।

দীর্ঘনিঃশ্বাস কেবল একটা আমারই পড়ল। মনে মনে ঠিক করলাম, শোনার মতোই কিছু যদি না শুনি, তাহলে এমন তেরছা কিছু বলব যাতে পিন্‌ডিদার মোগলাই পরোটা আর মেটের চচ্চড়ি উগরে দিতে ইচ্ছে করে।

হেবো হোঁতকা পড়ি মরি করে ছুটেছে। পিন্‌ডিদাকে দেখে মনে হল তার মন আবার ব্রেজিল বা স্যানটস বা ডক্টর লেঁবোর জঙ্গলের ল্যাবরেটারিতেই উধাও।

একসঙ্গে খাবার এলে ভাগ করার দায়িত্ব কার্তিকের। ডিশ ছ'টাই এসেছে, কিন্তু মেটের চচ্চড়ির ভাগটা সাত ডিশের মতোই হল। পিন্‌ডিদার ডিশে এক পিস করে মেটে বেশি দিলেই ভাগটা মোটামুটি সাত ডিশই হয়। হাবুলই প্রথম নিজের মোগলাই পরোটা থেকে খানিকটা ছিঁড়ে পিন্‌ডিদার ডিশে রাখল। ফলে দেখাদেখি সবাই তাই করল। অর্থাৎ ছ'খানা পরোটাও সাত ভাগ। কিন্তু পিন্‌ডিদার দৃষ্টি এখনো সুদূরে উধাও। এ-সব তুচ্ছ ব্যাপার লক্ষ করার সে অনেক ঊর্ধ্বে।

ধীরে-সুস্থে খাওয়া শুরু হল শেষ হল। দু'বোতল জলও হাতে হাতে শেষ হয়ে গেল। উচ্ছিষ্ট ডিশগুলো আর টিফিন কেরিয়ার হাবুল গুছিয়ে রেখে, ওটা সরিয়ে রাখার পর সকলে রেডি।

পিন্‌ডিদার একটু ঝিম মেরে থেকে বলল, হেবো ভাবতেও পারবে না, কাল মারীচ বধ দেখানোর জন্য ওর কাছে আমি কত কৃতজ্ঞ। ওটা দেখার পর আমি পুনর্জীবন লাভের স্বাদ পেয়েছি।

হাবুল হোঁতকা খুশিতে এমন দুলতে লাগল যে ওর দু'পাশে কার্তিক আর আমি নিরাপত্তার দায়ে একটু সরে সরে বসলাম।

এরপর কিছু ভণিতার পর পিন্‌ডিদা তার মগজ ডাকাতির কাহিনি শুরু করল। যতটা সম্ভব আমি সেই চিত্রই পাঠক-পাঠিকার সামনে তুলে ধরছি।

...অক্স-ডন্ ক্লাব হলো পিন্‌ডিদার ব্রেজিল ইলেভেনের চির-প্রতিদ্বন্দ্বী ফুটবল ক্লাব। অক্স-ডন্ ক্লাবের প্রেসিডেন্ট ধূর্ত হুটেনটেটের কোনও একসময় আর্মির লোক ছিল। সেই সুবাদে সে কিছুকাল ভারতে ছিল। এখানে ষাঁড়ের লড়াই দেখে তার মনে হয়েছিল এমন হিম্মতের লড়াই অরা হয় না। অক্স মানে ষাঁড়। আর ডন মানে ডন-বৈঠক আর কী। ভারতে এসে কিছু কিছু বাংলা শব্দও হুটেনটেটের শিখেছে। বেনারেসে এসে ষাঁড়ের লড়াই দেখে সে মুগ্ধ। দেখে জোরদার ডন-বৈঠকের লড়াই-ই মনে হয়েছে তার। নিজের মুখের আদলও ষন্ডের মতোই। দেশে ফিরে খেলোয়াড় বাছাই করে ফুটবল-দল গড়েছে সে। নাম দিয়েছে অক্স-ডন্ ক্লাব। অর্থাৎ তার ক্লাবের প্রত্যেকটি খেলোয়াড় এক-একটি লড়িয়ে দুর্ধর্ষ ষাঁড়। কিন্তু কোন প্রতিযোগিতায়ই তার ক্লাব পিন্‌ডিদার ব্রেজিল ইলেভেনের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছে না। তার চোখের কাঁটা পিন্‌ডিদা। পিন্‌ডিদার তখনো মালাই-চাকি সরেনি বা নড়েনি। ফুটবল-আকাশের সে তখন এক অনন্য তারকা। ফাইনালে উঠেও শুধু তার জন্যেই অক্স-ডন্ ক্লাব কোনওবার ট্রফি জিততে পারছে না। বার বারই তার ক্লাব রানারস আপ। ফাইনালে তাদের হার বাঁধা।

ব্রেজিল ইলেভেন হঠাৎই অক্স-ডনের হুটেনটেটেরের কাছ থেকে একটা বিচিত্র রকমের আমন্ত্রণ পেল। পৃথিবীর দুই সেরা টিম অক্স-ডন্ ক্লাব আর ব্রেজিল ইলেভেন স্যানটসে একটা বিখ্যাত গোল্ডকাপ টুর্নামেন্টে খেলবে—খেলার ইতিহাসে যা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই খেলায় ফুটবলের

'কিং অফ কিংস্' (রাজার রাজা) নির্বাচিত হবে। সেই কিং অফ কিংস্ পাবে মস্ত একখানা সোনার কাপ। নগদ পাবে পঞ্চাশ হাজার ডলার। জিতিয়ে দলের অন্যেরা পাবে প্রত্যেকে ছোট সোনার কাপ আর দশ হাজার নগদ। যারা হারবে তারা কেবল প্রত্যেকে পাবে রুপোর কাপ আর আড়াই হাজার জলার নগদ। কিন্তু সব থেকে উত্তেজনার ব্যাপারখানা হলো কিং অফ কিংস্ নির্বাচন। ব্রেজিল ইংল্যান্ড রাশিয়া ফ্রান্স আর হল্যান্ড থেকে এই নির্বাচনের জন্য পাঁচজন অভিজ্ঞ নিরপেক্ষ জাজ্ আনা হবে।

খবরটা কাগজে বেরতে বেশ একটু শোরগোলই পড়ে গেল। ব্রেজিল ইলেভেনের ম্যানেজার বলল, পিন্‌ডি, আর কেন, কোমর বেঁধে তৈরি হও–সব তো তোমার কপালেই ঝুলছে।

পিন্‌ডিদা একটু ভেবে মাথা নাড়ল। –উঁহু, কেমন একটা গন্ডগোলের গন্ধ পাচ্ছি...।

ম্যানেজার অবাক, সে আবার কী?

পিন্‌ডিদা বলল, অক্স-ডন্ ক্লাব প্রত্যেক বছরই ফাইনালে আমাদের সঙ্গে হেরে চলেছে, তবু হুটেনটেটের এমন বিরাট চ্যালেঞ্জ ছোঁড়ে কী করে–কোন্ সাহসে? খেলাটাই বা এই এখানে না হয়ে স্যানটসে কেন?

ম্যানেজার বলল, দূর পিন্‌ডি, এতবড় একটা স্পোর্টসম্যান হয়ে তুমি বড় বেশি ভাব। এটা একটা পাবলিসিটি স্টান্ট–বুঝলে? চ্যালেঞ্জ ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে চার দিকে কেমন সাড়া পড়ে গেছে দেখছ না–হুটেনটেটের নিশ্চয় চার আগের টিকিট সরিয়ে রাখবে, আর দুশো ডলারের টিকিট শেষ দু'হাজার ডলারে বিক্রি করবে। যা-ই হোক, চ্যালেঞ্জ অ্যাকসেপ্ট না করলে আমাদের মান থাকবে?

এটা সত্য কথা। মনের খুঁতখুঁতুনি নিয়েও পিন্‌ডিদা রাজি না হয়ে করে কী?

এরপরই এমনই একটা সাড়া পড়ে গেল যে সাত দিন আগে থাকতে দর্শকের ভিড়ে কোনও হোটেলে আর তিল ধারণের জায়গা নেই। আগে থাকতেই দলের খেলোয়াড়দের জন্যে দুটো সাত-তারা হোটেলের ঘর বুকড্। আর মস্ত চ্যালেঞ্জ হলেও এটা তো উৎসব ধরনের খেলা। তাই বেড়ান আর আনন্দ করার জন্যে দুই দলের সকলেই খেলার তিন দিন আগে থাকতে এয়ারে স্যানটসে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা। তা রাজসিক আনন্দে আর ফুর্তিতে থাকতে পেলে কোন্ দল না তিন দিন ছেড়ে তিরিশ দিন আগে যেতে রাজি হয়?

এ ব্যাপারেও কেবল পিন্‌ডিদারই ভিতরটা খুঁতখুঁত করতে লাগল। দু'দলের তিন দিনের সাত-তারা হোটেল খরচাও তো এক এলাহী ব্যাপার!

যা-ই হোক, একটু দুশ্চিন্তা মনে চেপেই পিন্‌ডিদা দলের সঙ্গে তিন দিন আগেই এরোপ্লেনে স্যানটসে রওনা হয়ে গেল।

প্লেনে উঠেই পিন্‌ডিদার সঙ্গে লন্ডন টাইমস-এর জার্নালিস্ট বন্ধু মিস্টার নারলেকারের দেখা। দু'জনকে দেখে দু'জন দারুণ খুশি। এই খেলা কভার করার জন্য সে লন্ডন থেকে উড়ে এসেছে। তাদের এত বন্ধুত্ব দেখে দলের অন্য খেলোয়াড়রা হাসাহাসি করে আড়ালে বলল, দু'জনেরই রোগা-পটকা ঢ্যাঙা হাড়গিলে চেহারা কিনা তাই এত ভাব।

কিন্তু আসলে যে কারণে অন্য খেলোয়াড়রা নারলেকারকে এড়িয়ে চলত, ঠিক সেই কারণেই পিন্‌ডিদার সঙ্গে তার অত ভাব। স্পোর্টস জার্নালিস্ট হলেও লোকটা দিলদরিয়া আধ-পাগলা, আর বেজায় দার্শনিক গোছের। হঠাৎ হঠাৎ অন্যমনস্ক হয় যায়, কিছু দেখে অকারণে হি-হি করে হাসতে থাকে যার কোনো কারণ কেউ খুঁজে পায় না। আবার হঠাৎ হঠাৎ প্রকৃতির কিছু দেখেও স্থান-কাল ভুলে মুগ্ধ চোখে চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে। তখন কী করছিল কী বলছিল কিছুই আর খেয়াল থাকে না। পিন্‌ডিদার মনে হত এটা হয়তো এক ধরনের রোগ। কিন্তু মজার রোগ।

দু'জনে প্লেনেই ঠিক করে নিল, পাশাপাশি ঘরে তারা দু'জনে থাকবে, একসঙ্গে ঘুরবে বেড়াবে ফুর্তি করবে, খেলার পর আবার পিন্‌ডিদার ইন্‌টারভিউ নেবার জন্যে সে আবার তার সঙ্গে ফিরে

আসবে। কারণ, ফুটবলের কিং অফ কিংস্ যে পিন্‌ডিদাই হবে তাতে তো তার একটুও সন্দেহ নেই। এই চ্যালেঞ্জ-কাপ খেলার পর পিন্‌ডিদার যোলো পাতার একটা বিরাট কভারেজ দেবে সে—তাতে পিন্‌ডিদার খাওয়া শোয়া ওঠা বসা আরাম বিরাম পছন্দ অপছন্দ হবি—যাবতীয় কথা থাকবে।

স্যানটসের সাত-তারা হোটেলের এলাহী ব্যবস্থা। স্বর্গের দেব-দূতেরা সব এসে উঠেছে যেন। এমনি আরাম বিলাস আর খাওয়ার ব্যবস্থা। বেড়াবার জন্য সক্কলের এক-একখানা ঢাউস এয়ার-কনডিশনড্ গাড়ি। আর তেমনি দিলদরিয়া বিপক্ষ অঙ্গ-ডন্ ক্লাবের সর্বাধ্যক্ষ হুটেনটেটের। শত্রুপক্ষের সক্কলে যেন তার পরম আপনার জন।

এ-সব দেখেশুনে পিন্‌ডিদার খুঁতখুঁতুনি বাড়তেই থাকল। কিন্তু মনের ভাব প্রকাশ করার মানুষ সে নয়।

প্রথম রাতটা হই-হুল্লোড়ের মধ্যে কেটে গেল। পরদিন খেলোয়াড়রা সব যে যার গাড়ি নিয়ে ইচ্ছেমতো বেড়াতে বেরিয়ে পড়ল। পিন্‌ডিদা আর নারলেকারও এক গাড়িতে বেরুনোর জন্যে প্রস্তুত। আর তাদের বেড়িয়ে আনার জন্যে প্রস্তুত এক নিগ্রো ড্রাইভারও।

অনেকক্ষণ বাদে গাড়ি এক নির্জন রাস্তার দিকে চলল। নিগ্রো ড্রাইভারটা ভাঙা-ভাঙা ইংরেজি জানে। পিন্‌ডিদা জিগ্যেস করতে জানাল সে একশ কিলোমিটার দূরের এখানকার এক ফেমাস জাংগল্ দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে।

নারলেকার শুনেই উৎসাহিত। —ফার্স্ট ক্লাস!

কিন্তু সাড়ে ছ'ফুট নিগ্রোটাকে দেখে সে আর কিছু বলল না। হতেও পারে, স্যানটসের জঙ্গল দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে কেন!

কিন্তু খুঁতখুঁতে পিন্‌ডিদা আবার চিন্তিত। কিছু না বলতে লোকটা তাদের জঙ্গল দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে কেন!

হঠাৎ লক্ষ করল, নারলেকার মুগ্ধ চোখে আকাশ দেখছে। পিন্‌ডিদাও উঁকি দিয়ে দেখার মতো কিছু দেখল না। একটু বাদেই নারলেকার হি-হি করে হাসতে লাগল। জিগ্যেস করতে বলল, আকাশের ওই মেঘটাকে সমুদ্রের বুকে ডানা-ছড়ানো অ্যালবেট্রসের মতো লাগছিল, দ্যাখ, হঠাৎ যেন ওটা কেশর-ফোলানো সিংহের মতো হয়ে গেল!

তার মর্যাদার খাতিরে পিন্‌ডিদা হাসল একটু।

একটু বাদে কী মনে পড়তে নারলেকার হি-হি করে হাসতে হাসতে বলল, অঙ্গ-ডনের ওই হুটেনটেটের লোকটা কী বজ্জাত জান, এই খেলার একটা আগাম ঢাউস ম্যাগাজিন ছেপে রেখেছে, খেলার শেষে সারকুলেট করবে। সে ধরেই নিয়েছে এই খেলায় তোমরা এগারো-শূন্য গোলে হারবে। এই নিয়ে খুব মজার মজার সব লেখা ছাপা হয়েছে। আর সকলের থেকে দারুণ ছাপা হয়েছে লম্বা-লম্বি দু'পাতা জোড়া তোমার রঙিন কার্টুন। একটা নয়, একেবারে গায়ে গায়ে লাগানো দুটো। একটা হল তালগাছের মতো মাথা উঁচনো পিন্‌ডিদা। তার নিচে লেখা, পিন্‌ডি বিফোর দ্য চ্যালেঞ্জ টুর্নামেন্ট। তার পাশে গায়ে ছোট্ট এক বামন পিন্‌ডিদা। তার নিচে লেখা, পিন্‌ডি আফটার দ্য চ্যালেঞ্জ টুর্নামেন্ট। অর্থাৎ একটা হল এই খেলার আগের আকাশ-ছোঁয়া পিন্‌ডি, আর পাশেই হল এই খেলা পরে বামন হয়ে যাওয়া পিন্‌ডি।

দেখেই তো পিন্‌ডিদা রাগে ফুলে উঠল। কিন্তু নারলেকারের কথা শুনে সচকিত। হুটেনটেটের নাকি বলেছে, এই টুর্নামেন্টে অঙ্গ-ডন ক্লাব কম করে এগারো গোলে জিতবে, সেই জন্যেই আগাম এই ম্যাগাজিন ছাপা হয়ে আছে, খেলার পর সারকুলেট করা হবে। একখানা ম্যাগাজিন সে নাকি নারলেকারকে দিয়ে বলেছে, এটা তুমি তোমার বন্ধু পিন্‌ডিদাকে আগাম উপহার দিতে পারো—সে দেখে রাখুক ফুটবলের আকাশ-ছোঁয়া পিন্‌ডি এই খেলার পর কেমন বামনটি হয়ে গেছে।

অন্য কেউ হলে ভাবত পিন্‌ডিদাকে ঘাবড়ে দেবার জন্যে এই ম্যাগাজিন ছাপা হয়েছে। কিন্তু

তা তো হতে পারে না—এ ম্যাগাজিন তো এখন পর্যন্ত কারও চোখেই পড়েনি—এটা বিলি হবে 'কিং অফ কিংস্' টুর্নামেন্ট খেলার পরে। বরাবর হেরে এবারে হুটেনটেটর জিতবে বলে এমন শিওর হয়ে বসে থাকে কী করে!

ম্যাগাজিনটা কোলের ওপর ফেলে রেখে পিন্‌ডিদা ভাবতে বসল। সমস্ত ব্যাপারটাই কি রকম একটা তৈরি গোছের মনে হচ্ছে তার। যত ভাবছে তত দুশ্চিন্তা। .....এই ড্রাইভার ব্যাটাই বা একশ কিলোমিটার পথ ঠেঙিয়ে সব ছেড়ে তাদের জঙ্গল দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে কেন!

নারলেকার বকবক করেই যাচ্ছে। মাঝে মাঝে কিছু দেখে হি-হি করে হেসে উঠছে। এক একসময় আবার কিছু প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে তন্ময় হয়ে যাচ্ছে।

জঙ্গলের সামনে গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভার বলল, তোমরা জঙ্গল ঘুরে দেখে এস, আমি অপেক্ষা করছি।

নারলেকার তক্ষুনি পা বাড়াবার জন্য তৈরি। পিন্‌ডিদা হাত ধরে তাকে থামাল। ড্রাইভারকে বলল, হাতে বন্দুক নেই কিছু নেই জঙ্গলে ঢুকব কেন, এর ভিতরে গিয়ে দেখার কী আছে?

ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে ড্রাইভার জানাল, এখানে ভয় পাবার মতো কোনও জানোয়ার নেই, এটা হলো ডক্টর লেঁবোর জঙ্গল, মাইল দুই এগোলে ডক্টর লেঁবোর ল্যাবরেটারি দেখতে পাবে—পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য জিনিস! সভ্য জগতের কেউ আজও এর খবর রাখে না—মিস্টার হুটেনটেটর তোমাদের এই দুর্লভ জিনিসটি দেখিয়ে আনতে হুকুম করেছে—চলে যাও, কোনও ভয় নেই।

শুনে খবরের কাগজের নারলেকার যত খুশি পিন্‌ডিদা ততো চিন্তাচ্ছন্ন। ডক্টর লেঁবো কে? জঙ্গলের মধ্যে তার ল্যাবরেটারি এ আবার কী ব্যাপার! হুটেনটেটরই বা এই ল্যাবরেটারি দেখানোর এত আগ্রহ কেন!

এই চিন্তার ফাঁকেই এক বিস্ময়কর কাণ্ড ঘটল। জঙ্গলের সামনেই দাঁড়িয়ে একটা গ্রেট-ডেন কুকুর। ওটার চোখে চোখ পড়তে পিন্‌ডিদা আর নারলেকার দুজনেই অবাক! তিন পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে ডান দিকের সামনের পা কপালে ঠেকিয়ে স্যালিউট জানাল, তারপর পা-টাই নেড়ে নেড়ে কাছে আসার ইশারা করতে লাগল। আর আশ্চর্য! কুকুর কখনও হাসে? হ্যাঁ স্পষ্টই তারা দেখছে কুকুরটা হাসছে। হাসি ছাড়া কী বলবে পিন্‌ডিদা বা নারলেকার। হাসছে আর একটা পা তুলে যেন সাদর অভ্যর্থনায় নেড়ে নেড়ে দু'জনকে কাছে ডাকছে।

বিস্ময়ের পরেই খুশিতে আটখানা হয়ে নারলেকার ওটার দিকে ছুটল। অগত্যা পিন্‌ডিদাও পিছু নিল। ছুটে তার কাছে গিয়ে বলল, নারলেকার, আমি ব্যাপার ভালো বুঝছি না, চলো ফিরি—

নারলেকারের থেকে কুকুরটাই যেন পিন্‌ডিদার মনের ভাব বেশি বুঝল। ঘুরে দু'পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে সামনের দু'পা দিয়ে যেন হাত জোড় করে তার সঙ্গে আসার জন্যে মিনতি জানাল, তারপর একটা পা এমনভাবে দু'দিকে নাড়ল যেন বলছে, তোমরা এসো দয়া করে, কোনো ভয় নেই।

নারলেকার বলে উঠল, আমি জার্নালিস্ট, এমন কুকুর পৃথিবীতে কেউ দেখেছে—দেশে ফিরে আমার কাগজে সাড়া ফেলে দেব—ও আমাদের কোথায় নিয়ে যেতে চায় দেখতেই হবে—হোয়াট্ এ ডগ্!

গ্রেট-ডেন কুকুরটা এঁকে বেঁকে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এগোচ্ছে, ঘুরে দেখছে ওরা আসছে কি না—খুশি হয়ে দাঁত বার করছে, আবার টিমেতালে ছুটছে।

আশ্চর্য! স্যানটসের জঙ্গলে তক্ষুনি পিন্‌ডিদার মারীচ বধের পঙ্‌ক্তিগুলো মনে এসে গেল—

'ক্ষণে চায় ক্ষণে যায় ক্ষণে বহুদূর
নানা রঙ্গে চলে মৃগ মায়ায় প্রচুর।'

—এখানে কেবল চলে 'মৃগ' না হয়ে চলে 'কুকুর' হলেই হুবহু মেলে। ভয় সত্ত্বেও ততক্ষণে

পিন্‌ডিদারও কৌতূহলের নেশা ধরে গেছে। জঙ্গল বেশ নিবিড়, কিন্তু তার মধ্যে সুন্দর পায়ে চলা রাস্তা। আধ ঘন্টার ওপর ছুটিয়ে গ্রেট-ডেনটা যেখানে পিন্‌ডিদা আর নারলেকারকে নিয়ে এল–দেখে দু'জনেই হাঁ। সামনে মস্ত আঙিনার মধ্যে মস্ত একটা দুধ-সাদা বাংলো বাড়ি। যেন শ্বেতপাথরের তৈরি। কম্পাউন্ডের চারদিকে উঁচু দেয়াল, সামনে প্রকাণ্ড ইস্পাতের ঝকঝকে গেট। কুকুরটা গেটের সামনে দাঁড়াতেই ওটা আপনি খুলে গেল। চমৎকার, বাগান, মাঝখানের তকতকে রাস্তা বাংলোতে সিঁড়িতে গিয়ে শেষ।

বাংলোর দাওয়ায় বড় জোর সাড়ে তিন ফুট লম্বার গাঁট্টা-গোট্টা কালো কুচকুচে একটা বামন দাঁড়িয়ে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, পুরু ঠোঁট। ওখান থেকেই ব্রেজিল দেশের ভাষায় হাঁক দিল, জিংগারো! গেস্টদের আদর করে নিয়ে এসো!

দু'জনেই বুঝল এই অদ্ভুত শিক্ষিত গ্রেট-ডেন কুকুরটার নাম জিংগারো। হুকুম শুনে সে আবার দু'পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে সামনের দু'পা জোড় করে একটু একটু দাঁত বার করে হেসে মিষ্টি দুটো ঘেউ ঘেউ ডাক দিয়ে যেন মানুষের মতোই অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাল। দারুণ আনন্দে নারলেকার হি-হি হি-হি হি-হি করে হাসতে লাগল। কিন্তু এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় পিন্‌ডিদার কপালে ঘাম ছুটেছে। নারলেকার প্রেজেন্ট করা হাতের ম্যাগাজিনটা নেড়ে নিজেকে বাতাস করছে তাকে টানতে টানতে গেটের এ-ধারে নিয়ে এল। এখনো সে ফুর্তিতে হেসেই চলেছে। তারা এ-ধারে আসতেই স্টিলের গেট আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে গেল।

পিন্‌ডিদার গা ছমছম করছে। ঝকঝকে দিন, দু'দিকের বাগানের ফুল আর গাছপালাও যেন আশ্চর্য রকমের জীবন্ত। সে-সবও যেন দুলে দুলে তাদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। পায়ে পায়ে বাংলোর বারান্দার কাছে এসে দাঁড়াতেই বামন লোকটা মাথা নিচু করে স্প্যানিশ-ভাষায় যা বলল, তার অর্থ, ডক্টর লেঁবোর ল্যাবরেটারিতে অতিথিদের আমি স্বাগত জানাচ্ছি–দয়া করে চলে এস।

স্প্যানিশ ভাষা নারলেকারও কিছু বোঝে। অভ্যর্থনার জবাবে সানন্দে মাথা ঝাঁকিয়ে পিন্‌ডিদার হাত ধরে সে দাওয়ায় উঠল।

কালো কুচকুচে বামন নিজের পরিচয় দিল। –আমি নেবুচি, ডক্টর লেঁবোর একমাত্র সহচর আর কমবাইন্‌ড্ হ্যান্ড–তোমরা আসছ ডক্টর লেঁবো আমাকে বলে রেখেছে–সে লাঞ্চের আগেই স্যানটস থেকে ফিরবে, তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে আসার জন্যই আমি জিংগারোকে পাঠিয়েছিলাম। দয়া করে ভিতরে এসে বোস–

পিন্‌ডিদার মন বলছে তারা কোনো ফাঁদে পা দিয়েছে। .....এত বার হেরেও হুটেনটেটরের এ-রকম একটা চ্যালেঞ্জ ছোড়া, আগে থাকতে ম্যাগাজিনে পিন্‌ডিদার অমন লম্বা আর বেঁটে কার্টুন ছেপে রাখা, তাদের জঙ্গলে পাঠানো, এ-রকম আশ্চর্য কুকুর জিংগারো, ডক্টর লেঁবোর ল্যাবরেটারি, যে আগে থাকতেই জানে তারা এই ল্যাবরেটারিতে আসছে, নেবুচিকে বলে গেছে, আর নেবুচি জিংগারোকে পাঠিয়েছে তাদের আনতে.....এর পিছনে ভীষণ কিছু ষড়যন্ত্র আছেই। মনের ভাব গোপন করে মুখে হাসি ফুটিয়ে পিন্‌ডিদা বলল, হ্যাঁ, জিংগারো আমাদের চমৎকার আনন্দ দিতে দিতে নিয়ে এসেছে, এমন ট্রেন্‌ড্ কুকুর আর দেখিনি–

ভিতরে নিয়ে যেতে যেতে পুরু ঠোঁট উলটে নির্লিপ্ত মুখে নেবুচি বলল, হবে না কেন, ওর মগজ অপারেশন করে ডক্টর লেঁবো তো ওর মাথায় মানুষের মগজ ঢুকিয়ে দিয়েছে–

শুনে নারলেকার, হাঁ, আর পিন্‌ডিদার পিলে চমকে গেল–কুকুরের মাথায় মানুষের মগজ!

নেবুচি বলল, ডক্টর লেঁবোর কাছে এ তো জল-ভাত ব্যাপার–এই ল্যাবরেটারিতে মগজ বদলানোর অনেক নজির দেখতে পাবে। ডক্টর লেঁবোর এই এক্সপেরিমেন্ট পৃথিবীর কম লোকেই জানে–তোমাদের ভাগ্য এত ভালো হলো কী করে জানি না।

কথার ফাঁকে বিশাল এক হল্-এ ঢুকেছে তারা। দু'দুটো টেনিস লনের মতো বিশাল হল্।

পিন্‌ডিদা আর নারলেকার বিস্ময়ে হতবাক। হলের দু'মাথায় সারি সারি খাঁচা। কোনওটা ভাঙে না এমন কাচের, কোনওটা জালের, কোনওটা বা ইস্পাতের। তাতে হরেক রকমের জন্তু-জানোয়ার। একটা কাচের খাঁচায় বিশাল একটা সিংহ শুয়ে আছে। আবার পরের ইস্পাতের খাঁচায় একটা ভেড়া—রাগে ভ্যা-ভ্যা নয়তো, যেন গোঁ গোঁ করছে।

নেবুচি বলল, আগে চা বা কফি খেয়ে ধীরে সুস্থে দেখো, এখানে ঠিক দেড়টায় লাঞ্চ, তোমরা ব্রেক-ফাস্ট করেই বেরিয়েছ নিশ্চয়?.....তাহলে চা খাবে না কফি?

চাপা উত্তেজনায় জার্নালিস্ট নারলেকারের মুখ লাল। বলল, কফি—

যেতে গিয়েও বামন নেবুচি ঘুরে দাঁড়াল। —ভালো কথা, তোমাদের মধ্যে ফুটবল স্টার মিস্টার পিন্‌ডি কে?

চকিতে মাথায় কী খেলে গেল পিন্‌ডিদার। নারলেকারকে দেখিয়ে বলল; ইনি ফুটবল স্টার পিন্‌ডি আর আমি তার সহচর এবং পা-গার্ড।

নেবুচি অবাক একটু।—পা-গার্ড কী?

গম্ভীর মুখে পিন্‌ডিদা আবার নারলেকারের পায়ের দিকে ইশারা করে জবাব দিল—ফুটবল স্টার মিস্টার পিন্‌ডির পায়ের দাম আশি লক্ষ ডলার—ইন্‌সিওর করা আছে—ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানির তরফ থেকে আমি তাই মিস্টার পিন্‌ডির পা-গার্ড।

নেবুচি খানিক হাঁ করে চেয়ে থেকে কফি আনতে চলে গেল। নারলেকার ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করল, এটা কী-রকম হলো?

পিন্‌ডিদা বলল, একটা সহজ কথা বুঝতে পারছ না, ডক্টর লেঁবো যদি জানতে পারে একজন জার্নালিস্ট তার গোপন ল্যাবরেটারি দেখে ফেলেছে, তোমাকে সে আর এখান থেকে ফিরতে দেবে? তার থেকে তোমাকে পিন্‌ডি ভেবে সে যদি খুব যত্ন করে সব দেখায়, ফিরে গিয়ে তোমার কাগজে লিখে তুমি সমস্ত পৃথিবীকে তাক লাগিয়ে দিতে পারবে না?

পিন্‌ডিদার বুদ্ধি দেখে নারলেকার এবারে মুগ্ধ। —আমার তো এটা মাথাতেই আসেনি, আমি জার্নালিস্ট ডক্টর লেঁবো জানতে পারলে তো রক্ষা নেই! কিন্তু আমাকে পিন্‌ডি না বানিয়ে তোমার পা-গার্ড করলে না কেন?

পিন্‌ডিদা গম্ভীর। —এ-ও বুঝতে পারছ না? জার্নালিস্ট-চোখ দিয়ে দেখে দরকার মতো তুমি ডক্টর লেঁবোর কাছ থেকে যা জেনে বুঝে নিতে পারবে, আমি কি তা পারব!

নারলেকার বেজায় খুশি। তারপর বলল, এ তো এক তাজ্জব জগতে এসে গেছি আমরা! ওই কাচের খাঁচায় সিংহ আর ইস্পাতের খাঁচায় ভেড়া!

পিন্‌ডিদা জানে কেন। সিংহের মগজে ভেড়ার মগজ চালান করা হয়েছে, আর ভেড়ার মগজে সিংহের। পিন্‌ডিদা স্পষ্ট বুঝেছে ভয়াবহ কোনও ষড়যন্ত্র করেছে অক্স-ডন্‌ ক্লাবের হুটেনটেটর—ডক্টর লেঁবোর সঙ্গে যোগসাজশে সে তার সর্বনাশ করার ব্যবস্থা করেছে। পাছে নারলেকারের কোনওরকম সন্দেহ হয় তাই পিন্‌ডিদা আর মগজ বদলের আলোচনার মধ্যে গেলই না।

নেবুচি কফি নিয়ে ফিরে এল। তার দিকে চেয়ে নারলেকার পিন্‌ডিদাকে ইংরেজিতে বলল, এখানে সবই অবাক ব্যাপার, নিগ্রোরা তালগাছের মতো লম্বা হয় অথচ এই লোকটা দ্যাখো কেমন বেঁটে বামন!

কফির ট্রে রেখে সঙ্গে সঙ্গে নেবুচি ফুঁসে উঠল, মুখ সামলে কথা বোল, আমার দুঃখের জায়গায় ঘা দিও না!

পিন্‌ডিদা আর নারলেকার দু'জনেই হতবাক। পিন্‌ডিদা জিগ্যেস করল, তুমি ইংরেজি জানো?

গম্ভীর মুখে নেবুচি বলল, জানি না, কিন্তু ডক্টর লেঁবো আমার মগজে এমন যন্ত্র বসিয়ে দিয়েছে

যে তাতে কথার ঘা পড়লেই সেটা আমার নিজের ভাষা হয়ে যায়।.....ডক্টর লেঁবো আমাকে ভালোবাসে, আমার জন্যে অনেক করে, কিন্তু এক ব্যাপারে সে-ই আমার চরম শত্রুতা করেছে, লম্বায় আমি প্রায় সাত ফুট ছিলাম, বার কয়েক মগজ অপারেশন করে সে আমাকে সাড়ে তিন ফুট বানিয়ে দিয়েছে—লজ্জায় আমি সে-জন্যে আর বাইরে বেরুতে পারি না, নিজের লোককেও আর মুখ দেখাতে পারি না!

নেবুচির দু'চোখ রাগে জ্বলতে লাগল। একটু বাদে ঠান্ডা হয়ে বলল, যাক, আমার অদৃষ্ট, ডক্টর লেঁবোকে যেন এ-সব কিছু বোলো না।

ভিতরে ভিতরে বেশি উত্তেজনা হলেই নারলেকার চান করে ফ্রেশ হয়ে নিতে চায়। পিন্‌ডিদাকে বলল, কৌতূহলে আমার মাথা ফেটে যাচ্ছে, বেশ করে স্নান করে আগে মাথা ঠান্ডা করে নিই। নেবুচিকে ডেকে বলতে সে তাকে স্নানের ঘর দেখিয়ে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে পিন্‌ডিদা তৎপর। এই ফাঁদ থেকে নিরাপদে বেরুতে হলে নেবুচির সাহায্য দরকার! ওর ব্যথার জায়গা জেনেছে, আর একটা বুদ্ধিও মাথায় এসেছে। তাকে ডেকে বলল, তুমি আবার আগের মতো লম্বা হতে চাও?

নেবুচি হাঁ। আবার একটু সন্দেহও।

পিন্‌ডিদা হাত ধরে টেনে তাকে পাশে বসাল। হুটেনটেটরের দেওয়া জার্নাল খুলে সেই কার্টুনটা বার করল। তালগাছের মতো লম্বা পিন্‌ডি আর পাশে বেঁটে খুদে পিন্‌ডি। কার্টুনের নিচে কী লেখা নেবুচি তো আর পড়তে পারে না। পিন্‌ডিদা কার্টুনের খুদে বেঁটে পিন্‌ডিদাকে দেখিয়ে বলল, এই দ্যাখো আগে আমি কিরকম ছিলাম। তাল গাছের মতো পিন্‌ডিকে দেখিয়ে বলল, আর এই দ্যাখো এখন আমি কি-রকম হয়েছি! তোমাকে লম্বা করে দেওয়া আমার কাছে জল-ভাত ব্যাপার।

উত্তেজনায় নেবুচি থরথর করে কাঁপছে। দুটো কার্টুনের সঙ্গেই পিন্‌ডিদাকে মেলাচ্ছে। কোনও ভুল নেই, একই লোক বেঁটে থেকে তালগাছের মতো লম্বা হয়েছে বটে। নেবুচি পিন্‌ডিদার পা দুটো জড়িয়ে ধরল, কাকুতি-মিনতি করে বলল, আমাকে তুমি আবার আগের মতো লম্বা করে দিয়ে বাঁচাও মিস্টার পা-গার্ড।

—ঠিক আছে, ডক্টর লেঁবো যেন ঘুণাক্ষরেও টের না পায়। আজ থেকে তিন দিন বাদে তুমি আমার স্যানটসের ওমুক হোটেলে চলে আসবে, আমি ব্যবস্থা করে দেব। কোনও চিন্তা নেই, ব্যাপারটা যেন ফাঁস না হয়।

আনন্দে গদগদ নেবুচি বলল, কেউ জানবে না, লম্বা হয়ে আমি আর ডক্টর লেঁবোর মুখও দেখব না।

—ঠিক আছে। ডক্টর লেঁবো কি মিস্টার পিন্‌ডিকে চেনে?

খানিক ভেবে নেবুচি জবাব দিল, চেনে না, ডক্টর লেঁবো তো বারো মাসে বারো দিনও এই জঙ্গল থেকে বেরোয় না, এই ক'দিন ধরে একটা লোকের সঙ্গে তার খাতির দেখছি.....আজ সকালে বেরুবার আগে আমাকে বলে গেছে মিস্টার পিন্‌ডি নামে একজন গ্রেট ফুটবলার আসবে, তার সঙ্গে আর একজন লোক থাকবে হয়তো, তুমি তাদের খাতির যত্ন করবে, আর দুপুরে লাঞ্চের ব্যবস্থা রাখবে।.....ডক্টর লেঁবোর এখানে মাঝে-সাজে লোক অসে, তাই আমি জিগ্যেস করলাম, মিস্টার পিন্‌ডি দেখতে কী-রকম? তাইতে ডক্টর লেঁবো বলল, আমি জীবনে কখনও ফুটবল খেলা দেখিনি, কেমন দেখতে জানি না, শুনেছি রোগা ঢ্যাঙা—যা-ই হোক, আজ পিন্‌ডি ছাড়া অন্য গেস্ট আসবে না, তাকে নিয়ে আসার জন্যে জিংগারোকে পাঠিয়ে দিও।

পিন্‌ডিদা মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। এবারে আমকে দেখাও তো ডক্টর লেঁবো কী-ভাবে মগজ অপারেশন করে?

নেবুচি তাকে একটা ঘরে নিয়ে এল। বলল, কী করে অপারেশন করে তুমি তো বুঝবে না,

অজ্ঞান অবস্থায় মানুষ বা জানোয়ারকে ওই মস্ত ক্যাপসুলটার মধ্যে ঢুকিয়ে এই অপারেশন টেবিলে রাখে। তারপর যেমন দরকার সে-রকম সুইচগুলো টিপে কাজ সারে—ছুরি কাঁচি ব্যান্ডেজের কোনও ব্যাপার নেই। লেসার বিম দিয়ে খুলি সরিয়ে যা দরকার তা তুলে নেয় আর যা দরকার তা বসিয়ে দেয়। তারপর আবার সুইচ টিপেই খুলি জুড়ে দেয়—যার অপারেশন হয় সে-ও কিছু টের পায় না।

স্তব্ধ হয়ে দেখার পর একটা সেলকে বড় দুটো কাচের শিশিতে ঠিক এক-রকম দেখতে কতগুলো বড়ি দেখতে পেল পিন্‌ডিদা। একটার গায়ে বড় ছাপার অক্ষরে লেবেল আঁটা, ন্যাচারাল এনার্জি স্টিমুলেটার, অন্যটার গায়ে লেখা—ডাইভারজেন্ট এনার্জি স্টিমুলেটার। অর্থাৎ ঠিক একরকম শিশির একই রকম দেখতে বড়িগুলোর বিপরীত গুণ। একটা হল, স্বাভাবিক এনার্জি উৎপাদক, অন্যটা অস্বাভাবিক বা উলটো-পালটা এনার্জি প্রবর্ধক।

পিন্‌ডিদা জিগ্যেস করল, এই ট্যাবলেটগুলো কী ব্যাপার?

নেবুচি বলল, এগুলো খুব মজার ব্যাপার—দেখাচ্ছি তোমাকে—তবে একটার বেশি নিতে পারব না, কারণ ডক্টর লেঁবো বলে রেখেছে স্যানটসের খেলার দিনে এই দুই শিশির ট্যাবলেটই অনেক লাগবে, বেশি খরচ কোরো না।

নেবুচি ডাইভারজেন্ট এনার্জি স্টিমুলেটারের ফায়াল থেকে একটা ট্যাবলেট বার করে পিন্‌ডিদাকে নিয়ে হল্‌ঘরে এল। ওটা গুঁড়ো করে ছোট খাঁচা খুলে দুটো গিনিপিগকে একটু একটু খাইয়ে দিল। হঠাৎ চাঙা হয়ে ও দুটো পাগলের মতো ঝাঁপাঝাঁপি করতে লাগল, বাইরে বেরিয়ে আসতে চায়। খাঁচা খোলা কিন্তু তবু বেরুবার পথ খুঁজে পাচ্ছে না। ভেড়ার মগজপোরা সিংহটার মুখে বাকি গুঁড়োটুকু গুঁজে দিতে লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করতে লাগল, আর খোলা দরজা দিয়ে বেরুতে না চেষ্টা করে অভঙ্গুর কাচের দরজা ভেঙে বেরুনোর চেষ্টা।

এরপর ল্যাবরেটারির জন্তু-জানোয়ারগুলো দেখাল নেবুচি। কোন্ জন্তুর ব্রেন-সেল-এ কী বসানো হয়েছে শোনাল। একটা হরিণের মগজে সাপের ব্রেন, সামনে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ফোঁস-ফোঁস শব্দ করে তেড়ে আসতে চাইল। আবার একটা বিষধর সাপের মাথায় খরগোশের মগজ। সামনে যেতেই ওটা পালাবার পথ খুঁজছে। এমনি হতবাক্ হবার মতো আর কত কী দেখালে নেবুচি।

তারপর একটু ক্লান্ত ভাব দেখিয়ে সোফায় বসে পিন্‌ডিদা বলল, আমাকে আর একটু কফি খাওয়াতে পারো নেবুচি?

—নিশ্চয়। সে কিচেনের দিকে চলে গেল।

পিন্‌ডিদা উঠে এক ছুটে ডক্টর লেঁবোর ল্যাবরেটারিতে। তাক থেকে ন্যাচারাল এনার্জির ফায়াল খুলে দুটো ট্যাবলেট নিয়ে নিজের পকেটে পুরল। তাপর সবগুলো ট্যাবলেট সামনের টেবিলে ঢেলে ডাইভারজেন্ট এনার্জি স্টিমুলেটারের বড়িগুলো ওই খালি ন্যাচারাল স্টিমুলেটারের লেবেল আঁটা শিশিতে ঢালল। আর ডাইভারজেন্ট স্টিমুলেটারের বড়িগুলো সব ন্যাচারাল স্টিমুলেটারের লেবেল আঁটা শিশিতে রেখে দিয়ে ছুটে এসে হল্-এর সোফায় বসল।

তার এক মিনিটের মধ্যে নেবুচি কফি নিয়ে হাজির। পিন্‌ডিদা জিগ্যেস করল, আচ্ছা নেবুচি, ব্রেনের কোথায় কী 'সেল' ডক্টর লেঁবো চেনেন কী করে?

নেবুচি জবাব দিল, ডক্টর লেঁবোর পক্ষে চেনা খুব সহজ। যে সেলটা সব থেকে বেশি পুষ্ট সেটাই তার স্পেশাল দোষ বা গুণের সেল। যেমন ধরো, মিস্টার পিন্‌ডি, তার সব থেকে পুষ্ট সেলটা ফুটবলের জিনিয়াসের সেল হবে। ডক্টর লেঁবো কিছুদিন আগে এক ষাঁড়-মুখো ভদ্রলোককে এ-রকমই যেন বোঝাচ্ছিলেন।

ষাঁড়-মুখো ভদ্রলোক! সে তো তাহলে নিশ্চয় অঝ্-ডন্ ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হুটেনটেটর। চেহারা

দেখে অনেকেই তো তাকে আড়ালে অস্ত্র-ডনের মিস্টার অস্ত্র বলে! পিন্‌ডিদার বুক দুরুদুরু।

নারলেকারের চান নয় তো স্নান-বিলাস। এক ঘণ্টা বাদে স্নান-পর্ব সেরে সে বেরুল। পিন্‌ডিদা সমঝে দিল, ভুলে যেও না, তুমিই কিন্তু ফুটবল স্টার মিস্টার পিন্‌ডি—আর আমি তোমার পা-গার্ড নারলেকার।

—তাই কখনও ভুলি, আমার প্রাণের মায়া আছে না! এখানে 'দি জার্নালিস্ট ইজ্ ডেড্'! তারপরেই হি-হি হি-হি হি-হি হাসি। হাসি আর থামেই না। —হোয়াট এ জোক্, আমি হলাম ফুটবল ওয়ারলড্ স্টার পিন্‌ডি আর তুমি কিনা আমার পা-গার্ড ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানির নারলেকার! ওয়ান্‌ডারফুল!

তারপর প্রস্তাব করল, চলো এবার কী আছে এখানে দেখা যাক্—

পিন্‌ডিদা গম্ভীর মুখে বলল, ডক্টর লেঁবো আসুক, সে তোমাকে খাতির করে সব দেখাবে। নেবুচি বলল, তার কাউকে কিছু দেখানোর এক্তিয়ার নেই।

অগত্যা নারলেকার ঘুরে ঘুরে নিজেই জন্তুগুলো দেখতে লাগল। যত দেখে ততো অবাক। আর ততো হাসি।

তাদের বিশ্রামের জন্যে চমৎকার একটা ঘর দেওয়া হয়েছে। সেই ঘরে আরামের শয্যায় শুয়ে পিন্‌ডিদা গভীরভাবে চিন্তিত। পিন্‌ডি হয়ে নারলেকারকে যদি ডক্টর লেঁবোর পাল্লায় পড়তেই হয় তাহলে তার বড় রকমের ক্ষতি কিছু হবে কি না। তার সব থেকে পরিপুষ্ট সেল কী?.....আদৌ সে ক্লাস ওয়ান জার্নালিস্ট, না নেহাত সাদা-মাঠা। তার ব্রেনে সেটা খুব একটা বড় প্রতিভার স্বাক্ষর হতেই পারে না। একবার ভাবল, ডক্টর লেঁবো আসার আগে এখান থেকে পালাতে চেষ্টা করলে কী হয়? তার পরেই মনে হল ওই ব্যাটা ড্রাইভার কী জঙ্গলের ধারে তাদের ছেড়ে দিয়ে এখনো বসে আছে! শাঠ্ আছে যখন, তাদের জঙ্গলে পাঠিয়ে নিশ্চয় পালিয়েছে। তবু বেড়াবার ছল করে নারলেকারকে ডেকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল, তারপর ইস্পাতের গেটের কাছে এসে পিছন ফিরে দেখল কেউ নেই। গায়ের জোরে ঠেলেও গেটটাকে এক ইঞ্চি নড়াতে পারল না। তক্ষুনি বুঝল ওটা খোলা বা বন্ধ করার কল বাংলোর ভিতরে।

এ-দিকে নারলেকার তখন বাগানের ফুল আর গাছ দেখে মুগ্ধ। একেবারে ভাব-রাজ্যে চলে গেছে সে। এত তন্ময় যে চারবার ডেকেও তার সাড়া পেল না। একটু বাদে দুটো বড় গোলাপ বাতাসে দুলে ঠোকাঠুকি খাচ্ছে দেখে হি-হি হা-হা করে হেসে সারা। পিন্‌ডিদাকে ডেকে বলে, দ্যাখো দ্যাখো পিন্‌ডি, গোলাপেরাও ষাঁড়ের মতো একটা আর একটাকে ঢুঁ মারছে!

পিন্‌ডিদা গম্ভীর। ধমকের সুরে বলল, হচ্ছে কি? এখানে পিন্‌ডি তো তুমি আর আমি তোমার পা-গার্ড! এরপর ভুল করেও আর আমাকে পিন্‌ডি বলে ডাকবে না—লেঁবোর বাংলোর দেয়ালেরও কান থাকতে পারে!

নারলেকার বলে উঠল, সরি পিন্‌ডি, সরি।

—ফের!

দু'জনে আবার বিশ্রামের ঘরে ফিরে এল। খুশি মুখে নারলেকার বলল, লন্ডনে ফিরে গিয়ে এবারে আমি পৃথিবীসুদ্ধ লোককে তাক লাগিয়ে দেব—কাগজের হেড জার্নালিস্ট হয়ে বসব—আধ-পাগলা ফিলসফার জার্নালিস্ট বলে ঠাট্টা করা বার করছি আমি। কানের কাছে মুখ এনে বলল, এর মধ্যে সবগুলো জন্তুর ছবি তুলে ফেলেছি, বুঝলে?

পিন্‌ডিদা আতঙ্কিত। —তোমার ক্যামেরা ব্রিফকেসের মধ্যে লুকিয়ে ফ্যালো শিগগির, লেঁবো ক্যামেরা হাতে দেখলে তোমার আর রক্ষা নেই—নেবুচি দেখেনি তো?

ঘাবড়ে গিয়ে নারলেকার মাথা নাড়ল, দেখেনি। তারপর ক্যামেরাটা তাড়াতাড়ি ব্রিফকেসে পুরে কাগজ চাপা দিল।

ঘড়িতে ঠিক একটা কুড়ি হতেই নেবুচি এসে খবর দিল, ডক্টর লেঁবো এসেছে, তোমরা হলঘরে এসো।

সে ফিরে যেতেই পিন্‌ডিদা চাপা গলায় বলল, মনে রেখো তুমি পিন্‌ডি, স্মার্টলি আগে আগে যাও। আমি তোমার পেছনে থাকব।

–হ্যালো হ্যালো হ্যালো! বলতে বলতে বেঁটেখাটো ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি ডক্টর লেঁবো নারলেকারকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল। –সো ইউ আর পিন্‌ডি দ্য গ্রেট! কাল বাদে পরশুর খেলায় কিং অফ কিংস্ হবে! হাঃ হাঃ হাঃ!

হাসিটা ব্যঙ্গের হাসির মতো লাগল ভাজা-মাছ উল্টে-খেতে না-জানা পিন্‌ডিদার। নারলেকার পরিচয় করে দিল, এ হল আমার ফ্রেন্ড–

–শুনেছি, নেবুচির মুখে সব শুনেছি, তোমার ফ্রেন্ড অ্যান্ড পা-গার্ড মিস্টার নারলেকার–দ্য ইনসিওরেন্স ম্যান।

হেলায় তার সঙ্গেও একবার করমর্দন করে নিল।

নারলেকার স্মার্ট মুখ করে বলল, তোমার ল্যাব দারুণ ইনটারেস্টিং ডক্টর লেঁবো, আমাকে একটু দেখাও শোনাও বোঝাও–

–ও শিওর! বাট লাঞ্চ ফার্স্ট, আই অ্যাম হাংরি, সো ইউ শুড বি–নেবুচি! লাঞ্চ রেডি?

তিন জনে গিয়ে একটা ছোট ঘরে ঢুকল। ডাইনিং টেবিলে খাবারের বউলগুলো দেখেই আর গন্ধ নাকে আসতে পিন্‌ডিদার জিভের জল মাটিতে পড়ে আর কী।

মিক্সড ফ্রাইড রাইসের সঙ্গে আট রকমের মাংসের প্রিপারেশন, স্যালাড আর পুডিং। এমন স্বাদের খাওয়া পিন্‌ডিদা জন্মে খায়নি। মাংসের টুকরোগুলো যেন মাখনের টুকরো। ভালো করে চিবুতে হয় না, আগেই গলে যায়। তাছাড়া মাটন আর মুর্গির মাংসের এত রকমেরও স্বাদ হয়! পিন্‌ডিদা জিগ্যেস না করে পারল না, মাংসের এমন প্রিপারেশন আর এত রকমের স্বাদ হয় কী করে ডক্টর লেঁবো?

–হুঁ-হুঁ-হুঁ, ডক্টর লেঁবোর মুখে রহস্যের হাসি, মিস্টার পা-গার্ড তুমি আর জগতের কতটুকুই বা জানো–আমার এখানকার সব রান্না সুইচ টিপে সোলার রে দিয়ে হয়–আর একই অ্যানিম্যালকে ভিন্ন-ভিন্ন ইনজেকশন দিয়ে আমি ইচ্ছেমতো তাদের মাংসের আলাদা আলাদা টেস্ট করি–বুঝলে মিস্টার পা-গার্ড?

পিন্‌ডিদা বোকা-বোকা মুখ করে মাথা নাড়ল। খেতে খেতে লক্ষ করছে ডক্টর লেঁবো তার ঝকঝকে চোখ দুটো তুলে নারলেকারের মাথাটা থেকে থেকে লক্ষ করছে। পিন্‌ডিদার মনে হলো একেই বোধহয় এক্স-রে আই বলে।

সব শেষে জলের স্বাদও এমন যে একটু খেলে আরও খেতে ইচ্ছে করে। অত ভরা পেটেও দেড় গেলাস করে জল খেল পিন্‌ডিদা আর নারলেকার। পেটে জায়গা থাকলে আরও খেত। ডক্টর লেঁবো কিন্তু এক ফোঁটাও জল খেল না।

অমন চমৎকার খাওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যে সমস্ত শরীরে অদ্ভুত আবেশ। শরীরটা যেন বাতাসে ভাসছে। ডক্টর লেঁবো বলল, তোমাদের দেখছি ঘুম পাচ্ছে, ঘরে গিয়ে একটু রেস্ট নিয়ে নাও, পরে কথা হবে।

নারলেকারও বলল, সেই ভালো, একটু বিশ্রাম করে তারপর তোমার ল্যাব্ দেখব।

ঘরে এসেই দু'জনে শুয়ে পড়ল। পিন্‌ডিদার মনে কেমন খটকা লাগছে, কিন্তু আর চোখ তাকাতে পারছে না।

চোখ তুলে পিন্‌ডিদা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে একটু অবাক। ঠিক সকালের মতো লাগছে। উঠে বসল। সকলের আলো, গাছের পাতায় পাতায় শিশির! ঘড়ি দেখল, ন'টা। তার

মানে! ঘড়িটা কি বন্ধ হয়ে গেল? কানে লাগাল। না ঠিক চলছে। কিন্তু সকাল ন'টা হবে কী করে—আর রাত ন'টা তো হতেই পারে না! নারলেকার এখনো বে-ঘোরে ঘুমোচ্ছে। পিন্‌ডিদার নিজের শরীরটাও দারুণ অবসন্ন লাগছে। মনে হচ্ছে কত কাল ঘুমোয়নি। নাকি এখনও জেগে স্বপ্ন দেখছে সে!

ঘরের দরজার সামনে নেবুচি এসে দাঁড়ল। পিন্‌ডিদা জিগ্যেস করল, ক'টা বেজেছে বলো তো নেবুচি?

—সকাল ন'টা বেজে দু'মিনিট। ডক্টর লেঁবো তোমাদের ঠিক সকাল ন'টায় তুলে দিতে বলে বেরিয়ে গেছে—জঙ্গলের বাইরে তোমাদের ফেরার গাড়ি অপেক্ষা করছে। আজ নাকি স্যানটসে মিস্টার পিন্‌ডির ক্লাবের কী বড় খেলা আছে—মিস্টার পিন্‌ডিকে জোরে ঝাঁকানি দিয়ে ডেকে দাও।

নেবুচি জানে নারলেকারই পিন্‌ডি। পিন্‌ডিদার দু'চোখ ছানাবড়া। এতক্ষণে ঘড়িতে ডেট দেখল। এ কী কাণ্ড! ঘড়িতে যে উনত্রিশ তারিখ। তারা এখানে এসেছে সাতাশ তারিখ সকালে! তার মানে টানা বিয়াল্লিশ ঘন্টা ঘুমিয়েছে তারা! কী সর্বনাশ!

তীক্ষ্ণ চোখে লোকটার দিকে তাকালো পিন্‌ডিদা। --নেবুচি, লম্বা হতে চাও তো সত্যি কথা বলো—ডক্টর লেঁবো কী করেছে, আমরা এতক্ষণ ঘুমোলাম কেন?

—পরশু লাঞ্চের পর তোমাদের ক্ষুধা-নিবারক ঘুমের ওষুধ মেশানো জল খাইয়েছে। তারপর মিস্টার পিন্‌ডিকে তুলে নিয়ে তার ব্রেন অপারেশন করেছে।

পিন্‌ডিদা সভয়ে নিজের মাথায় হাত দিল।

নেবুচি বলল, তোমার না, মিস্টার পিন্‌ডির বললাম তো!

—ও.....। পিন্‌ডিদা সামলে নিল। ঝুঁকে নারলেকারের মাথাটা দেখল। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

আশ্বাসের সুরে নেবুচি বলল, কিছুই না, দেড় মিনিটের অপারেশন, ব্রেনের দুটো পুষ্ট সেলের খানিকটা করে তুলে নিয়েছে শুধু।

.....বেচারা নারলেকার। নেবুচি চলে গেল।

ঠেলে-ঠুলে কোনওরকমে তোলা হলো নারলেকারকে। সে আরও ঘুমোতে চায়। পিন্‌ডিদা কয়েকটি ঝাঁকুনি দিয়ে তাকে সজাগ করল। তারপর চাপা গলায় বলল, শয়তান ডক্টর লেঁবো ওষুধ খাইয়ে দু'দিন ধরে আমাদের ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে, আজই স্যানটসের সেই খেলা, ওঠো শিগগির!

নারলেকার হাঁ।

—তোমার কেমন লাগছে?

—কেন, ফাইন, কেবল আরও ঘুমোতে ইচ্ছে করছে।

—আর ঘুমোয় না, তুমি শিগগির উঠে মুখ-হাত ধোও, এক্ষুণি বেরুতে হবে।

পিন্‌ডিদা ছুটে ঘর থেকে বেরুল। নেবুচিকে সামনে পেয়ে জিগেস করল, ডক্টর লেঁবো কোথায়?

—বোধহয় স্যানটসে, বলে গেছে আজ রাত্রে আর ফিরবে না। তোমাদের জন্যে জঙ্গলের বাইরে গাড়ি থাকবে।

পিন্‌ডিদা ছুটে ডক্টর লেঁবোর ল্যাবরেটারিতে গিয়ে ঢুকল। তাকের ওপর ন্যাচারাল এনার্জি স্টিমুলেটার বা ডাইভারজেন্ট এনার্জি স্টিমুলেটর-এর কোনও ফায়ালই নেই। পিন্‌ডিদা মনে মনে হেসে নিজের বুদ্ধির তারিফ করল। এ-রকম কিছু হবে আঁচ করেই ভিতরের ওষুধ পাল্টে রেখেছিল।

নেবুচি তাদের ব্রেকফাস্ট করে যেতে বলল, কিন্তু পিন্‌ডিদা আর কিছু স্পর্শ করতেও রাজি নয়। যাবার আগে নেবুচিকে লম্বা করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে দুজনে বেরিয়ে পড়ল। জিংগারো তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। ইস্পাতের গেট এবারে আপনি খুলে গেল। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে

জিংগারো তাদের নিয়ে চলল, এখন আর সে হাসছে না বা নাচছে না।

সত্যি একটা দামি লাক্সারি কার দাঁড়িয়ে আছে। অন্য ড্রাইভার। তারা উঠতে সেটা চলতে শুরু করল। নারলেকার বলল, আমার আবার ঘুম পাচ্ছে আর ভীষণ অবসন্ন লাগছে—ব্যাটা কী খাওয়াল!

পিন্‌ডিদারও একই দশা। কী মনে পড়তে পকেটে হাত ঢোকাল। সেই ন্যাচারাল এনার্জি স্টিমুলেটার ট্যাবলেট দুটো বার করে একটা নিজে খেল, নারলেকারকে দিল।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে দু'জনেই দারুণ চাঙা। গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে ছোটার মতো এনার্জি।

পিন্‌ডিদা তীক্ষ্ণ চোখে নারলেকারকে লক্ষ করছে। যেতে যেতে অনেক হাসির জিনিস আর চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য চোখে পড়ছে। সে-সব দেখেও নারলেকার আগের মতো হাসছে না, তন্ময় হচ্ছে না। নিবিষ্ট মনে ডক্টর লেঁবোর সম্পর্কেই আলোচনা করছে।

স্যানটসে পৌঁছনোর আগেই পিন্‌ডিদার স্পষ্ট ধারণা হল, ব্রেনসেল অপারেশনের ফলে নারলেকারের ভালো ছাড়া মন্দ হয়নি। তার পাগলাটে হাসি আর দার্শনিক তন্ময়তার পুষ্ট সেল দুটোই সরানো হয়েছে শুধু। সে এখন সিরিয়াস এবং স্বাভাবিক।

হোটেলে পৌঁছুতে ব্রেজিল ইলেভেনের ম্যানেজারের মেজাজ খাপ্পা। বলল, কোথায় কার অতিথি হয়ে তুমি খেলার দিন এসে পৌঁছুবে বলে খবর পাঠালে, আমি ভেবে সারা, অন্য প্লেয়াররাও নারভাস, ওদিকে হুটেনটেটর এমন করছে যেন চ্যালেঞ্জ জিতেই বসে আছে—যদি তাই হয় তোমার বিরুদ্ধে ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন্ নেব বলে দিলাম।

নির্লিপ্ত মুখে পিন্‌ডিদা বলল, আর যদি ওদের এগারো জনকে এগারোখানা গোল ঠুসে দিতে পারি তাহলে?

ম্যানেজার আনন্দে আটখানা। —তাহলে তোমাকে আমি এগারো দিন ধরে নেমন্তন্ন খাওয়াবো।

ম্যানেজারকে কী বলার ছলে, সে হুটেনটেটর পিন্‌ডিদাকে টেরিয়ে দেখল। জিগেস করল, দু'দিন কোথায় হাওয়া হয়ে গেছলে শুনলাম?

নিরীহ মুখে পিন্‌ডিদা বলল, হ্যাঁ, আমার মাথাটা এখনো কী রকম হাওয়ায় ভাসছে।

খিকখিক করে হাসতে হাসতে হুটেনটেটর চলে গেল।

বিকেলে খেলা শুরু হবার আধঘণ্টা আগে ব্যস্ত-সমস্ত ম্যানেজার এগারোটা ট্যাবলেট হাতে করে পিন্‌ডিদার কাছে এসে বলল, পিন্‌ডি এই দ্যাখো, এগুলো নাকি কোন্ বিরাট সায়েনটিস্টের তৈরি এনার্জি ট্যাবলেট, সে তার নিজের প্লেয়ারদের একটা করে দিয়ে মাঠে নামার আগে খেতে বলল, আর এগুলো আমাকে দিয়ে বললে, আমি নিরপেক্ষ স্পোর্টসম্যান, এই এনার্জি ট্যাবলেট তোমার প্লেয়ারদেরও একটা করে খাইয়ে দিতে পারা—কী করব?

পিন্‌ডিদা ট্যাবলেটগুলো হাতে নিয়ে দেখল। মনে খুশি ধরে না। ওদের দলের খেলোয়াড়দের নিশ্চয় ন্যাচারাল এনার্জি স্টিমুলেটার লেবেল-আঁটা শিশি থেকে ডাইভারজেন্ট এনার্জি স্টিমুলেটার ট্যাবলেট খাইয়েছে, আর এগুলোই আসল ন্যাচারাল এনার্জি স্টিমুলেটার ট্যাবলেট। শিশির ট্যাবলেট বদলে রাখার জন্যে আবার নিজের বুদ্ধির তারিফ করল পিন্‌ডিদা। গম্ভীর মুখে বলল, এগুলো আমার কাছে থাক, ওদের দেওয়া কোনও জিনিস আমাদের প্লেয়ারদের খাবার দরকার নেই।

পিন্‌ডিদা জানে ভুল করে ন্যাচারালের নামে ডাইভারজেন্ট এনার্জির ট্যাবলেট খেয়ে অস্ক্র-ডনের খেলোয়াড়রা এমনিতেই মাঠে নিজেদের মধ্যে দক্ষযজ্ঞ বাধাবে, আর হেরে মরবে। মাঝখান থেকে এমন দুর্লভ ট্যাবলেটগুলো খরচ হয় কেন! তবু সাবধানের মার নেই, চুপিচুপি একটা ট্যাবলেট আগে নারলেকারকে খাওয়াল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সে স্বাভাবিক এনার্জিতে টগবগ করতে লাগল। তার হাসির রোগ দার্শনিকতার রোগ তো আগেই সেরেছে, সে বলল, পিন্‌ডি, মনে হচ্ছে মাঠে নামিয়ে দিলে আমিও একটা কিছু করতে পারি।

নিশ্চিন্ত হয়ে পিন্‌ডিদা নিজে একটা ট্যাবলেট খেয়ে বাকিগুলো নিজের কিট-ব্যাগে রেখে দিল। খেলা শুরু। স্টেডিয়াম ফুল। বাইরেও লাখখানেক লোক।

কিন্তু দু'মিনিট না যেতে দর্শকের চোখ ছানা-বড়া। এ কী কাণ্ড করছে অক্স-ডনের মস্ত খেলোয়াড়রা! ষন্ড বিক্রমে তারা নিজেদের দলের কাছ থেকেই বল কেড়ে নিচ্ছে, বিপক্ষ দলের লোককে পাস্ করছে! বীরবিক্রমে এক-একবার গোলের কাছে বল নিয়ে গোল-পোস্টের উলটো দিকে বল মেরে বসছে! একবার তাদের ব্যাক তেড়ে-ফুঁড়ে দারুণ শট নিয়ে নিজেদের গোলকিপারকেই গোল খাইয়ে দিলে। ফলে নিজেদের মধ্যেই হাতাহাতি, মারামারি। এদিকে পিন্‌ডিদার পায়ে বল পড়লে পাঁচ ছ'টা প্লেয়ারকে কাটিয়ে একটার পর একটা গোল করে চলেছে। অক্স-ডন সতেরো মিনিটের মধ্যে চার গোল খেয়েছে। ম্যানেজার হুটেনটেটর পাগলের মতো নিজের মাথার চুল ছিঁড়ছে। কোচ দুটো প্লেয়ার বদল করেছে। মাঠে নেমে তাদেরও একই আচরণ। অক্স-ডন্ একটা পেনালটি পেল। কিন্তু বল সাজিয়ে তাদের স্ট্রাইকার গোল-পোস্টের বিশ গজ দূর দিয়ে বল বাইরে পাঠিয়ে গোল বলে নেচে উঠল!

লোকে খেলা দেখবে কী, হুই-হুল্লোড় কাণ্ড। তারা যেন পাগলা-গারদের ব্যাপার দেখছে এক পক্ষের। অন্য দিকে পিন্‌ডিদা একে একে ছ'গোল দিয়েছে। সেম-সাইড গোল নিয়ে হাফ-টাইমের আগে তার ব্রেজিল ইলেভেন সাত গোলে জিতছে। তার পরেই অক্স-ডনের খেলোয়াড়রা নিজেদের মধ্যে হাতাহাতি মারামারি বক্সিং শুরু করে দিল। রেফারি আর খেলা চালাতেই পারল না। কারণ অক্স-ডনের কারও মাথা ফেটেছে, কারও দাঁত ভেঙেছে, কারও বা নাক। রেফারি সামাল দিতে এলে এক ধাক্কায় তাকেই তারা মাটিতে ফেলে বুকে চেপে বসল। পুলিশ এসে তাকে উদ্ধার করল।

খেলা ভন্ডুল। দর্শকরা সকলেই উদ্‌ভ্রান্ত। ফুটবল খেলার ইতিহাসে এমন কাণ্ড কেউ দেখেনি বা শোনেনি। পুলিশ লাঠি বেয়নেট রিভলবার নিয়ে নেমে পড়তে পালাবার হিড়িকে দর্শকদের মধ্যেও লণ্ডভণ্ড কাণ্ড। কারও হাত ভাঙছে, কারও পা ভাঙছে, কেউ বা পায়ের নিচে চাপা পড়ে চোখ উলটে দিচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত পুলিশ-পর্ডনে অক্স-ডনের খেলোয়াড়দের টেন্টে নিয়ে আসা হল। তখন তারা ওই পুলিশদেরই ফুটবল ভেবে শট্ হাঁকাতে চেষ্টা করছে, আর রুলারের গুঁতো খাচ্ছে। অন্যদিকে পিন্‌ডিদার দলও পুলিশ-বেষ্টনির মধ্য দিয়ে নিজেদের টেন্টে এসেছে। হাফ-টাইমের মধ্যে সাত গোলে জিতেও তাদের ম্যানেজারের চক্ষু কপালে। ছুটে এসে পিন্‌ডিদাকে জিগ্যেস করল, পিন্‌ডি এ কী ব্যাপার তুমি কি কিছু বুঝতে পারছ?

তার ভয় ধরেছে, দু'দিন অনুপস্থিত থেকে পিন্‌ডিদাই কিছু করে এমন ব্যাপার ঘটালো কিনা যা ধরা পড়লে তার দল বিপন্ন হতে পারে। গম্ভীর মুখে জবাব দিল নারলেকার। এত বড় ঘটনা দেখেও সে আর হি-হি করে হাসছে না। বলল, পিন্‌ডি জানবে কী করে, দু'দিন ধরে সমস্তক্ষণ আমি তো তার সঙ্গেই ছিলাম।

—তাহলে অক্স-ডনের সবগুলো প্লেয়ার মাঠে নেমেই অমন পাগল হয়ে গেল কী করে!

অন্য দিকে তাকিয়ে পিন্‌ডিদা বলল, হুটেনটেটরর অতি চালাক কিনা তাই তার গলায় দড়ি।

হুটেনটেটর লোকটা এই ব্যাপারের পর আধা পাগলই হয়ে গেছে। সে ঘোষণা করল, এই খেলা বরবাদ—সমস্ত ব্যাপারটার আগে ইনভেস্টিগেশন হবে—কিং অফ কিংস গোল্ড-কাপ টুর্নামেন্ট পোস্টপোন্‌ড্ সাইন ডাই!

কিন্তু রাতের মিলিত ডিনার পার্টি তা বলে বাদ গেল না। পিন্‌ডিদাদের সাত-তারা হোটেলেই দু'পক্ষের ডিনারের আসর বসল। দূরে বসে সেই থেকে ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি বেঁটে-খাটো অনন্য বৈজ্ঞানিক ডক্টর লেঁবো জুলজুল করে পিন্‌ডিদাকে দেখছে। আর মাঝে মাঝে হুটেনটেটরের কানে

কানে বলছে কিছু। হুটেনটেটর কটমট করে পিন্‌ডিদার দিকে তাকাচ্ছে। ওদিকে অক্স-ডনের খেলোয়াড়দের সম্বিত ফিরেছে। কেউ মাথায় ব্যান্ডেজ করে, কেউ নাকে ঠোঁটে থুতনিতে লিউকোপ্লাস্ট এঁটে মাথা নিচু করে ডিনার খাচ্ছে।

কিন্তু পিন্‌ডিদার চোখ কেবল ডক্টর লেঁবোর দিকে। ফিসফিস করে নারলেকার বলল, দ্যাখ, ডক্টর লেঁবোকে মনে হচ্ছে নিজের মগজ অপারেশন করে বেবুনের মগজ ঢুকিয়েছে।

নারলেকার এখন স্বাভাবিক মানুষ। শুনে হি-হি করে হাসল না। বলল, আমি তো এখন কিছুই বুঝতে পারছি না, এ-রকমটা হলো কী করে! দু'তিন নিজের বাংলোয় আমাদের অজ্ঞান করে রেখে সে কী করল?

পিন্‌ডিদা বলল, সবুর বন্ধু সবুর, পরে সব বুঝবে। দু'দিন ওই অজ্ঞান হয়ে থাকার ফলেই অদূর ভবিষ্যতে তুমি বোধহয় তোমাদের কাগজের হেড্ জার্নালিস্ট হয়ে বসবে।

ডিনারের পর পিন্‌ডিদা হাসিমুখে সোজা গিয়ে ডক্টর লেঁবোর কাছে উপস্থিত। বলল, সত্যি ডক্টর লেঁবো, পৃথিবীর তুমি একজন অত্যাশ্চর্য সায়েনটিস্ট, তোমার তুলনা নেই। তবে তোমার সামান্য একটু ভুল হয়ে গেছল। তোমার যদি আমাদের এপিক রামায়ণের মারীচ-বধ চ্যাপ্টারটা ভালো করে পড়া থাকত, তাহলে জঙ্গল থেকে আমাদের তোমার ল্যাবরেটারিতে নিয়ে যাবার জন্যে জিংগারোকে পাঠাতে না। জিংগারোর ছলা-কলা দেখা-মাত্র বুঝেছিলাম তুমি ফাঁদ পেতেছ, ওয়েল, আই উইল রিমেম্বার ইউ, গুড-নাইট!

ডক্টর লেঁবো ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। নারলেকারকে নিয়ে পিন্‌ডিদা চলে এল।

পরদিন সকালের প্লেনেই ফেরার জন্য তাড়াহুড়ো করে গোছগাছ করতে লাগল। নারলেকার দু'তিন বার বলল, যাবার জন্য এত ব্যস্ত হয়েছ কেন—খাসা আরামে আরো দুটো দিন কাটিয়ে যাই, সব দেখি শুনি—তোমার এখন জয়-জয়কার, ফিরে আর কি তোমার নাগাল পাব!

শেষে পিন্‌ডিদা বলল, প্রাণে বাঁচতে চাও তো চটপট সকালেই পালাই চল—লম্বা হবার জন্য নেবুচি এখানে হানা দেবে—

নারলেকার হাঁ। —লম্বা হবার জন্যে নেবুচি এখানে হানা দেবে মানে!

—আঃ! তোমরা জার্নালিস্টরা সবেতেই কেবল মানে খুঁজে বেড়াও! যা বলছি তাই শুনেই এখন চটপট তোমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও—আজ সকালের মধ্যেই হটকান দিতে না পারলে খুব বিপদ জেনো।

গল্প শেষ করে পিন্‌ডিদা নির্লিপ্ত মুখে দূরের আকাশের দিকে চেয়ে রইল।

আমি কেবলু কার্তিক চটপটি এমন কি হাবুলও হতভম্বের মতো বসে। চোখ চাওয়া-চাওয়ি করছি।

পনেরো বিশ সেকেন্ড বাদে আমিই প্রথম বলে উঠলাম, তোমার একটু পায়ের ধুলো নেবে পিন্‌ডিদা?

পিন্‌ডিদা একটু ঘোরালো চোখে তাকালো আমার দিকে। ঠোঁটের হাসি গিলে খেঁকিয়ে ওঠার সুরে বলে উঠল, আমি ফুরিয়ে যাচ্ছি, না আমার পায়ের ধুলো ফুরিয়ে যাচ্ছে?

গম্ভীর মুখে উঁচু ঢিবি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে এগল।—চল্‌রে হেবো।

হেবো হোঁতকা ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গ নিল। আমরা বাকি চারজন আবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি।

# পিন্‌ডিদা : হেভিওয়েট্ ফুটবল

ব্যাপারখানা বোঝা যাচ্ছে না। দু'দুনি ধরে পিন্‌ডিদাকে লক্ষ করছি, বেশ যেন খোশমেজাজে আছে। তার পেটে রসদ জোগাতে না পারলে এমন মেজাজ বড় দেখা যায় না। আর সেটা করতে হলে সদা-সর্বদা আমার পকেটই ফাঁক হয়ে থাকে। দু'দিনই পিন্‌ডিদা একটু দেরি করে পান চিবুতে চিবুতে এল, হাসি হাসি মুখে তার উঁচু ঢিবির আসনে বসল, হাসি-ছোঁয়া চোখ দুটো ঘুরে ফিরে আমার মুখখানাকেই টারগেট করে যেন মজা পাচ্ছে। গতকাল দুই একবার বিলিতি শিস কানে এসেছে, আজ থেকে গুনগুন করে ব্রেজিলের গান ভাঁজছে কিনা বুঝলাম না।

গতকাল জিগেস করেছিলাম, পান চিবুতে চিবুতে এলে পিন্‌ডিদা, তার আগের পর্বটি তাহলে বেশ ভালোই হয়েছে কোথাও?

মিষ্টি করে জবাব দিয়েছে, হয়েছে তো, এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা, জোর করে শ্বশুরবাড়িতে ধরে নিয়ে গিয়ে বেশ খাওয়াল-টাওয়াল।

মনে মনে ভাবলাম, তা না হলে এই মেজাজ! তবু খটকা লাগল, আজ পর্যন্ত আমিও তো কম খাওয়াইনি, কিন্তু খাওয়ার পরে এরকম ফুর্তি-ফুর্তি ভাব কখনও দেখেছি? চিমড়ে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে কখনও শিস বেরুতে দেখেছি? তাহলে খাওয়ার ওপর দিয়ে যায় এমন কি রসের যোগ থাকতে পারে?

সংস্কৃত বিশারদ কেবলু কিলবিল করে উঠেছে, কস্য শ্বশুরালয় পিন্‌ডিদা?

না রেগে পিন্‌ডিদা মজা করেই জবাব দিয়েছে, ন তস্য।

শুনে পিন্‌ডিদার মোসায়েব হাবুল হোঁতকার হাসির চোটে কাশি।

আজও একটু দেরি করে হাসি হাসি মুখে পান চিবুতে চিবুতেই এল। বসার আগেই আমি বলে উঠলাম, আজও সেই পুরনো বন্ধু আর তার শ্বশুরবাড়ি?

আসন নিয়ে একটু অপ্রস্তুত মুখ করে পিন্‌ডিদা জবাব দিল, ও তোদের কাল বলিনি বুঝি? আজ তো ওই বন্ধুর শ্বশুরবাড়িতে আমার চায়ের নেমন্তন্নই ছিল.....জব্বর খাওয়ালে।

পিন্‌ডিদা জব্বর খেয়েছে হেবো-হাতিটার তাইতেই তৃপ্তি। ঠেসের চোখে একবার আমার মুখে ঝাপটা মেরে তোয়াজের সুরে বলল, তাহলে তোমার খুব উদার বন্ধু বলতে হবে পিন্‌ডিদা, বন্ধুকে দেখলেই আগে পকেট সামলাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে না।

অর্থাৎ আমি ব্যস্ত হয়ে পড়ি। একদিন দু'দিন নয়, আমার পকেটের ওপর দিয়ে যে বারো মাস হামলা হচ্ছে সেটা কিছু নয়! আমি চিড়বিড় করে উঠলাম, কথা যদি বলতেই হয় অমন বোকার মতো বলিস না হেবো, শুনছিস পিন্‌ডিদার আগের দিনের খ্যাট পরের দিনের নেমন্তন্ন দুটোই বন্ধুর শ্বশুরবাড়িতে—আর তুই বন্ধুকে উদার দেখে ফেললি! তোর শ্বশুরবাড়ি যদি বরাতজোরে উদার হয় তাহলে তোকেও উদার বলতে হবে?

হাবুল হোঁতকা খাপ্পা হয়ে ওঠার আগেই ওর মহাগুরু স্বয়ং পিন্‌ডিদা হেসে তারিফ করতে চুপসে গেল। —যা বলেছিস সোনা, ওটার মাথায় যে কী আছে! তোর এত বুদ্ধি, চেষ্টা-চরিত্র করে ওর মগজে কিছু গ্রে-ম্যাটার—মানে সাদা পদার্থ ঢোকাতে পারিস না?

চটপটি চটপট আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে হেবোর কানে হ্যাঁকা দিয়ে পিন্‌ডিদার কানে মধু ঢালল। —তুমিই পারলে না পিন্‌ডিদা, সোনা বা আমরা কোন্ ছার!

মুচকি হেসে পিন্‌ডিদা পান চিবুতে চিবুতে একবার সরু ঘাড় উঁচিয়ে পড়ন্ত বিকেলের আকাশে হয়ত কোনো অজানা পাখিই খুঁজল। ঘাড় নেমে এল, হাসি-ছোঁয়া দু'চোখ মাঠের শেষের শতেক

ঝুরি বার-করা বিরাট অশ্বত্থ গাছটার দিকে। তারপরেই আমি অবাক আর উৎকর্ণ, চটপটি কেবলু কার্তিক, এমন কি হাবুলও সচকিত। পিন্‌ডিদার গলা দিয়ে গুনগুন গান বেরুচ্ছে।

গতকাল শিস, আজ গান!

যদিও কোন ভাষায় গান বোঝা যাচ্ছে না।

চটপটি আমি কেবলু কার্তিক মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। গান না গলা দিয়ে মটর কড়াই কিছু বেরিয়ে বোঝার চেষ্টায় মোটা শরীর নিয়ে হাবুল যতটা সম্ভব ঝুঁকে দেখতে চেষ্টা করল। শরৎবাবু মানে শ্রীকান্ত, কাবুলিঅলাও গান গায় দেখে বিষম অবাক হয়েছিল, পিন্‌ডিদাও গান গায় শুনে আমরা কী তার থেকে কম অবাক কিছু?

আবারও আমার কালকের সেই কথাই মনে হল। দু'দিন ধরে বন্ধুর শ্বশুরবাড়িতে কেবল খাওয়াটাই নয়, তার সঙ্গে বাড়তি রসের যোগ কিছু আছেই।

যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল তেমনি হঠাৎ গান থেমে গেল। স্নেহ মাখা দু'চোখ আমার দিকে ঘুরল। গলার স্বরও মধু-মধু। –হ্যাঁরে সোনা, তোর বাবা-মা, মানে আমাদের পূজনীয় মেসোমশাই আর মাসিমা কেমন আছেন?

হঠাৎ বাবা-মায়ের খোঁজ কেন ভেবে পেলাম না। –ভালোই তো.....

–আর আমার ঠাকুমা-যশোদা?

পিন্‌ডিদাকে দেখলেই ঠাকুমা গোপাল গোপাল করে অস্থির, নাতির বন্ধু নাতি সম্পর্ক, তাই তার কথা উঠলে পিন্‌ডিদা মা-যশোদা না বলে ঠাকুমা-যশোদা বলে। বাবা-মা থেকে ঠাকুমা পর্যন্ত এসে যেতে কেন যেন একটু সতর্ক হওয়া দরকার ভাবলাম। ঠাকুমা-বুড়ি গোপাল বলতে অজ্ঞান, পিন্‌ডিদা এখন সেটা খুব ভালো করেই জানে। যে কোনও ছুতোয় তার কাছ থেকে খাওয়া আদায় কর এখন জল-ভাত তল করার মতোই সহজ। বললাম, আছে এক-রকম, তবে বয়েস হয়েছে, এটা-ওটা লেগেই আছে!

চটপটির কৌতূহল চাপার ধৈর্য কম, জিগেস করে বসল, হঠাৎ সোনার বাবা-মা-ঠাকুমার খবর নিচ্ছ কেন পিন্‌ডিদা?

পিন্‌ডিদার চিমড়ে ঠোঁটে সত্যি মিষ্টি হাসি। পেটে অর্ধেক মুখে অর্ধেক গোছের জবাব দিল, তাঁদের অনুমতি ছাড়া এখান থেকে নড়ার প্রশ্ন ওঠে? একবার যেতে হবে.....

নড়ার কথা শুনেই আমাদের চক্ষু ছানাবড়া। সবার আগে মোটা হাবুল ককিয়ে উঠল, তুমি আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছ পিন্‌ডিদা?

সস্নেহ ধমকের সুরে পিন্‌ডিদা বলল, তুই যে মেয়েছেলেরও অধম দেখছি–গেলে কাঁদবি?

সঙ্গে সঙ্গে কেবলুর গলা দিয়ে সংস্কৃত-মিশল আর্তনাদ বেরিয়ে এল, কুত্র চলে যাচ্ছ পিন্‌ডিদা–কুত্রঃ!

একটু ঢঙের সুরে পিন্‌ডিদা জবাব দিল, পাটলিপুত্রঃ!

পিন্‌ডিদার চলে যাবার নামে এমনি ভেবাচাকা খেয়ে গেছি যে শব্দটা কানে ঢুকলেও সেই মুহূর্তে মাথায় ঢুকল না। দুই-এক মুহূর্ত পরে আমাদের মধ্যে স্বল্পভাষী কার্তিক বিড়বিড় করে বলল, পাটলিপুত্র....সে-তো পাটনা!

--আজ্ঞে, তোরও মাথার সাদা পদার্থ কাজ করছে।

তবু জিগেস করলাম, পাটনা যাবে?

--হ্যাঁ, এখানে আর একঘেয়ে ভালো লাগে–তোরাই বল্?

বুঝতেই পারছি। বললাম, দু'দিন ধরে শ্বশুরবাড়ি খাওয়াচ্ছে, তোমার এই বন্ধুটি পাটনায় থাকে?

মুচকি হেসে জবাব দিল, ঠিক ধরেছিস তো! যাবার জন্যে খুব ধরেছে–

আমার শুধু অভিমান হচ্ছে না, রাগও হচ্ছে। এতদিন ধরে আমরা--আমরা বলতে আমিই এত

করছি, আর দু'দিন ভালো-মন্দ খাইয়ে ডাকল বলে ওমনি অমাদের ছেড়ে পাটনা চলে যাচ্ছে! .....অবশ্য এই বন্ধুও পিন্‌ডিদার কদর জানে বলেই এভাবে ডাকছে নিশ্চয়।

হাবুল এবার ভেঙেই পড়ল, আমাদের ছেড়ে তুমি একেবারে চলে যাচ্ছ পিন্‌ডিদা?

পিন্‌ডিদার পান-খাওয়া ঠোঁটের হাসিতে টান ধরল একটু। বক্র চোখে আমার দিকে চেয়ে বলল, ওর বুদ্ধি দেখেছিস? উঠে মাথায় একটা গাঁট্টা বসা না!

শুনে মনে মনে আমি একটু আশান্বিত। জিগেস করলাম, তুমি কবে যাচ্ছ আর কদ্দিনের জন্যে যাচ্ছ?

পিন্‌ডিদা এবারে খানিক হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে রইল। –তোদের সব হল কী আজ? শুধু আমি যাচ্ছি–তোরা যাচ্ছিস না? তাহলে তোরা বাবা-মা-ঠাকুমার কাছে পারমিশন নিতে যাবার দরকার কী আমার? আমি কি তোর মতো সোনা না মরচে-ধরা পেতল–যম-দোরে যেতে হলেও কারও পারমিশনের দরকার আছে? বন্ধু কালই চলে যাচ্ছে, আমরা কবে যাচ্ছি সেটা পরামর্শ করে ঠিক করতে হবে, আর ক'দিনের জন্য যাচ্ছি সেটা এখান থেকে বলা যায়? তবু এক সপ্তাহ.....না, দু'সপ্তাহই ধরে রাখা ভালো।

আমরা পাঁচ মূর্তি হাঁ একেবারে। প্রথমে হুঁশে এল চটপটি। তিড়িং করে উঠে হেবো-হোঁতকাকে হাত ধরে টেনে তুলল, তারপর দুজনে জড়াজড়ি করে নেচে নিল একপ্রস্থ। কেবলু বলে উঠল, কিম্ আশ্চর্যম–হৃদয়ে বহতি ফুর্তিস্য ধারা! পিন্‌ডিদা ত্বং হি তব তুলনাঃ!

পিন্‌ডিদা হাসিমুখেই খেঁকিয়ে উঠল, আর কান ঝালাপালা করিস নাঃ!

আমি ঘর-পোড়া গোরু, খরচের চিন্তাটাই বিদ্যুতের মতো মাথায় ঘা বসিয়েছে। কিছু বলার আগে কার্তিক জিগেস করল, এখানকার শ্বশুরবাড়ির বন্ধু আমাদের সুদ্ধু নেমন্তন্ন করেছে?

–তা না হলে সকলে মিলে যাওয়ার কথা ওঠে?

এবারে আমি বোঝাপড়ায় নামলাম। আগে মতলব বোঝা দরকার, পরে ফেঁসে যেতে রাজি নই। বললাম, আমাদের ছ'ছটা লোকের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা সব তোমার বন্ধুর ওখানে?

পিন্‌ডিদার পালটা তেরছা প্রশ্ন, তাই যদি হয় তোর আপত্তি আছে?

–তা ঠিক না.....তোমার না হয় খুব বন্ধু, কিন্তু আমরা পাঁচ-পাঁচটা লোক চিনি না, জানি না, তার ঘাড়ে চেপে বসতে যাচ্ছি....যে আকাল পড়েছে, একজনের চারবেলা খাওয়া সারতেই কত খরচ–

পিন্‌ডিদার চাউনিটা আমার ভিতরে সেঁধিয়ে যেতে লাগল। তারপর গম্ভীর গলায় জবাব দিল, আমরা ঘাড়ে চেপে বসতে যাচ্ছি বিহার গভর্মেন্টের খোদ পুষ্যিপুত্র ডিপার্টমেন্টের– সাতদিন বা দশদিন বা পনেরো দিনের জন্য থাকতে যাচ্ছি তাদের হাল-ফ্যাশানের ক্লাব-হাউসে–আমাদের ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ ইভনিং টি আর ডিনারের ব্যবস্থা সেই ক্লাব-হাউসের দ্রোপদী-খানায় অর্থাৎ ক্যানটিনে, যেখানে পনেরো টাকার খাবার পাঁচ টাকায় মেলে–আর সেই পাঁচ টাকার হিসেবটাও চলে যাবে আমার বন্ধুর ভি. আই. পি. অতিথি আপ্যায়নের অ্যাকাউন্টে–এত বড় আনন্দের খবরটা পেয়েও টাকার চিন্তায় ঝেড়ে কাশতে পর্যন্ত পারছি না, ভাবছিস পিন্‌ডিদা মাসিমা-মেসোমশায় আর ঠাকুমা-যশোদার কাছ থেকে টাকা খসিয়ে মজা লোটার তালে আছে!

আনন্দের খবর শুধু নয়, এমন তাজ্জব আনন্দের খবর শোনার পরেও সকলের চোখ থেকে একটু-আধটু ধিক্কার আমার মুখের ওপর ছিটকোবে না এমন আশা করা যায় না। কেবলু বিড়বিড় করে বলল, ক্ষমা হি পরমং তপো পিন্‌ডিদা, মাপ করে দাও.....। আর হোঁতকা হাবুল কেবল চোখের দৃষ্টি দিয়ে নয়, গলা দিয়েও দুটো ধিক্কারের ঘোঁত্ ঘোঁত্ শব্দ বার করে ফেলল।

পিন্‌ডিদার দু'চোখ এখনও আমার ওপর চড়াও হয়ে আছে। বলল, নেহাত ছ'ছটা বাউন্ডুলে গাঁট-ছড়া বেঁধে বসে আছি, আর একটু পাব্‌লিসিটির জোর থাকলে যাতায়াতের ট্রেন ভাড়াও লাগত না–বুঝলি?

এতখানির পরেও ফের আমি সতর্ক। মিনমিন করে বললাম, ট্রেন ভাড়া আমাদের ব্যাঙ্কের ক্লাব-ফান্ড থেকে তুলবে?

—না তো কি আমার ট্যাঁকে দু'চারটে গৌরী সেন গোঁজা আছে?

বলতে বলতে পিন্‌ডিদা চোঙা-প্যান্টের এক পকেট থেকে পাশ-বইয়ে গোঁজা চেক-বই আর অন্য পকেট থেকে এক টাকা দামের ডট্ পেন বার করল। আমরা অবাক হতবাক এবং পুলকিত হয়ে দেখছি পিন্‌ডিদার হাতে সত্যিই ওটা পিন্‌ডি অ্যান্ড কোম্পানির চেক-বই! (ক্লাব-ফান্ডের রোমাঞ্চকর হদিস পেতে হলে 'লিডার বটে পিন্‌ডিদা' আর 'পিন্‌ডিদার পঞ্চবাণ' থেকে 'পিন্‌ডিদা ও মা উৎকোচেশ্বরী' পড়ো।)

ওই পাশ-বই খুললেই দেখা যাবে ওতে ক্লাবের নামে তিন হাজার পাঁচশ সতেরো টাকা উনিশ পয়সা জমা পড়ে আছে। আজ পর্যন্ত পিন্‌ডিদা ওর থেকে এক কপর্দকও তুলতে দেয়নি। তুলতে গিয়ে আমি পিন্‌ডিদার কাছে নাজেহাল হয়েছি, কতবার না তার বুদ্ধির কাছে হেরে বুদ্ধু বনে ঘরের টাকা গচ্চা দিয়েছি। আজ পিন্‌ডিদা কিনা টাকা তোলার জন্যে সেই চেক-বই আর কলম হাতে করে নিয়ে এসেছে! একটু আগে ট্রেন ভাড়ার কথায় সতর্ক হবার জন্যে নিজেকেই আমার ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করছে।

চেক-বই আর কলম আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে পিন্‌ডিদা বলল, আমার সই করাই আছে, নিচে তুই সই কর, কত তোলা হবে ঠিক করে টাকার অঙ্কটা বসিয়ে নে....ভাবছি কালকের মধ্যেই টাকাটা তুলে ফেলি, যদি শনিবার নাগাদ রওনা হওয়া যায়।

আজ সবে সোমবার। চটপট সই করে দিলাম। আমার আর পিন্‌ডিদার জয়েন্ট সিগ্‌নেচারে টাকা উঠবে। এখন প্রশ্ন, কত টাকা তোলা হবে। পিন্‌ডিদার নিস্পৃহ মন্তব্য, মেইলে গেল বছরেও সেকেন্ড ক্লাসের ভাড়া ছিল বিয়াল্লিশ টাকা, এখন তো নিত্যি ভাড়া বাড়ছে, পার-হেড পঞ্চাশ টাকাই ধর—তাহলে প্রত্যেকের যাতায়াতে একশো টাকা, ছ'জনের ছশো টাকা.....আমার তো মনে হয় আটশো টাকা তুললেই হয়ে যাবে।

এমন এঁটে-সেঁটে টাকা নিয়ে বেরুন আমার একটুও পছন্দ নয়, কেবলু কার্তিক চটপটিরও পছন্দ হবার কথা নয়। কিন্তু হাবুল আগেভাগে সায় দিয়ে বসল, খুব, খরচ যখন নেই, যথেষ্ট হবে।

আমি কটমট করে ওর দিকে তাকাতে কার্তিকই প্রথম একটু সংশয়ের সুর তুলল, ওখানে গিয়ে তো আর ক্লাব-হাউসে বসে থাকব না.....সাইট-সি-ইং এর খরচ আছে, নিজেদের ইচ্ছেমতো টুকটাক খাওয়া আছে—মাত্র দুটো টাকা বেশি নিলে হবে?

ও কম কথা বলে, তাই পিন্‌ডিদা ওর কথার কিছুটা গুরুত্ব দেয়। কিন্তু টাকার বেলায় দিল না। বলল, টুকটাক দুশো টাকার বেশি খাবি? সাইট্-সি-ইং-এর জন্যে অষ্টপ্রহর একটা জিপ বা ভ্যান আমাদের জন্য ক্লাব-হাউসের দোরগোড়ায় মজুত থাকবে।

হেবো গাধাটা ওমনি ফোঁস করে উঠল, কেন যে তোরা পিন্‌ডিদার কথার ওপর কথা বলতে যাস!

সমস্তক্ষণ জিপ বা ভ্যান মজুত থাকলে একটা বড় খরচ বাঁচে বটে। পিন্‌ডিদা বেশ শাঁসালো মক্কেলের ঘাড়েই চেপেছে সন্দেহ নেই। তবু যাতায়াতে ছশো টাকা যেখানে ট্রেন ভাড়া লেগে যাচ্ছে সেখানে মাত্র আটশো টাকা নিয়ে বেরুনোর কথা আমি ভাবতেও পারি না। অজানা-অচেনা জায়গায় কতরকমের বিভ্রাটে পড়ে যেতে পারি তার ঠিক আছে! আমি চোখে আর এক দফা হেবো-হোঁতকাকে ভস্ম করে গলার স্বরে অভিমানে ঢেলে পিন্‌ডিদাকেই সালিশ মানলাম, আচ্ছা পিন্‌ডিদা, তুমি কত টাকা দরকার হবে তাই নিয়ে পরামর্শ করতে চাইলে তার মধ্যে মুখ খুললেই হাবুল যদি এভাবে তেড়ে আসে তাহলে তো আমাদের মুখ বুজে থাকাই ভালো—কথা বলার স্বাধীনতা তো আমাদের সংবিধানেও আছে!

পিন্‌ডিদা এতটা গলে যাবে ভাবিনি। যে করে তাকাল হাবুলের দিকে, ওর তাতেই হয়ে গেছে।

তারপরে গর্জন—হেবো! ফের একটা কথা বলবি তো তোকে আমি এদের সকলের কাছে পায়ে হাত দিয়ে ক্ষমা চাইয়ে ছাড়ব! তোর নিজের কোনও মতামত নেই বলে এদেরও থাকবে না!

—ঠিক আছে, যেতে দাও পিন্‌ডিদা। অন্য তিনজনের দিকে ফিরলাম।—কী রে টাকা তোলার ব্যাপারে তোদের কী মত বল্‌ না?

মনের কথা আঁচ করে কেবলুই আগে বলে উঠল, ভ্রমণে বিচার নাস্তি, আটশো-ফাটশো নয়, ও হাজার মুদ্রা পুরিতং করে দাও পিন্‌ডিদা—

পিন্‌ডিদা হেসেই সায় দিল, ঠিক আছে, আর ফ্যাচফ্যাচাং না কুরু।

আমি কলম বাগিয়ে বসলাম, তাহলে হাজার টাকা আমাদের খরচা হবে ধরে নিচ্ছি?

—আবার কথা কী, পিন্‌ডিদা বিরক্ত, কথা তো হয়েই গেল, খরচ কী হবে সে তো দেখাই যাবে।

খসখস করে টাকার অঙ্ক লিখে চেকটা ছিঁড়ে পিন্‌ডিদার হাতে দিলাম। তারপরেই পিন্‌ডিদার বিষম ভ্রূকুটি, হাজার টাকা ঠিক হল, দেড় হাজার টাকা লেখার মানে?

আমিও অবাক যেন। —হাজার টাকা তো খরচই হবে ধরে নেওয়া হল—বাকি পাঁচশো টাকা তো তোমার কাছে রিজারভ থাকবে, আমরা ও-টাকা আছে বলেই ধরব না—বিদেশ-বিভুঁইয়ে ছ-ছটা লোক যাচ্ছি, ও-ক'টা টাকা তুমি হঠাৎ আপদ-বিপদের জন্য সঙ্গে রাখবে না? লাগবে না তো জানা কথাই—ফিরে এসে ও-টাকা আবার ব্যাঙ্কে জমা করে দেবে—হয়ে গেল!.....ইমারজেন্সির জন্যে কিছু সঙ্গে থাকবে এ তুমি সত্যি ভাবো না নাকি পিন্‌ডিদা?

সকলের জোড়া জোড়া সশঙ্ক চোখ তার মুখের ওপর। পিন্‌ডিদা ঘটা করে খানিক আমার দিকে চেয়ে রইল। তারপর টিপ টিপ হেসে বলল, পাঁচশো না হোক, শ'তিনেক ইমারজেন্সির বাড়তি টাকা তোর সঙ্গে থাকবে ভেবেছিলাম—কিন্তু আমার সঙ্গ-গুণে তুই বেশ চালাক হয়ে উঠেছিস দেখা যাচ্ছে—ঠিক আছে, কিন্তু ও-টাকার কথা কেউ মুখে এনেছ কী গলা টিপে ধরব।

বাড়িতে কেবল বলা হয়েছে, ক্লাব-ফান্ডের টাকায় সকলে মিলে দশ-পনেরো দিনের জন্যে পাটনা বেড়াতে যাচ্ছি। পিন্‌ডিদা সঙ্গে আছে, আমার বাড়ি থেকে কোনও বাধা এল না। এখানে রেলের এক পদস্থ অফিসার বাবার পেশেন্ট, অনায়াসেই অমৃতসর মেইলে ছ'বার্থের একটা রিজারভ কুপেই জায়গা পেয়ে গেলাম। পিন্‌ডিদার হিসেবে গোড়াতেই ভণ্ডুল, কেবল টিকিটের দামই ধরেছিল, এর ওপর মাথাপিছু স্লিপারের রিজারভেশন ফি লেগেছে। সেজন্যে গজগজ কথাও শুনতে হয়েছে—শাহেন শা বাদশা এসেছে সব, ট্রেনেও একরাত্রি না ঘুমুলে চলে না!

আমার বাড়ি থেকে সকলে রাতের খাওয়া খেয়ে রওনা হয়েছি। এটা কেউ খরচের মধ্যে ধরে না। এর ওপর ঠাকুমা আবার একটু বেশি রাতের জন্য লাল করে ভাজা পরোটা আর শুখা আলুর দম দিয়ে দিয়েছে—আ-হা গোপাল ভালোবাসে—ট্রেনে উঠেই কী আর ঘুমুবে সকলে! আর লুচি আলুর দম থাকলে কিছু না হোক এক বাক্স বর্ধমানের মিহিদানাও থাকবে! রওনা হবার আগে ঠাকুমা আমার মাথায় যত না হাত বুলিয়েছে তার থেকে ঢের বেশি বুলিয়েছে পিন্‌ডিদার গায়ে-মাথায়। —গোপাল, দেখ বাবা, তোমার ভরসাতেই সোনাকে ছেড়ে দিলাম, ওর কিন্তু কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই!

পিন্‌ডিদা প্রত্যেকবার তার পায়ের ধুলো নিয়ে বলেছে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ঠাকুমা।

রওনা হবার মুখে বাবার প্রশ্ন, তোমরা কোথায় উঠবে বললে না তো, সময়ে চিঠি না পেলে চিন্তায় থাকব—

আর একবার পায়ের ধুলো নিয়ে পিন্‌ডিদা তাঁকেও নিশ্চিন্ত করল, ঠিক পাবেন, দেখে-শুনে কোন ভালো জায়গাতেই উঠব।

কোথায়, বিহার সরকারের কোন পুষ্যিপুত্র দপ্তরের অতিথি হয়ে উঠতে যাচ্ছি সে-কৌতূহল আমারও কম নয়। কিন্তু জিগেস করা সত্ত্বেও পিন্‌ডিদা ভাঙেনি। ঠোঁট উলটে বলেছে, সরকারের সব দপ্তরই উনিশ-বিশ পুষ্যিপুত্র দপ্তর, ঠগ্‌ বাছতে গাঁ উজাড়—আমাদের ভালো থাকা নিয়ে কথা।

আমার ধারণা, পিন্‌ডিদার বন্ধু ট্যুরিজ্‌ম্ ডিপার্টমেন্টের কেউকেটা কোনও অফিসার, তাছাড়া ভ্রমণের এমন পরিপাটি ব্যবস্থা আমাদের জন্য আর কে করতে পারে?

হাওড়া থেকে অমৃতসর মেইল বর্ধমানে এসে পৌঁছুনোর কথা রাত ন'টা বেজে চার মিনিটে, পৌঁছুল সাড়ে ন'টায়। পাটনা জংশনে গিয়ে উপস্থিত হতে সকাল পাঁচটা দশের জায়গায় বড়োজোর ছ'টা হতে পারে। সে বরং ভালো। আমরা ঝটপট একেবারে বিছানাই পেতে ফেললাম। পিন্‌ডিদা আর হাবুল নিচের বার্থে, চটপটি আর কেবলু মাঝের দুটোয়, আমি আর কার্তিক ওপরে। মাঝের বার্থ দুটো গুটিয়ে নিচের দুই বেঞ্চে সকলে আরাম করে বসলাম। সকলেরই মেজাজ আনন্দে ভরাট। ট্রেন স্পিড নিয়েছে। আমি খুব সিরিয়াস গলায় বললাম, পিন্‌ডিদা, হাবুলকে একটা গান গাইতে বলো—

চটপটি তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল, আমি তাহলে চলন্ত ট্রেন থেকে ঝাঁপ খেয়ে আত্মহত্যা করব।

কার্তিক বলল, কেন, তুই গানের সঙ্গে নাচ না!

চটপটি ঝুপ করে বসে পড়ল।—তার থেকে পিন্‌ডিদা, তুমি আর সোনা বরং বেরিয়ে পরপর তিন জানলার তিন দু'গুণে ছ'জন প্যাসেঞ্জারকে ভালো করে স্টাডি করে এসো—দেওঘর যেতে সে কাণ্ডখানা হয়েছিল, রাম-বাদশার দলের মতো কেউ ঘাপটি মেরে বসে আছে কি না কে জানে! ('লিডার বটে পিন্‌ডিদা' পড়ো।)

কেবলু তক্ষুণি নাক চোখ মুখ কুঁচকে ফেলল!—আঃ, অশুভং মা স্মরেৎ! যাচ্ছি হইচই করে আনন্দ করতে, দিলি সেই হাড়কাঁপানো অলুক্ষণে দিনের কথা মনে করিয়ে!

এ-কথায় পিন্‌ডিদার হঠাৎ রাগ হয়ে গেল কেন বুঝলাম না।—দ্যাখ কেবলু গঙ্গারাম, বাজে ফ্যাচাং ফ্যাচাং করিস না। দেওঘরের হাড়-কাঁপান ব্যাপারখানা শেষ পর্যন্ত কোন দিকে গড়াল—ওই দুঁদে ডাকাতকে দলসুদ্ধ জেলে পুরে সরকারের দু'হাজার টাকা পুরস্কার আমরা পকেটে পুরিনি? আর তুই এখন তার থেকে ভাগ বসাচ্ছিস না?

লাভ যে শেষ পর্যন্ত হয়েছিল সেটা আর কে অস্বীকার করতে পারে। কিন্তু সেই ভয়ংকর দিনের কথা মনে পড়লে গায়ে কাঁটা দেয়। তা বলে ভয়েরও কোনও মানে হয় না অবিশ্যি, রাম-বাদশা আর তার দল এখন বারো বছর ধরে ঘানি টানবে।

পিন্‌ডিদার মেজাজটাই যেন খিঁচড়ে দেওয়া হল।—নে, পরোটা আলুর দম আর মিহিদানা বার কর হেযো—তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়ি, ভোরবেলায় আবার উঠতে হবে।

বাড়ি থেকে ভর-পেট খেয়ে বেরিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যে আবার খাওয়া। কিন্তু হেবোর ওপর যখন খাবার দেবার অর্ডার হল, এখনই যতটা পারা যায় খেয়ে না নিলে পরে আর জুটবে না। দু'জনে মিলে অর্ধেকের বেশি সাবড়ে দেবে। অতএব আমরাও প্রস্তুত।

রাতটা দিব্যি নিদ্রায় কেটে গেল। পিন্‌ডিদারই সবার আগে ঘুম ভেঙেছে, সক্কলকে ঠেলা মেরে তুলে দিয়ে জানান দিল, অনেকক্ষণ মোকামা ছাড়িয়েছি, এর পরেই পাটনা জংশন।—ট্রেন পঞ্চাশ মিনিট লেট, আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছে যাব।

অর্থাৎ পাঁচটা দশের জায়গায় সকাল ছ'টা হবে। মিনিট কুড়ির মধ্যে আমরা মুখ-হাত ধুয়ে মালপত্র গুছিয়ে রেডি। এরপর আলোচনা উঠল পাটনায় কী কী দেখার আছে, পাটনা থেকে আমরা কোথায় কোথায় যেতে পারি। দেখা গেল পিন্‌ডিদার এ আলোচনায় তেমন আগ্রহ নেই। কেবলু বলল, পাটনা থেকে গয়া গচ্ছামি তো নিশ্চয়।

পিন্‌ডিদার নিস্পৃহ প্রশ্ন, কস্য পিণ্ডি দদামি?

ট্রেন ছ'টার পাঁচ মিনিট আগে পাটনা জংশনে এল। গম্ভীর চালে পিন্‌ডিদা বলল, আমি নেমে দেখি ভদ্রলোক স্টেশনে এলো কিনা, টেলিগ্রাম পেয়ে থাকলে আসা উচিত, মালপত্র নিয়ে তোরা

নেমে আয়। দু'পা বাড়িয়েই পিন্‌ডিদা আমার দিকে ফিরল, সোনা, রাতে ঘুমিয়ে-টুমিয়ে তোর নার্ভ বেশ স্টেডি আছে তো?

শুনে আমি হতভম্ব। সকলকে ছেড়ে হঠাৎ আমাকে এ-কথা কেন! বললাম, আমার নার্ভ কবে আবার তুমি আনস্টেডি দেখলে?

—ভেরি গুড!

ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল।

আমরা ধীরে-সুস্থে নেমে এক জায়গায় জড় হয়ে দাঁড়ালাম। পিন্‌ডিদা লিডার, একটু মাতব্বরি তো করতেই হবে, নইলে এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে যার আসার কথা সে-ই আমাদের খুঁজে নিত। তা না নিজে গেল এই ভিড়ের মধ্যে তাকে খুঁজতে।

হঠাৎ আমার পিঠে বেশ জোরে একখানা আদরের চাপড়।—হ্যালো, হ্যালো মাই ইয়ং ফ্রেন্ডস, সো গ্ল্যাড মিট ইউ এগেন—তোমাদের লিডার পিন্‌ডি কোথায়?

আমরা পাঁচ মূর্তিই হাঁ একেবারে—এ কাকে দেখছি! খুব খুব চেনা.....কিন্তু কে যেন! হাসিমুখে ভদ্রলোক মাথার শৌখিন টুপিটা হাতে নিতেই আমাদের দু'তিনজনের গলা দিয়ে বেরিয়ে এল, হাজারিলালবাবু!

দেওঘরের সেই তরুণ পুলিশ অফিসার হাজারিলাল, যার বুদ্ধি কৌশল আর দুঃসাহসের উপর নির্ভর করে পিন্‌ডিদা সেই সাক্ষাৎ যমের মতো ডাকাত রাম-বাদশাকে সদলবলে বারো বছরের জন্যে জেলের খাঁচায় পুরতে পেরেছিল। বাঘের সামনে ছাগল বেঁধে রাখার মতো আমাকেই দেওঘরের তপোবন পাহাড়ের গুহায় দুর্ধর্ষ ডাকাত রাম-বাদশার সামনে টোপের মতো রেখে দিয়ে এই হাজারিলাল আর পিন্‌ডিদা কিস্তি মাত করেছিল—হাজারিলাল, সেই সঙ্গে আমাদেরও জয়-জয়কার। মাত্র আধ-ঘণ্টার জন্যে হলেও রাম-বাদশা আর তার দলের খপ্পরে পড়ার সেই ভয়াল স্মৃতি কি জীবনে ভোলবার!.....দেওঘরের সেই তরুণ পুলিস অফিসার নায়ক হাজারিলাল আজ এখানে এই জাংশনের প্লাটফর্ম! ('লিডার বটে পিন্‌ডিদা' পড়ো।)

আমাদের বিশেষ করে আমার দিকে চেয়ে হাজারিলাল অবাকই একটু।—কী ব্যাপার বলো তো সোনাবাবু, তোমরা যেন আমাকে ঠিক এক্সপেক্ট করোনি.....তোমাদের লিডার কি আমার কথা কিছু না বলেই—

—এই যে হাজারিলালবাবু আমি আপনাকেই খুঁজছিলাম। হাত টেনে নিয়ে পিন্‌ডিদা বার তিনেক জোরে জোরে হ্যান্ডশেক করল। সেই মুহূর্তে বুঝলাম নামার আগে কেন আমার নার্ভ স্টেডি আছে কি না জিগেস করেছিল। নার্ভ নয়, এখন আমার মাথাটাই কীরকম ভোঁতা হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।

হাজারিলাল বলল, কিন্তু কী ব্যাপার পিন্‌ডি, এরা যেন কেউ আমাকে এক্সপেক্ট করেনি.....তুমি এদের কিছু বলোনি নাকি?

পিন্‌ডিদার একমুখ হাসি।—কেমন সারপ্রাইজখানা দিলাম তাহলে বুঝুন—হ্যাঁরে সোনা, এখনও যে তোর মুখে কথা সরে না!

—ইউ ন'টি বয়, সোনাকে অন্তত তোমার বলা উচিত ছিল, দেওঘরের নন্দন পাহাড়ে ওর সেই বুদ্ধি আর সাহসের কথা আজও আমার মনে আছে, টাকা তোমার কাছে, দল নিয়ে চড়াও হয়ে রাম-বাদশা টাকা চাইতে সোনা হঠাৎ পড়ি-মরি করে ছুটল যাতে ওরা মনে করে টাকা ওর কাছে—তবে সোনাবাবু বড্ড বেশি রিস্ক নিয়েছিল, আর দু মিনিট সময় পেলে ওরা ওকে গুলি করে মারত—বোকার মতো ওরা ওর পিছনে ছুটে পুলিস দেখে সটকান দিল। যাক, চল এখন, আগে-ক্লাব হাউসে গিয়ে চা-টা খেয়ে ফ্রেশ হয়ে তারপর গপপো।

পিন্‌ডিদা কিছুই বলেনি বলে চতুর পুলিস অফিসার হাজারিলাল আর অভিযোগ বাড়াল না।

জিপ ছুটেছে। সামনে ড্রাইভারের পাশে পিন্‌ডিদা, তার পাশে হাজারিলাল। পিছনে আমরা

পাঁচমূর্তি। মূর্তি ছাড়া আর কী, নতুন জায়গা নতুন শহর, রাস্তা ঘরবাড়ি সব সাগ্রহে দেখতে দেখতে যাবার কথা, কিন্তু আমার আর কেবলু কার্তিক চটপটিরও ঘুরেফিরে দৃষ্টি পিন্‌ডিদা আর হাজারিলালের দিকে। তারা হাসিমুখেই কথা বলছে বটে, কিন্তু নিচু গলায়। জিপের আওয়াজে কিছু শোনা যাচ্ছে না।

আমার মগজ এখন একটু একটু কাজ করছে।.....হতে পারে হাজারিলালের শ্বশুরবাড়ি, বর্ধমানে, হতে পারে দেখা যেতে পারে পিন্‌ডিদাকে খাইয়েছে-দাইয়েছে, হতে পারে আমাদের দলটির সাহায্যে রাম-বাদশার মতো ডাকাতকে খাঁচায় পুরতে পেরে হাজারিলালের খুব সুনাম হয়েছে.....কিন্তু শুধু কৃতজ্ঞতার খাতিরে আমাদের এই ছ'জনের দলটিকে জামাই আদরে নেমন্তন্ন করে বর্ধমান থেকে পাঁটনায় নিয়ে যাওয়া, দশ-পনেরো দিন ক্লাব-হাউসে রেখে চারবেলা খাওয়ান, সাইট-সিইং-এর জন্যে জিপ বা ভ্যান মজুত রাখা.....নাঃ, ট্যু-মাচ, মনের সায় পাচ্ছি না।

.....সরকারের এটা এক নম্বর পুষ্যিপুত্র বিভাগ হতে পারে বটে, কিন্তু বিনা পয়সায় এত তোয়াজে রাখার মতো ভি. আই. পি. আমরা কেউ নয়.....আর হাজারিলালেরও এমন আপ্যায়নে এতটা উৎসাহী হবার কথা নয়।

.....শুধু একটু আনন্দে থেকে খেয়ে-দেয়ে হইচই করে যাওয়ার জন্যে ব্যাঙ্কের ফান্ড থেকে হাজার টাকা তুলে খরচ করবে পিন্‌ডিদা, সেটা আরও অসম্ভব। কেউ তাকে বলেনি, সে নিজে সেধে এই ব্যবস্থা করেছে, আর আমরাও আনন্দে কাঁসি বাজিয়েছি।

.....রাতে ট্রেনে চটপটি দেওঘর অভিযানের কথা মনে করিয়ে দিতে কেবলু ভিতুটা 'অশুভং মা স্মরেৎ' বলে উঠতে পিন্‌ডিদা রেগে গিয়ে মুখ খিঁচিয়ে উঠেছিল। তার মতে দেওঘর যাত্রা মোটেই অশুভ নয়, কারণ শেষ পর্যন্ত আমরা রাম-বাদশার মতো ডাকাতকে দলসুদ্ধ জেলে পুরে সরকারের দু'হাজার টাকা পকেটে পুরতে পেরেছি আর তারই জোরে এখন এই ফুর্তি করতে বেরুনো।

নতুন পথ-ঘাট-শহর দেখব কী, চোখের সামনে আমি কোনও অদৃশ্য বাঘের নাগালের মধ্যে দড়ি-বাঁধা একটা ছাগলের টোপ দেখছি।

পুষ্যিপুত্র বিভাগের এই ক্লাব-হাউস বেশ তকতকে ঝকঝকেই বটে। আধখানা চাঁদের মতো ঘোরানো একতলা দিব্যি বড়সড় বাংলো। সামনে লন। দুটো বড় হল্-এর দু'দিকে চারটে করে বড় ঘর, অ্যাটাচড্ বাথ। হলঘরে তাস দাবা পাশা ক্যারম পিং পং খেলার ব্যবস্থা। ব্যবস্থা-পত্র দেখে কেবল আমি ছাড়া সকলে মুগ্ধ। আরও খুশি মুখ-হাত ধোয়ার পর ডাইনিং রুমে এসে ব্রেকফাস্টের বহর দেখে। প্রত্যেকের প্লেটে দুটো করে এগ্-পোচ, বড় ট্রেতে পাঁজা-পাঁজা টোস্ট, দুটো মাখন-ঠাসা কাচের বাটি, প্রত্যেক ডিশের পাশে দুটো করে কলা, একটা করে আপেল, জ্যাম আর মারমালাডের শিশি, সাতটা বড় সাদা কাচের বাটিতে গরম দুধ, মাঝখানে সদ্য-খোলা মস্ত একটা কর্নফ্লেক্সের প্যাকেট।

হাজারিলালও আমাদের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট-এ বসল।

সবকিছুর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে পিন্‌ডিদা বলল, কেউ লজ্জা-টজ্জা করিস না বাপু, যার যা দরকার চেয়ে নিবি, নে শুরু কর্—হাজারিলালবাবু, একটা কথা আপনাকে খোলাখুলি বলে রাখাই ভালো, আমাদের এই বন্ধুদের সব পেটে খিদে মুখে লাজ, আসলে সব এক-একখানা খুদে রাক্ষস—একটু এদিক-ওদিক হলে এই পিন্‌ডিদার পিণ্ডি চটকাতে ছাড়ে না।

দেওঘরের এই তরুণ পুলিস অফিসারকে মেজাজী দাম্ভিকই দেখেছিলাম আমার মনে আছে, সেই লোক এখন হাসি-খুশি অমায়িক।—তোমাদের দেওঘরের সেই বাজার করা আর খাওয়ার ঘটা আমি খুব ভালো করেই জানি। দোরগোড়ার বেয়ারাটাকে হুকুম করলেন, কেয়ারটেকার সহদেববাবুকো, অওর বাবুর্চিকো বোলাও। বেয়ারা ছুটে যেতে ভিজে গলায় আমাকে বলল, ব্রেকফাস্ট দেখে কি মনে হচ্ছে খাওয়া-দাওয়ার খুব অসুবিধে হবে? লজ্জা করো না, আর কিছু চাই তো বলো।

তেমনি তেরছা করে জবাব দিলাম, আমাদের জন্যে ভাববেন না, দলের মধ্যে পিন্‌ডিদারই কেবল কোমর থেকে গলা পর্যন্ত পেট, আবার লজ্জাও তেমনি—ওকে ঢেকুর তোলাতে পারলে আপনি নিশ্চিন্ত।

সকলেই হাসতে লাগল। সহদেববাবু উপস্থিত, পিছনে বাবুর্চি। হাজারিলাল পরিষ্কার হিন্দিতে তাকে বুঝিয়ে দিল, এই মেহমানদের পুলিশ-ক্লাবের গেস্ট নয়, স্টেট-গেস্ট ধরে নিয়ে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় যেন, এদের জিগেস করে প্রত্যেক দিনের মেনু হবে, ইচ্ছে হলে এরা তোমার সঙ্গে বাজার যাবেন, যেমন বলবেন তেমনি বাজার করবে। বাবুর্চিকে সমঝে দিলেন, মেহ্‌মানদের খুশি করা চাই মনে রেখে রান্নায় হাত লাগিও।

তারা ইয়েস সার, জি হুজুর করে প্রস্থান করল।

ব্রেকফাস্ট সারা হতে হাজারিলাল উঠে পড়ল। বলে গেল, কোয়ার্টার্স-এ পৌঁছে জিপটা পাঠিয়ে দেবে, জিপ এখান থেকে আমাদের হেপাজতে থাকবে। বেড়ানোর প্রোগ্রাম ইচ্ছে করলে সহদেববাবুর সঙ্গে ঠিক করে নেওয়া যেতে পারে, এখানকার পুরনো লোক, সব জানে-শোনে। পিন্‌ডিদাকে বলল, লাঞ্চের পর একটু বিশ্রাম করে তিনটে নাগাদ আমার অফিসে এসো, আর সোনাবাবুর কষ্ট না হলে তাকেও নিয়ে এসো, আই অ্যাম ইনডেটেড টু হিম (আমি ওর কাছে ঋণী)

পিন্‌ডিদা আমার দিকে তাকাল, দু'চোখে স্নেহ গলে পড়ল।—নিশ্চয়, সোনা ইজ্ এ জেম!

হাজারিলাল বিদায় হতেই হোঁতকা হাবুল বলে উঠল, দ্যাখ সোনা, লিডার কাকে বলে দেখে নে, তোর তো ছারপোকার স্বভাব, কুটমুট কামড়াতে ছাড়িস না।

—এইও! পিন্‌ডিদা চোখ পাকাল, তোকে গাধার মতো তেল দিতে কে বলেছে?

হাবুল চুপসে গেল, তেল কেন, পিন্‌ডিদা, আমি তো সত্যি কথাই বলছিলাম—

—সত্যি কথা তোর কাছ থেকে কে শুনতে চেয়েছে?

হাবুলের মুখের অবস্থা দেখলে হাসি পাবার কথা, কিন্তু আমার হাসি পাচ্ছে না। পিন্‌ডিদা বলল, সহদেবকে ডেকে লাঞ্চ আর রাতে ডিনারের মেনু কী হবে ঠিক করে ফেলি—

বললাম, তার ঢের সময় আছে, তার আগে কোনও ধরে বসে নিজেদের মধ্যে আলোচনাটা সেরে ফেলি পিন্‌ডিদা, ওদের কেমন লাগছে জানি না, আর খুব বেশিক্ষণ বোকা বনে থাকতে আমার অন্তত ভালো লাগছে না—

হঠাৎ এমন সরাসরি আক্রান্ত হবে পিন্‌ডিদা ভাবেনি বোধহয়। এ-রকম কথা কেন বললাম, সেটা এক হেবো ছাড়া কার্তিক চটপটি আর কেবলু নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে।

রাগ দূরে থাক, পিন্‌ডিদার ছুঁচলো ঠোঁটে হাসি টুপটুপ করছে।—এই জন্যেই তোকে বড় ভালোবাসি রে সোনা, আমার ডান হাতটার অভাব হলে তোর কথা মনে পড়ে—চল্ বাবা চল্, কী আলোচনা আগে শুনিই নিই—

চিনি-কথায় গলে যেতে রাজি নই, রাম-বাদশার স্মৃতি এই দিনের বেলায়ও আমার গলায় সাঁড়াশির মতো চেপে বসেছে। সকলে সামনের হলঘরটায় ঢুকলাম। চেয়ার টেনে গোল হয়ে বসলাম। নাটকীয় সুরে কাঁদ-কাঁদ গলায় পিন্‌ডিদা বলে উঠল, হ্যাঁ হেবো, এই চারজন একসঙ্গে খাঁড়া উঁচোলে তোর পিন্‌ডিদাকে রক্ষা করতে পারবি তো?

হেবো-হোঁতকা রাগ করবে, না হাসবে বুঝতে পারছে না। কারণ, কেবলু কার্তিক আর চটপটি হাসছে। হাসিটা অবশ্য রণে ভঙ্গ দেবার গোছের। আমিও সেয়ানা। ঝুঁকে টুক করে পিন্‌ডিদার বুটের ধুলো নিয়ে কপালে ঠেকালাম, বললাম, শিষ্যদের একটু যোগ্য হতে দাও পিন্‌ডিদা, না-বালক করে রেখো না—

—ঠিক আছে, ঠিক আছে, বল্ কী বলবি?

—পাটনায় এসে আমরা হাজারিলালের গেস্ট হব, এ-কথা বর্ধমানে ভাঙোনি কেবল সারপ্রাইজ্ দেবার জন্য?

—তাছাড়া আর কী.....। হল-এর ছাদ দেখছে।

—তা তোমাকে দেখেই হাজারিলাল আমাদের সক্কলকে এমন ঘটা করে নেমন্তন্ন করে ফেলল, দশ-পনেরো দিনের জন্যে প্রায় স্টেট-গেস্টের খাতির-যত্নে আমাদের এখানে এনে তুলল?

পিন্‌ডিদা বিরক্ত।—কেন তুলবে না? তোর আর আমার জন্যেই তার কপাল ফিরেছে—পুলিশের ও. সি. হতে চাকরির অর্ধেক বছর কেটে যায়, রাম-বাদশাকে খাঁচায় পুরতে পেরে এই বয়সেই তড়িঘড়ি প্রমোশন পেয়ে এত বড় থানার ও. সি. হয়ে বসল—তার একটা কৃতজ্ঞতাবোধ নেই?

—এই কৃতজ্ঞতাবোধেই এতটা করছেন, তোমাকে দিয়ে—তার মানেই আমাদের দিয়ে তার আর কোনও প্রত্যাশা নেই?

পিন্‌ডিদা গম্ভীর।—হেবো, সোনার নামে একটা থ্রি চিয়ারস্ দে!

হাবুল হকচকিয়ে গেছল, কেবলু কার্তিক চটপটি হেসে উঠতে ড্যাবড্যাব করে পিন্‌ডিদার দিকে চেয়ে রইল।

—শোন্ রে সোনামণি, তুই কোনান ডয়েলের যোগ্য ওয়াটসনই হয়ে উঠেছিস, হাজারিলালের কিছু প্রত্যাশা আছে—সেটা সফল হলে, মানে বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়লে সে তড়িঘড়ি অ্যাসিসট্যান্ট কমিশনার হবার স্বপ্ন দেখবে, আর আমরা সামান্য তিরিশ হাজার টাকার একটা পুরস্কারের থলে নিয়ে বর্ধমানে ফিরে যাব—এক কথায়, গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল!

তিরিশ হাজার টাকার পুরস্কার শুনেই আমাদের রক্তে রোমাঞ্চ, সেই সঙ্গে বুক টিপটিপ।

পিন্‌ডিদা বলে গেল, তা বলে তোরা ভাবিস না, ক্লাব-ফান্ডের হাজার টাকা খরচা করে আমি কেবল আকাশের চাঁদ ধরার আশায় তোদের এখানে নিয়ে এসেছি। ধরে নে, আমাদের কিছুদিন আনন্দে কাটানোর জন্যেই এখানে আসা, চারবেলা তোফা খাওয়া-দাওয়া, নিখরচায় সাইট-সিইং, হই-হুল্লোড় করে আনন্দে কাটানো, ছ'জনে হাজার টাকা খরচ করে অন্য কোথাও ফুর্তি করতে গেলে এর সিকি ভাগও কি হত? সেদিক থেকে আমরা কি কিছু লোকসান করছি?

কেবলু কার্তিক চটপটি একসঙ্গে বলে উঠল, কিছু না, কিছু না! তিরিশ হাজার টাকা পুরস্কারটা কী ব্যাপার, আগে তাই বলো?

পিন্‌ডিদা এদিক-ওদিক তাকাল।—এগিয়ে এসে বোস্ সব, দেয়ালেরও কান আছে।

আমরা চেয়ার আরও টেনে ঘন হয়ে বসলাম।

পিন্‌ডিদার বক্তব্য বড় নয়। গত তিন বছর ধরে এই এপ্রিল মে মাসে আই. বি. রিপোর্টে এখানে কোটি টাকা পাচারের হদিস পাওয়া যাচ্ছে। কোথা থেকে কীভাবে এত সোনা আসছে সেটা কেউ ভেবে পাচ্ছে না। কিন্তু আসছে যে সেটা ঠিক। এটা ধরার জন্যে আই. বি. ডিপার্টমেন্ট হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কোনও হদিস পাচ্ছে না।.....বর্ধমানে হাজারিলালের শ্বশুরবাড়ি ঠিক নয়, শালার বাড়ি। দু'দিনের জন্য সেখানে এসে পিন্‌ডিদার সঙ্গে তার হঠাৎ দেখা। পাটনায় বাইরে থেকে সোনাপাচার হয়ে আসছে, তার জন্যে প্রত্যক্ষভাবে হাজারিলালের খুব মাথা ঘামানোর কথা নয়। কারণ এ নিয়ে মাথা ঘামানোর কথা আই. বি. ডিপার্টমেন্টের। কিন্তু পিন্‌ডিদাকে দেখেই তার মগজের ভিতরটা নড়েচড়ে উঠেছে। যদি কোনওভাবে সোনা স্মাগলারের দলটাকে ধরে দিতে পারে তাহলে কালে দিনে চাকরির কোন চূড়ায় উঠতে পারবে ঠিক নেই। কিন্তু নিজের স্বার্থের কথা কী আর খোলসা করে বলে!

সরকারের তিরিশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণাটাই পিন্‌ডিদার চোখের সামনে রাজভোগের মতো তুলে ধরেছে। যারা বা যে কেউ স্মাগলারদের জালে ফেলার হদিস দিতে পারবে তারা বা তার কপালে ওই তিরিশ হাজার টাকা নাচছে। হাজারিলালের ধারণা, পাটনা এমন কিছু বড় জায়গা নয়, সবকিছুই সকলের চোখের ওপরে। আই. বি. ডিপার্টমেন্টের লোকগুলোর বুদ্ধির ঘটে কিছু

থাকলে এত দিনে স্মাগলাররা জেলের ঘানি টানত। কিন্তু আই. বি.-র কাজে ও. সি হাজারিলাল মাথা গলাতে পারে না, অত সময়ই বা কোথায়? তাই পিন্‌ডিদা যদি ভাগ্যের পাশায় আর একবার দান ফেলতে চায় শিষ্যদের নিয়ে পাটনা চলে আসতে পারে, সক্কলের খাওয়া-দাওয়া, তোফা আরামে থাকা আর ট্যুরিস্টের মতো ঘুরে বেড়ানোর ব্যবস্থা করার দায়িত্ব হাজারিলালের। যাতায়াতের ট্রেন ভাড়াটাই তাদের খরচ। কিছু না হোক, প্রায় নি-খরচায় সক্কলের বেড়ানোটা তো হবে।

পিন্‌ডিদা হিসাব করে দেখেছে সব খরচা দিতে হলে দশ-পনেরো দিনের হোটেল ভাড়া আর খাওয়া-দাওয়াসহ এমন বেড়ানো তিন হাজার টাকাতেও হত না। তাই একবাক্যে রাজি হয়ে গেছে।

শোনার পরে আমাদের বেড়ানোর চেহারাটাই বদলে গেল। কেবলু চাপা উত্তেজনায় বলে উঠল, আমার কর্ণপটহে ত্রিংশ সহস্র মুদ্রাং ঝনঝনাস্তি!

আর মোটা শরীর দুলিয়ে হাবুল বলল, ওরে ব্বাস! তিরিশ হাজার টাকা পেলে আমাদের ক্লাবের তো একটা নিজস্ব ঘর হয়ে যেতে পারে!

পিন্‌ডিদা হেসেই বলল, ওদের দু' মাথায় দুটো গাঁট্টা বসা তো সোনা—

কিন্তু আমি সিরিয়াস। বললাম, আমরা তোমার পিছনে আছি পিন্‌ডিদা, কিন্তু একটা শর্তে। তিরিশ হাজার টাকার লোভে দেওঘরের মতো কাউকে টোপ বানানো চলবে না, আর কখন কী ভাবছ কী জন্যে কী করছ আমাদের জানাতে হবে।

শোনামাত্র পিন্‌ডিদা সত্যি রেগে গেল।—তার থেকে একটা ঢাক-ঢোল নিয়ে সক্কলকে জানান দিয়ে বাজাতে বাজাতে যাই না?.....ঠিক আছে, তোরা যে জন্যে এসেছিস তাই কর্, খা-দা বেরিয়ে বেড়া, তেমন ভাগ্যের জোর থাকলে তিরিশ হাজার টাকা কেবল আমার পকেটেই আসবে না, না এলে বয়েই গেল।.....টোপ! টোপের আতঙ্ক তোকে পেয়ে বসেছে! বলি, দেওঘরের সারকামস্ট্যান্স আর এখানকার পরিস্থিতি এক? তিরিশ হাজার ছেড়ে তিন লক্ষ টাকার জন্যেও আমি তোর জীবন রিস্ক করতে পারি? এতদিনে এই বিশ্বাস তোর পিন্‌ডিদার ওপর?

হাবুল গাঁ-গাঁ করে বলে উঠল, শেম-শেম!

হেবো! বসা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পিন্‌ডিদা গর্জে উঠল, ফের একটি কথা বলবি তো আমার হুকুমে সোনাই তোকে ঘাড় ধাক্কা দিতে দিতে ঘর থেকে বার করে দেবে! ওই হাজারিলাল আমার থেকেও সোনাকে বেশি পছন্দ করে সেটা জানিস? ধুপ করে আবার বসে পড়ে অনেকটা নিজের মনেই বলল, সেইজন্যেই হয়েছে মুশকিল, নইলে আর কী.....

সক্কলেই চুপ। আমি মনে মনে ঘায়েল হয়ে এসেছি। কার্তিক হঠাৎ প্রস্তাব করল, এক কাজ করো না পিন্‌ডিদা, তুমি কেবল সোনাকে সঙ্গে নাও, ওর কাছে কিছু গোপন করো না, দরকারে আমরা তো তোমার পিছনেই আছিই।

সঙ্গে সঙ্গে পিন্‌ডিদার মুখে হাসি।—চমৎকার বলেছিস তো! কী রে সোনা, রাজি?

আমিও হেসে উৎসাহ দেখালাম, নিশ্চয়!

দুপুরের রাম খ্যাঁটের পর ওরা চারজন ভোঁস ভোঁস ঘুমোতে লাগল। জিপ নিয়ে ঘড়ি ধরে আমি আর পিন্‌ডিদা হাজারিলালের দপ্তরে পৌঁছুলাম। ভদ্রলোক আমাদের খাতির করে বসাল, দুপুরের খাওয়া কেমন হয়েছে খোঁজ নিল। তারপর হেসে আমাকে জিগ্যেস করল, সোনাবাবু, সব শুনেছ?

আমি মাথা নাড়লাম। শুনেছি।

একটা ফাইল খুলে সামনে ধরল।—এতে আই. বি.-র রিপোর্টের কপি আছে, আর আছে তিন বছরের খবরের কাগজের কাটিং, আমি অবশ্য এ-বছর নতুন এখানে। পিন্‌ডিদা খুঁটিয়ে পড়ে ফাইল আমার দিকে ঠেলে দিল। রিপোর্ট পড়ে মনে হল এখানে সোনা পাচার হয়ে আসছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কাগজের কাটিং পড়ে বোঝা গেল, এপ্রিল থেকে মে'র গোড়ার দিকের মধ্যে

ব্যাপারটা ঘটেছে বলে সন্দেহ। পিন্‌ডিদা আমাকে তিনটে কাটিং থেকে কাগজের ডেটগুলো টুকে নিতে বলল। তারপর হাজারিলালকে জিগ্যেস করল, কীভাবে আমরা এগোতে পারি বলুন?

—আমার মনে হয় দু'দিন তোমরা সমস্ত পাটনা শহরটা চষে দেখে নাও। তোমাদের যে জিপটা দিয়েছি সেটা পুলিশের মার্কা-মারা জিপ নয়। কেউ সন্দেহ করবে না, প্লেন ড্রেসের ড্রাইভারটাও এক্সপার্ট।.....তারপর আমি তিনটে জায়গায় বিশেষ নজর রাখা দরকার মনে করছি। প্রথম, বড় সোনা-গয়নার দোকানগুলিতে, অনেক বার রেড করেও কারও গায়ে আঁচড় কাটা যায়নি। ওরাই সোনা আনছে কোনও সন্দেহ নেই।.....চালের বস্তায় লুকিয়ে আনতে পারে। আজকাল আবার সোনা জলের মতো লিকুইড করেও চালান হচ্ছে এরকম রিপোর্টও এসেছে। তাহলে বড় ওষুধের কারখানায় নজর রাখা যেতে পারে। ট্যুরিস্ট হিসেবে তোমরা কাজ শুরু করতে পার—স্টুডেন্ট ট্যুরিস্ট ভেবে তোমাদের চট করে কেউ সন্দেহ করবে না।

এরপর দু'দিন আমরা জিপে সক্কলে মিলে পাটনার সর্বত্র চষে বেড়ালাম। সর্বত্র বলতে শহরতলি আর গ্রাম-গঞ্জ পর্যন্ত। কিন্তু তাতে কী আর সন্দেহ হবার মতো কিছু পেতে পারি! আমি আর পিন্‌ডিদা ছাড়া বাকি চারজন আমাদের উদ্দেশ্যও জানে না। দু'দিন ঘুরে ঘুরে বড় বড় চালের আড়তেও হানা দিলাম। সেখানে আমরা কে? আমরা হলাম বর্ধমানের কৃষি বিভাগের ছাত্র ট্যুরিস্ট। এখানে কোন্ সময়ে কোন্ ধানের কী রকম চাষ হচ্ছে জানার বাসনা। মালিক তো আর এখানে বসে নেই যে সন্দেহ করবে। ডাঁটের মাথায় পিন্‌ডিদা অনেক বস্তা খুলিয়েছে। হাজারিলালের দেওয়া সে একটা ছোট্ট মেটাল ডিটেক্টার পকেটে নিয়ে ঘুরছে। সকলের অলক্ষে সেটা বস্তায় ঠেকাচ্ছে, খোলা বস্তার মুখ তার দিয়ে বাঁধা থাকলেও ধাতুর ইঙ্গিত আসছে। সোৎসাহে ধাপ্পা দিয়ে সেই বস্তা খোলানো হচ্ছে। কিন্তু হা হতোস্মি!

এরপর বড় তিনটে ওষুধের ফ্যাক্টরিতে হানা দিলাম। এখানে আমরা বর্ধমান মেডিকেল কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র, পিন্‌ডিদা ফাইন্যাল ইয়ারের। ওষুধের কারখানা দেখার আগ্রহ থাকতেই পারে। কিন্তু আমাদের দেখার আড়ম্বর দেখে সেখানকার লোকজনেরা কেমন সন্দিগ্ধ হয়ে উঠতে লাগল। নানা রকমের সলিউশনের জারগুলো থেকেও আমরা স্যাম্পল সংগ্রহের উৎসাহে মেতেছিলাম। তিন জায়গা থেকে অন্তত পঞ্চাশ-ষাটটা ছোট শিশির স্যাম্পল হাজারিলালের কাছে পেশ করেছি। পিন্‌ডিদার বদ্ধ ধারণা, টেস্ট করলে কোনওটা থেকে লিকুইড সোনা বেরুবেই। পরে শুনলাম ওগুলোর কোনওটা হজমের, কোনওটা পেট পরিষ্কার করার, কোনওটা লিভারের, কোনওটা বা হার্টের ওষুধের র' মেটিরিয়াল।

একে একে আটটা দিন কেটে গেল। আমি আর পিন্‌ডিদা যে তিমিরে সেই তিমিরে। ওরা চারজন তবু এটা-ওটা দেখে নিয়েছে। গোলঘর দেখেছে, তার হুইসপারিং গ্যালারি দেখেছে, হরমন্দির লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির দেখেছে। ওদেরও সর্বত্র চোখ-কান সজাগ রাখার নির্দেশ দিয়ে রেখেছে পিন্‌ডিদা। তার ফলে হেবো হাঁদাটা অপছন্দের মুখ দেখলেই স্মাগলার সন্দেহে জেরা করতে এগোয়। একবার এক দলের পাল্লায় পড়ে মার খাওয়ার দাখিল হয়েছিল সকলের।

যাই হোক, আমার থেকেও পিন্‌ডিদার হতাশা বেশি। আমাদের রোজই দুপুরের দিকে একবার করে হাজারিলালের দপ্তরে যেতে হয়। কবে কোথায় কী চেষ্টা করলাম জানিয়ে আসি। চক্ষুলজ্জার খাতিরে পিন্‌ডিদাকে বেশ বানিয়ে আর বাড়িয়েও বলতে হয়। আটটা দিন কেটে যেতে দু'জনেই বেশ বিমর্ষ আমরা। হাজারিলালের দপ্তর থেকে সেদিন সাইকেল রিকশায় ফিরছি, জিপ নিয়ে ওরা গেছে বজ্জার বেড়াতে। পাটনা থেকে জিপে পৌনে দু'ঘণ্টার পথ! ওদের বেড়ানোর শখ দেখে পিন্‌ডিদা মনে মনে তিক্ত-বিরক্ত, আবার চুপচাপ বসে থাকতে দেখলেও রেগে যায়।

রিকশায় যেতে যেতে পিন্‌ডিদা বলল, আর দিন দুই দেখে এখান থেকে পালিয়ে যাই চল্ সোনা—নইলে প্রেস্টিজ পাংচারড্ হয়ে যেতে পারে—হাজারিলাল এখনই কীভাবে তাকাচ্ছে আমাদের দিকে লক্ষ করেছিস? রোজ চারবেলা ছ'জনের এই খ্যাঁট, দশ লিটার করে পেট্রল

পোড়ানো—পুলিসের সংবর্ধনা খুব ভালো হবে মনে হচ্ছে না। তার থেকে চোখে ধুলো দিয়ে আগে পালানোই ভালো।

হ্যাঁ, আমারও খারাপ লাগছে। সাইকেল রিকশা প্রায় থেমে থেমে চলছে কেন লক্ষ করতে গিয়ে দেখলাম, সামনে শম্বুক গতিতে আরও চারটে রিকশা চলছে, তাতে বিশাল আকারের চারটে পেল্লায় জুতো—লম্বা এক একটা কাঠের টুলের ওপর বসিয়ে রাখা হয়েছে। এত বড় সাইজের জুতো, যে মানুষ ছেড়ে তিরিশ ফুট লম্বা কোনও দৈত্য-দানবের পায়েও ও-জুতো ঢলঢল করবে। রিকশাগুলোর আগে পিছে অনেক ছেলে-ছোকরা মজা দেখতে দেখতে চলেছে। কোনও বড় শু-ফ্যাক্টরির সচল বিজ্ঞাপন হবে বোঝা যাচ্ছে। সাইকেল রিকশা থেকে ইংরেজি-হিন্দির ছাপা হ্যান্ডবিলও ছোড়া হচ্ছে।

রিকশাঅলা পাশ কাটানোর চেষ্টা করতে দু'তিনটে দোমড়ানো হ্যান্ডবিল আমাদের রিকশায়ও পড়ল। খুলে পড়তে পড়তে আমি আর পিন্‌ডিদা দুজনেই হতভম্ব। জুতোর বিজ্ঞাপন নয়, বাঁকিপুরের ময়দানে চতুর্থ হেভিওয়েট্ ফুটবল শিল্ড কমপিটিশনের চটকদার হ্যান্ডবিল!

ফুটবলের গন্ধ পেলেই পিন্‌ডিদার নাড়িতে সাড়া জাগে।—হেভিওয়েট্ ফুটবল! সে আবার কী ব্যাপার রে!

কী ব্যাপার পড়ে আমরা আরও অবাক। এমন মজার ফুটবল প্রতিযোগিতার কথা জীবনে শুনিনি। সমস্ত ভারত আর বাইরে থেকেও বাছাই বাইশজন খেলোয়াড়ের দেহের ওজন অনুযায়ী তাদের বুটের ওজন দু'কেজি থেকে তিন কেজি পর্যন্ত হবে। নটবরলাল শু-ফ্যাক্টরির তৈরি সেই ঢাউস বুট পরে শিল্ড খেলা দেখার মজা পাটনার মানুষ বাঁকিপুর ময়দানে গত তিন বছরের মতোই উপভোগ করার সুযোগ পাবে। বম্বে থেকে, গোয়া থেকে, দমন দিউ, নেপাল কাঠমাণ্ডু থেকে, সিঙ্গাপুর সাংহাই থেকে, আরও কত জায়গা থেকে এতকালের নামজাদা বাছাই বাইশজন এবং এক্সট্রা দু'দলের ছ'জন—এই আঠাশজন খেলোয়াড়কে নিয়ে আবার সেই তীব্র প্রতিযোগিতার মজার অনুষ্ঠান বাঁকিপুরের ময়দানে। এই বিচিত্র শিল্ডের খেলা দেখার জন্য মাত্র আট আনার টিকিট।

হ্যান্ডবিল পড়ে যেটুকু বোঝা গেল, মজার অভিনব খেলাই বটে। এ-ও যে বড় শু-ফ্যাক্টরির এক ধরনের চটকদার বিজ্ঞাপন তাতে সন্দেহ নেই। পিন্‌ডিদা বলল, আর চারদিন বাদে এমন একটা মজার খেলা না দেখে যাই কী করে?

আমার মাথায় চারদিন ধরে কেবল সোনাই ঘুরছে। হেসে বললাম, ওই হেভি-ওয়েট্ বুটের মধ্যে চামড়ার বদলে সোনাও তো গোঁজা থাকতে পারে—

আমি ঠাট্টার ছলেই বলেছিলাম। কিন্তু শুনে পিন্‌ডিদা যেন ইলেট্রিকের শক্ খেয়ে সোজা হয়ে বসল। নিস্পন্দ খানিকক্ষণ। তারপর যেন মোহগ্রস্তের মতো বলল, হ্যাঁ রে সোনা.....এটা তো লোককে আনন্দ দেবার কোনওরকম স্বাভাবিক চিন্তার আয়োজন নয়, অস্বাভাবিক চিন্তার আয়োজন—কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য ছাড়া এরকম অনুষ্ঠান তো কারও করার কথা নয়! এই সময়েই তিন বছর ধরে সকলের চোখের ওপর ঢাক পিটিয়ে এই খেলার আয়োজন করা হচ্ছে, আবার তিন বছর ধরে অনেকটা এ-সময়েই গোল্ড স্মাগলারদের হদিস পাওয়া যাচ্ছে.....কী ব্যাপার রে!

এবারে আমার স্নায়ুগুলোও টান-টান হয়ে উঠল। ক্লাব হাউসে ফিরেই কেয়ারটেকার সহদেবকে তলব করল পিন্‌ডিদা। খোঁজ নিতেই এক খেলা সম্পর্কে সহদেব উচ্ছ্বসিত। ভারী জুতো পরে এই শিল্ড খেলাতে কতরকম মজাই না হয়। এই খেলার মজা দেখার জন্য পাটনা শহরে লোক ভেঙে পড়ে। ভিড় সামলাতে পুলিস হিমশিম খেয়ে যায়। এই পাব্‌লিসিটি করে নটবরলাল লোকটা ব্যবসায় লাল হয়ে গেল—তার জুতো ছাড়া অন্য জুতো এখানে কমই বিক্রি হয়।

পরদিনের কাগজে নটবরলাল শু-ফ্যাক্টরি আয়োজিত এই আসন্ন খেলার খবর বেরুল। কোন কোন জায়গা থেকে প্রাক্তন নামী খেলোয়াড়রা আসছে সেই খবরও। অন্যান্য বারের মতো

এবারেও এ খেলা দেখার জন্য শহরবাসীরা উন্মুখ হয়ে যাচ্ছে, আট আনা টিকিটের দাম পাঁচ-সাত টাকায় উঠে গেছে।

পরদিন পিন্‌ডিদা জিপে করে যেখানে নিয়ে গিয়ে হাজির হল সেটা এখানকার নামকরা খুদাবক্স লাইব্রেরি। গত তিন বছরের এপ্রিল-মে'র খবরের কাগজ বার করা হল। হেভি-ওয়েট্ ফুটবল শিল্ড সাড়ম্বর খবর, ছবি। আবার তারই পাঁচ-সাত দিন আগে বা পরে আই. বি ডিপার্টমেন্ট থেকে গোল্ড স্মাগলিং-এর রিপোর্ট।

জিপ নিয়ে সোজা আমরা থানায় ও. সি. হাজারিলালের কাছে। পথে পিন্‌ডিদা আমাকে সাবধান করে দিল, এ সম্পর্কে আমাদের দলের আর কারও সামনে মুখ খুলবি না—এ শুধু এখন তোর আর আমার ব্যাপার।

কথাটা কেন যেন আমার খুব ভালো লাগল না।

হাজারিলাল সব শুনে স্তব্ধ, হতচকিত। অবিশ্বাস খুব হচ্ছে না, আবার ভয়ও পাচ্ছে। বিরাট ব্যবসায়ী নটবরলাল, উঁচু মহলে তেমনি প্রতিপত্তি। সত্যি না হলে সব কিছু গন্ডগোল হলে ভীষণ বে-ইজ্জত হতে হবে। আবার পুলিশের ঝানু লোক হাজারিলাল, পিন্‌ডিদা যেভাবে তাকে বোঝাল, সে শিকারের তাজা গন্ধ পাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত পিন্‌ডিদার প্রস্তাবে রাজি, পুলিশের চাকরিতে রিস্ক নিতেই হয়। পিন্‌ডিদার চাহিদা তক্ষুনি মঞ্জুর। কাগজের রিপোর্ট দু'দলের খেলোয়াড় আর ম্যানেজাররা আগামীকালই এসে পড়ছে। উঠছে বাঁকিপুর ফোর স্টার হোটেলে। এই হোটেলের উলটো দিকেই শু-ফ্যাক্টরির মালিক নটবরলালের বাঁকিপুরের বিশাল বাগানবাড়ি। পিন্‌ডিদার চাই একজন প্লেন ড্রেসের ফোটোগ্রাফার, আর চাই এখানকার নামী কাগজের দুটো প্রেস কার্ড।

পরদিন সকালে প্রেস-কার্ড হাতে এল, বিকেলের আগেই প্লেন ড্রেসের ফোটোগ্রাফার হাজির। পিন্‌ডিদা আমাকে আর ফোটোগ্রাফারকে নিয়ে জিপে উঠে পড়ল। ফোনে জেনে নেওয়া হয়েছে হেভি-ওয়েট ফুটবলের দু'পক্ষের খেলোয়াড়রা সকালেই এসে গেছে। জিপ বাঁকিপুর নটবরলালের বাগান বাড়ির দিকে ছুটছে। কাগজে আছে, দু'পক্ষের খেলোয়াড়রাই এই দিন বিকেলে আর পরদিন সকালে নটবরলালের বাগানবাড়ির বিশাল লনে অনুশীলন করবে।

মিনিট কুড়ির মধ্যে জিপ নটবরলালের বাগানবাড়ির গেটের সামনে উপস্থিত। খেলোয়াড়দের অনুশীলন দেখার জন্যে সেখানে বেশ ভিড় জমে গেছে। গেটের সামনে মোতায়েন প্রহরী দুজন কাউকেই ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছে না। আমরা গটগট করে নেমে গেটের সামনে এলাম। দু'দলের খেলোয়াড়ই লনে হেভি-ওয়েট্ বুট পরে খালি গায়ে অনুশীলন করছে। দু'দিকে দুটো সাময়িক গোল-পোস্টও করে দেওয়া হয়েছে। বেশির ভাগ প্লেয়ারেরই তাগড়াই চেহারা। কিন্তু বুটের ভারে কেউ জোরে ছুটতে পারছে না বা শট নিতে পারছে না। নানা জায়গা থেকে নানারকম চেহারার লোকই বাছাই করা হয়েছে বটে।

একজন প্রহরীর হাতে পিন্‌ডিদা একটা প্রেস-কার্ড দিয়ে বাদশাই চালে বলল, নটবরলালজি কো, জলদি!

কার্ড হাতে প্রহরী ছুটল। শৌখিন পোশাকের বেঁটে-খাটো একটি লোকের হাতে কার্ড দিল। লোকটি ঘুরে একবার গেটের দিকে তাকাল। তার পাশেই ওই রকম ভারী বুট-পরা দু'জন লোক আর দু'জন এমনি পোশাক-পরা লোক দাঁড়িয়েছিল। ওই বুট-পরা লোক দু'জন হাফ-প্যান্ট পরে কিন্তু গায়ে সিল্কের রঙিন চকচকে গেঞ্জি।

দারোয়ানটা আবার গেটের দিকে ছুটে আসছে। ওই চারজনও হাসিমুখে কথা বলতে বলতে গেটের দিকে আসছে। পিন্‌ডিদা খাটো গলায় বলল, নটবরলালের দু'পাশের চারজন হল দু'দলের কোচ আর ম্যানেজার।

দৌড়ে এসে প্রহরী সেলাম বাজাল, আইয়ে হুজুর। তার আগেই অন্যজন গেট খুলে দিয়েছে।

আমরা ভিতরে ঢুকলাম। পিন্‌ডিদার বাঁ হাতে একটা দোমড়ানো রুমাল। কেবল আমি জানি ওতে ছোট্ট মেটাল ডিটেকটার লুকনো আছে। গরম তেমন নেই কিন্তু পিন্‌ডিদার কপালের ঘাম মোছার দরকার হচ্ছে।

নটবরলাল হাসিমুখে আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে হাত বাড়াল। পিন্‌ডিদার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করতে করতে বলল, প্রেস থেকে তোমরাই প্রথম—

পিন্‌ডিদারও তেমনি জবাব, বড় কাগজের রিপ্রেজেনটেটিভ কারও পিছনে আসে না।

তার অনুমান মিথ্যে নয়। হাফ-প্যান্ট আর ভারী বুট পরা লোক দু'জন দু'দলের কোচ, আর দু'জন ম্যানেজার। নটবরলাল পরিচয় করিয়ে দিতে আর এক দফা হ্যান্ডশেকের ঘটা। পিন্‌ডিদা ঘুরে তাকিয়ে ইশারা করতে ফোটোগ্রাফার এগিয়ে এল। তারা হাসি মুখে লাইন করে দাঁড়িয়ে গেল। মাঝখানে বেঁটে-খাটো নটবরলাল, তার দু'দিকে একজন করে কোচ আর ম্যানেজার।

....আমি লক্ষ করছি। এই পাঁচজনের কার চেহারাই পছন্দ হচ্ছে না। দুই কোচ আর দুই ম্যানেজারের পরিচয় হেভি-ওয়েট্ বক্সার হলেই বেশি মানাত। বেঁটে নটবরলালের খুদে চোখ দুটো যেন পেল্লায় ইঁদুরের দুটো চোখ। নাকের নিচে এক ইঞ্চিটাক থুবড়ানো গোঁফ।

ফোটো তোলা হতে পিন্‌ডিদা হেভি-ওয়েট্ বুট সম্পর্কে নানা প্রশ্ন শুরু করল। এত ওজনের বুট পরে হাঁটতে কেমন লাগে, দৌড়াতে কেমন লাগে, বলে শট নেবার সময় কেমন লাগে, শট নিলে গোলার মতো ছোটে কি না। একজন কোচের বুট টিপে টিপে দেখতে গেলে সে হাসি মুখে তার বুট জোড়া খুলে দিল। বলল, দেখে কৌতূহল মেটাও।

খুশি হয়ে পিন্‌ডিদাও দুটো হাতে তুলেই বলে উঠল, বা-বাবাঃ, এ তো তিন কেজি কেন, পাঁচ কেজি ওজন মনে হচ্ছে!

বুটের মালিক হেসে জবাব দিল, তোমার বডি-ওয়েট তাই তো মনে হবে। পিন্‌ডিদার হাতে ঘাম-মোছা দোমড়ানো রুমাল, খুব আগ্রহভরে বুট-জোড়া উলটে-পালটে দেখল, গন্ধও শুঁকল, তারপর নিজের জুতো খুলে ওই বুট-জোড়া পরে কষে ফিতে বেঁধে হাঁটতে আর একটু ছুটতে চেষ্টা করে সক্কলকে হাসাল। চলচল করছে, আছাড় খেতে খেতে বাঁচল।

আবার সকলের সঙ্গে অন্তরঙ্গ করমর্দন। তারা পাঁচজন সৌজন্যের সঙ্গে আমাদের গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল। পিন্‌ডিদার কাঁধে নটবরলালের হাত। যাবার আগে পিন্‌ডিদার চিনি-মুখ করে বলল, ফির মিলুঙ্গা—

অফ কোর্স, অফ কোর্স!

দারোয়ান দুটো ড্যাবড্যাব করে পিন্‌ডিদাকে দেখছে। ভাবছে হয়তো, মালিক এত খাতির কাকে করছে!

জিপে এবারে আমি আর পিন্‌ডিদার পিছনে বসেছি। আনন্দে আর উত্তেজনায় পিন্‌ডিদা কাঁপছে। আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল, কেল্লা ফতে! হাতে মেটাল-ডিটেকটারের যা গুরগুর শব্দ না, ভয় হচ্ছিল ওরাও না শুনতে পায়!

আমি দ্বিধাভরে বললাম, লোহা দিয়েও তো বুটের ওজন বাড়ানো হতে পারে—

খেঁকিয়ে উঠল, লোহার শব্দ আর সোনার শব্দ একরকম হবে! তাছাড়া এরকম খেলা খেলানোর আর কোনও অর্থ থাকতে পারে?

সেটা অবিশ্যি!

এখন ও. সি. হাজারিলালেরও মেজাজ তুঙ্গে। তারও বদ্ধ বিশ্বাস, রাঘব বোয়ালটি এবারে জালে পড়বেই। আট-ঘাট বেঁধে সে প্রস্তুত।

খেলা শুরু হয়েছে। মাঠে হইচই হাসি-হুল্লোড়ের ধুম পড়ে গেছে। কোনও মতলবের কথা জানা না থাকলে ভারী উপভোগ্য আর জম-জমাট ব্যাপারই বটে। বল নিয়ে কেউ প্রাণপণে ছুটতে চেষ্টা

করেও ছুটতে পারছে না, শট নিতে গিয়ে বুটের ভারে মাটি খুবলে তোলা হচ্ছে, আস্তে পাস করতে গেলে বল সাঁ করে গুলির মতো বেরিয়ে যাচ্ছে, বুটের ওজনে দু'পক্ষের খেলোয়াড়দের সে কী লপটা-লপটি কাণ্ড। গোলের সামনে বল, এদিকে খেলোয়াড় বল দখলে রেখে প্রাণপণে ছুটছে, কিন্তু ভারি বুটের ছোঁয়ায় বল বেশি এগিয়ে গেছে, ওটা আগে ধরার জন্য গোল-কিপারও প্রাণপণে ছুটে আসতে চেষ্টা করছে। শেষে দেখা গেল কলিশন বাঁচাতে দুই বিপক্ষের খেলোয়াড় দু'দিকে সরে গেছে, ফাঁকা গোলের দিকে বল গড়াচ্ছে। স্টপার এসে হুমড়ি খেয়ে ওটার ওপর বুক দিয়ে পড়ে গোল আটকাল, পা দিয়ে আটকাতে গেলে বুটের ঠোক্করে ওটা যদি গোলে গিয়ে ঢোকে!

এক ঘণ্টার ভীষণ উত্তেজনার পরে রেজাল্ট, টু-নিল। পিন্‌ডিদা আর আমিও লক্ষ করেছি, ভালো খেলোয়াড়ের দল নয় (ভালো খেলোয়াড় কে তা বোঝা-ই গেল না), যে দলের দম আর শরীরের তাগত বেশি তারাই জিতল। খেলা শেষ হবার চার মিনিট আগে আমি আর পিন্‌ডিদা দলের বাকি চারজনকে ক্লাব হাউসে চলে যেতে বলে সিট ছেটে উঠে পড়লাম।

সময়ে খেলা শেষ। শিল্ড দেওয়া, প্রাইজ দেওয়া হয়ে গেল। দু'পক্ষের বাইশজন খেলোয়াড়, ছ'জন রিজারভ, এক জোড়া লাইনসম্যান আর রেফারি টেন্টের দিকে চলল।

টেন্টের চারদিক পুলিস ঘেরাও করে রেখেছে। যারা দেখল তারা ধরে নিল খেলোয়াড়দের নিরাপত্তার জন্যে এই রাজসিক ব্যবস্থা। হাজারিলালের কাজে খুঁত নেই। বিরাট ক্লাব টেন্টের ভিতরে যে নাটক হচ্ছে বাইরে থেকে কেউ তা কল্পনা করতে পারবে না! প্লেয়ার, লাইনসম্যান, কর্মকর্তাসহ তিন ডজন লোকের নাকের ডগায় এক ডজন রিভলভার ঘুরছে। একমাত্র নটবরলাল আর তার ম্যানেজার নন্দ মাহাতোর দু'জোড়া চোখ পিন্‌ডিদা আর আমার মুখের ওপর ধক্-ধক্ করে জ্বলছে। বাকি সকলে পুতুলের মতো বসে।

এদিকে আমার আর পিন্‌ডিদার মুখ-বুক শুকিয়ে আসছে। হাজারিলালের আনা এক্সপার্ট লোক মেশিনে চোখের পলকের এক-এক জোড়া ওই পেল্লায় ভারী বুট শাতার মতো কচকচ করে কেটে চলেছে। কিন্তু কোনওটার থেকে এক চিলতে সোনা বেরুচ্ছে না। কেবল চামড়া আর চামড়া। মাঝে মাঝে দুই এক লেয়ার লোহার পাত! কোচ লাইনসম্যানকে ধরে দু'দলের বত্রিশ জোড়া বুটের মধ্যে ষোল-সতেরো জোড়া টুকরো টুকরো করে কাটা হয়ে গেল—কিন্তু কোথায় সোনা? এক-এক জোড়া বুট ফালা ফালা করা হচ্ছে আর হাজারিলালের মুখ বাঘের মতো হিংস্র ভয়ংকর হয়ে উঠছে।

হঠাৎ লক্ষ করলাম পিন্‌ডিদা মরিয়া হয়ে কিছু যেন খুঁজছে। চারদিকে তাকাচ্ছে, বড় তক্তপোশগুলোর তলায় উঁকি দিচ্ছে, উঠে গিয়ে চার-দিকের আনাচ-কানাচ দেখছে। বুটের মধ্যে সোনা না পেয়ে পিন্‌ডিদার মাথা খারাপ হয়ে গেল কিনা বুঝছি না। অদৃষ্টে আমাদের কী যে আছে কে জানে। থেকে থেকে নটবরলাল দাঁত কড়মড় করে হাজারিলালের উদ্দেশে শাসাচ্ছে, আমি দেখে নেব তুমি কত বড় অফিসার, এই ধৃষ্টতার ফল তুমি জন্মের মতো টের পাবে। হাজারিলালের দু'চোখ আমার আর পিন্‌ডিদার মুখের ওপর ঘোলাটে লাল। আবার লক্ষ করলাম দু'দলের দুই কোচ আর দুই ম্যানেজারের চোখও যেন আমাদের মাথা দুটো কাঁচা চিবিয়ে খাচ্ছে। কেবল প্লেয়াররাই হতভম্ব ননীর পুতুল। কী ব্যাপার তারা এখনও বুঝছে না।....কিন্তু পিন্‌ডিদা হঠাৎ এমন পাগলের মতো কী খুঁজছে? তার চোখ জোড়াও তো অস্বাভাবিক! এক ফাঁকে চুপি-চুপি জিগেস করলাম, কী খুঁজছ পিন্‌ডিদা?

অস্বাভাবিক জ্বলজ্বলে দু'চোখ আমার দিকে ঘুরিয়ে পিন্‌ডিদা বিড়বিড় করে বলল, দেখছিস না? আরও যা থাকার কথা নেই কেন? একটাও নেই কেন?

বলতে বলতে কাচের আলমারিগুলোর দিকে চলে গেল। ভয়ে আর উত্তেজনায় পিন্‌ডিদার মাথাই খারাপ হয়ে গেল? টেন্টে আর কী থাকার কথা—কী নেই?

ওদিকে বিশ-জোড়া বুট কাটা হয়ে গেছে। সোনা মরীচিকা।

হঠাৎ লক্ষ করলাম পিন্‌ডিদা নেই। এদিক ওদিক কোথাও নেই। আমার বুকের ভিতরটা ধুকপুক করে উঠল। বেগতিক দেখে কোন ফাঁকে সটকান দিল? বাইরের পুলিসের লোক তাকে চেনে, বাধা দেবে না। কিন্তু এভাবে পালিয়ে লাভ কী?

.....চব্বিশ জোড়া বুট কচুকাটা হয়ে গেল। একে একে ছাব্বিশ জোড়া আটাশ জোড়া তিরিশ জোড়া বত্রিশ জোড়া। টেন্টের মধ্যে চামড়ার স্তূপ। পিন্‌ডিদা সরে পড়ার এক ঘন্টার মধ্যেই সমস্ত বুটনিধন পর্ব শেষ। হাজারিলালের সামনে এসে নটবরলাল গলা দিয়ে বিষ ঢালল, নাও অফিসার, হোয়াট নেক্সট, আমার সম্মানিত অতিথি প্লেয়াররা এখন খালি পায়ে হোটেলে ফিরতে পারে কি পারে না?

হাজারিলাল কেবল মাথা নাড়ল, পারে। হ্যাঁ, সব থেকে বড় ঝড়টা এখন তার মাথার ওপরেই।

তার রেজিমেন্ট দুটো ট্রাকে ফিরছে। আমি আর কয়েকজন হাজারিলালের ভ্যানে। থমথমে গলায় হাজারিলাল বলল, তোমাদের লিডার পিন্‌ডি চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে—কেমন? এক সগ্‌গে ছাড়া তোমাদের আর পালাবার জায়গা নেই, বুঝলে? তোমাদের মতো ইডিয়েট রাসকেল অর্বাচীনের কথায় ভুলে তিন কেজি ওজনের জোড়া-জোড়া বুট কেটে কেবল আমিই কচুকাটা হব ভেবেছ? তোমাদেরও অ্যাডভেঞ্চারের সাধ এ-জীবনের মতো ঘুচে যাবে—বুঝলে ছোকরা?

আমার বুকের ভিতরটা হিম। জেলে পুরলে ভয় করি না, বাবা ঠিক ছাড়িয়ে আনবে—কিন্তু কথা শুনে মনে হচ্ছে গায়ের ছাল-চামড়া ছাড়াবে।

পিন্‌ডিদা ক্লাব-হাউসেও নেই।

আমাদের জিপটা দাঁড়িয়ে আছে। হাজারিলাল তার দু'জন অফিসারকে রেখে গেল। হুকুম, পিন্‌ডি ফিরলেই আমি যেন তাকে নিয়ে থানায় যাই—আগে কাগজপত্র যা তৈরি করার করতে হবে, তার পরে কার বরাতে কী আছে দেখা যাবে।

আমাকে দেখেই হাবুল কেবলু কার্তিক চটপটি ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল। হেভি-ওয়েট ফুটবল খেলা দেখতে বসে তারা তো সব জেনেই গেছল। তিরিশ হাজার টাকার পুরস্কার পকেটে এসেই এসে গেছে ধরে নিয়েছিল। কিন্তু হাজারিলাল আর অন্য পুলিসদের আর সেই সঙ্গে আমারও মুখ দেখে সমাচার কুশল নয় বুঝেছে।

সব শোনার পর ওরাও আঁতকে উঠল। ভয়ে মুখ চুন সকলের।

ওরা বসে। আমি পাগলের মতো ঘরে পায়চারি করছি। পিন্‌ডিদা গেল কোথায়? বর্ধমান পালাল? তা হতে পারে না। পালিয়ে পার নেই এটুকু বুদ্ধি তার আছে। কিন্তু রাত আটটা বাজতে চলল এখনও তার দেখা নেই কেন?

....পাগলের মতো পিন্‌ডিদা টেন্টের মধ্যে কী খুঁজছিল? খুঁজতে খুঁজতে তার চোখ অমন অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল কেন? আমি জিগ্যেস করতে বলেছিল, দেখছিস না—আরও যা থাকার কথা নেই কেন? একটাও নেই কেন?

ভাবতে ভাবতে আমি মাথার চুল ছিঁড়ছি। আরও কী থাকার কথা? একটাও কি নেই? মাথা খুঁড়ে চিন্তা করছি টেন্টে কী কী থাকে, তার মধ্যে ওই টেন্টে কী ছিল না। এই একটা উত্তর খুঁজে পাবার মধ্যে যেন আমাদের মরা-বাঁচা।

রাত পৌনে ন'টা। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। আমি কী একটা রামছাগল! নিজে প্লেয়ার হয়ে এ-কথাটা এতক্ষণ ধরে আমার মাথায় এল না?.....তাই যদি হয় পিন্‌ডিদার তো তাহলে ভীষণ ভীষণ ভীষণ বিপদ এখন!

চিৎকার করে উঠলাম, কেবলু কার্তিক চটপটি হাবুল! শিগ্‌গির চল! এক মিনিটও দেরি করার সময় নেই, পিন্‌ডিদাকে খতম করে পাখি হয়তো এতক্ষণে উড়েই গেল। আঃ, হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকিস না—বেরিয়ে আয় সব!

অফিসার দু'জনকে জিপে তুলে নিয়ে আমরা পাঁচ মিনিটের মধ্যে থানায়। হাজারিলাল গুম হয়ে বসেছিল, রক্তচক্ষু মেলে আমাদের সমস্ত দলটিকে দেখে খিঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। তার আগেই আমি উত্তেজিত গলায় বলে উঠলাম, হাজারিলালবাবু, আর এক মিনিটও নষ্ট করার মতো সময় নেই, চোরাই সোনা উদ্ধার করতে আর পিন্‌ডিদার প্রাণ বাঁচাতে চান যদি, এক্ষুনি ট্রাক-বোঝাই পুলিশ নিয়ে আমার সঙ্গে চলুন—একবার ঠকেছেন, আমি বলছি আর ঠকবেন না!

হাজারিলাল কথা শুনে হোক বা আমার মূর্তি দেখে হোক, থতমতো খেয়ে গেল।—কোথায় যাবে?

—বাঁকিপুরে—নটবরলালের বাগানবাড়িতে—আমি বলছি দেরি হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে!

—আবার নটবরলাল—কেন সেখানে যাবে? কী জেনেছ তুমি?

—সব, সব জেনেছি! টেন্টে বুট কেটে কেটে কিছুই যখন পাওয়া যাচ্ছিল না, পিন্‌ডিদা তখন পাগলের মতো কী খুঁজছিল লক্ষ্য করেছেন?

হাজারিলাল মাথা নাড়ল, করেছে। জিগেস করল, পিন্‌ডি কী খুঁজছিল?

—ডুপ্লিকেট বুট! প্রত্যেক প্লেয়ারের দু'জোড়া করে অন্তত বুট থাকবেই, আমরা স্কুলে ফুটবল খেলেছি, আমাদেরও আছে—এত বড় প্লেয়ার, এত বড় খেলা, ওদের একজনেরও ডুপ্লিকেট বুট নেই, এ কি হতে পারে? খেলার সময় তা টেন্টে থাকার কথা—নেই কেন? আমি বলছি, পিন্‌ডিদা ওদের ডুপ্লিকেট বুটের খোঁজে গিয়ে বিপদে পড়েছে, আপনি আর দেরি করবেন না—এবারও যদি ফেল করি, একবার গলা কাটা গেছে, না হয় আর একবার যাবে—খুব তফাত নেই, কিন্তু গলা বাঁচাতে হলে এই একটাই রাস্তা—আর দেরি না করে চলুন।

হাজারিলালের শিরে সংক্রান্তি। তাই আবারও আশা।

...আধ ঘণ্টার মধ্যে ট্রাক-বোঝাই আরমড্ পুলিশ আর ভ্যান নিয়ে আমরা বাঁকিপুরে নটবরলালের বাগানবাড়ি পৌঁছুলাম। গেটের প্রহরী দু'জন এত পুলিশ দেখে ভেবাচাকা খেয়ে গেল। তারা কিছুই জানে না। পিস্তলের ডগা উঁচিয়ে তাদের ভ্যানে তুলে নেওয়া হল। ভ্যান আর ট্রাক নিঃশব্দে বাগানবাড়ির ভেতরে গিয়ে থামল।

বাগানবাড়ি আলোয় ঝলমল করছে! বাইরে থেকে মনে হচ্ছে ভিতরে জনমানব নেই। কিন্তু প্রহরী দু'জন কবুল করেছে ভিতরে কারা আছে।

হাজারিলালসহ পাঁচজন সশস্ত্র অফিসার আর দশজন পুলিশের পিছনে আমরা ভিতরে চললাম। বাকি পুলিশেরা রাইফেল বাগিয়ে বাড়ির সামনে অপেক্ষা করতে লাগল।

ভিতরের একটা বড় ঘরের সামনে নটবরলালের গলা কানে আসতে আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম।

—হামিদ, রসুল আর ঘোড়েরামকে নিয়ে তুমি বেরিয়ে পড়ো, এই শয়তান ছোঁড়ার রক্ত খাবার জন্যে অনেকক্ষণ ধরে তোমার হাতের ছোরা লকলক করছে, ওকে সুবিধেমতো কোনও জায়গায় খতম করে ঝাঁঝার জঙ্গলের এমন জায়গায় পুঁতে রাখবে যাতে পৃথিবীর কেউ কোনদিন আর হদিস না পায়।

একটা গোঙানো আর্তনাদ কানে এলো। বোধহয় পিন্‌ডিদার গলা থেকেই।

—হোটেলের পার্টিতে যাবার সময় পার হয়ে যাচ্ছে, পত্তন সিং, যোসেফ, তোমরা দু'জন মার্কা-করা জুতোর বাক্স এনে সোনার পাতগুলো জায়গায় রেখে হোটেলে চলে এসো। নন্দ মাহাতো আর লাল্লু তোমরা দুজনও জলদি এই কাটা বুটের ঠিকি ফ্যাক্টরিতে চালান করে যত তাড়াতাড়ি পারো হোটেলে চলে এসো—

হাজারিলাল আর তার সশস্ত্র বাহিনী আচমকা ঢুকে পড়ে রিভলভার বাগিয়ে গর্জন করে উঠল, হ্যান্ডস আপ! কেউ নড়াচড়ার অবকাশ পেল না, প্রত্যেকের চিবুকে ঘাড়ে বুকে রিভলভার ছুঁয়ে আছে। হাজারিলাল আবার শাসাল, কেউ নড়েছ কি কুকুরের মতো গুলি করে মারব!

প্রত্যেকের দু'হাত মাথার ওপর। চোখের পলকে হা তা-কড়া পরানো হয়ে গেল।

যা দেখছি চক্ষুস্থির। সামনে থাকে থাকে ঠিকি দেওয়া সোনার ভারী পুরু পাত। ওগুলো সামনেই মেশিনে কাটা বুটের স্তূপ। একটা চেয়ারের সঙ্গে পিন্‌ডিদাকে পিছমোড়া করে বেঁধে রাখা হয়েছে। মুখে পুরু এক পাঁজা বুটের চামড়া গোঁজা। তার দিশেহারা দুই চোখ দিয়ে দরদর করে জল নেমেছে। সামনের ছোট টেবিলে একজোড়া রিভলভার। ঝকঝকে ছোরা হাতে যে লোকটা দাঁড়িয়েছিল সে-ই হামিদ হবে।

আমি ছুটে গিয়ে পিন্‌ডিদার মুখ থেকে বুটের চামড়া খুলে নিলাম। বাঁধা অবস্থায় পিন্‌ডিদার মাথাটা একদিকে ঢলে পড়ল। ককিয়ে বলে উঠল, সোনা—তোরা এসেছিস না আমি স্বপ্ন দেখছি—

রাত বেশি নয়। পিন্‌ডিদা ক্লাব-হাউসের ঘরে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। এক্ষুনি জ্ঞান হবে মনে হচ্ছে, একটু একটু নড়ছে, এক-একবার চোখ খুলতে চেষ্টা করছে। হাজারিলাল ছুটে গিয়ে দুধের গেলাসে কী একটু মিশিয়ে মুখের সামনে কাছে ঝুঁকল, পিন্‌ডিভাই, এক্ষুণি ঠিক হয়ে যাবে, এটুকু খেয়ে নাও তো!

হাজারিলালের কাছে এখন আমরা হীরের থেকে দামি, গলায় মধু ঝরছে। আমি অন্তত বুঝেছি দুধের সঙ্গে খানিকটা ব্রান্ডি মেশানো হয়েছে।

বার দুই শরীরটা একটু ঝাঁকুনি খেল, তারপর পিন্‌ডিদা চোখ মেলে তাকাল। ফ্যালফেলে চাউনি। আমার চোখ পড়তে টেনে টেনে বলল, তুই সত্যিই সোনা নাকি...আমি বেঁচে আছি, না লাশ হয়ে গেছি?...

আমি ঝুঁকে পড়লাম। —পিন্‌ডিদা, তুমি বেঁচে আছ—ভালো আছ! এই দেখো চটপটি, কার্তিক, হাবুল—এই কেবলু, পিন্‌ডিদাকে তোর সংস্কৃত শোনা না! হাজারিলাল বলল, আর এই যে আমি পিন্‌ডিভাই—তোমার হাজারিদাদা—আজ থেকে তোমরা সকলে আমার প্রাণের ভাই।

পিন্‌ডিদার এরপরে চনমনে হয়ে উঠতে সময় লাগল না। আমরা ঘটনা শুনলাম। একটু আড়াল থেকে হাজারিলালের লোক নোট নিতে লাগল।

...হ্যাঁ, বুট থেকে সোনা না বেরুতে পিন্‌ডিদা ডুপ্লিকেট বুটগুলোই খুঁজছিল। একটাও না দেখে এক ফাঁকে বেরিয়ে এসে ট্যাক্সিতে চেপে সোজা বাঁকিপুরে নটবরলালের বাগানবাড়িতে। পাহারাওলা দু'জন কিছু সন্দেহ করেনি, সকালে স্বচক্ষে তার খাতির-যত্ন দেখেছে, মালিক তাকে অপেক্ষা করতে বলেছে শুনে বসার ঘরে এনে বসিয়েছে। সে চলে যেতেই পিন্‌ডিদা অন্দরে চলে এসেছে, মতলব একজোড়া ডুপ্লিকেট বুট কাঁধের থলেতে ফেলে কোনও অজুহাত দেখিয়ে চম্পট দেবে। ওই ঘরে একজোড়া কেন, অন্তত পঞ্চাশ জোড়া বুট আর চামড়া-কাটা মেশিন।

কিন্তু হাত দিতে পারেনি। কে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে তার বুকের ওপর বসে ছোরা উঁচলো। ও-ই হামিদ। তার পিছনে আর একটা লোক। সে হল রসুল। হামিদের হুকুমে সে ছুটে মালিককে ফোন করতে গেল। আমার মনে পড়ল, টেন্টে নটবরলালের একটা ফোন এসেছিল বটে।

...ওই দু'জন ম্যানেজার আর দু'জন কোচ নটবরলালের দলের লোক। আসলে ওরাই সবকিছুর অর্গানাইজার। হামিদ পিন্‌ডিদাকে চেয়ারের সঙ্গে পিছমোড়া করে বেঁধে রেখেছিল। ওরা পাঁচজন এসেই পিন্‌ডিদার গালে এক-একজনে পাঁচ জোড়া করে চড় বৃষ্টি করল। মরিয়া হয়ে পিন্‌ডিদা শেষ চেষ্টা করল, বলল, আমার মাথায় কী রকম বুদ্ধি আছে প্রভু নটবরলাল, তুমি তার প্রমাণ পেয়েছ, আমাকে প্রাণে না মেরে তোমার দলে নিয়ে নাও, আমি চিরজীবন তোমার দাস হয়ে থাকব।

শুনে নটবরলালের সে কি হি-হি হাসি। তার ইশারায় একজন পিন্‌ডিদার মুখে বুটের চামড়া গুঁজে দিয়ে কথা বন্ধ করল। ততক্ষণে কচকচ করে মেশিনে ডুপ্লিকেট বুট কাটা শুরু হয়ে গেছে, আর তার থেকে ভারী ভারী সোনার পাত বেরুচ্ছে। পিন্‌ডিদা একটু নড়লে বা শব্দ করতে চেষ্টা করলে নটবরলাল রিভলভার তোলে আর হামিদ গলায় ছোরাটা গলায় ঠেকায়।

শব্দ না করেও পিন্‌ডিদা প্রাণপণে বোবা আর্তনাদ করে যাচ্ছিল। করতে করতে শরীরের রক্ত জল হচ্ছিল আর শরীর অবশ হয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ স্বপ্নই দেখল মনে হল, পুলিশ এসেছে আর শিষ্যরা সব এসেছে।

কাগজের লোকের হামলায় রাত প্রায় দুটো পর্যন্ত আমরা চোখের পাতা এক করতে পারিনি। পরদিন সকালে কাগজ পড়ে পাটনা শহরে হইচই ব্যাপার। জনতার অভিনন্দের ঝড় থেকে বাঁচাতে হাজারিলালকে পুলিশ দিয়ে আমাদের আগলে রাখতে হয়েছে।

আমরা পাঁচজন আর পিন্‌ডিদা এক ঘরে। বললাম, এবার, এখান থেকে পালাই চল পিন্‌ডিদা–

–পালাব মানে! পিন্‌ডিদা খেঁকিয়ে উঠতে গেল। –তিরিশ হাজার টাকার প্রাইজ নিতে হবে না? তাছাড়া হাজারিলালের কাছ থেকে আরও কত কী আদায় করি দ্যাখ্ না–রিসেপশন পাব, যাতায়াতের ফার্স্ট ক্লাস ফেয়ারও পাব।

কার্তিক জিগেস করল, প্রাইজের টাকা পেতে দেরি হবে না?

–হলে হবে, তোদের তাড়া থাকে তো চলে যা, তোদের তো কোনও কাজ নেই, আমি আর সোনা থাকলেই হবে। গম্ভীর। –শোন্ সোনা, এবারের সমস্ত ব্যাপারটা কেবল তোর আমার মধ্যে, যদিও বলতে গেলে আমিই সব করেছি। আমার মনে হয়, প্রাইজের কুড়ি হাজার টাকা আমার আর দশ হাজার তোর–এই ভাগটাই ঠিক হবে।

সঙ্গে সঙ্গে তেতে উঠলাম। চটপটি কেবলু কার্তিকের মুখ শুকনো। বললাম, দেওঘরের ব্যাপারটাও কেবল তোমার আমারই ছিল–সেই প্রাইজের টাকা ক্লাব-ফান্ডে গেছে।

পিন্‌ডিদা দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠল। –কিন্তু গলায় হামিদের ছোরা আর নটবরলালের রিভলভারের সামনে তো কেবল আমাকেই পড়তে হয়েছিল।

–দেওঘরে কেবল আমাকেই পড়তে হয়েছিল।

–তাহলে আমার আর তোর আলাদা করে কিছু প্রাপ্য নেই বলতে চাস?

হেসে বললাম, সত্যি বলতে কী ষোলো আনার চোদ্দ আনাই তোমার প্রাপ্য। কিন্তু ঠিক সময়ে গিয়ে না পড়লে তোমার ঝাঁঝার জঙ্গলে লাশ হয়ে মাটির তলায় থাকার কথা–তাই তোমার ওই চোদ্দ আনাও আমাদেরই প্রাপ্য। আমাদের ভাগ্যের জোরে তুমি বেঁচে আছ যখন, সবটাই এখন সকলের প্রাপ্য, মানে ক্লাব-ফান্ডের প্রাপ্য। তাছাড়া আমাদের এ-যাত্রার ক্যাপিটালও ওই ক্লাব-ফান্ড।

পিন্‌ডিদা তেরিয়া হয়ে চেয়ে রইল। তারপর দৃষ্টি বদলাল। হাসি চুঁয়ে চুঁয়ে গলে গলে পড়তে লাগল। বলল, সোনা রে, সত্যি তুই সোনার টুকরো একখানা। তোর আলাদা পাওয়ার লোভ আছে কি না আমি সেই পরীক্ষা করছিলাম–

আমি বলে উঠলাম, থ্রি-চিয়ারস্ ফর পিন্‌ডিদা!

সকলে হইচই করে আমার সঙ্গে গলা মেলাল।

# পিন্‌ডিদার দেড় ব্যাটারি

প্রথমেই বলে রাখি, দেড় ব্যাটারি কথাটার চালু ভাবার্থ আদৌ ব্যাটারি সংক্রান্ত কিছু নয়। আসলে শব্দ দুটো বিশুদ্ধ শ্লেষের চাবুক। অর্থাৎ অমায়িক গোছের একখানা উঁচু স্তরের গালাগাল। যেমন কালো মগজে বুদ্ধির ঘাটতি দেখলে চৌকস লোকটি তাকে গোরু গাধা স্টুপিড নন্‌সেন্স না বলে মোলায়েম সুরে যদি বলে, দেড় ব্যাটারি দিয়ে আর কতকাল চালাবে বাবা, মগজের ভোলটেজ বাড়াতে চাও তো তিন ব্যাটারি বসাও—তাহলে সেটা হবে যাকে বলে মিছরির ছুরি। আবার মোটাসোটা বেঁটে-খাটো কেউ হয়তো হাঁসফাঁস করে চেষ্টা করছে কোনও কাজ দ্রুতগতিতে সেরে আসতে, কিন্তু সাধ্যে কুলোচ্ছে না, তখন যদি সহানুভূতির সুরেও কেউ বলে, আহা, দেড় ব্যাটারিতে চলছে দেখছ তো এর বেশি আশা করো কী করে? ওই লোকটি যদি ভালো মানুষও হয়, আর সহানুভূতির কথাগুলো যদি তার কানে যায়, তাহলে তারও শিরায় শিরায় রক্ত ফুটতে পারে, আর মাথায় খুন চাপতেও পারে। আক্ষরিক অর্থে দেড় ব্যাটারির অর্থ দেড়খানা ব্যাটারিই বটে, কিন্তু ভাবার্থে ওই শব্দ প্রয়োগের জের খুব নিরাপদ নয়। এবং সবল ভিন্ন দুর্বলের প্রতি এই শ্লেষের চাবুক হানার হিম্মত আর কার?

যাক্, পিন্‌ডিদার কথা বলতে পারি না। বর্ধমান বাবুঞ্জের মাঠে তার উঁচু ঢিবির আসনে বসে তার প্রিয় শিষ্য হাবুলের এত গর্বের 'হি-ম্যান টু-ইন-ওয়ান' রেডিও-ক্যামেরার রক্ত গরম করা ধারাবিবরণীও মন দিয়ে শুনছে কি না বোঝা যোচ্ছে না। ঠাকুমার থেকে চেয়ে আমারই আনা চিঁড়ে-মুড়ির মোয়া আর নারকেলের নাড়ু ধীরে-সুস্থে চিবুচ্ছে। পিন্‌ডিদার নাম করে চাইলে ঠাকুমা পরিমাণে বড় কম দেয় না। পকেটের টাকায় যখন টানাটানি পড়ে (বিশেষ করে মাসের শেষে), ঠাকুমারা হাত-বাক্সও যখন আমার হাতের টানে গড়ের মাঠ এবং মাসের গোড়ার সপ্তাহের আগে বাবার কাছ থেকে তাঁর মাসোহারা আসার সম্ভাবনাও নেই, পিন্‌ডিদার নাম করে তখন মোয়া-নাড়ুর ওপর দিয়েই চালিয়ে দিতে হয়। হ্যাঁ, পিন্‌ডিদার একটু গুণ-কীর্তন করতেই হয়। বর্ধমান বাবুগঞ্জের যে প্রদীপনারায়ণ দত্ত ফুটবল খেলার জাদু দেখিয়ে সমস্ত পৃথিবী মাত করে পি. এন. ডি থেকে ফুটবলেশ্বর পিন্‌ডি হয়ে বসেছে, তার কিন্তু খাওয়ার কোনও ব্যাপারে অরুচি নেই। বড় সাধকের মতোই সমস্ত খাওয়ার জিনিসকে সমচক্ষে দেখতে পারে।

পিন্‌ডিদা হল গিয়ে ঠাকুমার গোপাল-ঠাকুর, তার নাম করলে বুড়ির হাত দরাজ হয়ে ওঠে। ফলে পলিথিনের থলেতে মোয়া-নাড়ুর পরিমাণ কম ছিল না। ভাগ-বাঁটোয়ারার ভার বরাবরই কার্তিকের ওপর। ভাগ কেমন হবে তাকে বলা নিষ্প্রয়োজন। পিন্‌ডিদা, আমি (সোনা), কেবলু কার্তিক হাবুল আর চটপটি, কিন্তু ছ'জনের জন্য ভাগ হবে সাতটা। আমাদের পাঁচ ভাগ যার যার রুমালে, বাকি দু'ভাগ ওই পলিথিনের থলেতেই পিন্‌ডিদার। কোলের কাছে থলে টেনে নিয়ে কখনও নাড়ু কখনও মোয়া চিবুচ্ছে। তার মেজাজের তাপ-উত্তাপ বোঝা যাচ্ছে না। খুশিও না অ-খুশিও না, উৎসাহ নেই বিরক্তি নেই, বেশ একটা নির্লিপ্ত ভাব।

কিন্তু আমরা পাঁচ জন হাবুলের টু-ইন-ওয়ানে হুমড়ি খেয়ে আছি, স্নায়ুর রক্ত ওঠা-নামা করছে। ওয়ান এর অর্থাৎ ক্যামেরার সুইচ বন্ধ, এখন একটাই চলছে, সেটা রেডিও বা ট্রানজিস্টার, সকলের বাড়িতেই আছে, কিন্তু মাঠে পিন্‌ডিদাকে ঢিবির আসনে বসিয়ে বাকি পাঁচজন গোল হয়ে বসে রিলে শোনার মধ্যে একটু অন্য রকমের রোমাঞ্চ আছেই। পিন্‌ডিদার খুব বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করা যাবে কী করে—এ খেলা তার কাছে ছেলেখেলা বই আর কি? কিন্তু আমাদের কাছে এ-খেলাই তো চরম উত্তেজনার ব্যাপার! লিগ খেলা, খেলছে ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগান! মোহনবাগান দুই-এক গোলে জিতছে। আর মাত্র দশ মিনিট কাটিয়ে দিতে পারলেই আমাদের টান-টান স্নায়ুগুলো শিথিল

হতে পারে। পিন্‌ডিদাকে না হয় আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় হিসেবে বাদই দিলাম, তার কৃতিত্ব ভৌগোলিক সীমার ঊর্ধ্বে, কিন্তু বাকি পাঁচ জনের চারজনেই আমরা মোহনবাগানের একাত্ম সাপোর্টার, কেবল কেবলু বংশ পরিচয়ের দিক থেকে পূর্ব বাংলার। ও কেন, ওর বাবাও কখনও পদ্মা পাড়ি দেয়নি, ফলে কেবলু নিজেকে এই বাংলার ছেলে বলেই চালায় আর আমাদের মতো মোহনবাগানের সাপোর্টারই হতে চায়। কিন্তু দলে বিপক্ষের একজন না থাকলে চলে? ফলে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলা হলে ওর পেছনে আমরা লাগতে ছাড়ি না।

খেলা শেষ হবার তিন মিনিট আগে ইস্টবেঙ্গল ঘাটতি গোলটা শোধ করে বসল। খেলার রেজাল্ট শেষ পর্যন্ত টু-অল্। এই খেলটার ওপর অনেক নির্ভর করছিল, পয়েন্ট সমান ভাগ হয়ে যেতে আবার সেই অনিশ্চিত অবস্থা, খেলার সময় চটপটিই উত্তেজনায় সব থেকে বেশি লাফালাফি করছিল। কেবলু তেরছা চোখে তার দিকে চেয়ে মন্তব্য করল, ঢ্যাঢ্যাং ঢ্যাঢ্যাং মা কুরু মা ফলেষু কদাচন।

সংস্কৃত বুলি শুনলে যার মাথায় রক্ত ওঠে সেই পিন্‌ডিদাও মুচকি হাসল একটু।

হাবুল ঘাসের ওপর একটা ছোট তোয়ালে পেতে হি-ম্যান টু-ইন্-ওয়ানকে রেখে তার মাথায় তেমনি আর একটা ছোট তোয়ালে চাপিয়েছিল। রিলে শেষ হতে সদ্যোজাত শিশুর মতো অতি যত্নে যন্ত্রটি কোলে তুলে নিয়ে তোয়ালে দিয়ে পরিষ্কার করতে করতে করতে পিন্‌ডিদার দিকে চেয়ে বলল, এর তিন ব্যাটারিতে একশটা ফ্ল্যাশ ছবি তোলা যায়, ছবি না তুললে টানা কতক্ষণ রেডিও চলতে পারে সে-হিসেব এখনও করিনি—

ইন্সটলমেন্টে এটা কেনার পর থেকে এক ঘুমনোর সময়টুকু ছাড়া হাবুল সর্বদা তার এই যন্ত্রের জিনিসটাকে নিয়ে বিভোর। কিছুদিন আগে হাবুলের বাবা মারা যেতে (মা আগেই গত হয়েছিল) ভায়েদের মধ্যে জমি-জমা আর বাড়িটা ভাগ হয়ে গেছে। বাপের শোকে ভাগের জমি বিক্রি করে দিতে হাবুল বেশি সময় নেয়নি, তার থেকে অর্ধেকেরও বেশি খরচ করে তার স্টুডিওর মালিককে ধরে বাইরে থেকে এই হি-ম্যান টু-ইন্-ওয়ান আনিয়েছে। প্রচুর দাম জিনিসটার, বাকি টাকা স্টুডিওর মালিক ওকে ধার হিসেবে দিয়েছে। সে মাস-মাইনের তিন ভাগের এক ভাগ কেটে নেয়, ইন্সটলমেন্টে এই ধার শোধ হতে আরও বছর দুই লাগবে। জিনিসটি হাবুলের হলেও এত দামি জিনিস থাকবে তো স্টুডিওর জিম্মায়, তাতে স্টুডিওর কিছু পাবলিসিটি হবে। ছবির সংখ্যা হিসেবে ব্যাটারির দাম দিতেও স্টুডিও মালিকের আপত্তি করার কোনও কারণ নেই। এই ক্যামেরার জন্যে আলাদা হিসেবের খাতা খোলা হয়েছে। স্টুডিওর জন্যে প্রতি একশ ফ্ল্যাশ ছবি তোলা হলে মালিক এক সেট ব্যাটারি দেবে। স্টুডিওর অবস্থা এখন রমরমা আর ক্যামেরা-অন্ত প্রাণ হাবুলও তার নেক নজরের কর্মচারী, তারই আনুকূল্যে ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে হাবুল তার এই স্বপ্নের সম্পদটি পেয়ে গেছে। আজই প্রথম মাঠে এনে এটির রেডিও-মহড়া দিল, এরপর ফ্ল্যাশে সকলের একটা গ্রুপ ছবি তোলার কথা।

এক পিন্‌ডিদা ছাড়া হাবুল আর সকলের ওপর মহা বিরক্ত। এমন একটা জিনিসের প্রতি কারও কৌতূহল নেই, এখন খেলার তর্কে নেমেছে। খানিক চুপ করে থেকে গাঁ-গাঁ করে বলেই উঠল, দেখলে পিন্‌ডিদা, কেবল তুমি ছাড়া কেউ এর মর্ম বোঝে? এরপর ছবি তোলা হবে তা পর্যন্ত কারও মাথায় নেই!

নির্লিপ্ত মুখের গহ্বরে শেষ দুটো নারকেলের নাড়ু ফেলে ধীরে-সুস্থে চিবুতে চিবুতে পিন্‌ডিদা নির্লিপ্ত জবাব দিল, আজ 'হাফ' (অর্ধেক) হয়েছে এই ভালো, এরা 'হাফ'-এর ভক্ত—আমি অনেকদিন আগেই বুঝেছি...তাছাড়া এই দিনটাও সবেতে যেন হাফা-হাফির দিন, হাফে পুরোটার আনন্দ।

পিন্‌ডিদা মুখ খুলেছে, এবার আমাদের সকলেরই তার দিকে মনোযোগ। কেবলু আগের সংস্কৃত মন্তব্য ঝেড়ে বসল, পণ্ডিতঃ অর্ধং ত্যজন্তি।

পিন্‌ডিদাকে ভুরু কোঁচকাতে দেখে চটপটি খেঁকিয়ে উঠল, কেবলুর কপালে অশেষঃ ভোগান্তি ভবন্তি।

এবারে আমি উৎসুক এবং অগ্রণী, সবিনয়ে প্রশ্ন করলাম—আমরা 'হাফ'-এর ভক্ত আর এই দিনটা সবেতে হাফাহাফির দিন মানে পিন্‌ডিদা?

—মানেটার মধ্যে কঠিন কী দেখলি। ...হেবোর হি-ম্যান- টু-ইন-ওয়ানের হাফ্ কাজ দেখেই পুরো আনন্দ পেলি, ফুটবল লিগের রেজাল্টও হাফাহাফি হল, কিন্তু তোদের একসাইটমেন্ট পুরোটা হল, বাড়ির আনা চিঁড়ের মোয়া নারকেলের নাড়ু চালিয়ে পুরো ভোজের আনন্দ দিতে চাইলি—আরও শুনবি?

আমরা চেয়ে আছি।

পিন্‌ডিদা বলল, আসার আগে বিনোদ ডেকে তার নতুন কেনা কী একটা আভেন দেখিয়ে বলল, হাফ আঁচে ধিকি ধিকি সেদ্ধ হয়ে বা ঝলসে ওতে আপনা থেকেই মসলা মাখানো মুরগির রোস্ট বা তন্দুরি বা পাঁঠা খাসির বটি কাবাব হয়ে যায়—আর খেতে পুরো আঁচে তৈরি থেকে ডবল টেস্টফুল হয়। কাল ও চিকেন-তন্দুরি দিয়ে স্টার্ট করবে বলল।

পিন্‌ডিদার জুলজুল করে আমার দিকেই সোজা চেয়ে আছে। আমি তক্ষুনি গার্ড নেওয়া অর্থাৎ সতর্ক হওয়া দরকার বোধ করলাম। হেসে তাচ্ছিল্যের সুরে বললাম, ওর কেবল ব্যবসার চমক বাড়ানোর ধান্দা।

পিন্‌ডিদাকে চিকেন-তন্দুরি থেকে সরানোর চেষ্টা আমার।—আমরা 'হাফ্'-এর ভক্ত এ তুমি অনেকদিন আগেই বুঝে নিয়েছ তার মানে কী?

—বুঝব না? একটা ঘটনার হাফ শুনেই তোদের এমন মন ভরে গেল দেখলাম যে বাকি হাফের কথা আর জিগেসই করলি না কেউ।

আমরা হতভম্ব। আর চুপ করে থাকা যায়? বললাম, হাফ গল্প শুনে আমাদের মন ভরে গেল, বাকি অর্ধেকের কথা জিগেসই করলাম না—এটা কোন গল্প?

—গল্প নয়, ঘটনা—বুঝলে উড্-বি স্কলার? কী দিন হয়েছে আজকাল, এই মেমরি নিয়েও তুই স্কলারশিপ পেতে চলেছিস?

মাথার ঘিলু চষেও মনে পড়ল না। কোন গল্পের, থুড়ি, ঘটনার অর্ধেক শুনেই আমাদের মন ভরে গেছল যে বাকি অর্ধেক আর শুনতেই চাইনি! কেবলু কার্তিক চটপটিও যথার্থ চিন্তিত।

পিন্‌ডিদার গলায় ব্যঙ্গ ঝরল, এখনও মনে পড়ল না? ধন্যি তোরা, অথচ আসল অর্ধেকই বাকি। বলি, আমাদের পরেই ব্রেজিলের সব থেকে নাম-করা ফুটবল টিম অক্সডন ক্লাব তার ষাঁড়মুখো কোচ অ্যান্ড প্রেসিডেন্ট হুটেনটেটরকে মনে পড়ছে? পৃথিবীর সব থেকে প্রতিভাবান পাগলা সার্জন ডক্টর লেঁবোর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে ইতিহাসে স্মরণীয় গোল্ড কাপ খেলার জন্যে আমাদের ব্রেজিল-ইলেভেন আর অক্সডন ক্লাবকে স্যানটসে নিয়ে গেছল, সেখানে ফুটবলের কিং অফ কিংস যে হবে, সে পাবে মস্ত একটা সোনার কাপ আর নগদ পঞ্চাশ হাজার ডলার—তারপর আমাকে আর লন্ডন টাইমস-এর জার্নালিস্ট বন্ধু নারলেকারকে ডক্টর লেঁবোর জঙ্গলের ল্যাবরেটারিতে ধরে নিয়ে গেছল। লেসার-বিম্ দিয়ে আমার ফুটবল খেলার পুষ্ট সেলটুকু কেটে সারিয়ে ফেলার জন্যে—এক কথায় আমার খেলার মগজ চুরি করার জন্যে—এরই মধ্যে ভুলে গেলি?

কার্তিক এবার লাফিয়ে উঠল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মারিচ বধের সেই স্বর্ণমৃগর মতো মানুষের মগজ ভর্তি কুকুর জিংগারোকে পাঠিয়ে তোমাদের তাজ্জব করে দিয়ে ল্যাবরেটারিতে ধরে নিয়ে গেছল, আর সেখানে ছিল কমবাইন্ড হ্যান্ড নেবুচি, যে একসময় সাত ফুট লম্বা নিগ্রো ছিল, ব্রেন সেল আর টিসু সেল অপারেশন করে ডক্টর লেঁবো তাকে সাড়ে তিনফুট বানিয়ে রেখেছিল—যে জন্যে তার রাগ

লজ্জা আর অভিমানের অন্ত ছিল না, আর তুমি তোমার লম্বা-বেঁটে দুটো কার্টুন দেখিয়ে তাকে ফের লম্বা করে দেবে কথা দিয়ে তার কাছ থেকে সব গোপন তথ্য বার করে নিয়েছিলে!

এবারে চটপটিও সোৎসাহে যোগ দিল, বিপদ বুঝে তুমি ডক্টর লেঁবো আর নেবুচি দু'জনের কাছেই জার্নালিস্ট বন্ধু নারলেকারকে 'পিন্‌ডি' বলে পরিচয় দিয়েছিলে, আর নিজে হয়েছিলে পিন্‌ডির পা-গার্ড নারলেকার। বলেছিলে, পিন্‌ডির খেলার পা দুটো ক্লাব থেকে আশি লক্ষ ডলারে ইনসিওর করা, তাই কোম্পানির তরফ থেকে পা-গার্ড হিসেবে তুমি সর্বদা তার সঙ্গে ঘোরো—

ফুর্তির চোটে কেবলু বলে উঠল, মনসাগতাঃ মনসাগতাঃ!.....সেই বিরাট লাঞ্চের পরে ডক্টর লেঁবো তোমাদের ঘুমের জল খাইয়ে অজ্ঞান করে পিন্‌ডি ভেবে লেসার-বিম্ দিয়ে নারলেকারের দার্শনিক আর হি-হি হাসির রোগের পুষ্ট মগজ অপারেশন করে দিল— উলটে সে ভালো হয়ে গেল—অহং সঠিকং স্মরেৎ পিন্‌ডিদা?

রাগের বদলে পিন্‌ডিদার মুখে একটু বাৎসল্যের হাসি। —হানড্রেড পারসেন্ট সঠিকং। আমার দিকে ফিরল, সোনা-চাঁদ, তোমার তাহলে এখনও মনে পড়ছে না?

আমার চিন্তায় এখনও বিনোদের দোকানের নতুন আভেনের চিকেন তন্দুরি ঘুরছে, এদের মতো লাফিয়ে ওঠা মানেই মাসের শেষে গড়ের মাঠ পকেটের ওপর কম করে পঞ্চাশ-ষাট টাকার ট্যাক্স বসানো। তবু বললাম, তুমি ডক্টর লেঁবোর নাম করা মাত্র মনে পড়েছে....তোমার বদলানো ডাইভারজেন্ট এনার্জি পিল খেয়ে হুটেনটেটেরের দলের এগারোজনের মধ্যেই ষণ্ডের লড়াই লেগে গেছিল, তুমি একে-একে দু'গোল করার পর ওরা রেফারির সঙ্গে বক্সিং শুরু করে দিল, নিজেদের মধ্যেও মাথা ফাটাফাটি করল—তারপর তো পুলিশ নামিয়ে খেলাই বন্ধ করে দিতে হল—হুটেনটেটর আধা-পাগল হয়ে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে ঘোষণা করল, এই খেলা বরবাদ—সমস্ত ব্যাপারটার আগে ইন্‌ভেস্টিগেশন হবে—কিং অফ কিংস গোল্ড কাপ টুর্নামেন্ট পোস্টপোনড্ সাইন-ডাই! কিন্তু তারপর আবার কী....

একটা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিয়ে পিন্‌ডিদা বলল, তোর ডিকশনারিতে কী পোস্টপোনড্ সাইন ডাই মানে কী চিরকালের জন্যে বাতিল না কি?

আমতা-আমতা করে বললাম, তা না.....

—একটি ডিক্লেয়ারড টুর্নামেন্ট যার পিছনে এত পাব্‌লিসিটি এত প্রমিস আর এত লক্ষ লক্ষ ডলারের টিকিট বিক্রি সেটা চুপচাপ একেবারে বন্ধ করে দিলে হুটেনটেটেরের ঘাড়ের ওপর মাথাটা থাকবে? তার ক্লাব থাকবে? একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে পড়ে খেলা বন্ধ ঘোষণা করতে হয়েছিল, স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সে খেলা আর হবে না? যে ব্যাপারখানা ঘটেছিল, হাজার ইন্‌ভেস্টিগেশন করেও তারা কোন ঘোড়ার ডিমের হদিস পাবে?

হাবুল হোঁতকা তার ক্যামেরা তুলে সোৎসাহে জিগেস করল, তাহলে সেই খেলা আবার কবে হয়েছিল পিন্‌ডিদা! কিং অফ্ কিংস হয়ে সেই মস্ত গোল্ড কাপ আর নগদ পঞ্চাশ হাজার ডলার তুমি পেয়েছিলে?

জবাবে পিন্‌ডিদা হঠাৎ ভাবলেশহীন চোখে তার দিকে চেয়ে রইল। চেয়ে আছে তো চেয়েই আছে। চোখের পলক পড়ছে না।

হাবুল আর স্থির থাকতে পারল না। অস্বস্তিতে কঁকিয়ে উঠল, অমন করে কী দেখছ পিন্‌ডিদা?

পিন্‌ডিদার মুখ দিয়ে ফটাস করে বেরিয়ে এল, দেড় ব্যাটারি!

কেবলু হাবুল কেন, আমরা সুদ্ধু হাঁ। পিন্‌ডিদা হঠাৎ তার সব থেকে স্নেহ-ভাজন হাবুলকে দেড় ব্যাটারি বলে গাল দিয়ে উঠল কেন? ছেলেটা তো আর বেঁটে নয়, হাতির মতো তাগড়াই, আর গুরুকে একটু বেশি তোষামোদ করলেও ক্যামেরা সম্পর্কে মাথা খাটাতে পারে— ভোঁতা-টোতা নয়—তাকে হঠাৎ দেড় ব্যাটারি বলে ওঠা কেন!

বুঝুক না বুঝুক, তার পাশ থেকে কেবলুর খুকখুক হাসি শোনা গেল, হেবোকে দেড় ব্যাটারি বলায় মজা পেয়েছে। পিন্‌ডিদার গম্ভীর দু'চোখ এবার তার মুখের ওপর স্থির হয়ে রইল। ফলে হাসি গিয়ে তার আত্মারাম খাঁচাছাড়া। গলার স্বর বেরুল না, দুই চোখ দিয়ে বলতে চাইল, মার্জনাং কুরু পিন্‌ডিদা....

আরও কয়েক পলক ওর দিকে তেমনি চেয়ে থাকার পর পিন্‌ডিদার গলা দিয়ে কতকগুলো দুর্বোধ্য কিন্তু স্পষ্ট বেরিয়ে এল, 'আর সি সি বি সি এ!'

আমরা হাঁ। কেবলুই প্রথমে কাতরে উঠল, এটা কোন্ ভাষায় কী গালাগাল পিন্‌ডিদা? জবাবের বদলে পিন্‌ডিদার দু'চোখ এবারে চটপটির মুখের ওপর চড়াও হল। দেখা শেষ হতে গলা দিয়ে তেমনি ছাড়া-ছাড়া শব্দ বেরুল, 'হা ভি স্পা ডবলিই বি!'

আমরা পাঁচ মূর্তি আবার বোবা। আবার কী শুনতে হয় সেই ভয়ে চটপটি কিছু জিগেসই করল না। পিন্‌ডিদার নির্লিপ্ত অথচ ভাব-গম্ভীর দু'চোখ এবার কার্তিকের মুখের ওপর। ও কম কথা বলে বলে পিন্‌ডিদাটা সাধারণত ওর ওপর একটু সদয়। কিন্তু আজ ওকেও ছাড়ল না। গলা একটু খাটো করে বলল, বি বি গান!

আমরা তেমনি নির্বাক।

তারপরেই কেবল আমি বাদে সকলের উসখুসুনি, কারণ, পিন্‌ডিদার ওই বিষম ঠান্ডা দু'চোখ এবারে আমার মুখের ওপর উঠে এসেছে। চাউনি বদলাতে লাগল, চোখ দুটোয় ব্যঙ্গের আভাস। গলার স্বরও একটু টনটনে। –মগজ থেকে কানের পাশে দুই ইঞ্চি ফাঁক!

কথা ক'টা শেষ হবার আগেই উঠে দাঁড়াল, কারও দিকে বা কোনও দিকে না তাকিয়ে হনহন করে চলল। সেই চলা দেখলে মনে হবে তার ট্রেন ধরার তাড়া আছে।

আমরা নির্বাক বিমূঢ়। পঞ্চ-মূর্তি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি। অনেকক্ষণ বাদে কেবলুই প্রথম মুখ খুলল, একমাত্র হাবুলের গালা-গালটা বোঝা গেল, দেড় ব্যাটারি, আর সর্বৈঃ দুর্বোধ্যঃ!

হাবুল হোঁতকা রাগে গোঁ-গোঁ করে উঠল, তোদেরটা যে এর চারগুণ বাড়া গালাগাল নয় বুঝলি কী করে?

কেবলুর পালটা চ্যালেঞ্জ, আমাকে কি বলল মনে রাখতে পেরেছিস?

কার্তিক জবাব দিল, তোকে বলেছে, 'আর সি সি বি সি এ'।

চটপটি একটু ভেবে মন্তব্য করল, 'আর সি সি' আরে ছি ছি হতে পারে, আর 'বি সি সি এ' যদি বোক-চন্দ্র-অ্যাস্ হয়?

একটু উষ্ণ গলায় কেবলু ঝাঁঝ দেখাল, আর বিদ্যে ফলাস না, নিজেরটা ভাব।

কার্তিক চটপটিকে স্মরণ করিয়ে দিল, তোকে 'হা ভি স্পা ডবলিউ' বলেছে।

চটপটির মান-অভিমান নেই, বোঝার আগ্রহই বেশি।–হা ভি তো হা ভগবান হতেই পারে, স্পা আর ডবলিউ.....কী?

খোঁচা দেওয়ার সুরে আমি বললাম, তুই তো একটু ছটফটে, স্পা-তে স্পার্টান, ডবলিউ তে উলফ্ আর বি'তে যদি ব্যাট্‌ল্, খেলতে নেমে হঠাৎ আক্রমণ তো মন্দ করিস না.....

কার্তিক এবার সবটা মেলাল, তাহলে দাঁড়াল পিন্‌ডিদা চটপটিকে বলেছে, হা ভগবান, স্পার্টান নেকড়ে যুদ্ধ?.....ঘুরিয়ে কি পিন্‌ডিদা ওকে প্রশংসা করে গেল নাকি!

কেবলু মাথা ঝাঁকিয়ে আপত্তি জানাল, নঃ সম্ভবম্–অসম্ভবম্!

এবারে কার্তিকের সমস্যা। –আমাকে বলেছে বি বি গান, এ আবার কোন রাগ-রাগিণীর গান!

পিন্‌ডিদা সামনে না থাকলে চটপটির রসিকতার মাথা খোলে। বলল, বি বি আলাদা না করে জুড়ে দিয়ে বিবি কর, আর গান-এর উচ্চারণটা গন্ কর্–(তাহলে দাঁড়াল তোর 'বিবি গন্') অর্থাৎ তোর বিবি সট্‌কান দিয়েছে।

সকলে হেসে উঠতে কার্তিক বলল, আমার ছেড়ে স্বয়ং কার্তিক ঠাকুরেরও কোনওকালে বিবি ছিল না জানি।

—তা বটে। সকলে সায় দিতে বাধ্য হল।

হেবো হোঁতকা হঠাৎ কোঁত কোঁত করে হেসে নিজের বিদ্যে জাহির করল। —আমাদের সোনাকে কিন্তু পিনুডিদা জব্বর বলেছে, আর পরিষ্কার বোঝাও যাচ্ছে—মগজ থেকে কান পর্যন্ত দুই ইঞ্চি ফাঁক!

আমি খেঁকিয়ে উঠলাম, কী বোঝা যাচ্ছে?

—বোঝা যাচ্ছে, তোর কানে যা ঢোকে ওই ফাঁকের জন্যে মগজ পর্যন্ত তা পৌঁছায় না।

আমি লাফিয়ে উঠে (অর্থাৎ ওর নাগালের বাইরে একটু নিরাপদে সরে গিয়ে) বলে উঠলাম, শাবাশ দেড় ব্যাটারি! ওরে তোরা দেড় ব্যাটারির মগজের জোর দ্যাখ—

শুনেই হেবো হোঁতকা ঘুষি বাগিয়ে উঠে দাঁড়াতে গেল। তার আগেই দু'দিক থেকে চটপটি আর কেবলু তার গলা জড়িয়ে ধরে আবার তাকে বসিয়ে দিল। চটপটি বলল, গুরু বাক্যি শুনলে কান শুদ্ধ হয়, তোর কিনা এই মতি—দাঁড়া কাল পিনুডিদাকেই বলব!

হাবুল থোঁত-থোঁত করে শূন্যে মাথায় ঢুঁ চালাল, পিনুডিদা দেড় ব্যাটারি ছেড়ে হাফ ব্যাটারি বলুক, কিন্তু ও বলবে কোন সাহসে?

আমিও তেরিয়া জবাব দিলাম, দু'আঙুল ছেড়ে পিনুডিদা মগজ থেকে কান ছ'আঙুল বলুক, তুই বলিস কোন সাহসে?

—ব্যস ব্যস! দু'হাত তুলে কেবলু ঘোষণা করল, গৃহযুদ্ধম কুরুক্ষেত্রাৎ অপি নিকৃষ্টং! অতি অতং সন্ধিঃ, অতঃ সন্ধিঃ!

যে-যার ঠান্ডা হয়ে বসার পর আবার ভাবনা শুরু হল। কার্তিক মন্তব্য করল, পিনুডিদার কোনও কথাই আমরা ঠিক ঠিক বুঝতে পারিনি—হঠাৎ সে হাবুলকে দেড় ব্যাটারি বলে উঠবে কেন, আমাদের ওপরেই বা ওই সব দুর্বোধ্য বাক্যি ঝাড়তে গেল কেন? আমার মনে হয় বড় রকমের রহস্য আছে। .....তাছাড়া পিনুডিদার সেই মগজ চুরির গল্পটা মাত্র অর্ধেক শোনা হয়েছে, এ কি আমরা ভাবতে পেরেছি!

গম্ভীর গলায় হাবুল শুধরে দিল, ফের গল্প বলছিস—ঘটনা বল্।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঘটনা—মানে ঘটনার মাত্র অর্ধেক শুনেই আমাদের চক্ষু চড়ক গাছ, বাকি অর্ধেক তাহলে কেমন?

এবারে আমারও মাথা খুলে যাচ্ছে। বললাম, আলোচনাটা অন্য দিক থেকে শুরু করা যাক। .....পিনুডিদার গোল্ অর্থাৎ আসল লক্ষ্যখানা কী সেটা তো জল-ভাতের মতো বোঝা গেছে—নাকি কারও বুঝতে বাকি আছে?

প্রশ্নটা আমি হাবুলের মুখের ওপর ছুড়লাম।

মেজাজ ঠান্ডা এখন হাবুলের, আমি তো আর বুদ্ধির বড়াই করি না, আর একটু বুঝিয়েই বল্—

আজ পিনুডিদার গোল্ বা আসল লক্ষ্য হল, বিনোদের দোকানে নতুন আভেনে তৈরি কালকের চিকেন তন্দুরি।.....কি, এব্যাপারে সকলে একমত?

বুঝে কার্তিক আর চটপটি বলে উঠল, নিশ্চয়। কেবলু বলল, নিশ্চিতং। হাবুল পর্যন্ত স্বীকার করল, তাই হবে মনে হচ্ছে।

আমি সোৎসাহে ব্যাখ্যায় এগোলাম। —খেলার রিলে শেষ হতে পিনুডিদা 'হাফ' দিয়ে 'পুরো' আনন্দ পাবার নজিরে চলে এল। যেমন হাবুলের হি-ম্যান টু- ইন-ওয়ান হাফ কাজ করল, ছবি তোলা ছেড়ে কেবল রেডিও শোনা হল, লিগের খেলা ড্র হতে পয়েন্ট হাফা-হাফি হয়ে গেল কিন্তু আমরা পুরো আনন্দে (অর্থাৎ বিতর্কে) মশগুল, চিঁড়ের মোয়া আর নারকেলের নাড়ু অর্থাৎ হাফ-জলযোগের ব্যবস্থা করে আমি পুরো আনন্দ দেবার চেষ্টা করলাম—আর তার পরেই এসে

গেল বিনোদের আনা নতুন আভেনে হাফ-আঁচে তৈরি চিকেন তন্দুরির পুরো অর্থাৎ ষোলো আনা আনন্দ দেবার কেরামতির খবর।.....কিন্তু সেই গোলে অর্থাৎ চিকেন তন্দুরি ডিশে আনার লক্ষ্যে যাওয়া যাবে কী করে? না সেই হাফের চাবুক মেরেই—অর্থাৎ ডক্টর লেঁবো হুটেনটেটের আর পিন্‌ডিদার মগজ-চুরির হাফ-গল্প—খুড়ি, ঘটনা শুনেই আমরা এমন খুশি যে কল্পনা করতে চেষ্টাও করলাম না বাকি হাফের ঘটনা আরও কত রোমাঞ্চকর, কত বিস্ময়কর। তার মানেটা হল কী? বিনোদের দোকানের হাফ-আঁচের চিকেন তন্দুরি ডিশে আনতে হলে, 'কিং অফ কিংস্'-এর বাকি হাফ শোনার রাস্তা ধরতে হবে আমাদের—এ ছাড়া বাকিটা পিন্‌ডিদার পেট থেকে বেরুবে আশা করিস কেউ?

চটপটি সায় দিল, আবার প্রশ্নও তুলল, তা তো বটেই, কিন্তু এই সঙ্গে গালাগালের মতো প্রত্যেকের ওপর যে কথাগুলো ঝেড়ে গেল সেগুলি কী?

জবাব দিলাম, আমার ধারণা ওগুলো বাড়তি টোপ, যা না গেলা পর্যন্ত আমরা সুস্থির থাকতে পারব না, হয়তো বাকি আধখানা গল্প ইয়ে—ঘটনার সঙ্গে ওই কথাগুলোর রোমাঞ্চকর রকমের কিছু যোগ আছে।

চটপটি যেন চিরকাল আমারই শরণাপন্ন এমনি গলা। —তাহলে কী করা যায় বল্ তো ভাই সোনা, হাফ-টুকুই যদি অমন সেন্‌সেশন্যাল হয়, তাহলে বাকি হাফ কী-রকম হবে! পিন্‌ডিদা থাকতে ফুটবলে কিং অফ কিংস্ কে হল তাহলে—ঢাউস সোনার কাপ আর নগদ পঞ্চাশ হাজার ডলার পিন্‌ডিদা ছাড়া আর কার কপালে নাচতে পারে? শোনার জন্যে আমার যে এখন থেকেই পেট ফুলছে!

কেবলু শুধরে দিল, কেবল তোর পেট কেন, বল্ অস্মাকম্-এর পেট ফুলছে।

আমারও সত্যিই একই অবস্থা, সব না শোনা না জানা পর্যন্ত রাতে ঘুমই হবে না। ফোঁস করে একটা বড় নিশ্বাস ফেলে বললাম, কী আর হবে, মাসের শেষে ওই বিনোদ ব্যাটার ধারের খাতায় আমার নাম উঠবে, পিন্‌ডিদা কি শুধু শুকনো চিকেন তন্দুরি চিবিয়েই খুশি হবে—তারপর বাড়ি গিয়ে ডাল-ভাত সাঁটবে? এমন কী ছন্দপতনের জন্যে শেষে আমাকেই সারা জীবন খোঁটা খেতে হবে। চল্, সব যাই বিনোদের দোকানে, আগে দু'খানা করে মোটা তন্দুরি রুটি আর এক কটোরা তড়কা, শেষে তন্দুরি চিকেন আর সালাড—এতেই সত্তর পঁচাত্তর টাকার ধাক্কায় পড়ব দেখিস—

সকলে আমার নামে শাবাশ দিয়ে উঠল। কেবলু বলে উঠল, অস্মাকম সোনা স্বর্ণ মন্ডিতং! হেবো হোঁতকার মুখেও এখন সোনা-গলানো হাসি। আমি ধারালো চোখে তার দিকে তাকালাম, শোন্ হেবো (জানি এখন হোঁতকা বললেও রাগ করবে না), তুই কেবল পিন্‌ডিদাকে জানিয়ে যাবি, আমি কাল তাকে বাড়ির রাতের ডিনার 'অফ' করে বিকেলে মাঠে আসতে বলেছি—এ ছাড়া তার গালাগাল নিয়ে আর গল্প নিয়ে—

হেবো বাধা দিল, ঘটনা নিয়ে বল্—

—থাম্! মোট কথা আর যে-সব নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হল সে সম্বন্ধে একটি কথাও বলবি না, যদি বলিস তাহলে 'দেড় ব্যাটারি' কথাটা নিয়ে তোর ওপর পিন্‌ডিদাকে এমন তাতিয়ে দেব যে নিজেই চিকেন তন্দুরির মতো ঝলসে যাবি মনে রাখিস!

—ঠিক আছে ভাই, ঠিক আছে ভাই, হাবুল এখন বশংবদ, আমি কেবল তোমার নেমন্তন্নের টোপটি ফেলে দিয়েই সরে পড়ব—বাড়িতে আলাদা হয়ে যাবার পর থেকে আমাকেও তো আবার হোটেলের খানা খেতে হয়, গল্প করার সময়ই বা পাব কোথায়!

পরদিন এই বহু আশার বিকেল।

আমরা পাঁচজন জায়গা নিয়ে বসেছি। চক্ষুলজ্জার খাতিরে কেবলু আর চটপটি বাজার থেকে বারোটা বাছাই কচি শশা একেবারে ছাড়িয়ে প্লাসটিকের ঠোঙায় করে নিয়ে এসেছে। সঙ্গে ছুরি, ঝালনুন, দু'চারটে কাঁচা লঙ্কা। দু'আড়াই ঘণ্টা একেবারে শুকনো মুখে আসর চলবে সেটাই বা

কেমন। আর কার্তিক প্লাস্টিকের ঠোঙায় এনেছে সকলের জন্যে এখানকার নাম করা মিষ্টির দোকানের একটা করে ভেজিটেবল প্যাটিস।

আজ পিন্‌ডিদা যতটা সম্ভব সময়ে আসবে জনা কথাই। মান রাখার জন্যে মাত্র চার মিনিট লেটে এল। হাসি-হাসি দু'চোখ প্রথমে আমার ওপরেই। –সোনা-বাবুর আজ হঠাৎ কীসের উৎসব....একেবারে রাতের নেমন্তন্ন!

আমিও তেমনি হাসি মুখে বললাম, আমার কেন, বিনা অস্ত্রে এই পাঁচ-পাঁচটা লোককে তোমার আধ-মরা করে রেখে যাওয়ার কৃতিত্বের উৎসব।

—আমি! তোদের? উঁচু ঢিবির আসনে বসার ফাঁকে পিন্‌ডিদা বিস্ময়ে বিস্ফারিত। –খেতে ডেকে যে খাবি খাওয়াচ্ছিস রে সোনা!

টেরিয়ে প্লাস্টিকের ঠোঙা দুটোয় শশা আর প্যাটিস দেখে নিল। তারপর নিজের হাতঘড়ির দিকে চেয়ে মন্তব্য করল, সময় আছে, চলতে পারে।

কার্তিক তৎপর হয়ে শশা আর প্যাটিস ভাগ করায় মন দিল। পিন্‌ডিদার আমার দিকেই চোখ। –তা কী বলছিলি?

—বলছিলাম, বাগবাদিনীর আভেনে ফেলে তুমি সেই কাল থেকে আমাদের হাফ-রোস্ট করে রেখে গেছ, এখন তুমিই দয়া করে উদ্ধার না করলে আমরা যে প্রাণে বাঁচি না!

পিন্‌ডিদার দু'চোখে বাৎসল্য উছলে উঠল। অন্যদের দিকে চেয়ে বলল, সোনা মাঝে মাঝে বেশ বলে.....না?

বে বলু তক্ষুনি সায় দিল, হ্যাঁ পিন্‌ডিদা, সোনা মাঝে-মাঝে স্বর্ণ-ভাষিতং হয়ে যায়।

পিন্‌ডিদা হাসছে।— কার্তিক, তোর হাতের ছুরি দিয়ে কেবলুর জিভটা খণ্ডিতং করতে পারিস?

হাবুলের ফোলা গাল খুশিতে থলথল, বলল, তুমি হুকুম করলে আমি পারি, কিন্তু আজকের দিনের মতো ওকে মাপং কুরু পিন্‌ডিদা।

পিন্‌ডিদা বিষম আঁতকে উঠল, তারপর ভীষণ ক্রুদ্ধ।—দ্যাখ হেবো, তোর মুখে যদি কেবলুর আর একটা বুলি শুনি তোকে আমি কীচক বধ করব। তুই হাতির ডাক ডাকলে বা গন্ডারের নাচ নাচলে আমার আপত্তি নেই।

শেষের কথাট সকলেই হেসে উঠতে হাবুলও হেসে বাঁচল।

ছজনে শশা-সহ প্যাটিস সৎকার শুরু হল। পিন্‌ডিদা ধীরে-সুস্থে স্নেহ-মাখা দু'চোখ আবার আমার দিকে ঘোরাল।—তা আমার কী কথা নিয়ে তোরা কাল থেকে অত ছটফট করে মরছিস? আমার তো কিছুই মনে পড়ছে না!

বললাম, মনে পড়িয়ে দিচ্ছি তাহলে, দায় তো আমাদের।.....হাবুল কাল তার হি-ম্যান টু-ইন-ওয়ানের হাফ পারফরম্যান্স শুনিয়েছে, অর্থাৎ ছবি না তুলে কেবল খেলার রিলে শোনালো—মনে পড়ছে?

—খুব পড়ছে, সুন্দর জিনিসটা।

হাবুল আনন্দে দুলে উঠল।

—খেলার রেজাল্ট ড্র, কাজেই পয়েন্ট হাফ-হাফ—ও. কে.?

—ও. কে.।

—গল্পের চিঁড়ের মোয়া নারকেলের নাড়ুর হাফ খাওয়া থেকে তুমি সোজা চলে এলে বিনোদের নতুন কেনা আভেনের হাফ-আঁচে তৈরি চিকেন তন্দুরির আহা-মরি স্বাদে, আর তারপরেই ঝাঁপ দিলে তোমার খেলার মগজ চুরির সেই গায়ে কাঁটা দেওয়ার প্রসঙ্গে, আর আমরা ধরাশায়ী হলাম যখন শুনলাম ওটা হাফ-গল্প—থুড়ি হাফ—ঘটনা, অর্থাৎ আসল হাফই আমাদের শুনতে বাকি—মনে পড়ছে?

—তুই যেমন রসিয়ে বলছি, সে-রকমভাবে কিছু বলি নি.....তবে মনে পড়ছে।

আমি আর একটু ভালো করে চড়াও হলাম, ধরাশায়ী হলেও তখন পর্যন্ত হাফ-আঁচে চিকেন তন্দুরি আর হাফ-গল্প, থুড়ি, ঘটনার মধ্যে একটু লিংক খুঁজে পেয়েছিলাম, কিন্তু তারপরেই আমাদের প্রত্যেকের প্রতি তোমার দুর্বোধ্য গালাগালি শুরু হতে আমরা তপ্ততপে কড়া থেকে একেবারে গনগনে আগুনে! মনে পড়ছে?

শশা চিবুতে গিয়ে আর চিবুনো হল না, পিন্‌ডিদার মুখখানা হাঁ, চাউনিতে তাজ্জব কিছু শোনার বিস্ময়!—আমি? গালাগাল্ করলাম? তোদের? তোরা হলি গিয়ে আমার পাঁচ-পাঁচটা সোনার চাঁদ ভাই, আনঅ্যাডোলটারেটেড বন্ধু—আমি তোদের গালাগাল করলাম? তোদের কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? কেন, আমি কী বলেছি?

পকেট থেকে অনেক টাকা খসছে, ছেড়ে কথা কইতে রাজি নই।—প্রথমেই হাবুলকে বলেছ দেড় ব্যাটারি।

পিন্‌ডিদা প্রথমে বিমূঢ় খানিক, তারপর আকাশের দিকে মুখ তুলে সে কী হাসি! হাসির চোটে মুখ থেকে শশার টুকরো বেরিয়ে আসছে খেয়াল নেই। হাসি আর থামেই না।—ওঃ, হাসাতে হাসাতে পেঠে ব্যথা ধরিয়ে দিলি, আর দেড় ব্যাটারি হল গিয়ে সত্যিকারের দেড় ব্যাটারি, ভোলটেজ বাড়িয়ে তিন ব্যাটারির কাজ পাওয়া যায়, অবশ্য এটা বাজারের জিনিস নয়, মস্ত বিজ্ঞানীর গায়ের ঘাম-ঝরানো আবিষ্কার—ওই দেড় ব্যাটারি হল হুটেনটেটরের এগারোটা বাছাই ষণ্ড খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে আমার ট্রাম্প কার্ড—বুঝলি? তা না হলে ব্রেজিলের খেলার আকাশ থেকে সেই ফাইনালের দিনই পিন্‌ডি নামটা একেবারে মুছে যেত। হেবোর হাতে তিন ব্যাটারির হি-ম্যান টু-ইন-ওয়ান দেখে সেই পরম সম্পদ দেড় ব্যাটারির কথা মনে পড়ে যেতে মুখ দিয়ে শব্দটা বেরিয়ে এসেছিল—তোরা কিনা সেটা গালাগাল ভেবে নিলি! আমি যাই কোথায়—

আমরা বুদ্ধুর মতো মুখ চাওয়াচাওয়ি করছি। পিন্‌ডিদা আবার শশায় কামড় দিয়ে জিগেস করল, তারপর আর কাকে কী গালাগাল দিয়েছি?

কার্তিক জানান দিল, কেবলুর দিকে চেয়ে তুমি বলেছিল, আর সি সি বি সি এ.....

পিন্‌ডিদার দুই চক্ষু কপালে।—এও কি গালাগালি ভেবেছিস নাকি! আরে এ-যে কী তা তো ও-দেশের ফ্রক-পরা মেয়েরাও জানে! আর সি সি বি সি এ হল, রিমোট কন্ট্রোল কম্প্যুটারাইজ্‌ড ব্রেন কনট্রোল অ্যাকুইডেক্টর—কেবলুর ব্রেন-এর সঙ্গে ওটা কী কাণ্ড করবে ভাবতে ভাবতে বলেছি—বিজ্ঞান জগতে এ- যে কী জাদুর জিনিস জানলে হাঁ হয়ে যাবি।

আমরা না জেনেই হাঁ হয়ে গেছি। বললাম, তারপর চটপটির দিকে চেয়ে বলেছিলে, হা ভি স্পা ডবলিউ বি!

—ওর মানে হল, হাই ভোলটেড স্পার্ক রিস্ট্র ব্যান্ড—আর সি সি বি সি এর যম বুঝলি?

বুঝে তো দিগগজ্ আমরা। কার্তিক মিনমিন করে বলল, আমার দিকে চেয়ে বলেছিলে, বি বি গান।

—ও তো সোজা ব্যাপার, বোন বনডেট গান—ডক্টর বন্-এর আবিষ্কার—এটা পড়লেই বন্দুকের সরু নল দিয়ে এক ধরনের সাদা লিকুইড বেরিয়ে আসবে, যাতে দশ সেকেন্ডের মধ্যে হাড় বা খুলি এমন জোড় খেয়ে মিশে যাবে যে একটা আঁচড়ের চিহ্নও থাকবে না। ডক্টর বন এর এই আবিষ্কারের ফর্মুলা ডক্টর লেবো চুরি করাতে দুই সাইনটিস্টের এখন সাপে-নেউলে সম্পর্ক।

সব শেষে আমি। খাবি খেতে খেতে বললাম, আমার দিকে চেয়ে তোমার শেষ কথা, —'মগজ থেকে কানের পাশে দু ইঞ্চি ফাঁক!'

পিন্‌ডিদা হাসতে লাগল।—এ-ও বুঝলি না, ওই 'আর সি সি বি সি এ' যন্ত্রটি বসাতে কানের পাশ থেকে মগজ পর্যন্ত দু ইঞ্চি অপারেশন করতে হয়—ওটার জন্যে দু ইঞ্চি জায়গা লাগে। .....তোর দিকে চেয়ে বলেছিলাম কারণ, এমনিতেই যা বুদ্ধি তোর, তার ওপর ওই যন্ত্র তোর মগজে বসালে আর সেই রিমোট কনট্রোল আমার থাকলে বাকি দশটা বাছুর নিয়ে একলাই তুই

মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের বাইশ জনের বাছাই কমবাইনড্ প্লেয়ারকে গুনে গুনে বাইশ গোলে হারাতে পারতিস।

আমরা বোবা মেরে বসে আছি। পিন্‌ডিদাই কেবল শশা শেষ করে আয়েস করে ভেজিটেবল প্যাটিস চিবুচ্ছে। গা-ঝাড়া দিয়ে আমিই বলে উঠলাম, আর আমাদের তোমার হাফ-আভেনে ফেলে দগ্ধে রোস্ট কোরো না, বিনোদ বলেছে, ঠিক আটটায় তার চিকেন তন্দুরি কোঁক্কোরো-কোঁ ডাক ছেড়ে তোমাকে এবং তোমার পিছনে আমাদের ডাকবে, সেই ডাক কানে গেলে তোমাকে আর হাজার চেষ্টা করলেও ধরে রাখতে পারব না—অতএব আমাদের আর ত্রিশংকু অবস্থায় না রেখে তুমি তোমার গল্পের খুড়ি, ঘটনার বাকি হাফ-এর বিস্তার শুরু করে দাও, কোনও কিছুর বিন্দু-বিসর্গ বাদ দিও না।

প্যাটিসের শেষটুকু জঠরে চালান করে দিয়ে আর শশার যেটুকু বাকি ছিল তাই চিবিয়ে গলা ভিজিয়ে পিন্‌ডিদা হাসি মুখে সোজা হয়ে বসল।—এত হাঁকু-পাঁকু করছিস তোরা এ কী জানতাম, আচ্ছা, বেশ মন দিয়ে শোন তাহলে।

এবারে পিন্‌ডিদার ভাষাতেই অর্থাৎ বয়ানেই গল্পটা—খুড়ি, ঘটনাটা বলতে হচ্ছে। পাঠকের মনে রাখতে হবে এবারের 'আমি' বলতে সোনা নই—গল্পের নায়ক স্বয়ং পিন্‌ডিদা। আমাদের পাঁচজনকেই অল্ অ্যাটেনশন দেখে পরিতৃপ্তির সুরে পিন্‌ডিদা শুরু করল :

'স্যানটসের মাঠে হুটেনটেটরের অক্সডন ক্লাবের এগারোটা প্লেয়ারকে নাকানি-চোবানি খাওয়ানোর পর থেকেই আমি একরকম সিওর ছিলাম এরপর আরও ভীষণ, আরও কিছু অব্যর্থ প্রতিশোধ নেবার জন্যে হুটেনটেটর প্রস্তুত হবেই। পাগলা সার্জন-শিরোমণি ডক্টর লেবোঁও আর ছেড়ে কথা কইবে না! আমাকে মাঠে দেখেই তো বুঝেছে আমার ভাঁওতায় ভুলে সে নারলেকারের মগজ অপারেশন করেছে। পিন্‌ডির পা-গার্ড ভেবে আমার দিকে ভালো করে চোখ তুলে তাকানোও দরকার মনে করেনি। কিন্তু মাঠে আসল পিন্‌ডিকে দেখে তার চক্ষু তো ছানাবড়া হবারই কথা। তার ওপর মাঠে অক্সজন ইলেভেনের প্রত্যেকের মদমত্ত উলটো পালটা কাণ্ড দেখে তার বুকের ধুকপুকনিও নিশ্চয় বন্ধ হবার উপক্রম। এত বড় সার্জন, সে কি আর তক্ষুনি বোঝেনি হুটেনটেটর তার ক্লাবের খেলোয়াড়দের ডাইভারজেন্ট এনার্জি স্টিমুলেন্ট ট্যাবলেট খাইয়েছে—নইলে এমন উলটো-পালটা কাণ্ড হয় কী করে? তারপর দুই শিশির বাকি ট্যাবলেটই চেয়ে নিয়ে গিয়ে সে নিশ্চয় দুটো গিনিপিগকে খাইয়ে বুঝেছে ব্যাপারখানা কী। দুই লেবেল আঁটা শিশির ট্যাবলেট উলটো-পালটা রাখা হয়েছে, এ আর বুঝতে কতক্ষণ?

'.....এর পর থেকেই আমি আমার মাথার পিছনে আরও দুটো চক্ষু লাগিয়ে চলছি। অর্থাৎ খুব সজাগ আমি। কারণ এখন আমার ডবল শত্রু। এক-নম্বর শত্রু অক্সডনের প্রেসিডেন্ট-কাম-কোচ-হুটেনটেটর, এখন দু'নম্বর শত্রুটি তার থেকেও ভীষণ ভয়ংকর—পাগল-জিনিয়াস বিজ্ঞানী সার্জন এতবড় অপমানের পরে চুপচাপ বসে থাকবে, এ যে বিশ্বাস করবে সে মূর্খের স্বর্গে বাস করছে। স্যানটসের 'কিং অফ কিংস' এর গোল্ড কাপ টুর্নামেন্ট তখনকার মতো বাতিল হলেও আমার নাম তো আর কম ছড়ায় নি। নারলেকার তো ফিরে গিয়ে এমন চমকপ্রদ অথচ যুক্তিসঙ্গত প্রবন্ধ লিখেছে আমাকে নিয়ে যার দরুন সিনিয়র স্পোর্টস জার্নালিস্ট হিসেবে তার প্রমোশন হয়ে গেছে। আর ব্রেজিলের কাগজেও তো এই খেলা নিয়ে কম হইচই পড়েনি—আর তার চোদ্দ আনা তো আমাকে নিয়েই! সেই আমাকে সর্বদা চিন্তাচ্ছন্ন দেখে আমাদের রাশভারী ম্যানেজারও উদ্বিগ্ন। প্রায়ই জিগেস করে, পিন্‌ডি, হল কী তোমার? প্র্যাকটিসে পর্যন্ত সে-রকম মন দেখছি না, প্রায়ই দেখি ভাবছ...কী ব্যাপার?

'আমি তা-না-না করে কাটান দিই। হুটেনটেটর যদি এরপর হইচই করত, লাফাঝাঁপি করত বা তড়পাত, তাহলেও কিছুটা নিশ্চিন্তি থাকতে পারতাম। কিন্তু লোকটা যেন নিজের অস্তিত্ব নেই এমনভাবে চলা-ফেরা করছে। কিন্তু বেনারসের ষাঁড়ের লড়াই দেখে যে লোক ব্রেজিলে এসে

অক্সডন ক্লাব খুলেছে, সে হার মেনে চুপ করে যাবে এমন পাত্র? আর যে-ই বিশ্বাস করুক, আমি করব?

'ভেবে-চিন্তে আমি একটা উপায় বার করলাম। তোরা নিশ্চয় জানি, ও-সব দেশে ডিটেকটিভ এজেন্সির ছড়াছড়ি। যাদের কাজ হল গোপন তথ্য বার করে আনা। এখানকার ডিটেকটিভ গল্পের নায়কদের মতো সবজান্তা মগজের কারবারি নয়। তারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জন করে। কিন্তু এই শহরের ডিটেকটিভের ওপর ভরসা করা গেল না, সত্তর মাইল দূরের এক আধ-শহুরে এজেন্সি থেকে দু'সপ্তাহের জন্য একজন ডিটেকটিভ ভাড়া করলাম। সামান্যই কাজ তার। স্যানটস থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে জঙ্গলের কাছে ভবঘুরের মতো সকাল থেকে বিকেল ঘোরাঘুরি করবে সে—ওই জঙ্গলের ভিতরের পাকা রাস্তায় যে কটি গাড়ি ঢুকবে আর বেরুবে, সেগুলোর প্রত্যেকটার নম্বর আমি চাই।

'আঠেরো দিনের মাথায় রিপোর্ট পেলাম। রিপোর্টে মাত্র তিনটে লাকসারি কারের নম্বর। নির্দিষ্ট পনেরো দিনের মধ্যে প্রথমে দুটো নম্বরের গাড়ি চারবার জঙ্গলের রাস্তায় ঢুকেছে আর বেরিয়েছে, আর তৃতীয় গাড়ির নম্বরের প্রায় সাধারণ একখানা গাড়ি একবার মাত্র জঙ্গল থেকে বেরিয়েছে এবং ফিরেছে।

'প্রথম দুটো লাক্সারি গাড়ির নম্বর ধরে মালিকের হদসি পেতে পাঁচ মিনিটের ব্যাপার। দুটো গাড়িই অক্সডন ক্লাবের প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড কোচ হুটেনটেটরের! তৃতীয় গাড়ির মালিক ডক্টর লেবোঁ।

'বুঝতেই পারছিস, ষড়যন্ত্র হবে জানা সত্ত্বেও আমার চক্ষু-চড়কগাছ। এখন কী করি আমি? আর তারা কী করছে জানা পর্যন্ত আমার করারই বা কী আছে? আমাদের ম্যানেজারের কাছে খোঁজ নিই, অ্যাসোসিয়েশনে খোঁজ নিই। না, হুটেনটেটর তেমনি মেনি বেড়ালটি হয়েই আছে। এ-দিকে এখানকার সব থেকে বড় খেলা ব্রেজিল শিল্ডের খেলা শুরু হতে আর দু'মাসও দেরি নেই। সময়ে আমাকে পায় না বলে আমার কোচও মনে মনে বিরক্ত, কিন্তু সাহস করে কিছু বলতে পারছে না।

'দুই নামকরা বিজ্ঞানীর ঝগড়ায় প্রাণনাশের হুমকি! এই হেডিং-এ খবরের কাগজের একটা খবর চোখে পড়ল হঠাৎ। আর তাতে প্রথমেই প্রায় লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকা প্রতিভাধর বিজ্ঞানী ডক্টর লেবোঁর নাম। দ্বিতীয় বিজ্ঞানীটি হল এই ব্রেজিলের ডক্টর বন্। ডক্টর বন্ অবশ্য ডক্টর লেবোঁর মতো অত নামজাদা হয়, তবে খুব সামান্য অবস্থা থেকে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে ভদ্রলোক। সাগ্রহে বিবাদের বিষয়টি পড়লাম। অসম বয়স্ক দুই বিজ্ঞানীর মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল, ডক্টর বন মাঝে মাঝে দুই-একদিনের অবকাশ বিনোদনের জন্য ডক্টর লেবোঁর স্যানটসে জঙ্গলের ল্যাবরেটরিতে যেত। ডক্টর বন্-এর অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার, 'বোন্ বনডেট্ গান,' এই গানের ট্রিগার টিপলে এক বৈজ্ঞানিক লিকুইড বেরিয়ে আসে, যার অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা। জিনিসটির রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেলে ভবিষ্যতে ডক্টর বন্-এর ফুলে-ফেঁপে ওঠার কথা। কিন্তু তার আগেই ফর্মুলাসহ এক বৈজ্ঞানিক সাপ্তাহিক-পত্রে খবর বেরুল ডক্টর লেবোঁ ওই অত্যাশ্চর্য বৈজ্ঞানিক পদার্থটি আবিষ্কার করেছে। খেপে গিয়ে ডক্টর বন্ ঘোষণা করল, এটা তার আবিষ্কার, লেবোঁ তার ফর্মুলা চুরি করেছে, ওই চোরকে সে খুন করে ফাঁসি যেতে হলেও যাবে। রিপোর্টাররা ডক্টর লেবোঁর কাছে ছুটতে সে নাকি রসিকতা করে বলেছে, ডক্টর বন্‌কে দোলনায় শুয়ে দোল খেতে বলো, বিজ্ঞানী হিসেবে তার সঙ্গে আমার অতটাই তফাত।

খবরটা পড়ে তোদের এই পিন্‌ডিদা অকূল সমুদ্রে যেন একটা কাঠের টুকরো হাত পেল। তড়িঘড়ি ডক্টর বন্-এর ফোন নম্বর বার করলাম, কিন্তু তারপরেই হতাশ আমি। ফোনে তার বউ জানাল, কোনও কারণে ডক্টর বন্ মানসিকভাবে অসুস্থ, চিকিৎসকের নির্দেশে তাকে কোনও রেস্ট স্যানেটেরিয়ামে পাঠানো হয়েছে, তাই তিন সপ্তাহের আগে তার সঙ্গে যোগাযোগের আশা নেই। কে কী জন্যে ফোন করছে জিজ্ঞাসা করলে আমি শুধু বললাম, পিন্‌ডি। তাইতেই একটু কাজ হল,

ও-ধার থেকে শোনা গেল, সুপার সুপার স্টার ফুটবলার পিন্‌ডি? আমি সবিনয়ে জবাব দিলাম, আর ফোন না করে তিন সপ্তাহ বাদে ঠিক ওমুক দিন তমুক সময়ে আমি যাব—বিশেষ দরকার—দয়া করে তাঁকে বলে রাখবেন।

'ঠিক দু'সপ্তাহ যেতে আমাদের দাম্ভিক ম্যানেজারটি একেবারে কোচকে সঙ্গে করে সকাল বেলা আমার স্যুইটে এসে হাজির। —পিন্‌ডি খবর শুনেছ?

'বললাম, না তো কী এমন খবর, যার জন্যে হন্তদন্ত হয়ে তোমরা এই সকালেই এসে উপস্থিত?

'ম্যানেজার বলল, তুমি এখন কোন্ স্বর্গে পাখা মেলে উড়ছ তুমিই জানো, কোনও খবরই রাখো না—এ-দিকে হুটেনটেটের বেড়াল তপস্বীর মতো রেজোলিউশান পাশ করিয়ে নিয়েছে, অ্যাসোসিয়েশন আপত্তি করবে কেন, তাদের তো বিরাট লাভ, ব্রেজিল শিল্ডের খেলায় এমনিতেই তো বাইরের টিম আসে, কাল-পরশুর মধ্যে খবরটা কাগজে বেরুলে সমস্ত পৃথিবী থেকেই এবারে টিম আসবে জানা কথা!

'আমি উত্তেজনা চেপে জিগেস করলাম, হুটেনটেটের অ্যাসোসিয়েশনের কাছ কী রেজোলিউশন পাশ করে নিয়েছে? কাল-পরশুর মধ্যে কাগজে কী খবর বেরুবে?'

'এরপর ওদের দুজনের কাছ থেকে ব্যাপারখানা বোঝা গেল। হুটেনটেটের প্রস্তাব দিয়েছে, 'কিং অফ কিংস্' গোল্ড কাপ টুর্নামেন্ট আর আলাদা করে হবে না, ব্রেজিল শিল্ডের সঙ্গেই এর ফয়সলা হয়ে যাবে—ব্রেজিল শিল্ডে যে-দল জিতবে, কিং অফ কিংস্ গোল্ড কাপও সেই দলই পাবে—জয়ী দলের থেকে 'কিং অফ কিংস্' বেছে নেওয়া হবে—তাকে এবার আর পঞ্চাশ হাজার ডলার নয়, থোক দু'লক্ষ ডলার আর ওই গোল্ড কাপ দেওয়া হবে, বাকিরা মিনি গোল্ড কাপের সঙ্গে প্রত্যেকে পাবে চল্লিশ হাজার ডলার করে। আমাদের ম্যানেজার বলল, হুটেনটেটরের মুখ দেখে আর কথা শুনে মনে হল, এ-ব্যাপারে তার আর খুব একটা উৎসাহ নেই, তাই আলাদা করে এই টুর্নামেন্ট আর খেলাতে চায় না, তার ফলে তার অজস্র টাকা লোকসান হবে—তা হোক, ছোট গণ্ডির মধ্যে না থেকে পৃথিবীর সব থেকে সেরা দলের সেরা খেলোয়াড়ই এই ট্রফি আর প্রাইজ মানি নিক—তার কেবল একটাই শর্ত, কেবল ফাইনাল খেলার দিনে দু'লক্ষ দর্শকের স্টেডিয়ামে কেবল বিশ হাজার টিকিট তাকে দিতে হবে ব্যস, তার আর কোনও দাবি নেই।...অ্যাসোসিয়েশন এই প্রস্তাব লুফে নিয়েছে, কারণ তাদের তো লাভের সীমা-পরিসীমা নেই! এই ব্যাপার কাগজে প্রচার হলে ইংল্যান্ড রাশিয়া জার্মানি পোল্যান্ড ইটালি বেলজিয়াম হল্যান্ড উরুগুয়ে ফ্রান্স চিন—সব দেশই এবারে এক-খেলায় ব্রেজিল-শিল্ড কাম কিং-অফ-কিংস্ ডবল টুর্নামেন্টে খেলতে আসবে। হুটেনটেটর তো কেবল ফাইনাল খেলার দিন বিশ হাজার টিকিট নেবে—কিন্তু ফাইনালের আগে তো কত খেলা—সে-সব দিনেও তো ওই জায়েন্ট স্টেডিয়ামে প্রায় ফুলই থাকবে – কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে তো ফুল থাকবেই। তাছাড়া অ্যাসোসিয়েশনের তিনজন প্রধান কর্মকর্তার তিনটে পাঁচ-তারা হোটেল আছে—এখানে এত বড় খেলা হলে তো অনেক দিন আগে থেকেই সে-সব হোটেলে আর তিলধারণের জায়গা থাকবে না। অতএব অ্যাসোসিয়েশন চুক্তিপত্রে সই করতে পাঁচ মিনিটও দ্বিধা করেনি। উলটে ফুটবল-প্রেমিক হিসেবে হুটেনটেটরকে তারা আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়েছে।

'সব শোনার পর বুঝলি, আমার মাথাটাই কেমন গুলিয়ে গেল। মনে মনে হিসেব করে দেখলাম, টাকার দিক থেকে হুটেনটেটরের লোকসান অবশ্য কিছু নেই। কারণ, ফাইনালে বিশ হাজার টিকিটের দাম তুঙ্গে তো উঠবেই। ধর্, দশ ডলারের টিকিটের দাম যদি সেদিন কম করে একশো ডলারও হয়, তাহলে বিশ হাজার টিকিট থেকে সে কত পাবে? বিশ লক্ষ ডলার। তার মধ্যে কিং অফ কিংস্‌কে দু'লক্ষ, বাকি তেরো জন খেলোয়াড়কে চল্লিশ হাজার করে পাঁচ লক্ষ বিশ হাজার—সমস্ত গোল্ড কাপ মিলিয়ে খরচ ধর আশি হাজার ডলার, আর বাদ বাকি সমস্ত খরচ যদি আরও দুলক্ষ ডলারও (নিজের টিমকে তো কিছু দিতেই হবে) ধরা যায় তাহলেও হুটেনটেটরের মোট লাভ দশ লক্ষ ডলার। ...কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত দেশকে আমন্ত্রণ জানিয়ে সে নিজের ক্লাবের

স্বার্থ দেখবে না, শুধুই ফুটবল প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে এ কাজ করবে—এ কি একটা বিশ্বাস করার মতো কথা?

'আমার মন বলছে, না। কক্ষনো তা হতে পারে না। তাহলে পনেরো দিনের মধ্যে দু'বার হুটেনটেটের ডক্টর লেবোর জঙ্গলের ল্যাবরেটেরিতে যায় কেন? খুব গম্ভীর মুখে ওদের দু'জনকেই জিগেস করলাম, তোমরা হুটেনটেটেরের সততায় বিশ্বাস করো?....ডক্টর লেবোঁর মতো পাগলা জিনিয়াস বিজ্ঞানী তার সহায় সে-তো গেলবারে নিজেদের চোখেই দেখেছ, আমার হাত-যশের ফলে তার তৈরি সেই ট্যাবলেট হুটেনটেটেরের দলের লোকেরাই খেয়েছিল বলে তার খেলোয়াড়দের মাঠে সেই তাজ্জব দশা হয়েছিল, আমি না থাকলে ওই ট্যাবলেট খেয়ে ওই দশা আমাদের হত—বুঝলে! আমি ইচ্ছে করেই তোমাদের কিছু বলিনি, কিন্তু আজ না বলে পারছি না। তোমরা ভাবছ আমি শূন্যে উড়ে বেড়াচ্ছি, কিন্তু আসলে এতদিন ধরে আমি কেবল হুটেনটেটেরের ওপর নজর রেখে চলেছি। আমার খবর আছে, হুটেনটেটের ওই পাগলা-জিনিয়াস ডক্টর লেবোঁর সঙ্গে নিয়মিত যোগযোগ রেখে চলেছে। তোমরা এবং আমরা এখনও সজাগ না হলে জেনে রাখো, এবারের ব্রেজিল-শিল্ড আর কিং অফ কিংস্ গোল্ড্ ট্রফি ওই হুটেনটেটেরের অক্সডন ক্লাবের কপালে ঝুলছে—সে এই দিকে চোখ রেখেই যা করার করে যাচ্ছে—তোমরা হুঁশিয়ার না হলে সে আমাদের ল্যাজে-গোবরে করে ছাড়বে—আমার কথা যদি বিশ্বাস না করো তাহলে আমাকে ছেড়ে দাও, আমি আর তোমাদের ব্রেজিল ইলেভেনে নেই।

'শুনে আমাদের কোচ আর ম্যানেজারের দু' জোড়া চোখ যাকে বলে ছানাবড়া। গেলবারে কিং অফ কিংস্ টুর্নামেন্টে অক্সডন ক্লাবের এগারোটা খেলোয়াড়ের সেই উন্মাদ-লীলা কি ভোলার ব্যাপার! আমাদেরই কপালে ওই দুর্যোগ বাঁধা ছিল শুনে তারা ভেবড়ে গেল। হাফ টাইমের মধ্যে পিন্‌ডি সেবারে ছ-ছটা গোল দিয়েও খেলা ভেস্তে গেল বলে কিং-অফ-কিংস্ হতে পারেনি, কাজেই তার কথা অবিশ্বাস করার কী আছে? হ্যাঁ, হুটেনটেটেরের সমস্ত ব্যাপারটাই কৃত্রিম আর সাজানো মনে হয়েছিল কোচ আর ম্যানেজারের।

'ম্যানেজার আর কোচ সানুনয়ে আমার হাত চেপে ধরল, পিন্‌ডি তুমি ছাড়া আমাদের উপায় নেই, এ-তো কেবল ফুটবলের সঙ্গে লড়াই নয়, এ-যে দেখছি ফুটবল প্লাস বিজ্ঞানের সঙ্গে লড়াই। সমস্ত বিশ্বদলকে শয়তানি করে হারিয়ে হুটেনটেটের যদি ব্রেজিল শিল্ড আর কিং-অফ-কিংস্ ট্রফি দুই-ই নিয়ে যায় তাহলে আমরাও গেলাম, ফুটবলও গেল—আমাদের দু'জনকেই তাহলে আত্মহত্যা করে বাঁচতে হবে।

'আমি আশ্বাস দিলাম—পিন্‌ডি বেঁচে থাকলে এর শেষ দেখবে জেনে রাখো, হুটেনটেটের আর ডক্টর লেবোঁর প্ল্যান যে করেই হোক আমায় জানতেই হবে—এ-জন্যে আমার নিজের পকেট থেকে খরচ শুরু হয়ে গেছে, আমাকে বিশ্বাস করে তোমাদের আমার পাশে দাঁড়াতে হবে, খরচের ধকল সামলাতে হবে, আর তোমাদের মুখ সেলাই করে বসে থাকতে হবে।

'তারা ব্ল্যাঙ্ক চেক দিয়ে চলে গেল। বলে গেল, যত টাকা খরচ হয় হোক, ওই শয়তান দুটোর মুখোশ খুলে দিতে হবে, তাদের জব্দ করতেই হবে।

'ওরা চলে যেতে ভেবে-চিন্তে আমি লন্ডনে মিস্টার নারলেকারকে একটা আর্জেন্ট টেলিগ্রাম করলাম আরও চার-দিন বাদে। তার মধ্যে ব্রেজিল শিল্ড আর কিং-অফ-কিংস গোল্ড কাপ ট্রফির একসঙ্গে খেলা হবার খবর সমস্ত পৃথিবী জেনে গেছে। তার মধ্যে আমার টেলিগ্রাম। নারলেকার পরদিনই উড়ে চলে এল। এবারে একটা কথা তোদের বলে রাখি, সেবারে স্যানটস থেকে পালিয়ে ব্রেজিলে আসার পর সমস্ত ঘটনা শুনে, বিশেষ করে লেবোঁ 'পিন্‌ডি' ভেবে লেসার বিম দিয়ে তারই ব্রেন অপারেশন করেছে শুনে নারলেকার আমার ওপর প্রথমে খুব খচে গেছল। তার উপকার হয়েছে বলতেও বিশ্বাস করেনি। শেষে তার কাগজে কিং-অফ-কিংস্ খেলার কয়েকটা

ফিচার বেরুবার ফলে সিনিয়ার জার্নালিস্ট হয়ে বসতে রাগ গেছে। লম্বা চিঠি লিখে নিজেই স্বীকার করেছে—আগে তার লেখার চারভাগের তিন ভাগই কেটে দেওয়া হত, সব লেখাতে অত উচ্ছ্বাস দেখে 'চিফ' রেগে যেত। এখন তার লেখা থেকে একটা শব্দও বাতিল হয় না, চিফ তাকে সব থেকে নির্ভরযোগ্য লোক ভাবে। এখন সে বুঝছে তার কত উপকার হয়েছে, অতএব পিন্‌ডির প্রতি সে বিশেষ কৃতজ্ঞ। সে যাক, নারলেকারকে সমস্ত ঘটনা অর্থাৎ এবারের শিল্ড কাম গোল্ড কাপ খেলায় আমার আশঙ্কার কথা তাকে বললাম। নারলেকার বলল, তোমার কথামতো সব করতে রাজি, কেবল ভালোর জন্যে হলেও ফের আমার ব্রেন অপারেশন হতে দিতে রাজি না। আমি বললাম, তা না, এবারে তোমাকে কেবল আমার শত্রুর ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে, ডক্টর লেবোঁর কমবাইন্ড হ্যান্ড সেই বেঁটে নেবুচিকে তোমার হাত করতে হবে। নেবুচিকে লম্বা করে দেব কথা দিয়ে পালিয়ে এসেছি, সে আমাকে পেলে কুচি কুচি করে কাটতে চাইবে। ভাঁওতা দিয়ে তোমাকে পিন্‌ডি সাজিয়ে ব্রেন অপারেশন করিয়েছি জেনে তুমিও আমার শত্রু হয়ে গেছ বলবে—তার অবিশ্বাস করার কারণ নেই—তার ওপর তুমি তার জন্যে দেদার টাকা খরচ করবে, সে টাকা আমার অ্যাকাউন্ট থেকে যাবে।

'নারলেকার সভয়ে বলে উঠল, তাকে পাচ্ছি কোথায়, আবার আমাকে ডক্টর লেবোঁর সেই জঙ্গলের ল্যাবরেটরিতে ঢুকতে হবে? বাপরে বাপ! আমি বললাম, কিচ্ছু ঘাবড়াবার নেই, আমি ডিটেকটিভ লাগিয়ে কখন লেবোঁ থাকবে না বার করে নেব, তুমি তখন নেবুচির সঙ্গে দেখা করবে, আর এই করে তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে।'

এ পর্যন্ত বলে পিন্‌ডিদা আমাদের পাঁচ মূর্তির দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হাসল একটু। তারপর বলল, ধর্মযুদ্ধে সব সময়েই একটু লাক্ ফ্যাক্টর থাকে বুঝলি, আমার এত তোড়জোড়ের দরকার হল না। বেঁটে নেবুচি সেধে এসে এই ব্রেজিলে নারলেকারের খপ্পরে পড়ল। যাক, শুনে যা—

'নারলেকারকে আমার সুইটে রেখে নির্দিষ্ট দিনে আমি এসেছি লেবোঁর শত্রু ডক্টর বন্-এর সঙ্গে দেখা করতে। এ-ও আবার এক খিটখিটে মানুষ। আমার কার্ড পেয়ে আমাকে বসতে দিয়েই বলল, তুমি ফুটবল সুপার-সুপার স্টার পিন্‌ডি জানি, কিন্তু আমার এ ব্যাপারে কোনও ইন্টারেস্ট নেই। আমি উঠে কাছে এসে পকেট থেকে বড় একটা খবরের কাগজের কাটিং বার করে তাতে আমার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়ানো ডক্টর লেবোঁর ছবিটা দেখালাম, যেটা স্যানটসের ডিনার পার্টিতে তোলা হয়েছিল—আমি তখন তাকে রামায়ণের মারীচের কথা বলে ঠেস দেবার জন্যে তার সামনে হাসি মুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম—তোদের মনে আছে নিশ্চয়? ডক্টর লেবোঁর ছবি দেখিয়ে ডক্টর বন্‌কে জিগেস করলাম, তুমি এর প্রতি ইনটারেস্টেড কী?

'দ্যাট স্কাউনড্রেল, আ উইল কিল হিম! এর সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক?

'বললাম, তোমার মতোই তেতো সম্পর্ক।

'এরপর ডক্টর বন্ আমাকে একটু খাতির করে বসাল। তারপর গেল বছর স্যানটসে খেলার আগে পরে যা যা ঘটেছিল সব সাগ্রহে শুনল। এবারে আরও খুশি হয়ে আমার পিঠ চাপড়াল। এই ফাঁকে আমি তাকে এবারের সমস্যার কথা জানালাম। সামনেই ব্রেজিল শিল্ড আর কিং-অফ-কিংস্ ট্রফির মিলিত খেলা, হুটেনটেটের ডক্টর লেবোঁর সঙ্গে ভীষণ কোনও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত—আমার এই দৃঢ় বিশ্বাসের কথাও বললাম।

'শুনে ডক্টর বন্ আমার সঙ্গে একমত। বলল, কিন্তু ডক্টর লেবোঁর সায়েনটিফিক প্ল্যান না জানলে আমি তোমাকে সাহায্য করব কী করে? আমি তখন নারলেকারের কথা তাকে বললাম। জানালাম আমার শত্রু হিসেবে সে লেবোঁর দলে যোগ দিতে চেষ্টা করবে, তারা জানে আমি নারলেকারের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তার ব্রেন অপারেশন করিয়েছি—মোট কথা তার প্ল্যান জানতে পারলে তোমার সাহায্য ছাড়া গতি নেই।

'ডক্টর বন্ বিমর্ষ মুখে বলল, টাকার অভাবে আমার ল্যাবরেটরি প্রায় অচল এখন, লেবোঁ বোন বন্‌ডেড গান-এর ফর্মুলা চুরি করে বাজারে না ছাড়লে এতদিনে আমি বহু টাকার মুখ দেখতাম, এখন কত সময় আমি তোমার জন্যে দিতে পারব বলতে পারছি না মিস্টার পিন্‌ডি—

'শুনে আমি বললাম, টাকার জন্যে ভেবো না, আমি আমার ক্লাবের থেকে পাঁচ হাজার ডলার তোমাকে আগাম দেব, তা ছাড়া কিং-অফ-কিংস্-এর প্রাইজ্ মানি দু'লক্ষ ডলার—তোমার সাহায্য পেলে সে-টাকা আমি পাবই—আমার খেলার দিব্বি কেটে বলছি এই দু'লক্ষ ডলারও আমি তোমার ল্যাবরেটরিতে দিয়ে দেব—আমার কাছে এখন টাকার থেকে ইজ্জত ঢের বড়। এখন থেকে ওই খেলা পর্যন্ত তুমি আর আমি এক মন-প্রাণ দিয়ে কাজ করব এই গ্যারান্টি তুমি দাও। শুনে ডক্টর বন্ সানন্দে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ডান্।

'এরপর কী কী ভাবে ডক্টর লেবোঁর প্ল্যান জানা যেতে পারে আমরা সেই আলোচনায় মগ্ন, কারণ নারলেকারের ওপর তো পুরো ভরসা করা যাচ্ছে না। ছলে-কৌশলে তার জঙ্গলের ল্যাবরেটরিতে কোনও বিজ্ঞানী-গোয়েন্দা লাগান যায় কি না এই আলোচনা করছিলাম। এমন সময় টেবিলের টেলিফোন বেজে উঠল। সাড়া দিয়ে বন্ রিসিভারটা বাড়িয়ে দিল, তোমার বন্ধু নারলেকার—

'আমি নারলেকারকে ডক্টর বন্-এর ফোন নম্বর দিয়ে এসেছিলাম বটে, যদি ম্যানেজার বা কোচ আমার খোঁজ করে এই জন্যে। কিন্তু নারলেকার ফোনে যা বলল, শুনে আনন্দে দু'চোখ আমার কপালে। মেঘ না চাইতে জল! ধর্মযুদ্ধের এই সেই লাক ফ্যাক্টর।... নারলেকার রাস্তায় হাঁটতে বেরিয়েছিল, মুখোমুখি তার সঙ্গে ডক্টর লেবোঁর কমবাইনড্ হ্যান্ড নেবুচির দেখা, তার হাতে বিশাল কার্ড-বোর্ডের বাক্স। দু'জনেই দু'জনকে দেখে প্রথম হতভম্ব। দুই এক কথার পরেই খুব অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো তার গলা জড়িয়ে ধরে নারলেকার বলেছে, পিন্‌ডি তোমার শত্রু, আর সে আমারও পয়লা নম্বরের শত্রু এখন, আমাকে মিথ্যে করে পিন্‌ডি সাজাবার জন্যে ডক্টর লেবোঁ ভুল করে আমার মগজ অপারেশন করেছে, ফলে আমার কীর্তে ক্ষতি হয়েছে তুমি ভাবতে পারবে না নেবুচি, তাই কেবল তোমাকেই চুপি চুপি বলছি, আমি লন্ডন থেকে এখানে এসেছি পিন্‌ডিকে খুন করতে—খুন করে ফাঁসি যেতে হয় তা-ও আচ্ছা। আর তোমার সঙ্গেও কি সে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি, তোমাকে আবার আগের মতো লম্বা করে দিয়ে কথা রেখেছে? রাগে নেবুচির দু'চোখও জ্বলতে লাগল। কিন্তু তারপরে সে হেসে হেসে বলল, পিন্‌ডি-নিপাত আমিও চাই, কিন্তু তার জন্যে নিজে হাতে তাকে খুন করার রিস্ক্ তোমাকে নিতে হবে না বন্ধু, ডক্টর লেবোঁ আর হুটেনটেটর তার জন্যে এমন ফাঁদের ব্যবস্থা করেছে, যে ব্রেজিল শিল্ড আর কিং-অফ-কিংস্-এর একসঙ্গে ডবল টুর্নামেন্ট খেলা হয়ে গেলেই পিন্‌ডি নিজেকে নিজে খুন করবে, আত্মহত্যা করা ছাড়া তার আর কোনও উপায় থাকবে না। এই ক'টা দিন রোসো—মিথ্যে খুনখারাপির মধ্যে যেও না। নারলেকার জানাল, নেবুচি এসেছে তার প্রভুর ল্যাবরেটরির মস্ত ইলেকট্রনিক ঘড়িটা কী গণ্ডগোল করছে বলে একটা বড় ঘড়ির কোম্পানিতে সারাতে দিতে। বিকেলের আগেই ফিরে যাবে। কী করবে ভেবে না পেয়ে নারলেকার জামাই-আদরে তাকে লাঞ্চের নেমন্তন্ন করে মস্ত একটা হোটেলে তুলেছে, একবেলার জন্যে ঘর ভাড়া করে এরই মধ্যে তাকে পাঁচ বোতল বিয়ার খাইয়েছে। তারপর ঘরে লাঞ্চের অপেক্ষায় বসিয়ে রেখে এই ফোন করছে—প্রশ্ন, এখন কী করবে?

'তাকে ফোনটা একটু ধরতে বলে আমি যত তাড়াতাড়ি পারি ডক্টর বনকে ব্যাপারখানা বললাম। শুনে ডক্টর বন্ বসা থেকে একেবারে লাফিয়েই উঠল—বাই জোভ! ইলেকট্রনিক ঘড়ি মেরামত করার জন্যে এসেছে! ল্যাবরেটারির ঘড়ি? পিন্‌ডি তোমার বন্ধুকে বলো নেবুচিকে ঘড়ি মেরামতের জন্যে মেসার্স ডিংডং কোম্পানিতে নিয়ে যেতে. এই তাদের ঠিকানা—নেবুচিকে যেন বলে এদের থেকে বিশ্বস্ত আর বড় দোকান এ তল্লাটে আর নেই—আগে তোমার বন্ধুকে বলে নাও, তারপর কথা।

'আমি আবার ফোনে নারলেকারকে সেই ইনস্ট্রাকশন দিলাম, বললাম, খরচের জন্যে ভাবনা নেই, নেবুচিকে গলা পর্যন্ত লাঞ্চ খাইয়ে কেবল এই কাজটি করো।

'ফোন রাখতে ডক্টর বন্ তক্ষুনি বেরুবার জন্যে প্রস্তুত। আহ্লাদে ডগমগ সে। জানাল, মেসার্স ডিংডং ঘড়ি কোম্পানির মালিক মিস্টার ডিংডং তার অন্তরঙ্গ বন্ধু। তার কাছ থেকে অনেক বৈজ্ঞানিক ব্যাপারে সাহায্য পায় বলে লোকটা বিশেষ কৃতজ্ঞ। আর সময় নেই পিন্‌ডি, ওরা পৌঁছুবার আগেই আমাকে গিয়ে ডিংডং-কে তালিম দিয়ে রাখতে হবে। আমি তার খাসকামরায় থাকব। নেবুচি আমাকে চেনে, কিন্তু সে আমাকে দেখতে পাবে না, তুমি আমার ফোনের জন্যে অপেক্ষা করো, আর কিছু টাকা মজুত রেখো।

'ডক্টর বন্ হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল। ঘন্টা তিনেক বাদে তার ফোন পেলাম। গলায় উল্লাস। –কেল্লা ফতে পিন্‌ডি, ঘড়ি মেরামত হয়ে ফিরে গেলেই আমরা ডক্টর লেবোঁর প্ল্যান জানতে পারব–না ফোনে আর একটিও কথা নয়, তুমি বিকেলের দিকে প্রথম কিস্তির পাঁচ হাজার ডলার নিয়ে এসো।

'ভয়ে ভয়ে বললাম, কিন্তু পরের দু'লক্ষ ডলার তো খেলায় জিতে হাতে টাকা না পেয়ে দিতে পারব না।

'দিতে হবে না, পরেই দিও, ওদের বৈজ্ঞানিক উপায় আমি বানচাল করবই জেনে রেখো।

'ম্যানেজারের কাছ থেকে পাঁচ হাজার ডলার নিয়ে আমি বিকেলে হাজির হলাম। ডক্টর বন্-এর প্ল্যান শুনে আমি থ। এত সহজ! কিন্তু সহজ হলেও অব্যর্থই মনে হল। ব্যাপার আর কিছু না। নেবুচি যে মেরামত করা ঘড়ি নিয়ে যাবে তাতে একটা সিঙ্গল্ চ্যানেল ছোট্ট টি.ভি. ট্র্যান্স রিসিভার সেট। নেবুচি সাতদিন বাদে ঘড়ি নিয়ে ফিরবে। শুনলাম, ডক্টর লেবোঁ সব ইম্পরট্যান্ট কাজ দুপুর তিনটে থেকে ছটার মধ্যে করে। সাত দিন পরে রোজ আমাকে ওই সময় বন্-এর ল্যাবরেটরিতে হাজির থাকতে হবে।

সাত দিন ছেড়ে মাস ঘুরে গেল। টি.ভি. চালিয়ে আমরা কেবল নেবুচি আর ডক্টর লেবোঁকে দেখতে পাই। এক মাসের মধ্যে দিন তিনেক হুটেনটেটরকেও লেবোঁর সঙ্গে দেখলাম। ফুর্তিতে খোশ-গল্প করছে, খানা খাচ্ছে, আর আমার অর্থাৎ পিন্‌ডির মুণ্ডুপাত করছে।

'শিল্ড খেলার আর মাত্র পনেরো দিন বাকি। ব্রেজিলে হইচই পড়ে গেছে। এক খেলায় দুই বিরাট ট্রফি, এমন তো আর হয়নি। এখন থেকেই ছোট বড় সব হোটেল বুকড্। বাছাই দল আসছে সমস্ত পৃথিবী থেকে। ব্রেজিল ইলেভেনের কোচ আর ম্যানেজার দু'বেলা এসে পিন্‌ডি-পুজো করে যায়। কাগজে নানা গুজব পড়ে তারা নার্ভাস। কিন্তু পিন্‌ডিও তো একটা মানুষ। আমারই কি মাথার ঠিক আছে, রোজ সময় ধরে বন্-এর সিঙ্গল চ্যানেল টি.ভি.-র সামনে বসি, হুটেনটেটরকে এখন ঘন ঘন লেবোঁর কাছে টি.ভি-তে দেখি, কিন্তু এখনও তো তাদের প্ল্যানের হদিস পেলাম না!

'ঠিক পনেরো দিন আগে পেলাম। টি.ভি.তে দেখলাম, অক্সডনের চোদ্দজনের মধ্যে এগারোজন খেলোয়াড় ডক্টর লেবোঁর ল্যাবরেটরির সামনে লাইন করে দাঁড়িয়ে। হুটেনটেটরের পাশে ওই তো ওদের ক্যাপটেন গোল্‌ড্‌স্টোন আর ক্যানডি! ওই তো বাকি আট ন'জন খণ্ড মার্কা খেলোয়াড়! আমি আর ডক্টর বন্ রুদ্ধশ্বাসে দেখছি। হুটেনটেটর প্রথমে তার ক্যাপ্টেন গোল্‌ড্‌স্টোনকে নিয়ে ল্যাবরেটরিতে ঢুকল। লেবোঁর নির্দেশে সে গোল্‌ড্‌স্টোনের চুলের মুঠি ধরে টান দিতেই দেখা গেল তার হাতে সব চুল উঠে এল। অর্থাৎ ওটা পরচুলা, গোল্‌ড্‌স্টোনের সমস্ত মাথা মসৃণভাবে কামানো! এ কী কাণ্ড, নিশ্বাস বন্ধ করে দেখছি। মাথা কামানো ক্যাপ্টেন গোল্‌ড্‌স্টোন টেবিলে শুয়ে পড়ল। পাশে রাখা বিভিন্ন যন্ত্র চালিয়ে নেবুচি তার রক্তচাপ হার্ট অক্সিজেন সব সচল রাখছে। ডক্টর লেবোঁ ক্ষিপ্র হাতে লেসার-কাটার দিয়ে দু'ইঞ্চি প্রমাণ জায়গা কানের পাশ দিয়ে গোল করে কেটে ফেলল। তারপর অসংখ্য সরু সরু তার আর তারের মাথায় খুব ছোট ছোট চিপ লাগানো একটা প্লেট বসিয়ে দিল। তারপর সরু তারের চিপ লাগানো একটা

প্লেট বসাতে লাগল। এক মিনিটে কাজ শেষ করেই সেই ইঞ্চি কাটা খুলি আবার ফিট করে একটা বন্দুকের মতো কী টিপতে কাটা অংশের চার দিকে জলীয় কী ছিটকে পড়ল। দাঁতে দাঁত ঘষে ডক্টর বন্ বলে উঠল, বোন বনডেট্ গান! দেখতে দেখতে কাটা জায়গা এমন জুড়ে গেল যে দূরবিন লাগিয়েও কেউ বুঝতে পারবে না!

'একটা যন্ত্র টিপে গোল্‌ডস্টোনের চেতনা ফেরানো হল। সব মিলিয়ে তিন মিনিটের ব্যাপার। গোল্‌ডস্টোন তার মাথায় অবিকল নিজস্ব ধরনের চুলের পরচুলা পরিয়ে দেওয়া হল। সে সুস্থ স্বাভাবিক হেঁটে বেরিয়ে এল। আমি উদগ্রীব হয়ে ডক্টর বন্-এর দিকে তাকালাম। গম্ভীরমুখে সে বলল, ওয়েট, দেখে যাও।

'তারপর টেবিলে এল ওদের গোল-কিপার ক্যান্‌ডি। হ্যাঁ, তারও মাথায় নিজস্ব চুলের পরচুলা। সেটা খুলে তিন মিনিটের মধ্যে তারও অপারেশন এবং কানের পাশে দু'ইঞ্চি ফাঁকে মেশিন বসানো হল। একে একে বাকি ন'জনেরও তাই করা হল। পরচুলার নিচে সকলেরই ন্যাড়া মাথা। কিন্তু কেউ ধরতে পারবে না। পরচুলাগুলো আগে থাকতে অবিকল নিজস্ব চুলের মতো তৈরি করা।

'তেত্রিশ মিনিটের মধ্যে এগারো জনের অপারেশন এবং যন্ত্র বসানো শেষ।

'এবারে থমথমে গলায় ডক্টর বন্ বলল, ডক্টর লেবোঁ প্রত্যেকের মগজে যে যন্ত্রটি ফিট করল তা হল রিমোট কনট্রোল কম্পিউটারাইজড্ ব্রেন কনট্রোল অ্যাকুইভেটর। সরু তারের ওপর চিপগুলোর সঙ্গে মেমরি-সেল, ক্রিয়েটিভ-সেল, অ্যাকশন-সেল যুক্ত। অর্থাৎ বাইরে থেকে কেউ ওই মাঠের এগারো জনকেই, অর্থাৎ যে ক'জনকে ইচ্ছে কম্পিউটারে তাদের খেলাবে—মেশিনের নিখুঁত খেলাই বলা যেতে পারে—কারণ সবরকম বিপদ বা ক্রাইসিস কাটানোর নির্দেশও ওই কম্পিউটার থেকেই খেলোয়াড়দের মেমারি-সেল, ক্রিয়েটিভ-সেল, বা অ্যাকশন সেল-এ মুহূর্তে যাবে।

'আমি পিন্‌ডি এমন ঘাবড়ানো জীবনে ঘাবড়াইনি। এগারোটা নিখুঁত যন্ত্র-খেলোয়াড়ের সঙ্গে পৃথিবীতে কে পারবে? ডক্টর বন্ আশ্বাস দিল, কিছু ভেব না, ওদের কৌশল জানা গেছে যখন নিশ্চিন্ত থাকো। এখন খেলার পনেরো দিন বাকি, আমার চার-পাঁচ দিন মাত্র লাগবে।

'যাক, খেলার দিন এসে গেল। বহু টিম। প্রথমে ছাঁটাই-বাছাইয়ের খেলা। তারপর দু'দিক থেকে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ সেমিফাইনাল—এই পাঁচ-পাঁচ দশ রাউন্ডের খেলা। কিন্তু ব্রেজিল ইলেভেনের ফার্স্ট রাউন্ডের খেলায় আমি পিন্‌ডি, টিমের মেরুদণ্ড—এক ভীষণ বিপত্তি বাধিয়ে বসলাম। খেলা শেষ হতে মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি, হেসে খেলে তিন গোলে জিতছি, এমন সময় পড়ে গিয়ে বাঁ হাতের রিস্ট, মানে কবজি ভেঙে বসলাম! পরদিন কাগজে কাগজে আমার ছবি বেরুল। মন্তব্য, পিন্‌ডির এই টুর্নামেন্টে আর সম্ভবত খেলাই হবে না, হাড়ের সামান্য ফ্র্যাকচারের সঙ্গে রিস্টের নার্ভেরও ক্ষতি হয়েছে, দু'তিন জন স্পেশালাইজড্ ডাক্তারের এই মত।

'ক্লাবের সকলের মাথায় হাত। আমি কেবল ম্যানেজার আর কোচকে আলাদা করে ডাকিয়ে চোখ টিপে দিলাম, কিছু ভেব না। বললাম, কোনও প্রশ্ন কোরো না, কাউকে কিছু বোলো না, শুধু জেনে রেখে দাও ফাইনালে আমরা পৃথিবীর এক অজেয় দলের সঙ্গে লড়তে যাচ্ছি, যদি জিততে চাও, আমি যা বলি কেবল তাই করে যাও।

'তারাও বোকা নয়, যা বোঝার বুঝে নিল এবং কাগজে আমার সম্ভাব্য অনুপস্থিতির আশঙ্কা আরও বড় করে ছাপতে লাগল। পরের প্রত্যেক রাউন্ডে কবজিতে নরম অথচ মোটা একটা ব্যান্ড লাগিয়ে চোদ্দজন বাছাই দলের হয়ে মাঠে নামি, বুট ইত্যাদি পরীক্ষা হয়ে গেলে অবশিষ্ট তিন জনের সঙ্গে বসে থাকি। অর্থাৎ সে-রকম দরকার হলে কোচ আমাকে খেলতে নামাবে, নইলে রিজর্ভ নেবে না। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় রাউন্ডে আমার নামারই দরকার হল না। আমাদের টিমও তো দুর্ধর্ষ, দু'গোল করে জিতলাম। ফোর্থ রাউন্ডে খেলা শেষের কুড়ি মিনিট আগে পর্যন্ত ড্র যাচ্ছে দেখে কোচ আমাকে মাঠে নামালেন। ষোলো মিনিটের মধ্যে লক্ষ লক্ষ দর্শককে অবাক করে দিয়ে আমি চারটে

গোল দিয়ে খেলা শেষের চার মিনিট আগে কবজির ব্যথায় আবার ঢলে গেলাম। সেমি ফাইনালে খেলা শেষের পনেরো মিনিট আগে পর্যন্ত আমরা এক গোলে হারছিলাম। সেই পনেরো মিনিট আগে নেমেও আমি পর পর চার গোলই দিলাম। খেলা শেষ হতে হাতের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ক্লাবে ফিরলাম। খেলার সময়টুকু বাদে নারলেকার সর্বক্ষণ ছায়ার মতো আমার সঙ্গে থাকে, কোচ আর ম্যানেজার অন্য সকলকে সরিয়ে দেয়।

'এবারে ফাইনাল, এবং সেই হুটেনটেটরের অক্সডন ক্লাবের সঙ্গেই। সমস্ত ব্রেজিলে যেন উত্তেজনা আর উৎসবের দিন সেটা।'

'এদিকে অক্সডন ক্লাবের প্রত্যেক রাউন্ডের খেলা ভিড়ের মধ্যে বসে আমি লক্ষ করে যাচ্ছি। চার পাঁচ জনের নিখুঁত ছবির মতো খেলা দেখে তখনই বুঝেছি হুটেনটেটর কম্পিউটারাইজড্ মেশিনে ওই ক'জনকে কেবল খেলাচ্ছে। ওরা চার-পাঁচ ছটা করে ছবির মতো গোল দিচ্ছে, অক্সডনের গোলকিপার অনায়াসে বিপক্ষ দলের পেনাল্টি শটও আটকে দিচ্ছে। কাগজগুলোতেও লিখছে এমন মোহিত হবার মতো খেলা অক্সডনের আর দেখা যায়নি। মনে হয় যন্ত্রের পারফেকশনে খেলছে তারা।

'ফলে ফাইনালে দর্শকদের আর জুয়াড়িদের মধ্যে লক্ষ-লক্ষ ডলারের বাজি ধরাধরি চলছে।

'ব্রেজিল ইলেভেন ভার্সেস অক্সডন ইলেভেনের খেলা শুরু হল। শ্বাস বন্ধ করে সকলে দেখল হাফ-টাইম পর্যন্ত ব্রেজিল ইলেভেন চার-শূন্য গোলে হারছে। অক্সডন নিখুঁত খেলা খেলছে। হাফ-টাইমে কাঁদ-কাঁদ গলায় কোচ বলল, কী পিনুডি, এখনও তুমি নামবে না একেবারে ভরাডুবি হলে চিন্তা করবে? দর্শকরা ব্রেজিল ইলেভেনকে দুয়ো দুয়ো করছে।

'নারলেকার এসে চুপিচুপি বলল, হুটেনটেটরের টেন্টে গিয়ে দেখলাম লেবোঁ আর হুটেনটেটর নাচছে, তাদের কম্পিউটার বলছে, প্রথম হাফে বেশি দিলাম না, এবারে গুনে গুনে আরও সাত গোল দেখ!

'হাফ-টাইমের পর নারলেকারের কানে কানে কিছু বলে পিনুডিকে নামতে দেখে দর্শকে ঠাসা মাঠ একটু চাঙা। কিন্তু এমন খেলা খেলছে অক্সডন, চার গোল শোধ করে আর কি জেতা সম্ভব? পিনুডি নামলেই বা!

খেলা শুরু হল। কিন্তু আমার পায়ে বল পড়লেই উলটোদলের যে সামনে আসে তারই খেলা কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে, একটা ঝোঁক খেয়ে ভুল করে উলটো দিকে সরে যাচ্ছে। ওদের মধ্যে এলোমেলো কাণ্ডটাই বেশি হচ্ছে। আমি পিনুডি একে একে চার গোল শোধ করলাম। তারপর রসগোল্লার মতো বল গোলের মুখে একজনকে পাশ করে ছুটে গেল-কিপারের দিকে যেতেই তারও কী হল, গোল বাঁচানোর জন্য সে উলটো দিকে ঝাঁপ দিল। গোল! ব্রেজিল ইলেভেন এক গোলে জিতছে। পিনুডি পায়ে বল পেলে এরপর ওদের খেলা আরও এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে—আমিই অনায়াসে আর একটা গোল শোধ করালাম। এ পর্যন্ত সিক্স-ফোরে জিত। পরের গোলটা আগের মতোই আর একজনকে দিয়ে করলাম। সেভেন ফোরে জিত! শেষ গোলটা দেবার আগে আমি ঘন ঘন নারলেকার যেখানে বসে সেদিকে তাকাচ্ছি। হ্যাঁ লাল-নিশান চোখে পড়ল—খেলা শেষের দু'মিনিট আগেই আমি আমার ষষ্ঠ এবং টিমের অষ্টম গোল করেই আছাড় খেলাম এবং যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে গড়াগড়ি খেতে লাগলাম। নারলেকার আর ম্যানেজার এবং কোচ স্ট্রেচার নিয়ে ছুটে এল আর যন্ত্রণায় নীলবর্ণ অবস্থায় আমাকে স্ট্রেচারে তুলে মাঠের বাইরে নিয়ে চলে গেল।

'আমি জানি আর মাত্র দু'মিনিটের মধ্যে ওরা বড় জোর একটা গোল শোধ করতে পারে। তাই করল। তারপর শেষের বাঁশি বাজল। ব্রেজিল ইলেভেনের এইট টু ফাইভে জিত!

'কিন্তু বাইরের হুল্লোড়ের মধ্যেই রক্তবর্ণ মুখে হুটেনটেটর এবং ডক্টর লেবোঁ তিন জন অ্যাসোসিয়েশনের কর্ম-কর্তাকে নিয়ে আমাদের ক্লাব টেন্টে হাজির। তাদের কী নালিশ আছে। ওদের দেখে আমি কবজির যন্ত্রণায় আরও নীল, ডক্টর বন্ আমার ফোলা কবজিতে লোশন স্প্রে

করছে। তাকে দেখে ডক্টর লেবোঁ ত্রো থ। তারপর চিৎকার করে উঠল, আমি ওর সেই কব্জির রিস্ট ব্যান্ডটা দেখতে চাই।

'ঘামে ভেজা ব্যান্ডটা নারলেকার তার সামনে ধরল। ওপরে নিচে ফোম, মাঝে চামড়া। রাগের চোটে সেই ব্যান্ড ডক্টর লেবোঁ কুচি-কুচি করে কেটে দেখল। কিচ্ছু পেল না। আরও রাগের চোটে লোক দিয়ে আমার বডি সার্চ করল। কিচ্ছু পেল না। ডক্টর লেবোঁ আর হুটেনটেটের আবার আমার সামনে ঝুঁকতে আমি ককিয়ে বলে উঠলাম, হা ভি স্পা ডবলিউ বি!

'তারা হাঁ করে আমার দিকে চেয়ে রইল। তেমনি ককিয়ে আমি আমাদের ম্যানেজার আর কোচকে বললাম, এবার তোমরা ওদের টেন্টে গিয়ে ওদের এগারোটা প্লেয়ারের ন্যাড়া মাথায় পরচুলা কেন জানতে চাও?

'শোনামাত্র ডক্টর লেবোঁ আর হুটেনটেটের চোরের মতো মুখ করে পালিয়ে গেল। এরপরে লক্ষ লক্ষ লোকের অভিনন্দনের মধ্যে আমি ক্যাপটেন পিনডি ব্রেজিল শিল্ড নিলাম, কিং-অফ-কিংস্‌-এর গোল্ড কাপ নিলাম, দু'লক্ষ ডলারের চেকটা নিয়ে ডক্টর বন্‌কে দিয়ে বললাম, এটা তোমার কাছে রাখো, পরে ভাঙিয়ে দেব।

গল্প শেষ করে অন্ধকারে পিন্‌ডিদা নিজের হাত-ঘড়ি দেখল। কিন্তু আমরা তখনো যে তিমিরে সেই তিমিরে। জিগেস করলাম, এটা সম্ভব হল কী করে?

পিন্‌ডিদার জবাব, ওই চামড়া আর ফোমের রিস্ট ব্যান্ডটা কি বুঝলি না? ওটা হল ডক্টর বন্‌-এর আবিষ্কার হাই ভোলটেজ স্পার্ক রিস্ট ব্যান্ড—দেড় ব্যাটারিতে চলে, ওর সঙ্গে 'ভোলটেজ্‌ ডাবলার'-এর টিপস লাগানো ছিল—কব্জি বাঁকানো মানেই সুইচ অন্‌, বিপক্ষের সঙ্গে আমার গায়ের ছোঁয়া লাগলেই ওদের মগজের অ্যাকুইডেটর অকেজো—'ডি. কনট্রোল' —নিজের ব্রেনে তো খেলছে না—তাই একেবারে এলোমেলো দশা।

আমি আবার জিগেস করলাম, সুইচ অন করে দেড় ব্যাটারি ভোলটেজ দেড়শো করে দিলে তোমার নিজের অসুবিধে হল না কেন?

'—এই সহজ কথাটাও বুঝলি না, আমার বুটে স্পেশালি ইনসুলেটেড রাবার লাগানো ছিল, সুইচ অফ থাকলে ওটা দেখে কে কী বুঝবে? আর অন করা থাকলে আমার অসুবিধের কী আছে?'

কেবলু চেঁচিয়ে উঠল, কিন্তু তোমার ওই লেদার-ফোম রিস্টব্যান্ড ডক্টর লেবোঁ আর হুটেনটেটের তো কুটি-কুটি করে কেটে পরীক্ষা করে গেল? কিছু পেল না—কিম্‌ আশ্চর্যম!

পিন্‌ডিদা হেসে বলে উঠল, ত্বং হস্তী মূর্খং! খেলা শেষ হবার দু'মিনিট আগে আমি আবার চোট লাগার ভান করে বেরিয়ে এলাম কেন? টেন্ট ক্লাবে এসে নারলেকারের প্রথম কাজই হল ওটা আভেনে গিয়ে হাই করে ফেলা, ওরা যেটা দেখে গেছে সেটা একটু জলে ভেজানো নির্ভেজাল ব্যান্ড—মানে ঘামে ভেজা বোঝানোর জন্যে জল ছিটিয়ে রাখা হয়েছিল।

আধ মিনিটখানেক কারও মুখে কথা নেই। শেষে আমারই গলা দিয়ে স্বর বেরুল। করুণ সুরে জিগ্যেস করলাম, আচ্ছা পিন্‌ডিদা, তন্দুরি কি তন্দুরি খায়?

—কী বলছিস, তন্দুরি তন্দুরি খায় কী রে?

—তাই তো বলছি, বিনোদের দোকানের হাফ-আঁচের তন্দুরি এখন আর্তনাদ করে তোমার পেটে ঢুকতে চাইছে, আর আমাদেরও তোমার সঙ্গে যেতে হচ্ছে, কিন্তু আমরা এখন কে? তোমার দেড় ব্যাটারির গল্পের, ঘুড়ি ঘটনার আভেনের হাই ভোলটেজে ঝলসে-ঝলসে খাসা এক একখানা তন্দুরি বনে গেছি, কিন্তু আমাদের দিকে হাত বাড়ায় কে?

পিন্‌ডিদা মুখে সস্নেহ হাসি, উঠতে উঠতে বলল, অমন কথা বলিস না, তোরা আমার বুকের পাঁচখানা পাঁজর, চল্‌, আর দেরি করে লাভ নেই।